অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১৬শ বর্ষ—২য় খণ্ড

(ভাদ্র—মাঘ, ১৩২৬)

সম্পাদক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল্
শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র

প্রকাশক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়
অর্চ্চনা-কার্য্যালয়—পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন,
অর্চ্চনা পোষ্ট, কলিকাতা।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।



[illegible]

[illegible] ও সমালোচনী।

১৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩২৬

১ম সংখ্যা

আত্ম-নিবেদন।

আজ জন্মাষ্টমী। কবে কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কংস-কারাগারে নীলনীরদকান্তি শিশুর আবির্ভাব হইয়াছিল—আজি এই ঘোর তামসিক যুগেও যাঁহার লীলামাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া শত শত নরনারী এই মায়াময় বিশ্ব-সংসারের মোহপাশ ছিন্ন করিতেছে। কবে কোন্ বনে, কোন্ কুঞ্জে সেই শিশু মোহন মুরলী বাজাইয়াছিলেন, আজিও সে সুর ভারতবাসী ভুলে নাই। আজ ছোট-বড়, উচ্চ-নীচের যে পার্থক্য মুছিয়া ফেলিবার জন্য সারাবিশ্ব সচেষ্ট, সে পার্থক্য মুছিবার মন্ত্র দ্বাপরে তিনি দিয়া গিয়াছেন—ঐকান্তিক প্রেম। রাজার ছেলে মাঠে মাঠে বেণু বাজাইয়া গরু চরাইয়াছেন, বনের ফল পাড়িয়া শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদামের সহিত একত্র ভোজন করিয়াছেন, ভক্তিমতী শ্রীরাধিকার প্রাণে প্রেমের আগুন লাগাইয়া দিয়াছেন, প্রেমের জোরে ব্রজের গাছপালা, যমুনার জলকেও উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। অপ্রতিহত উদ্দাম রাজশক্তির গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, কংসের দর্প চূর্ণ করিয়া কুরু-বংশের ধর্ম্মহীনতার অবসান করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রমত্ত রাজশক্তি ক্ষণভঙ্গুর। ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে তিনি যে নীতির শিক্ষা দিয়াছেন, সে নীতিতে একদিন বিশ্ব জাগিয়া উঠিবে—সেই দিনই আসল যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

আজ এই শুভদিনে তাঁহার শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া তাঁহার চরণকমলে প্রণত হইয়া আমরা নূতন আকারে নূতন ভাবে "অর্চ্চনা" আরম্ভ করিলাম। নিন্দা-স্তুতি, লাভালাভ, [illegible] তুল্য জ্ঞান করিয়া, কর্ম্মফল তাঁহাকে অর্পণ করিয়া যেন কার্য্য করিতে পারি, যেন চিরদিন বলিতে পারি—

> ত্বয়া হৃষিকেশঃ হৃদিস্থিতেন
> যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

১লা ভাদ্র, ১৩২৬।

রেখা-গণিত।

[শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, বি-এ]

মুখবন্ধেই বলিয়া রাখা ভাল যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক গণিতশাস্ত্রকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ডেঙ্গু অপেক্ষা বেশী ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু যে ছেলের ভূতের ভয় বেশী, ভূত দেখিবার আগ্রহও তারই যেমন বেশী দেখা যায়, আমারও কতকটা সেই অবস্থা।

বাল্যকাল হইতে একটা গল্প শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, ইউক্লিডের জ্যামিতির সম্পূর্ণ পুস্তক নাকি জয়পুরে আছে। তখন মধ্যে মধ্যে আতঙ্ক হইত পাছে সেই সমগ্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়া আমাদের পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত হয়। এখন আর সে বিভীষিকা নাই, তাই কথায় কথায় এ বিষয় একজন স্থানীয় পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জয়পুরাধিপতি সুবিখ্যাত জ্যোতিষ-শাস্ত্রবেত্তা মহারাজ সবাই জয়সিংহের সভাপণ্ডিত "সম্রাট" জগন্নাথ-কৃত "সম্রাজ-সিদ্ধান্ত" ও "রেখা-গণিত" পুস্তকের উল্লেখ করেন।

উক্ত "রেখাগণিত" পুস্তকের কিয়দংশ পণ্ডিত কমলাশঙ্কর প্রাণশঙ্কর ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্পাদকতায় বম্বে গভর্ণমেণ্ট সেণ্ট্রাল বুক ডিপো কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমি পণ্ডিত-সম্রাট জগন্নাথের "রেখা-গণিতের" পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছি। আশা করি, বিশেষজ্ঞগণ আমার এই দুঃসাহসিকতা মার্জ্জনা করিবেন।

গ্রন্থ-পরিচয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সম্পাদক ত্রিবেদী মহাশয় কি প্রকারে কোন কোন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার বোধ হয় প্রয়োজন আছে। ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, বরোদার স্বর্গীয় হরিলাল হর্ষাদারাই ধ্রুব মহাশয় সর্ব্বপ্রথম এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। মিঃ ধ্রুব Stockholm ও Christiannয় অষ্টম "International Congress of Orientalists" পণ্ডিত-সভায় বরোদারাজ কর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া যোগদান করেন এবং সেখানে "রেখা-গণিত" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। জগন্নাথ-কৃত "রেখা-গণিত" পুস্তক সম্পূর্ণ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ইহার পুঁথি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সম্পাদক ত্রিবেদী মহাশয় ইঁহার পত্নীর নিকট উক্ত গ্রন্থের কিয়দংশ হস্তলিপি প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু ইহা অসম্পূর্ণ বলিয়া সমগ্র পুঁথির জন্য অন্যত্র চেষ্টা করিয়া নিম্নলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করেন এবং সেই সকল অবলম্বন করিয়া "রেখা-গণিত" প্রথমাংশ সম্পাদন করিয়াছেন।

(১) স্বর্গীয় মিঃ ধ্রুব কর্ত্তৃক সংগৃহীত পুঁথি।

(২) ত্রিবাঙ্কুর মহারাজ কলেজের পুঁথি।

(৩) কাশীর গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় ভেনিস মহোদয়ের প্রদত্ত পুঁথি।

(৪) কাশী গভর্ণমেণ্ট কলেজে রক্ষিত দ্বিতীয় পুঁথি। এই পুঁথিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য, কেন না ইহা জয়পুরাধিপ মহারাজ সবাই জয়সিংহের আজ্ঞায় তাঁহার ব্যবহারের জন্য লোকমণি নামক কোন "লেখক"-কর্ত্তৃক গ্রন্থের লিখিত পুঁথির নকল। ইহা গ্রন্থ লেখার কয়েক বৎসর পরেই সম্বৎ ১৭৮৪তে (১৭২৮ খ্রীঃ) লিখিত। ইহার পরিচয়ে লোকমণি লিখিয়াছেন:—

"যুগবসুনগভূবর্ষে শুচিশুক্লে যুগতিথৌ রবেবারে।
ব্যলিখল্লোকমণিঃ কিল সম্রাজ্ঞামাজ্ঞয়া পুস্তকম্॥"

গ্রন্থ-পরিচয়।

গ্রন্থ-পরিচয়ের সঙ্গে গ্রন্থকারের একটু পরিচয় দি বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কথিত আছে যে, একবার বাদশাহ ঔরঙ্গজেব মহারাজ সবাই জয়সিংহকে বলেন যে, তাঁর বিশ্বাস যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা আরবী ও ফার্সি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে না। মহারাজ বাদসাহের এই ধারণা দূর করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে জগন্নাথ পণ্ডিতকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন এবং তাঁহাকে জয়পুরে পাঠাইয়া আরবী ও ফার্সি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। জগন্নাথ পণ্ডিতের তখন বয়স ২০ বৎসর মাত্র, অথচ সেই বয়সেই তিনি সংস্কৃতশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত। পণ্ডিত সম্রাট কালে আরবী ও ফার্সিতেও বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং আরবী ভাষা হইতে "রেখা-গণিত" ও "সিদ্ধান্ত সম্রাজ" দুই গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ অথবা সংকলন করেন।

জগন্নাথ-কৃত "সিদ্ধান্ত সম্রাজ" গ্রন্থও রেখাগণিত-সংক্রান্ত, ইহাতে ত্রয়োদশটি অধ্যায়, এক শত একচল্লিশ প্রকরণ এবং এক শত ছিয়ানব্বই ক্ষেত্র আছে। কথিত আছে, ইহার অনেকগুলি সিদ্ধান্ত মহারাজ জয়সিংহের কৃত। "রেখাগণিত" পঞ্চদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, ইহার প্রথম ছয় অধ্যায়ের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই; কেন না, ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম ছয় অধ্যায় প্রায় সর্ব্বজনপরিচিত। ৭, ৮, ৯ অধ্যায়ে জ্যামিতির গণিতাংশ ১০ম অধ্যায়ে "ভিন্ন"* অঙ্ক (Incomensurable quantity) সম্বন্ধীয় প্রতিপাদ্য এবং ১১শ হইতে ১৫শ অধ্যায় "ঘন" ক্ষেত্র (solid geometry) সম্বন্ধীয়।

"রেখাগণিত" গ্রন্থের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া জ্যামিতি (বা রেখাগণিত বা শিল্পশাস্ত্র) বিদ্যা সম্বন্ধে দু

* "রেখাগণিতে" যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে দিবার ইচ্ছা আছে। লেখক।

একটা আলোচনা-যোগ্য কথার অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি, আশা যে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহার মীমাংসা করিবেন।

উপরে লিখিত হইয়াছে যে "রেখাগণিত" আরবী ভাষা হইতে অনূদিত বা সংগৃহীত। পণ্ডিত জগন্নাথ কিন্তু গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন :—

"পূর্ব্ববিচ্ছিন্নং শাস্ত্রং যত্র কোণাববোধনাৎ।
ক্ষেত্রেষু জায়তে সম্যগ্‌ব্যুৎপত্তি র্গণিতে যথা॥
শিল্পশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্রহ্মণা বিশ্বকর্ম্মণে।
পারম্পর্য্যবশাদেতদাগতং ধরণীতলে॥
তদ্বিচ্ছিন্নং মহারাজ জয়সিংহাজ্ঞয়া পুনঃ।
প্রকাশিতং ময়া সম্যক্‌ গণকানন্দহেতবে॥"

ইহার অনুবাদের প্রয়োজন নাই। এই মুখবন্ধ পড়িয়া মনে হয় যে, রেখাগণিত বা "শিল্পশাস্ত্র" আমাদের দেশে বহুদিন হইতে 'পারম্পর্য্যবশাৎ" চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহা "বিচ্ছিন্ন" অবস্থায় ছিল; জগন্নাথ তাহাকে "সম্যক প্রকাশিত" করিয়াছেন; অর্থাৎ এ শাস্ত্রের জন্য আমরা অন্য কোন দেশের নিকট ঋণী নহি, ইহা ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি।

পক্ষান্তরে জগন্নাথের রেখাগণিত-বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থ, "সিদ্ধান্ত সম্রাজের" ভূমিকায় আছে :—

"গ্রন্থং সিদ্ধান্ত সম্রাজং সম্রাট্‌ রচয়িত স্ফুটং।
তুষ্ট্যৈ শ্রীজয়সিংহস্য জগন্নাথাহ্বয় কৃতী॥
আরবী ভাষয়া গ্রন্থো মিজাস্তী নামকঃ স্থিতঃ।
গণকানাং সুবোধায় গীর্বাণ্যা প্রকটীকৃতঃ॥"

ইহার অর্থও খুব সুস্পষ্ট। ইহাতে পণ্ডিতজী যে আরবী ভাষার "মিজাস্তী" * নামক গ্রন্থ হইতে জ্যামিতি অনুবাদ করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন।

এখন স্বভাবতঃ আমাদের মনে এই প্রশ্ন উদিত হয় যে, এই দুই পরস্পর-বিরোধী কথার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?—হয় রেখাগণিত ভারতের "শিল্পশাস্ত্র", নয় ইহা আমরা আরবের মারফৎ গ্রীস হইতে পাইয়াছি। এ তর্কের মীমাংসা করিতে গেলে আমার মনে হয় একটু "মহীপালের গীত" গাওয়ার প্রয়োজন।

ভারতে প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রই বেদ-মূলক—ব্রহ্মণা প্রোক্তং। শিল্পশাস্ত্র বা রেখা-গণিতের উৎপত্তি-স্থানও সেই বেদ। বৈদিক যজ্ঞের ভূমি, বেদী, কুণ্ড প্রভৃতি নির্ম্মাণের যে সমস্ত বিস্তারিত আদেশ তৈত্তিরিয় সংহিতা, ব্রাহ্মণ, বৌধয়ন এবং আপস্তম্বাদিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে আমাদের সন্দেহের কোন কারণ থাকে না যে, জ্যামিতিক সিদ্ধান্ত ভারতের নিজস্ব নহে। আপস্তম্বের কল্পসূত্রের ত্রিংশ অধ্যায় শূল্ভ সূত্র—ইহাতে বহু জ্যামিতিক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। এ সকল বহু প্রাচীন বলিয়া সকলেই মানিয়া থাকেন, কাজেই "ধার করা" বলিবার কোন হেতু দেখা যায় না। বরং এ সম্বন্ধে ম্যাকডোনেল সাহেব তাঁহার "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে" বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্রিয়া-কাণ্ড সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণ যে প্রকারে শুচিতা ও স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়া চলিতেন, তাহাতে এ ধারণা কোন প্রকারেই করা যায় না যে, তাঁহারা ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন বিষয়ের জন্য বৈদেশিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ম্যাকডোনেল সাহেবের এ কথা অত্যন্ত ঠিক। তা' ছাড়া বৈদিক যজ্ঞসংক্রান্ত যে সকল সূত্রাদির উপরে উল্লেখ করিয়াছি, সেগুলি গ্রীক সভ্যতার অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বের বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। আর একটা কথা—যে ভারত বৈদিক যুগ হইতে জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিত ইত্যাদির চর্চ্চা আরম্ভ হইয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, যেখানে সর্ব্বপ্রথম দশমিক গণনা ও বীজগণিত আবিষ্কৃত হইয়া তৎকালীন অন্যান্য সভ্যদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, যেখানে জ্যোতিবিক অতি সূক্ষ্ম গণনার প্রণালী প্রচলিত ছিল, সেখানে যে জ্যোতিষাদির এই আত-ঘনিষ্ঠ বিদ্যা অজ্ঞাত ছিল, এ কথা কোনও ক্রমে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। বরঞ্চ আমাদের ধারণা, এ সম্বন্ধে অন্যবিধ। আমাদের বিশ্বাস যে, গ্রীসের প্রচলিত রেখা-

* মিজাস্তী গ্রন্থের প্রণেতা নসিরুদ্দিন মহম্মদ বেন হাসেন অল তুসি—একজন পারস্য দেশীয় জ্যোতিষী ছিলেন। ১২৭৬ খ্রীঃ অঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি "সুর"-নিবাসী ইউক্লিডের জ্যামিতি ১৫ অধ্যায় সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ৪৭৮ প্রতিপাদ্য আছে।

উক্ত "রেখাগণিত" পুস্তকের কিয়দংশ পণ্ডিত কমলাশঙ্কর প্রাণশঙ্কর ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্পাদকতায় বম্বে গভর্ণমেণ্ট সেণ্ট্রাল বুক ডিপো কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমি পণ্ডিত-সম্রাট জগন্নাথের "রেখা-গণিতের" পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছি। আশা করি, বিশেষজ্ঞগণ আমার এই দুঃসাহসিকতা মার্জ্জনা করিবেন।

গ্রন্থ-পরিচয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সম্পাদক ত্রিবেদী মহাশয় কি প্রকারে কোন কোন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার বোধ হয় প্রয়োজন আছে। ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, বরোদার স্বর্গীয় হরিলাল হর্ষাদারাই ধ্রুব মহাশয় সর্ব্বপ্রথম এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। মিঃ ধ্রুব Stockholm ও Christianaয় অষ্টম "International Congress of Orientalists" পণ্ডিত-সভায় বরোদারাজ কর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া যোগদান করেন এবং সেখানে "রেখা-গণিত" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। জগন্নাথ-কৃত "রেখা-গণিত" পুস্তক সম্পূর্ণ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ইহার পুঁথি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সম্পাদক ত্রিবেদী মহাশয় ইঁহার পত্নীর নিকট উক্ত গ্রন্থের কিয়দংশ হস্তলিপি প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু ইহা অসম্পূর্ণ বলিয়া সমগ্র পুঁথির জন্য অন্যত্র চেষ্টা করিয়া নিম্নলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করেন এবং সেই সকল অবলম্বন করিয়া "রেখা-গণিত" প্রথমাংশ সম্পাদন করিয়াছেন।

(১) স্বর্গীয় মিঃ ধ্রুব কর্ত্তৃক সংগৃহীত পুঁথি।

(২) ত্রিবাঙ্কুর মহারাজ কলেজের পুঁথি।

(৩) কাশীর গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় ভেনিস মহোদয়ের প্রদত্ত পুঁথি।

(৪) কাশী গভর্ণমেণ্ট কলেজে রক্ষিত দ্বিতীয় পুঁথি। এই পুঁথিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য, কেন না ইহা জয়পুরাধিপ মহারাজ সবাই জয়সিংহের আজ্ঞায় তাঁহার গ্রন্থাগারের জন্য লোকমণি নামক কোন "লেখক"-কর্ত্তৃক জগন্নাথের লিখিত পুঁথির নকল। ইহা গ্রন্থ লেখার কয়েক বৎসর পরেই সম্বৎ ১৭৮৪তে (১৭২৮ খ্রীঃ) লিখিত। ইহার পরিচয়ে লোকমণি লিখিয়াছেন ঃ—

"যুগবসুনগভূবর্ষে শুচিশুক্লে যুগতিথৌ রবের্বারে।
ব্যলিখল্লোকমণিঃ কিল সম্রাজ্ঞাজ্ঞয়া পুস্তকম্॥

গ্রন্থ-পরিচয়।

গ্রন্থ পরিচয়ের সঙ্গে গ্রন্থকারের একটু পরিচয় দি[illegible] বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কথিত আছে যে, এক বার বাদসাহ ঔরঙ্গজেব মহারাজ সবাই জয়সিংহকে বলে[illegible] যে, তাঁর বিশ্বাস যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা আরবী ও ফা[illegible] ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে না। মহারাজ বা[illegible] সাহের এই ধারণা দূর করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে অবস্থা[illegible] কালে জগন্নাথ পণ্ডিতকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন এ[illegible] তাঁহাকে জয়পুরে পাঠাইয়া আরবী ও ফার্সি ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থা করেন। জগন্নাথ পণ্ডিতের তখন বয়স ২০ বৎস[illegible] মাত্র, অথচ সেই বয়সেই তিনি সংস্কৃতশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত পণ্ডিত সম্রাট কালে আরবী ও ফার্সিতেও বিশেষ পাণ্ডি[illegible] লাভ করেন এবং আরবী ভাষা হইতে "রেখা-গণিত" "সিদ্ধান্ত সম্রাজ" দুই গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ অথ[illegible] সংকলন করেন।

জগন্নাথ-কৃত 'সিদ্ধান্ত সম্রাজ" গ্রন্থও রেখাগণি[illegible] সংক্রান্ত, ইহাতে ত্রয়োদশটি অধ্যায়, এক শত একচল্লি[illegible] প্রকরণ এবং এক শত ছিয়ানব্বই ক্ষেত্র আছে। কথি[illegible] আছে, ইহার অনেকগুলি সিদ্ধান্ত মহারাজ জয়সিংহে[illegible] কৃত। "রেখাগণিত" পঞ্চদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, ইহা প্রথম ছয় অধ্যায়ের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই; কে[illegible] না, ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম ছয় অধ্যায় প্রায় সর্ব্বজ[illegible] পরিচিত। ৭, ৮, ৯ অধ্যায়ে জ্যামিতির গণিতাংশ ১০ম অধ্যায়ে "ভিন্ন"* অঙ্ক (Incommensurable quantit[illegible] সম্বন্ধীয় প্রতিপাদ্য এবং ১১শ হইতে ১৫শ অধ্যায় "ঘন ক্ষেত্র (solid geometry) সম্বন্ধীয়।

"রেখাগণিত" গ্রন্থের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দি[illegible] জ্যামিতি (বা রেখাগণিত বা শিল্পশাস্ত্র) বিদ্যা সম্বন্ধে [illegible]

* "রেখাগণিতে" যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে দিবার ইচ্ছা আছে। লেখক।

একটা আলোচনা-যোগ্য কথার অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি, আশা যে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহার মীমাংসা করিবেন।

উপরে লিখিত হইয়াছে যে "রেখাগণিত" আরবী ভাষা হইতে অনূদিত বা সংগৃহীত। পণ্ডিত জগন্নাথ কিন্তু গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন :—

"পূর্ব্ববিচ্ছিন্নং শাস্ত্রং যত্র কোণাববোধনাৎ।
ক্ষেত্রেষু জায়তে সম্যগ্‌ব্যুৎপত্তি র্গণিতে যথা॥
শিল্পশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্রহ্মণা বিশ্বকর্ম্মণে।
পারম্পর্য্যবশাদেতদাগতং ধরণীতলে॥
তদ্বিচ্ছিন্নং মহারাজ জয়সিংহাজ্ঞয়া পুনঃ।
প্রকাশিতং ময়া সম্যক্ গণকানন্দহেতবে॥"

ইহার অনুবাদের প্রয়োজন নাই। এই মুখবন্ধ পড়িয়া মনে হয় যে, রেখাগণিত বা "শিল্পশাস্ত্র" আমাদের দেশে বহুদিন হইতে 'পারম্পর্য্যবশাৎ" চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহা "বিচ্ছিন্ন" অবস্থায় ছিল; জগন্নাথ তাহাকে "সম্যক প্রকাশিত" করিয়াছেন; অর্থাৎ এ শাস্ত্রের জন্য আমরা অন্য কোন দেশের নিকট ঋণী নহি, ইহা ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি।

পক্ষান্তরে জগন্নাথের রেখাগণিত-বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থ, "সিদ্ধান্ত সম্রাজের' ভূমিকায় আছে :—

"গ্রন্থং সিদ্ধান্ত সম্রাজং সম্রাট্ রচয়তি স্ফুটং।
তুষ্ট্যৈ শ্রীজয়সিংহস্য জগন্নাথাহ্বয় কৃতী॥
আরবী ভাষয়া গ্রন্থো মিজাস্তী নামকঃ স্থিতঃ।
গণকানাং সুবোধায় গীর্ব্বাণ্যা প্রকটীকৃতঃ॥"

ইহার অর্থও খুব সুস্পষ্ট। ইহাতে পণ্ডিতজী যে আরবী ভাষার "মিজাস্তী" * নামক গ্রন্থ হইতে জ্যামিতি অনুবাদ করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন।

এখন স্বভাবতঃ আমাদের মনে এই প্রশ্ন উদিত হয় যে, এই দুই পরস্পর-বিরোধী কথার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?—হয় রেখাগণিত ভারতের "শিল্পশাস্ত্র", নয় ইহা আমরা আরবের মারফৎ গ্রীস হইতে পাইয়াছি। এ তর্কের মীমাংসা করিতে গেলে আমার মনে হয় একটু "মহীপালের গীত" গাওয়ার প্রয়োজন।

ভারতে প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রই বেদ-মূলক—ব্রহ্মণা প্রোক্তং। শিল্পশাস্ত্র বা রেখা-গণিতের উৎপত্তি-স্থানও সেই বেদ। বৈদিক যজ্ঞের ভূমি, বেদী, কুণ্ড প্রভৃতি নির্ম্মাণের যে সমস্ত বিস্তারিত আদেশ তৈত্তিরিয় সংহিতা, ব্রাহ্মণ, বৌধায়ন এবং আপস্তম্বাদিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে আমাদের সন্দেহের কোন কারণ থাকে না যে, জ্যামিতিক সিদ্ধান্ত ভারতের নিজস্ব নহে। আপস্তম্বের কল্পসূত্রের ত্রিংশ অধ্যায় শুল্ভ সূত্র—ইহাতে বহু জ্যামিতিক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। এ সকল বহু প্রাচীন বলিয়া সকলেই মানিয়া থাকেন, কাজেই "ধার করা" বলিবার কোন হেতু দেখা যায় না। বরং এ সম্বন্ধে ম্যাকডোনেল সাহেব তাঁহার "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে" বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্রিয়া-কাণ্ড সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণ যে প্রকারে শুচিতা ও স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়া চলিতেন, তাহাতে এ ধারণা কোন প্রকারেই করা যায় না যে, তাঁহারা ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন বিষয়ের জন্য বৈদেশিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ম্যাকডোনেল সাহেবের এ কথা অত্যন্ত ঠিক। তা' ছাড়া বৈদিক যজ্ঞসংক্রান্ত যে সকল সূত্রাদির উপরে উল্লেখ করিয়াছি, সেগুলি গ্রীক সভ্যতার অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বের বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। আর একটা কথা—যে ভারত বৈদিক যুগ হইতে জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিত ইত্যাদির চর্চ্চা আরম্ভ হইয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, যেখানে সর্ব্বপ্রথম দশমিক গণনা ও বীজগণিত আবিষ্কৃত হইয়া তৎকালীন অন্যান্য সভ্যদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, যেখানে জ্যোতিষিক অতি সূক্ষ্ম গণনার প্রণালী প্রচলিত ছিল, সেখানে যে জ্যোতিষাদির এই আত-ঘনিষ্ঠ বিদ্যা অজ্ঞাত ছিল, এ কথা কোনও ক্রমে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। বরঞ্চ আমাদের ধারণা, এ সম্বন্ধে অন্যরূপ। আমাদের বিশ্বাস যে, গ্রীসের প্রচলিত রেখা-

* মিজাস্তী গ্রন্থের প্রণেতা নসিরুদ্দিন মহম্মদ বেন হাসেন অল তুসি—একজন পারস্য দেশীয় জ্যোতিষী ছিলেন। ১২৭৬ খ্রীঃ অঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি "সুর"-নিবাসী ইউক্লিডের জ্যামিতি ১৫ অধ্যায় সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ৪৭৮ প্রতিপাদ্য আছে।

গণিতের জন্মভূমিও এই ভারতবর্ষ। এ বিষয়ে হাণ্টার সাহেবের মত উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"Though no date can be fixed to the commencement of Geometry in India, yet the certainty which we now have that Algebra and the decimal arithmetic have come from that quarter, the recorded visits or the earlier Greek Philosophers to Hindustan, together with very striking proofs of originality which abounded in the writings of that country, make it essential to consider the claim of the Hindus or of their predecessors to the invention of Geometry. * * We advance that the people that first taught these branches of Sciences (Decimal Arithmetic and Algebra) is very likely to have been the first that taught Geometry and again seeing that we certainly obtained the former two either from or at least through India, we think it highly probable that the earliest European Geometry also came either from or through the same country." *

আমার এই বিশ্বাসের সপক্ষে আরও অনেক য়ুরোপীয় পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিতে পারা যায়, কিন্তু এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধকে কোটেশন-কণ্টকিত করিতে ইচ্ছা করি না। যাহা হউক পণ্ডিত-সম্রাট জগন্নাথ যে বলিয়াছেন যে, এই শিল্প-শাস্ত্র "ব্রহ্মণা প্রোক্তং" এবং তাহা ভারতে "বিচ্ছিন্ন" অবস্থায় ছিল, তিনি তাহা "গণকানন্দহেতবে" প্রকাশিত করিয়াছেন, এ কথার কারণ বুঝিতে পারি। আবার পণ্ডিতজী যে বলিয়াছেন যে, রেখাগণিত তিনি আরবী পুস্তক "মিজাস্তী" হইতে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা ত অস্বীকার করার কোন হেতু নাই।

কাজেই সম্রাট জগন্নাথের এই দুই স্বতো-বিরোধী কথার উদ্দেশ্য আমার মনে হয় যে, যদিও শিল্পশাস্ত্রের আদি উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষ—তবে তিনি যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে যে ভাবে রেখাগণিত লিখিত হইয়াছে তাহা বিদেশ হইতে সংগৃহীত—তাহার প্রণেতা ইউক্লিড, আরবী তাহার অনুবাদকর্ত্তা নসিরুদ্দীন আর তাহা হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন জগন্নাথ। এ যেন ভারতের রেশম বিলাতে গিয়া বস্ত্র-আকারে নবরূপ ধারণ করিয়া বৈদেশিক সওদাগরের দ্বারা ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

যাহা হউক, এ বিষয়ে আমার বেশী বলা বোধ হয় অনধিকার-চর্চ্চা; কাজেই সংক্ষেপে উক্ত গ্রন্থ-পরিচয় দিয়া ইহার বিস্তারিত আলোচনার ভার গণিতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উপর ন্যস্ত করিয়া আমি প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

* Vide. Imperial Gazetter of India—by Sir W. W. Hunter.

কানাইয়ের 'কানেড়া'।

[শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র]

(১)

পুরুষকারের সাহায্যে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে একমাত্র কানাইলালকে দেখা গিয়াছিল। সে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, যেমন করিয়াই হউক নিখুঁতভাবে 'দরবারি কানেড়া' আয়ত্ত করিবে। সে সুযশ চাহিত না, গায়ক বলিয়া সুনাম কিনিতে চাহিত না, তার অন্য কোনও উচ্চাভিলাষ ছিল না। মাথায় তাহার সুর লটকানি খাইয়া হাডু—ডু—ডু খেলিত, পারিত না সে শুধু গলায় তাহা উদ্গীরণ করিতে। যখন তার সুগায়ক বন্ধু, ভুটে ও বোদাই বলিত, ওরে আগে 'সারেগাম্' ভাঁজ—'ছেলে ধরুতে শিখে কেউটে'র দিকে যাস্, তখন তার মুখটা অপ্রসন্ন ও গম্ভীর হইত, হাঁড়ির মত তার হইত। সেই জন্য বন্ধুদিগকে লুকাইয়া সে দিবারাত্রি—কখনও গুণ গুঁণ স্বরে, কখনও বা রাসভ-বিনিন্দিত কণ্ঠে গাহিত—

'দেখা দাও হরি জীবন্যাথহারী
তোমারে দেখিতে কাঁদিতেছে প্রাণ।'

বন্ধুদিগের টিটকারী তাহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই।

(২)

এক বৎসরকাল মেসে আসিয়া সে সকলের সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ-পরিচয় করিত। অল্পকালের মধ্যে সে সকলের সহিত ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু কেহ তাহার পূর্ব্ব পরিচয় জানিত না, জানিতে চাহিলেও সে খুব ব্যস্তভাবে সে কথা চাপা দিয়া অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিত। বন্ধুবর্গও ব্যাপার বুঝিয়া তাহাকে অধিক কিছু জিজ্ঞাসা করিত না, কিম্বা সে জানিবার জন্ম মুখে কিছুমাত্র আগ্রহপ্রকাশ করিত না। কিন্তু তাহাদের প্রাণের ভিতর যে কানাইলালের কথা জানিবার জন্ম আগ্রহের একটা গুপ্ত অগ্নিশিখা জ্বলিত না একথা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিব না।

একত্র আহার-বিহার-নিদ্রায়, কানাইলাল অন্যের প্রতি এমন চমৎকার ব্যবহার করিত যে, সে তাহাকে ভাল না বলিয়া পারিত না। কিন্তু প্রত্যহ প্রত্যূষে তাহার

"আর ঘুমাইও না মন,
মায়াঘোরে কতদিন আর রবে অচেতন।"

এই প্রভাতীর তাড়নে অনেককে শয্যাত্যাগ করিয়া আরক্ত চক্ষু বাহির করিতে হইত। তাহার গান, সুর সমস্তই সময়োপযোগী ছিল কিন্তু তাহার কি ছিল না তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

(৩)

স্বজন-বন্ধুবান্ধব যে ত্রুটী উপেক্ষা করিতে পারেন—নিষ্কাশিত রক্ত চক্ষু পুনরায় কোটরগত করিতে বাধ্য হন—অন্যে তাহা সহ্য করিবে কেন? মেসের নিকটবর্ত্তী একটি ভাড়াটীয়া বাটীতে পেন্সনপ্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সুনীতি বাবু সপরিবারে বাস করিতেন। তিনি ও তাঁহার পরিবার-ভুক্ত সকলেই সাহেবী ঢঙে গঠিত। তাঁহাদের বাটীতে এক-পাল ছেলেমেয়ে, কিন্তু তাহাদের মুখে 'টুঁ' শব্দটি পর্য্যন্ত নাই। মাঝে মাঝে শুধু টুং করিয়া 'কলবেলের' ডাক ও 'হুজুর' প্রত্যুত্তর। এই ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অধুনা অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, কানাইলালের গানে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি স্বয়ং পত্র লিখিয়া কানাইলালকে তারেক বার বকাইয়াছিলেন।

সহগুণের হিমালয় পর্ব্বত কানাইলাল সে সব পত্র পাইয়া শুধু চুপ করিয়া থাকিত, কোনও উত্তর দিত না; কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও সে কখন সত্যচ্যুত হয় নাই। বন্ধুবান্ধবের শত নিষেধ সে চুপ করিয়া শুনিত, তাহার যে কঠিন শাস্তি অবশ্যম্ভাবী একথাও বন্ধুরা বুঝাইত; কিন্তু যথাসময়ে যথাস্বরে ও সুরে সে প্রাণ খুলিয়া গান গাহিত।

অত্যন্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর বিরক্তি ক্রমশঃ লয় পাইতেছিল বটে, কিন্তু প্রিয় সুহৃদ কানাইলালের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল।

(৪)

উৎকণ্ঠা একদিন সত্য সত্যই অমঙ্গলকে ডাকিয়া আনিল। কানাইলাল ফৌজদারী আদালত হইতে সমন পাইল যে, সাধারণের শান্তিভঙ্গের জন্ম আদালতে তাহার বিচার হইবে। সে একটুও বিচলিত হইল না। আদালতে হাজির হইল। বন্ধুরা একটী উকিল নিযুক্ত করিতে পরামর্শ দিল। কানাইলাল অনর্থক অপব্যয় করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল এবং স্বয়ং হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

ফরিয়াদী স্বয়ং হাজির হন নাই। সরকারী উকিল তাঁহার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কানাইলালের দোষ অতিরঞ্জিত করিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। যখন বুঝিলেন, আসামীর তরফে উকিল নাই তখন ত তাঁহার বুক অধিকতর স্ফীত হইল এবং মুখ হইতে একটা 'আধিনে ঝড়' নির্গত হইয়া গেল। এই বক্তৃতার মধ্যে নাকি এমন কথাও ছিল যে, কানাইলাল ফরিয়াদীর বাটীর মুক্ত প্রাঙ্গণে পাদচারণে রত মহিলাদের প্রতি বক্রদৃষ্টিপাত ও মধ্যে মধ্যে বিদ্রূপ করিয়াও থাকেন।

কানাইলালের বুকটা এবার কাঁপিয়া উঠিল। মানুষে এমন নির্জ্জলা মিথ্যা কেমন করিয়া শপথ করিয়া বলে! সে কম্পিতকণ্ঠে যোড়করে বলিল—'দোহাই হুজুর, একমাত্র গান গাওয়া ছাড়া আর আমার অন্য দোষ নাই।'

সাক্ষীসাবুদ ডাকিবার প্রয়োজন হইল না। হাকিম জোর করিয়া একটা ধমক দিয়া বলিলেন—'খবরদার'। তাহার পর বিচারের রায় হইল,—'রাত্রি দশটার পর কানাইলাল আর গান গাহিতে পারিবে না এবং তাহার

পূর্ব্বোক্ত অপরাধের দণ্ডস্বরূপ ২৫৲ টাকা অর্থদণ্ড দিতে হইবে অন্যথা এক সপ্তাহ কারাবাস।"

বন্ধুগণ চাঁদা তুলিয়া তৎক্ষণাৎ কানাইলালের অর্থদণ্ড প্রদান করিল।

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলিয়া' লওয়ার মত দুর্ব্বল মস্তকে বিচারের গুরুভার বহিতে বহিতে কানাইলাল সে যাত্রা নিষ্কৃতিলাভ করিল।

(৫)

বিচারের পর কয়দিন ধরিয়া কানাইলালের বিমর্ষ ভাব যেন বৃদ্ধি পাইয়া উঠিতেছিল। আহারে তাহার রুচি ছিল না, বন্ধুদের সহিত কথাবার্ত্তায় তাহার আর পূর্ব্বের ন্যায় মত্ততা ছিল না। কিন্তু যথাসময়ে গান গাহিতে সে ভুলিত না। সে কার্য্য কর্ত্তব্যরূপে ঘড়ির টিক্ টিক্ আওয়াজের মত অবিরামগতিতে চলিত। রেলওয়ে ষ্টেশনের ঘড়ির সহিত নিজের ট্যাঁক ঘড়িটী মিলাইয়া রাখাও তাহার দৈনন্দিন কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রিতে গান গাহিতে বসিয়াই সে সম্মুখে ঘড়িটী রাখিয়া দিত। রাত্রি দশটার সময় সেকেণ্ডের কাঁটা ঠিক ৬০এর ঘরে পৌঁছিলেই তাহার গান উচ্চ পরদা হইতে সর্ব্ব-নিম্ন খাদে লোকশ্রুতির বহির্দ্দেশে নামিয়া আসিত। আসন্ন-বিপদে যেমন বাষ্পীয় পোতচালক 'ভেকুয়াম ব্রেকে' ইঞ্জিনের গতিরোধ করে এবং ভিতরকার বাষ্পটুকু ফোঁস ফোঁস করিয়া গর্জ্জন করিতে থাকে।

১ দে | ২ খা দা | ৩ ও হ | ৪ রি জী | ব ব্যথা হারী

তোমা | ৫ রে হেরি | ৬ তে কাঁদি | ৭ ভে | ৮ ছে প্রাণ।

তাহার বন্ধুবর্গ 'নোট' করিয়া লিখিয়াছিলেন—সপ্তাহের প্রথম দিন ৪, ২য় দিন ৫, ৩য় দিন ৭, ৪র্থ দিন ১, ৫ম দিন ৬, ৬ষ্ঠ দিন ২ এবং সপ্তম দিন ৩ চিহ্নিত স্থানে রাত্রি দশটা বাজায় তাহাকে গান বন্ধ করিতে হইয়াছিল। এমন আইনমান্যকারী ব্যক্তি সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া না যাইলেও পেন্সনপ্রাপ্ত ডেপুটী সুনীতিবাবু অত্যন্ত চটিয়া যাইতেন। তিনিও গীত-ভঙ্গের সময় ঘড়ি মিলাইয়া দেখিতেন যে, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটা। আইনের মর্য্যাদা কানাইলাল অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে দেখিয়া মনে মনে তাহার প্রশংসা করিতেন বটে, কিন্তু আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত করিয়া সে রাগভক্তিবিমিশ্রিত কণ্ঠের মমতাটুকু বিসর্জ্জন করিতে পারিতেছে না দেখিয়া তিনি অতিমাত্রায় বিরক্ত হইতেন এবং তাহার ঔদ্ধত্য দেখিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন। তাহার অপমান-জ্ঞানটা আরও ফুলিয়া-ফুঁসিয়া উঠিত যখন তাহার স্ত্রী মধ্যে মধ্যে রহস্যচ্ছলে তাহাকে বলিত—"কইগো! এত বদমায়েসটাকে সায়েস্তা করেছ, জেলে দিয়েছ—আর এই একটা দুগ্ধপোষ্য বালকের ত কিছু করতে পারলে না।" কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কানাইলালের মুণ্ডপাত করিতে করিতে তিনি বলিতেন—"সে যে আইনের মর্য্যাদা রাখিয়া চলে!"

(৬)

ঘাড়মুখ গুঁজবাইয়া কানাইলাল একদিন প্রবল জ্বরে পড়িল। এক প্রকার সংজ্ঞাহীন। জ্ঞানের স্থানটুকু প্রলাপ অধিকার করিয়া বসিল বটে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ অধিকারটুকু কাড়িয়া লইয়া স্বীয় একাধিপত্য স্থাপন করিবার স্বার্থপরতা দেখাইল না। সে দিবারাত্রি সময়-অসময় নির্ব্বিশেষে কখনও খাদে কখনও সপ্তমে গাহিত—

"দেখা দাও হরি জীব ব্যথাহারী"

বন্ধুগণ প্রমাদ গণিল! ভুটে ভাবিল, এইবার বুঝি বন্ধুটিকে হারাইলাম। বোদাই ভাবিল, এইবার বুঝি যমে-মানুষে টানাটানি চলিল। কানাইলালের মৃত্যু বা শ্রীঘর-বাস দুইটার একটা অবশ্যম্ভাবী। পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরে চিকিৎসক ও 'সমন' এক সময়েই মেসে পদার্পণ করিয়া কানাইলালের নিকট পৌঁছিল। তখন কানাইলাল প্রলাপে গাহিতেছিল—

"পিতা পতি সুত সকলি ত প্রভু
ও রাঙা চরণে করেছি দান।"

বৃদ্ধ চিকিৎসক রোগীর অবস্থা দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আদালতের 'সমন' ভুটে ও বোদাই নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছে দেখিয়া চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওখানা কি?" ভুটে চিকিৎসককে পূর্ব্ব বৃত্তান্তটুকু সংক্ষেপে শুনাইল।

বিলাত-ফেরত বৃদ্ধ চিকিৎসক বলিলেন—"আমরা ৩০ বৎসর বিলেতে থেকেও বাঁ সুরে ...

বাবু যার বংশ তাই হয়েছেন। গানের দিক দিয়ে না দেখে, ভাবের দিক দিয়ে দেখলেও তো তাঁর পরকালের কতকটা কাজ হ'তে পা'রত! হরিনারায়ণ!"

গাও বাবা গাও। জ্ঞানেই গাও, অজ্ঞানেই গাও—প্রলাপেই গাও, বিলাপেও গাও, এমন নাম-মাহাত্ম্য আর নাই, এমন সদ্য মৃতসঞ্জীবনী কোনও ডাক্তারী শাস্ত্রে নাই, একথা আজ আমি তোমাদের স্পষ্ট ক'রে বলে রাখ্‌লুম।

ভূটে বোমাই দুজনেই নানা দেশে নানা রকমের লোক দেখিয়াছে বলিয়া মনে মনে তাহাদের একটা অহঙ্কার আছে; কিন্তু ডাক্তারবাবুর মত এমন সদাশিব জীবনে তাহাদের চক্ষে পড়ে নাই। বিলাত হইতে কি এমন ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া ফিরিতে পারা যায়? তাহারা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল। ডাক্তারবাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(৭)

কানাইলাল সে যাত্রা মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। দিনের পর দিন সে পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার গীতটী স্বীয় পূর্ব্বস্থানটুকু অধিকার করিয়া লইতেছিল। সে দিন শ্রাবণের আকাশ ঘোর ঘনাচ্ছন্ন হইয়াছিল, অবিশ্রান্ত ধারা একধারে পথিকের মনে বিরক্তি অন্যধারে বিলাস-পুষ্ট সুখ-শয্যা-নিরত ব্যক্তির প্রাণে অমৃত সঞ্চার করিতেছিল। পথের দিকে ক্ষুদ্র পথিকের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া কানাইলাল অন্যমনে গাহিতেছিল—

"বনমালী বৃন্দাবনে এসেছে!
কোকিল পাগল হ'য়ে যমুনা ভাসায়ে দিয়ে
বাঁশী সুরে পঞ্চম ঢেলেছে।"

ভূটে আসিয়া কানাইলালকে বাধা দিয়া বলিল, কি বোষ্টমী-গান গাচ্ছিস। 'কানু ছাড়া গীত নাই' সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়া সে আবার গাহিল—

ভরা মালতীর ডালা সাথের বকুল-মালা
তাহাতে [illegible] জলে আঁখি ভেসেছে—"

কানাইলাল আর [illegible] পারিতেছিল না; গানের [illegible] তাহার প্রাণে আসিয়া অশ্রুধারায় তাহার বসন সিক্ত করিয়া দিতেছিল। ভূটে তাহার ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িল, মুখে কিছু বলিতে পারিল না।

* * *

"বাবা কানাইলাল তোমাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে"—এই স্নেহের ডাকে কানাইলাল পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল ডাক্তারবাবু। কোথায় কি জন্য যাইতে হইবে প্রভৃতি কোনও প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া কানাইলাল দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—'চলুন'।

ডাক্তারবাবু তাহার সঙ্গে পথে আসিতে আসিতে বলিলেন—কোথায় যেতে হবে সেটা বোধ হয় তোমার শুনে রাখা দরকার।

কানাই—আপনি বল্‌লেই আমি শুনবো। কিন্তু সেটা জানবার আমার কৌতূহল নেই।

ডাক্তার বাবু—তোমার সঙ্গে যে শত্রুতা করেছে সেই সুনীতিবাবুর বাড়ীতেই আজ তোমাকে যেতে হবে।

কানাই—আপনার যে আজ্ঞা।

ডাক্তার—আমার আজ্ঞা নয়, অনুরোধ।

কানাই—আপনি পিতৃতুল্য, অমনভাবে কথা কহিলে আমার বড় কষ্ট হয়। বলুন আমাকে কি করতে হ'বে।

ডাক্তার—তোমার যে রকম অসুখ হ'য়েছিল, তাহার কন্যা যশোভারও ঠিক সেই রকম জ্বর হয়েছে; বিশেষ বিস্ময়কর ব্যাপার—তোমার মত জ্বরের প্রলাপে সেও গান গায়।

কানাই—আপনার যে রকম চিকিৎসার হাত-যশ তা'তে দু'দিনেই তিনি সেরে উঠ্‌বেন।

ডাক্তার—তা' নয় বাবা। পরমায়ু থাক্‌লে কেউ মার্‌তে পারে না। চিকিৎসক উপলক্ষ্যমাত্র।

সুনীতিবাবু ডাক্তারবাবুকে আনিবার জন্য রুদ্ধশ্বাসে ছুটিতেছিলেন। যশোভার কথা বন্ধ হইয়াছে, ক্রমশঃ নাড়ীও ক্ষীণগতি হইয়া পড়িতেছিল। ডাক্তারবাবুকে পথে দেখিয়াই সুনীতিবাবু ব্যাকুলভাবে বলিলেন—'ডাক্তারবাবু, আমার সর্ব্বনাশ হ'ল। যশোভা বুঝি আমাকে ফাঁকি দেয়!"

ডাক্তারবাবু—পরমায়ু না থাক্‌লে কেউ বাঁচাতে পারে না, সুনীতিবাবু। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে [illegible]

হ'য়েছি। আজ তাই আমার বন্ধুকে এনেছি; ভগবানের দয়ায় নিশ্চয় সে রক্ষা পাবে।

সুনীতিবাবু—কানাইলালকে দেখাইয়া বলিলেন, ইনি কে?

ডাক্তারবাবু বলিলেন—ইনি আপনার প্রতিবেশী কানাইলাল। ইনি সুগায়ক।

সুনীতিবাবুর মুখটা বিবর্ণ হইয়া গেল। জলমগ্ন ব্যক্তি সামান্য তৃণখণ্ড-দর্শনে যেরূপ ক্ষীণ আশায় সেটী অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, সেইরূপ ব্যাকুলতার সহিত ঘোরতর অপরাধীর ন্যায় সুনীতিবাবু অশ্রুভারাক্রান্ত নতদৃষ্টিতে কানাইলাল ও ডাক্তারবাবুকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

(৮)

একখানি ব্যাঘ্র-চর্ম্মের উপর বসিয়া বাহ্যজ্ঞানহীন কানাইলাল ও মৃত্যুশয্যায় শায়িতা ঘরণোত্তা ক্ষীণকণ্ঠে সুর মিলাইয়া গাহিল—

"সকল কাণ্ডারে বাঁচালে আমার
বিপদ-সাগরে করিলে হে ত্রাণ।
দেখা দাও হরি জীবব্যথাহারী
তোমারে হেরিতে কাঁদিতেছে প্রাণ।
পিতা পতি সুত সকলি ত প্রভু
ও রাঙা চরণে করেছি দান।"

কি মর্ম্মস্পর্শী উদাত্ত সুর! কি আন্তরিকতা!

ভাবে বিভোর সুনীতিবাবুর দুই নয়নে আজ ভক্তি-অশ্রুর বন্যা বহিল। তিনি কানাইলালকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন।

* * *

ডাক্তারবাবু প্রথম দর্শনেই চিনিতে পারিয়াছিলেন কানাইলাল তাহার সংসারত্যাগী ভ্রাতুষ্পুত্র। কানাইলাল পুনরায় পলাইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি আত্মপ্রকাশ করেন নাই। যদি কোনও রকমে তাহাকে বাঁচিতে পারেন তাহা হইলেই আত্মপরিচয় দিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি কানাইলাল ও ঘরণোত্তাকে পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে বাঁধিয়া নিজ গৃহশোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

ঘোলাই বলিল—কে'নোর সুর-লয়ের জ্ঞান নেই, কি ক'রে গান গেয়ে বাজিটা মা'রলে বল্‌তে পারিস্‌!

ভুটে বলিল—সবই অদৃষ্ট রে দাদা, অদৃষ্ট। আমরা তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে, নদী-সৈকতে, সীমাশূন্য নীলাম্বুর মধ্যে অর্ণবযানে, মহাশূন্যে বিমানপোতে গান-সাধনা ক'রে যা না পারলুম 'কেনো'টা তাব দেখিয়ে মেরে দিলে হে!

কানাইলাল ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "প্রাক্তন, রে ভাই প্রাক্তন। যা ভাগ।"

পথের মায়া।

[শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়]

(১)

পথের খেলা ফুরিয়ে গেল, পথের পানে চাহি',
সাঁঝের পাখী কুলায়ে গেল পথের গান গাহি'।
ওরে পথের মায়া,
জীবন-মরণ-ছায়া,
পথের শেষে দাঁড়িয়ে দেখি—তোর যে শেষ নাহি।

(২)

চলার সনে পেয়েছি শুধু পথের পরিচয়,
ভেবেছি শুধু পথের কথা—আর ত কিছু নয়।
ওরে পথের মায়া,
জীবন-মরণ-ছায়া,
পথের কাঁটা বিঁধেছে পায়ে করিনি দ্বিধা-ভয়।

(৩)

পথের পাশে ফুলের বাস হ'রেছে প্রাণ মন,
দাঁড়া'তে তবু দিলনি মোরে দেখা যে বহুক্ষণ।
ওরে পথের মায়া,
জীবন-মরণ-ছায়া,
ভুলা'লে মোরে নাইবি খোঁজা, পথ যে সনাতন।

পথের শেষে ধূলায় বসি' রাখিনু ধূলারাশি,
এমনি করি' পথের মায়া,—ভুলালি সর্ব্বনাশি ;
ওরে পথের মায়া,
জীবন-মরণ-ছায়া,
পথের সাথে বাঁধিতে চাস্ প্রেমের চির-ফাঁসি ।

পুত্রবধূ ।

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল]

"আসছে আসুক, কিন্তু দুদিন থেকেই তাকে চলে যেতে হবে। এখানে আসতে আমি ত তাকে ডাকিনি, তাকে আমার দরকারও নেই। মনে করেছে এসে গড়িয়ে পড়লেই আমি সব ভুলে যাব ; কিন্তু তা আর হবার নয়। এ বাড়ীতে তার আর স্থান নেই।"

পক্ককেশ বৃদ্ধ রামনারায়ণ উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া বাহিরে তাকাইয়া রাগে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে এই অপ্রিয় কথাগুলি উচ্চারণ করিল।

তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রের তাপে গ্রামের পথ-ঘাট সব যেন উজ্জ্বল শুভ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে !

ঘরের ভিতর উপবিষ্ট অপর কাহাকেও কিছু বলিতে না শুনিয়া বৃদ্ধ আপন মনেই বলিতে লাগিল,—"আমার কাছে তার আর কিছুই পাবার আশা নেই, আধ পয়সাও নয়। আমার বিষয়-সম্পত্তির উপর তার কোন অধিকারও নেই !"

"তার কেনই বা অধিকার নেই ? সে ত তোমারই ছেলের বৌ !" এক প্রৌঢ়া বিধবা তাহার কথায় বাধা দিয়া হঠাৎ এই প্রশ্ন করিল। কাদম্বিনী রামনারায়ণেরই ভগিনী।

বৃদ্ধ কাদম্বিনীর দিকে বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ চাহিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। রামনারায়ণ [illegible] দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে, সে যাহা ভাল বুঝে তাহা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও অভ্রান্ত। সেই জন্য কেহ তাহার কথার প্রতিবাদ করিলে সে আদৌ সহ্য করিতে পারিত না, বিপক্ষকে তীব্র বাক্যবাণে বিদ্ধ করিত, কিন্তু কাদম্বিনীর কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কাদম্বিনী তাহার কোনও কথার জবাব দিলে সে কোনও প্রকার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিত না। বিধবা ভগিনীর কথা যথার্থই সে মানিয়া চলিত এবং তাহার চরিত্রে সে এমন একটা তেজস্বিতা ও স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করিয়াছিল যে, তাহার কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে রামনারায়ণ কোনও উচ্চবাচ্য করিত না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে এই বিধবা ভগিনী সংসারের গৃহিণীপদে আসীন হইয়া নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিয়া কাজকর্ম্ম না দেখিলে সংসার চালান কতদূর কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য হইত, তাহা মিতব্যয়ী রামনারায়ণ ভালরূপই বুঝিত। কাদম্বিনীর পুত্র-কন্যা কেহই ছিল না, দাদার সংসারের কাজেই সে নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। রামনারায়ণ পাড়া-প্রতিবেশীর নিকট ভগিনীর গুণাবলীর উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিত। কাদম্বিনী বৃদ্ধকে আদৌ ভয় করিয়া চলিত না এবং দাদার যে কাজটা যখনই সে অন্যায় হইতেছে বলিয়া বিবেচনা করিত, তাহার মুখের উপর সে কথা বলিতে সে কুণ্ঠিত বা ভীত হইত না ; জ্যোৎস্না আসিতেছে শুনিয়াই তাহাকে আনিবার জন্য দাদার সম্পূর্ণ অমতে পাল্কীসমেত বেহারাদিগকে সে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং তাহার সম্বন্ধে রামনারায়ণকে অযথা কথা বলিতে শুনিয়া সে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিল। রামনারায়ণ তাহার কি উত্তর দিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

বৃদ্ধের কনিষ্ঠপুত্র রমেশ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, পিসিকে নীরব দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "পিসিমা, তুমি ভেতরের খবর কিছু জান না, তাই একথা বলছ। এই বৌদিদিই দাদার সর্ব্বনাশ করে। তাকে কুপরামর্শ দিয়ে দেশ-ছাড়া করায়। পরে রাক্ষসী তাকে খেয়ে তবে ছাড়লে ! অবশ্য এতে দাদারও যে দোষ ছিল না, তা বলা যায় না।"

জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুসংবাদে রামনারায়ণের প্রাণটা যথার্থই কাঁদিয়া উঠিল। নীরস বৃদ্ধের প্রাণে স্নেহ বলিয়া যেটুকু জিনিষ ছিল, তার সবটুকুই জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। সুরেশকে সে বড়ই ভালবাসিত। আকৃতি-প্রকৃতিতে ও আচার-ব্যবহারে সুরেশ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ঠিক বিপরীত ছিল। তাহার সুন্দর সুশ্রী, সরল অমায়িক ব্যবহার গ্রামের সকলকেই মুগ্ধ করিয়া-

পূর্বে রামনারায়ণের অবস্থা এত সচ্ছল ছিল না। বাজারে একখানি ছোট-খাট দোকান চালাইয়া সে কোনও প্রকারে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিত। সুরেশ তাহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিল। সে দোকানের কাজকর্ম সব দেখিত। এক সময় তাহাদের দোকানের অবস্থা বড় খারাপ দাঁড়াইয়াছিল, দেনার দায়ে দোকানটা বিক্রী হইয়া যাইবার জোগাড় হইয়াছিল। রামনারায়ণকে পুত্রদের লইয়া কোনও দিন অর্দ্ধাহারে, কোনও দিন অনাহারে কাটাইতে হইয়াছিল। এই দুঃসময়ে বৃদ্ধ পিতাকে বিপদ-সাগরে ফেলিয়া পত্নীকে লইয়া সে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। বিপদের ঝঞ্ঝাবাত সবটাই বৃদ্ধের মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। উপযুক্ত পুত্রের সাহায্য যখন একান্ত প্রয়োজনীয়, সে সময় বৃদ্ধকে এরূপ নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ করা, রামনারায়ণ কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই। যখনই সেই দুর্দ্দিনের ছবি তাহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত, পুত্রের অকৃতজ্ঞতার কথা ভাবিয়া রামনারায়ণের রক্ত গরম হইয়া উঠিত। পরে চঞ্চলা লক্ষ্মীর কৃপা-দৃষ্টিপাতে তাহার অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইলেও, পুত্রের এ দোষ বৃদ্ধ কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে নাই। দারুণ অভিমানের বশীভূত হইয়া সে পুত্রকে আর নিজ বাড়ীতে ডাকিতে পারে নাই। তবুও তাহার প্রতি তাহার স্নেহের তিলমাত্র হ্রাস পায় নাই। পিতা পুত্রের মধ্যে বিচ্ছেদের মূল কারণ পুত্রবধূর কুমন্ত্রণা, সে ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্যই পুত্রবধূর উপর সে হাড়চটা হইয়াছিল; তাহার সম্মুখে কেহ তাহার নামোচ্চারণ করিলেও সে সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু আমরণ মাকিয়া উঠিল। সে উত্তর দুষিল,—"...সব সুখভোগ আমরা করছি, এ সবের সেই দাদার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সৃষ্ট তৈরি করে গেছল। তুমি এর এক তিলও অর্জ্জন কর নি। পাড়ার সবাই তাকে কত ভালবাসত! সে চলে যেতে সবাই দুঃখ করেছিল, কিন্তু তোমাকে তারা দুচক্ষে দেখতে পারে না।"

রমেশ মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার কথায় কাদম্বিনীও বড় রাগান্বিত হইয়াছিল। সেও রমেশের উদ্দেশে বলিল,—"আচ্ছা সে ত তোর দাদা। সত্যি দোষ করে থাকলেও সে যখন আর বেঁচে নেই, তখন তার বিরুদ্ধে এসব কথা তুই বলছিস কি ক'রে? আজ তোদের মা বেঁচে থাকলে সে অমন বিদেশে প্রাণ হারাত না।"

এই শেষ কথাটা রামনারায়ণের সুপ্ত হৃদয়-তন্ত্রীতে জোরে আঘাত করিল। সেই পতিব্রতা সতী সাধ্বীর পূতমূর্ত্তি তাহার মানস-চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। স্বামীর নীরস কঠোর ব্যবহারের বিনিময়ে সে আজীবন তাহার প্রাণভরা ভালবাসা অযাচিত অকুণ্ঠভাবে দিয়া আসিয়াছে, সংসারের দুঃখ-জ্বালায় নিপীড়িত হইয়া তাহার বদন-কমল দিন দিন শুকাইয়া গিয়াছে, দেহলতা জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তবুও মুখ ফুটিয়া একটি অসন্তোষের বাণীও উচ্চারণ করে নাই, হাসিমুখে সাহস ও ধৈর্য্যসহকারে সংসার-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষতবিক্ষতদেহে নীরবে প্রমাণ করিয়াছে! স্ত্রীর জন্য এরূপ বিচলিত হইতে অদ্যাবধি কেহ রামনারায়ণকে দেখে নাই।

কাদম্বিনী উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত ভাবিয়া বলিতে লাগিল,—"আমার বয়স দিন দিন বাড়ছে ত, আমি ত আর চিরদিন বাঁচব না। আমি অবর্ত্তমানে সংসারের অবস্থা কি দাঁড়াবে তা একবার ভেবে দেখেছ? তখন বৌমা না হলে সংসার দেখবে কে?"

এইবার বৃদ্ধ রাগে চেঁচাইয়া উঠিল,—"কি, সে আমার সংসার দেখবে? আমরা না খেতে পাই, সংসার উৎসন্ন যায় সেও ভাল, তবু আর হাতের অন্ন বিষ হলে আমার মনে হবে।"

[illegible] উপর অত রাগ করে, [illegible] মানুষের চলবে কেমন?

রমেশ ইত্যবসরে বলিয়া উঠিল,—"তা তুমি যাই বল পিসিমা, সত্যি কথা বলতে হবে ত? বৌদিদিই ত যত অনিষ্টের মূল!"

এমন সময় পাল্কী আসিয়া বাড়ীর দরজায় থামিল। জ্যোৎস্না নামিতেই কাদম্বিনী তাহাকে আদর করিয়া ঘরের ভিতর ডাকিয়া আনিল। তাহাকে ঘরের ভিতর ঢুকিতে দেখিয়া রামনারায়ণ বা রমেশ কেহই কোন কথা কহিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শুভ্রবসনা নিরালঙ্কারা পুত্র-বধূকে দেখিয়া রামনারায়ণের মানসনেত্রে আর একদিনের ছবি ভাসিয়া উঠিল—যে দিন সে কত আদর-যত্নের সহিত বালিকাকে নব-সাজে সজ্জিত করিয়া প্রথম বাড়ী আনিয়াছিল! বৃদ্ধ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, তাহার সম্মুখে কি আজ সেই মূর্ত্তিই দণ্ডায়মান! মানুষের কি এত পরিবর্ত্তন সম্ভব! বৃদ্ধ হতভম্ব হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। জ্যোৎস্না শ্বশুরের পদতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিল। রামনারায়ণ বিড় বিড় করিয়া কি একটা কথা উচ্চারণ করিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না।

শ্বশুরের ভাবগতিক দেখিয়া জ্যোৎস্না বুঝিতে পারিল ব্যাপার বড় সুবিধাজনক নহে। দুঃখে কষ্টে [illegible] প্রাণটা যেন ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। সে যে বড় আশা করিয়া বাপ মার সম্পূর্ণ অমতে এখানে আসিয়াছে! এখানেই যে তাহার প্রাণ-বৃন্দাবনে শ্যামচাঁদের মুরলী প্রথম বাজিয়াছিল! এ বাড়ীর প্রতি ধূলি-কণা যে তাহার নিকট কত পবিত্র! সে যে তাহারই স্পর্শে জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তকে ধন্য ও সার্থক করিবে!

কাদম্বিনী জ্যোৎস্নার মনোভাবে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাকে অন্যত্র লইয়া গেল। পরে তাহাকে হাত-মুখ ধুইতে বলিয়া তাহার জলযোগের বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। জ্যোৎস্নার কিন্তু কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। [illegible]

কি উপায় হবে? এরা যে এখানে আমাকে থাকতে দেবে, তা ত মনে হয় না।"

কাদম্বিনী তাহাকে প্রবোধ দিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে উত্তর করিল,—"কি আর করবে, দুদিন চুপ করে থাক না, পরে দাদার রাগটা পড়ে গেলে আর কোন ভাবনা থাকবে না। এত দিন ধরে দাদা মনে মনে যে সব জল্পনা করে রেখেছে, সে সব উজোড় করবে ত!"

কাদম্বিনীর স্নেহের স্পর্শে জ্যোৎস্নার হৃদয়ের কপাট খুলিয়া গেল। সে কাতরভাবে তাহার হাত দুখানি ধরিয়া বলিল,—"পিসিমা, আমার কিন্তু কোন দোষ নেই, বাবা মিছিমিছি আমার উপর রাগ করে আছেন। এতদিন সে কথা কারও কাছে বলিনি, আজ আপনাকে তা না বলে থাকতে পারছিনে; আপনি কিন্তু কাকেও বলতে পারবেন না।"

কাদম্বিনী সে প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় জ্যোৎস্না বলিতে লাগিল,—"দোকানের অবস্থা যখন খুব খারাপ, চারিদিকে দেনা, আমরা সব হায় হায় করছি, বাবা ধান-জমি সব বিক্রী করবার জন্যে ওর উপরেই ভার দেন। সময় যখন মন্দ হয়, তখন বিপদ চারিদিক থেকে জড়িয়ে আসে। তখন কিসে টাকা হবে, কিসে টাকা হবে ভেবে ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছল, বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছিল? কুসঙ্গদোষে পড়ে উনি জুয়াখেলা আরম্ভ করেন। বাবা, আমরা কেউ সে কথা জানতুম না। জমি বিক্রী করে যেদিন দুশো টাকা উনি পেলেন, সেই দিন রাত্রিতেই জুয়া খেলে সব টাকা হারেন এবং বাড়ী এসে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েন। আমি বেশী পীড়াপীড়ি করাতে আমার কাছে সব কথা বলে কাঁদতে লাগলেন। ঐ টাকাই তখন আমাদের একমাত্র সম্বল, তা নষ্ট হয়ে গেছে শুনলে বাবা নিশ্চয়ই প্রাণে বাঁচবেন না ভেবে, আমি তাঁকে বুঝিয়ে সেই রাত্রেই আমার গয়না দিয়ে বললুম—সকালে যেমন করে হোক এই গয়না বিক্রী করে দুশো টাকা যোগাড় করে আনতে, উনি প্রথম কিছুতেই রাজি হন নি, পরে বাবার অবস্থা ভেবে সম্মত হলেন। পরদিন সকালে উনি গয়না বিক্রী করে টাকা এনে বাবাকে দেন। কিন্তু,

বাবা টের পেলে কি করে তাঁর সম্মুখে হাজির হবেন এই কথাই কেবল ভাবতে লাগলেন। আরও বললেন, সঙ্গী-দিগকে না ছাড়লে তাঁর স্বভাব-চরিত্র দিন দিন আরও খারাপ হবে। আমি কত বুঝিয়ে বললুম, বাবা টের পেলে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেই হবে, এমন অসময়ে বাবাকে বিপদ-সাগরে ফেলে চলে যাওয়া বড় দোষের হবে, কিন্তু তিনি কিছুতেই তা শুনলেন না। কলকাতায় কাজের জোগাড় করে আমাকে নিয়ে চলে এলেন। পিসিমা, আমার এতে কোন দোষ নেই।" এই বলিয়া জ্যোৎস্না কাঁদিতে লাগিল। কাদম্বিনীও স্নেহের আবেগে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। উঁকিয়া পাঠাইল। জ্যোৎস্না ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই শ্বশুরের মুখের ভাবে আসন্ন ঝটিকার চিহ্নসমূহ লক্ষ্য করিল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া বলির পূর্ব্ব ছাগশিশুর ন্যায় কাঁপিতে লাগিল।

বৃদ্ধ এতদিন ধরিয়া পুত্রবধূর বিরুদ্ধে মনে মনে যে রাগ ও বিদ্বেষ পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ সুযোগ পাইয়া তাহারা বাহির হইয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সেই যে তাহার বড় আদরের পুত্রকে তাহার স্নেহপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, সেই যে তাহার পুত্রের অকাল মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, রামনারায়ণের মনে তাহা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে বৃদ্ধের মনোভাব আর কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। সেই পুত্রবধূ আজ নিঃসহায় অবস্থায় ভিখারিণীর বেশে তাহার কৃপা-প্রার্থিনী হইয়া আসিয়াছে। রামনারায়ণ এমন সুযোগ কিছুতেই হেলায় হারাইতে পারে না!

রামনারায়ণ পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এখানে কত দিন থাকবে মনে করে এসেছ?"

"আমি ত আপনাদের চরণ-সেবা করবার জন্যেই এসেছি।"

"এখানেই থাকা তা হ'লে তোমার উদ্দেশ্য?"

এ প্রশ্নে জ্যোৎস্নার অন্তঃকরণ বড়ই ব্যথিত হইল। একবার মনে করিল সব কথা সে খুলিয়া বলে, এ অপমান আর সহ্য হয় না। কিন্তু পরক্ষণেই সে আপনাকে সংযত করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"আমি রাঁধুনির কাজে পেলেও ত আপনাদের খরচ হত, আমি রাঁধুনির কাজ করব। আমাকে এখান থেকে তাড়াবেন না, বাড়ীর এক কোণে একটু স্থান দিবেন।"

রামনারায়ণের কঠোর অন্তঃকরণ ইহাতেও বিচলিত হইল না। সে দৃঢ়স্বরে বলিল,—"না, তা আর হ'বার নয়। আমার বাড়ীতে তোমার আর স্থান হবে না। দুদিন থেকে চলে যেও। আমি এ বিষয়ে মন স্থির করেছি, আর কিছুতেই মতের পরিবর্ত্তন হবে না।"

সকলকে নীরব দেখিয়া বৃদ্ধ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "নিজের ছেলেকেই ছেড়ে যখন এতদিন থাকতে পেরে-ছিলুম তখন তার মৃত্যুর পর তোমাকে নিয়ে ঘর করব! এ স্বপ্নেও ভেবো না। তুমি কুমন্ত্রণা দিয়া তার সর্ব্বনাশ না করলে, সে আমারই মত বৃদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকতে পারত! থাক্, সে সব কথা ছেড়ে দাও, এখানে থাকা তোমার আর হবে না। না হয় তোমাকে কিছু টাকা দিচ্ছি, তাই নিয়ে তুমি যেখানে ইচ্ছে থাকগে। আমি এ পর্য্যন্ত করতে পারি।"

শ্বশুরের চরম উক্তি শুনিয়া জ্যোৎস্না একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। তাহার মুখ দিয়া আর কোনও কথা বাহির হইল না। কাদম্বিনী এতক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। দাদার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল, "বৌমা অনেক ক'রে বারণ করেছিল সে কথা কাউকে বলতে, তাই এতক্ষণ চুপ ক'রেছিলুম, কিন্তু আর না ব'লে থাকতে পারছি নি। তবে সব কথা শোন।" এই বলিয়া সে আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনা জ্যোৎস্নার নিকট যেমন শুনিয়াছিল যথাযথ বর্ণনা করিল।

রামনারায়ণ তাহা শুনিয়া একেবারে বিছানার উপর শুইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল,—"কি সুরেশ আমার একাজ করেছিল? এও কি সত্যি?" তাহার এতদিনের অহঙ্কার নিমেষের মধ্যে ধূলিসাৎ হইয়া মান-অভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে রামনারায়ণ জ্যোৎস্নার ঘরের দরজার নিকট গিয়া কাতরভাবে বলিল,—"মা লক্ষ্মী আমার, বড়ই দুঃখ পেয়েছ সে সময়ে তোমাকে চিনিতে পারি নি। বুড়ো

হেলের কোন দোষ নিতে নেই। তুমিই আমার ঘরের লক্ষ্মী।" পরে নীচে নামিয়া গিয়া বৃদ্ধ কাদম্বিনীকে বলিল,—সত্যি এতদিন কি অন্যায়ই করেছি, অমন সতী লক্ষ্মীকে আমি কত কুকথাই না বলেছি।"

"দাদা এমন বৌ পাওয়া বড় সৌভাগ্যের কথা।"

"সে কথা আবার বল্‌তে? আমার বরাত মন্দ, তাই অমন বৌকে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করতে পারলুম না। বৌমার শরীর দেখে ত আমার বড় ভয় হচ্ছে, একেবারে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গেছে। তা, এখানে দুদিন থাক্‌লে আবার সেরে উঠবে, কি বলিস?"

নিশ্চয়ই সেরে উঠবে; এখানকার জল-হাওয়া খুব ভাল।"

কবিতা।

[শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, এম-এ, বি-এল]

কিছু আর ত বাসনা নাই;
জীবনের সাধ তোমার প্রসাদ
জীবনে যেন মা পাই।
আমি শিশুকাল হতে এই পথে পথে
তোমার মন্দির-দ্বারে
ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতিমা হেরিবা
এসে দাঁড়ায়েছি দ্বারে;
বড় সাধ মনে তোমার অঙ্গনে
ফুটে যে কুসুম-রাশি,
চারিটি তুলিয়া ও চরণে দিয়া
আনন্দ-সলিলে ভাসি;
আর কিছু নয়, লুইয়া সদয়
সেগুলি চরণে রেখো,
হায়ারে চরণ যেন এ জীবন
বিফল না হয়ে দেখো।
তুমি আঁধারে আলোক মর্ত্তে দেব-লোক;
[illegible]
নিখিলেশ্বর পরশ-রতন,
সব রতনের বড়;
অরুণের হাসি, চন্দ্রকর-রাশি
তোমার চরণে মাখা;
বর্ণে বর্ণে লেখা ইন্দ্র-ধনু-রেখা
নয়ন-উপরে আঁকা;
তোমার অঞ্চল অনিল চঞ্চল
অবনী অম্বরময়,
তারকা-কণায়, খদ্যোত-ভূষায়
সতত খচিত রয়;
তোমার অঙ্গন ধবার নন্দন,
আনন্দ-প্রতিমা তুমি;
তোমার ভবন শিব-নিকেতন
মানস-কৈলাসভূমি;
হিমাদ্রি-শিখরে ছায়াপথ 'পরে
তোমার আসন পাতা;
মন্দাকিনী-নীরে তুমি ধীরে ধীরে
নামিয়ে এসেছ মাতা।
এ মানস-তীরে তোমার মন্দিরে
বিজনে বসিতে দিও;
বনফুল তুলে পাদমূলে খুলে,
চরণে পাতিবা নিও।

সরলতা।

[শ্রীদীননাথ মজুমদার, এম্-এ]

সরলতা সংসারের শ্রেষ্ঠ কোহিনুর,
পড় শিরে
জীবনে সহিতে হ'বে বেদনা প্রচুর।

বঙ্গে পর্তুগীজ-সম্প্রদায়-স্মৃতি।*

[শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী]

বাঙ্গালার স্মৃতিকথা বলিতে গেলে বা লিখিতে গেলে জানি না কি অজ্ঞাত কারণে নয়ন দিয়া অশ্রুধারা পতিত হয়। কত যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে, কত স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, শিল্প, কারুকার্য্য বঙ্গদেশকে গৌরব-মণ্ডিত করিয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। কত জাতির পর জাতি, বিজেতার পর বিজেতা আসিয়া বঙ্গে যে কত প্রকার স্মৃতি বিজড়িত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে কে তাহার নিরূপণ করিবে? পাঠান আসিয়াছিল, সোমনাথের চূর্ণ্যবচূর্ণিত মন্দির তাহার সাক্ষীস্বরূপ এখনও ভগ্ন অস্থি-কঙ্কালরাশি লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; গ্রীক আসিয়াছিল, পঞ্চনদের শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী চন্দ্রভাগা বিতস্তা কুলু-কুলু-রবে সে স্মৃতি-গাথা গাহিতে গাহিতে অসীম পারাবারে যাইয়া মিশিতেছে, মোগল আসিয়াছিল, দিল্লীর কুতবমিনার ও আগ্রার তাজমহল অভ্র-চুম্বী শিরোত্তলন করিয়া দিগ্-দিগন্তে এখনও সে বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। সেইরূপ যদিও পর্তুগীজ জাতি বহুদিন হইল বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, তথাচ এখনও তাহাদের বংশধরগণ অতীত কীর্ত্তির জাজ্বল্যমান সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। পর্তুগীজগণ বঙ্গীয় ভাষার উপর যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা এবং বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে তাহাদের যে সমস্ত গির্জ্জাঘর রহিয়াছে তাহা দূর ভবিষ্যতেও পর্তুগীজদের স্মৃতি-সৌরভ দিগ্‌দিগন্তে বহন করিবে। বঙ্গদেশে কলিকাতায়, ঢাকায়, হুগলীতে, চট্টগ্রামে, নোয়াখালীতে এবং আসামের সর্ব্বত্রই এখনও অনেক পর্তুগীজ সম্প্রদায় আছে, তাহারা পর্তুগীজ শোণিত-সম্ভূত না হইলেও তাহাদের সহিত অন্য পর্তুগীজ সম্প্রদায়ের কোন না কোন সূত্রে সম্বন্ধ আছে এবং তাহাদের [illegible] পর্তুগীজ [illegible]। যাহাতে পর্তুগালের সহিত [illegible] অন্যান্য উপনিবেশ-বাসীর পরস্পর সৌহার্দ্দ্য ও [illegible] প্রগাঢ় সহানুভূতির বিনিময় হয়, এই জন্য পর্তুগীজ জাতির মধ্যে এই নিয়ম হয় যে, পর্তুগীজ-অধিকৃত সমস্ত উপনিবেশ-বাসীরা পর্তুগীজ নাম, ধর্ম্ম, ভাষা এমন কি পোষাক পর্য্যন্ত গ্রহণ ও ব্যবহার করিবে। পর্তুগীজ ও ভারতীয় নারীর মধ্যে আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং কোন পর্তুগীজ কোন উচ্চবংশ-সম্ভূতা ভারত-নারীর পাণি গ্রহণ করিতে পারিলে আপনাকে গৌরবান্বিত, সম্মানিত, কৃতার্থ ও চরিতার্থ মনে করিতেন। পর্তুগীজ ও ভারতবাসীর মধ্যে যে আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে সমস্ত ভারতবাসী খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, তাহারা আপন আপন নাম পর্তুগীজ ভাষায় পরিবর্ত্তন করিতেন। আবার কোন কোন ভারতবাসী পদ-সম্মানের খাতিরে পর্তুগীজ নাম গ্রহণ করিতেন। ডিসুজা, ডিসিল্‌ভা, ডিমেলো, ব্যারো প্রভৃতি নাম ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ভারতবর্ষে যাহারা পর্তুগীজ-নামে পরিচিত তাহারা বংশানুক্রমে পর্তুগীজ নহে। তাহাদের মধ্যে অনেক বিশুদ্ধ ও অমিশ্র অধিবাসী আছে। প্রকৃত পর্তুগীজের সংখ্যা ভারতবর্ষে অতি কম; যাহাও অধুনা ভারতে দেখা যায় তাহার অধিকাংশ অল্পদিন হইল কেহ বা নাবিকভাবে, আর কেহ বা অন্য কোন ব্যবসায়ী হিসাবে—এদেশে আসিয়া বাস করিতেছে। ১৯১১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায় যে, অধুনা ভারতবর্ষে যে সমস্ত পর্তুগীজ আছে তন্মধ্যে শতকরা দশজন মাত্র পর্তুগালে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এদেশে পর্তুগীজদের বংশধরদিগকে প্রথমে "ফিরিঙ্গী" বলিত। বাস্তবিকই তখন ফিরিঙ্গী বলিলে পর্তুগীজ সম্প্রদায়কেই বুঝাইত। "ফিরিঙ্গী" শব্দটি পূর্ব্বে খৃষ্ট ধর্ম্মে ল্যাটিন-বিশ্বাসীদিগের প্রতি প্রযুক্ত হইত এবং এই শব্দটা এক সময়ে খুব গৌরবব্যঞ্জক ছিল। কিন্তু কালের বিচিত্র গতির ফলে এখন এই শব্দটী এক ঘৃণাব্যঞ্জক হইয়া [illegible] ক্লোজ সাহেবকে "ফিরিঙ্গী"-আখ্যায় [illegible]

---

* এই প্রবন্ধটি Mr. F. J. Monahan, I. C. S. মহোদয়ের সভাপতিত্বে Mr J. J. [illegible] কর্ত্তৃক "Portuguese in Bengal" শীর্ষক বক্তৃতার সারাংশ লইয়া লিখিত।

[illegible]। পর্তুগীজদের অধিকাংশই এংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইষ্ট ইণ্ডিয়ান নামে জনসাধারণে পরিচিত।

পর্তুগীজেরা যখন এদেশে প্রথম আগমন করেন, তখন দাস-ব্যবসায়ের খুব প্রচলন ছিল। তখন হিন্দু ও মুসলমান উভয় আইনই দাস-ব্যবসায়ের সমর্থন করিত। পর্তুগীজদিগের অনেক ক্রীতদাস ছিল। তাহারা পর্তুগীজ ভাষায় আপন আপন নামকরণ করিত। কলিকাতায় পর্তুগীজ নারীরা ভারে ভারে ক্রীতদাস কিনিয়া জাহাজে করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। অন্য লোকে ক্রীতদাস কিনিয়া অমানুষিক অত্যাচার করিবে ইহা তাঁহারা আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। পর্তুগীজ মিশনারীরা ইহাদের পর্তুগীজ ভাষায় নামকরণ করিতেন এবং তদনন্তর খ্রীষ্টান-দিগের নিকট তাহাদিগকে বিক্রয় করিতেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতের তথা-কথিত পর্তুগীজদের মধ্যে এমন শত শত সরলপ্রাণ ভারতবাসী রহিয়াছে যাহাদিগকে একদিন ক্রীতদাস করিয়া বলপূর্ব্বক খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছিল। যে সমস্ত খ্রীষ্টান এই মিশ্রিত পর্তুগীজ জাতি গঠন করিয়াছিলেন তাঁহারা ঠিক পর্তুগীজ জাতির ন্যায় পর্তুগীজ ভাষাতেই কথাবার্ত্তা বলিতেন। বলা বাহুল্য, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান ও পর্তুগীজ জাতির মধ্যে পর্তুগীজ ভাষারই প্রাধান্য ছিল। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্তুগীজ ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজী ভাষার প্রচলন হয়। এ বিষয়ে Abbe De Bois বলেন :—Most of the Christian Portuguese in India have no more relation by birth or otherwise with the Portuguese or other European nation than to the Tartar clamicks. They are partly composed of half-castes, the illegitimate offspring of Europeans and a few descendants of the Portu, whilst the majority of them are the offspring of Hindus of the lowest rank who after learning [illegible] of the European language put on a hat, হইত, তাহারাই অধিক পরিমাণে ইউরোপীয় পরিচ্ছদ, জুতা, জামা, চাল-চলন অনুকরণ করিত।

পর্তুগীজেরা যে সময়ে বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে, সেই সময়ে পর্তুগীজ ভাষা কেবল যে পর্তুগীজ জাতিদের ও বঙ্গবাসীদের প্রচলিত ভাষা বলিয়া পরিগণিত ছিল তাহা নহে, পরন্তু ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী এবং অন্যান্য বৈদেশিকগণ যাঁহারা বঙ্গদেশে প্রবাসিভাবে বাস করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও এই ভাষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সে সময়ে দেশীয় বিচারালয়সমূহে কেবল মাত্র পার্শী ভাষা ব্যবহৃত হইত। বঙ্গদেশে পর্তুগীজ আধিপত্য-বিলোপের অনেক পরেও জনসাধারণের মধ্যে পার্শী ভাষাই প্রচলিত ভাষা ছিল। শুধু ইহাই নহে, ভারতের সমগ্র উপকূলেও পর্তুগীজ ভাষা প্রচলিত ছিল। বঙ্গদেশে পর্তুগীজ ভাষা যে কেবল হুগলী ও চট্টগ্রামে আবদ্ধ ছিল তাহা নহে, পরন্তু এই ভাষা গঙ্গানদীর উপকূলসমূহে প্রচলিত ছিল; যেহেতু গঙ্গানদীর উপকূলের সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে পর্তুগীজ অধিকার ছিল। কলিকাতা, হুগলী, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে সমস্ত লোক বাস করিত, তাহাদের সহিত পর্তুগীজ ভাষাতেই কথাবার্ত্তা বলিতে হইত—নতুবা তাহারা বুঝিতে পারিত না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভৃত্যবর্গ পর্তুগীজ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিত। লর্ড ক্লাইব স্বয়ং পর্তুগীজ ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি এই ভাষাতে দ্রুত কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন এবং সৈন্যদিগকে তিনি এই ভাষাতেই আজ্ঞা করিতেন। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে সনন্দ লাভ করেন, তাহাতে অন্যান্য ধারার মধ্যে এইরূপ একটী ধারা ছিল যে, প্রত্যেক ইংরেজ কর্ম্মচারীকে এক বৎসরের মধ্যে পর্তুগীজ ভাষা শিখিতেই হইবে। এ বিষয়ে Alexander Hamiltion বলেন :—Along the coast the Portuguese have left the vestiges of their language that most European learn first to qualify themselves for a general conversa-

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক অধিবাসিগণ অর্থোপার্জ্জনের জন্যই হউক অথবা পর্তুগীজদিগের সহিত সম্বন্ধ হেতুই হউক যে-কারণেই হউক না কেন, সকলেই এই ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল। Kiernander বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম মিশনারী; তিনি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। Clarke নামক অপর একজন মিশনারীও ধর্ম্মপ্রচারকল্পে পর্তুগীজ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের Quarterly Review পত্রে জনৈক লেখক লিখিতেছেন:—"If in the eventual triumph of Christianity in India a Romish church should be formed; Portuguese will be the language of that church wherever it stands." বস্তুতঃ ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পর্তুগীজ ভাষা কলিকাতার সমস্ত ক্যাথলিক গির্জ্জায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। মিশনারীদের সাহায্যকল্পে বঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম যে তিনখানি পুস্তক রোমীও অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল তাহা ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবন সহরে পর্তুগীজদের দ্বারা লিখিত হইয়াছিল। এখ ও এই বই তিনখানির মধ্যে একখানি বঙ্গের Asiatic Soceity তে আছে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক দিনেমার জাতীয় সৈন্যাধ্যক্ষ প্রতিদিন শ্রীরামপুরের গবর্ণরের নিকট পর্তুগীজ ভাষায় রিপোর্ট পাঠাইতেন। বর্ত্তমানে পর্তুগীজ ভাষা তাহাদের বংশধর বা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী এতদ্দেশবের কাহারও মধ্যে ব্যবহৃত হয় না। ঐতিহাসিক মার্শম্যানের মত এই যে, অধিকাংশ পর্তুগীজ এখন বাঙ্গালা ভাষাতেই কথা বার্ত্তা বলে।

পর্তুগীজদের স্থাপত্যের স্মৃতি তাহাদের গির্জ্জা-সমূহে পরিস্ফুট রহিয়াছে। পর্তুগীজদের ভারতে আগমন উদ্দেশ্য যে কোন বাণিজ্য ও ব্যবসায় ছিল তাহা নহে, পরন্তু ধর্ম্মপ্রচারও তাহাদের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া Pedro Taveras এর অধীন যে পর্তুগীজ মিশনারী দল ভারতে আসে তাহারাই বঙ্গে সর্ব্বপ্রথম পর্তুগীজ। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দের আরম্ভ হইতে পর্তুগীজ ধর্ম্মপ্রচারকগণ বঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম [illegible] প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। অগষ্টিনিয়ান্ সম্প্রদায়ই বঙ্গের উল্লেখযোগ্য মিশনারী। তাঁহারা ঢাকা, ব্যাণ্ডেল, চাঁদপুর, বাঁশা, পিপ্লী, বালেশ্বর, তমলুক, যশোহর হিজলী, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটী, শিরীপুর ও আরাকানে যে সমস্ত গির্জ্জা তৈয়ারী করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি পর্তুগীজ-স্থাপত্যের অনন্ত সাক্ষী। ১৬২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পর্তুগীজেরা চট্টগ্রামে ৪২,০০০ ক্রীতদাস আনিয়াছিল, তন্মধ্যে ২৮,০০০ ক্রীতদাস খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন তাহারা ৫,০০০ আরাকান বা মগদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী-অবরোধের ফলে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারে অনেক বাধা উপস্থিত হয়। এই অবরোধের ফলে অনেক গির্জ্জা ঘর ও সমাধি পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়াছিল। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট সাজাহানের নিকট হইতে ৭৭৭ বিঘা নিষ্কর জমি লইয়া ও অন্যান্য অনেক সুবিধা লইয়া পর্তুগীজেরা হুগলীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ব্যাণ্ডেলে এখনও পর্তুগীজদের ৩৮০ বিঘা জমি আছে। সম্রাট সাজাহান যে ফর্ম্মাণ দিয়াছিলেন, সেই ফর্ম্মাণের বলে ব্যাণ্ডেলের ধর্ম্মযাজক স্থানীয় অধিবাসীদের উপর সমস্ত প্রকার দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ক্ষমতাও তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। কেবল কোন অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পর্তুগীজেরা এই প্রকার সুযোগ, সুবিধা ও ক্ষমতা ভোগ করিতেছিলেন; অতঃপর ইংরাজেরা আসিয়া তাঁহাদের ক্ষমতা লোপ করিলেন।

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্ণক যখন কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন, তখন পর্তুগীজ ও অন্য খ্রীষ্টানেরা তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন এবং পুরাতন কেল্লার নিকট একটি ক্ষুদ্র গির্জ্জাঘর তৈয়ারী করিয়াছিলেন। ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে স্যার জন গোল্ড করো এই ক্ষুদ্র গির্জ্জা ধ্বংস করেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ চার্চ্চ ষ্ট্রীটে মুর্গীহাটা চার্চ্চ তৈয়ারী হয়। এই চার্চ্চ এখন আর পর্তুগীজদের অধিকারে নাই, এখন ইহা খ্রীষ্টানদের "ক্যাথিড্রাল চার্চ্চ।" দিন দিন কলিকাতায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় বৈঠকখানায় আর একটি গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়, বলা বাহুল্য ইহাই পর্তুগীজদের শেষ কীর্ত্তি।

বিচার-কক্ষে ।

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল, বি-এ]

(১)

বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বছর পাঁচেক পরে অজিতকুমার যখন ঢাকার এডিশন্যাল সেসন্স জজের পদে বদলী হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৩০।৩১ বৎসর। গভর্ণমেণ্টের কাজে প্রথম হইতেই তাঁহার বেশ প্রতিপত্তি, এবং ক্রমেই তিনি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। সাধারণতঃ জজ সাহেব কিম্বা মিঃ ব্যানার্জ্জি আখ্যাতেই ছিল তাঁহার পরিচয়।

* * *

অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি; শীতটা তখন একটু একটু করিয়া বেশ তীক্ষ্ণভাবেই বাঙ্গালা নামিয়া পড়িতেছিল। সেই সময় একদিন বেলা তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে,—অজিতকুমার একটু ব্যস্তভাবে নিজের সাজ-সজ্জা সারিয়া লইতেছিলেন। আজ কোর্টে একটা বড় 'কেস্' শেষ হইবার কথা।

কি একখানা দরকারী পুরাণো কাজ খুঁজিতে ড্রয়ার খুলিয়া হাতড়াইতেই হঠাৎ একখানা অনেক দিনের চিঠি তাঁহার নজরে পড়িয়া গেল। খামের উপরে তাঁহারই নাম লেখা, লণ্ডনের ঠিকানায়। আজ সহসা এই চিঠিখানি তাঁহার হাতের উপর আসিয়া পড়িতেই তাঁহার মুখের ব্যস্ত ভাবটা যেন একটা কশাঘাতে মলিন হইয়া গেল! মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি অন্যমনস্কভাবে চিঠিখানি বাহির করিয়া চোখের সামনে ধরিলেন। চারি বৎসর আগেকার চিঠি, পরিচিত হস্তাক্ষর,—সেই আঁকা বাঁকা বড় বড় অক্ষরগুলা যেন তাঁহার হৃদয়ের তলে তলে একটা গুপ্ত ছুরী বসাইয়া গেল।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়
যশোহর।

শ্রীচরণেষু—

প্রিয়তম! অনেক দিন তোমার চিঠি পাই নাই। সকলে যা বলিতেছে, তাই কি ঠিক? বিলেতে গিয়া তুমি কি সব ভুলিয়া গেলে? আমি যে অভাগী, অনেক কথা ভাবিয়াছি, বড়, এখন করিতে পারি নাই। এখনও যে আমার মনে হয়, আবার তুমি আস্‌বে,—আবার তোমার পাব,—আবার তুমি তেমনি আদর ক'রে ডাক্‌বে। শুন্‌ছি, তুমি নাকি পাশ হ'য়েচ, কিন্তু কৈ, আমায় তো তুমি কোনও খবর দিলে না। তুমি আজ এত উঁচুতে, আর আমি কেন এমন ক'রে এত নীচেয় প'ড়ে থাকব? কত লোকে তোমার সঙ্গে দেখা ক'চ্চে, আমি কেন তা'তে বঞ্চিত হব? পায়ে পড়ি তোমার—একবারটি এসো তুমি, একবার আমায় দেখা দাও! মা'র ব্যারাম শুনেও যখন তুমি এলে না, তিনি যখন তোমাকে না দেখেই এমন করে' কেঁদে চলে গেলেন, তখন আমার জন্যে তুমি কি আস্‌বে?

যদি পার একটা উত্তর দিও। অন্ততঃ দুটী ছত্রও লিখো—তুমি কেমন আছ। আমি এখনও তোমার উত্তরের আশায় বুক বেঁধেছিনুম। পাষাণ-দেবতা, আমার ইহ-পরকালের সর্ব্বস্ব, আমার কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ কর।

প্রণতা
শ্রীমতী নীলিমা দেবী।

(২)

চিঠি পড়িয়া সুস্থ বলিষ্ঠ অজিতকুমারেরও যেন মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। আজ এই কতদিনের পুরাণো প্রয়োজনহীন চিঠিখানার ভিতর কত নূতন অর্থ—কত নূতন বেদনা সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কৈ, সেদিন ত তা হয় নাই! সেদিন ত এই পত্রখানা তাঁহার অন্তরে কোন উৎকণ্ঠা—কোন ব্যাকুলতা জাগাইতে পারে নাই! সেদিন ত এই সামান্য কাগজখানা এমনভাবে তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিতে পারে নাই! তখন হৃদয়ে তাঁহার এক অপূর্ব্ব উন্মাদনা—অভূতপূর্ব্ব আনন্দাবেগ, উহার একটী স্পর্শে অপর সব অনুভূতি—সব স্মৃতি নিমেষে চুরমার হইয়া গিয়াছিল। তখন তাঁহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া শুধু একটী চিন্তার—একটী মূর্ত্তির—একটী জ্যোতির স্থান ছিল,—সে এক হাস্যলাস্যময়ী সুশোভনা সুশিক্ষিতা যুবতী-প্রতিমা! আর ত তার কিছু ছিল না! হিন্দুত্বের অভিমান মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হইয়াছিল; দূর—অতিদূর—পরিত্যক্তা পরিণীতা ধর্ম্মপত্নীর বিদায়কালীন সে কাতর সজল কটাক্ষ, স্নিগ্ধোজ্জ্বল মাতৃমুখে সে সহস্র প্রাণোচ্ছ্বাস আশীর্ব্বাদ, রূপমুগ্ধ যুবকের আকুল অন্তরে তাহাদের একটু স্থান ছিল কি?

অজিত দুর্বলচিত্তে পিছনের সোফায় পড়িয়া ভাবিতে-ছিলেন, এমন সময়ে পদশব্দে চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, হাসিতে হাসিতে পত্নী লেনা আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি শুধু সন্ত্রস্তভাবে চিঠি-খানি কোটের পকেটের মধ্যে পুরিয়া ফেলিবার অবসর পাই-লেন। লেনা হাসিয়া বলিল, "এমন করে' বসে কেন?" তার পর একটা প্রেমের কবিতার খানিকটা আওড়াইয়া সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অজিতও হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে হঠাৎ চাপা দীর্ঘশ্বাস আপনাআপনি বাহির হইয়া পড়িল। লেনা বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল—'ও কি।'

অজিত তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সহাস্যে তাহাকে কাছে টানিয়া তাহার কম্পিত বিম্বাধরে নিজের অধর চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "কি?" অজিত তাহার মুখের পানে চাহিয়া এবং সপ্রতিভভাবে ঘড়িটি খুলিয়া দেখিয়াই লেনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মোটরে উঠিয়া বসিলেন।

(৩)

কোর্টে আসিয়া হাকিম সাহেব বিচারাসনে বসিলেন। নারায়ণগঞ্জের নিকট কোন এক গ্রামে একটা ভীষণ কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সেখানকার ঘোষেরা মস্ত বড় লোক, ঘোষেদের জন্যই সে গ্রামটী জেলায় প্রসিদ্ধ ছিল। উপস্থিত মোকর্দ্দমায় আসামী ঐ ঘোষেদের এক দুর্দ্দান্ত যুবক। গ্রামের মধ্যে তাহার প্রতাপ অত্যধিক। সম্প্রতি ঐ গ্রামের এক নিরীহ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রজার বাটীতে একটা ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বুড়া ঘরে ঘুমাইতে-ছিল, অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় প্রতিবেশীরা নাকি তাহাকে সেখান হইতে বাহির করিয়া আনে। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হই-বার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হয়। বাড়ীর ভিতরে বুড়ার এক-মাত্র দৌহিত্রী ছিল। কিছুদিন যাবৎ পিতৃমাতৃহীনা হইয়া সে এই বৃদ্ধের নিকটেই বাস করিতেছিল। সকলে প্রাণপণ চেষ্টায় তাহার সন্ধানে জলন্ত গৃহে প্রবেশ করে, কিন্তু মেয়েটীকে কোথাও পাওয়া যায় নাই। তখন অনেকের অনেক রকম সন্দেহ হয়; কিন্তু কেহই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই। গ্রামের দুই একজন ভদ্রলোক গোপনে পুলিশের সাহায্য লইয়া দুই তিনদিনের মধ্যে মেয়েটীকে আসামীর এক ভাঙ্গা বাড়ী হইতে উদ্ধার করে। সকলের বিশ্বাস, আসামীই সকল অনিষ্টের মূল। তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য সকলেই বদ্ধপরিকর।

হাকিম সাহেব সমস্ত শুনিয়া একবার আসামীর গর্ব্বিত মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া তিনি অপর একজন সাক্ষীর এজেহার শুনিলেন। তাহাও অনেকটা সন্তোষজনক হইল। তখন তিনি সেই মেয়েটীকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বক্রদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন, আসামীর মুখখানা যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে কালিবর্ণ হইয়া গেল।

ভদ্র-পরিবারের মহিলা-সংক্রান্ত মামলা বলিয়া আগেই দরখাস্ত-অনুসারে বিচার-কক্ষে বাহিরের লোক-সমাগম হইতে দেওয়া হয় নাই।

মেয়েটীকে আনিয়া কাঠ-গড়ায় হাজির করা হইল। অবগুণ্ঠনে তাহার সমস্ত মুখ ঢাকা! আসিতে আসিতে সে যেন বার দুই পড়িয়া যাইবার মত হইয়াছিল। হায়! ইহার চেয়ে যে তার মরণও ছিল ভাল! নিরপরাধা অন্তঃ-পুরবাসিনী আজ কেমন করিয়া এ সব কথা বলিবে! এ শাস্তি কেন ভগবান!

উকিল বলিলেন,—"আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করব, তার উত্তর দিতে হবে। ভয় নেই, বেশী কথা বল্‌তে হবে না।"

অবগুণ্ঠিতা নারীর সমস্ত শরীর যেন হিম হইয়া আসিল। কিন্তু পরক্ষণেই হঠাৎ কিসের একটা অনির্ব্ব-চনীয় তেজে উজ্জীবিত হইয়া সে নিজের অবগুণ্ঠন উন্মো-চন করিয়া দাঁড়াইল। সে কি সতীত্ব, না, মহামায়ার মহাশক্তি! সোজা দাঁড়াইয়া উকীলের দিকে সতেজ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"কি বলুন!"

সহসা এই ভাব-পরিবর্ত্তনে উকীল বাবু একটু যেন থতমত খাইয়া গেলেন। একটু আমতা-আমতা করিয়া করিয়া কি বলিতে মুখ তুলিলেন। একি! মেয়েটা যে একদৃষ্টিতে সোজা জজের দিকে তাকাইয়া; চক্ষে পলকও বুঝি পড়িতেছে না! বৃদ্ধ উকীল নারীর সেই ভাস্বর সুন্দর

মুখখানির পানে মুহূর্ত নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া বোধ করি 'অনধিকার-চর্চ্চা' ভাবিয়াই আপনা আপনি চক্ষু নামাইয়া লইলেন।

হাকিম সাহেবও পলক ফেলিতে পারিতেছিলেন না। ঐ স্থির আঁখি-তারাদ্বয় এমন ভাবে তাঁহার উপর নিবদ্ধ কেন? নারী নিশ্চল—সম্পূর্ণ নিশ্চল, বুঝি বা কোন্ এক ভাস্কর-খোদিত মনোহর পাষাণ মূর্ত্তি! কিন্তু, দৃষ্টি এত জ্বালাময়ী কেন? ঐ সামান্যা নারী আজ এ দৃষ্টি কোথা হইতে পাইল! তাহার সমস্ত গণ্ড-ললাট পাংশুবর্ণ। ঘন-কৃষ্ণ রুক্ষ কেশরাশি উজ্জ্বল করিয়া সীমন্তে সিন্দুর-রেখা দীপ্তি পাইতেছে!

অজিতকুমার কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। চক্ষু নামাইয়া লইলেন; কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাহা তুলিতেই দেখিলেন—ঠিক তেমনি করিয়া সে চাহিয়া আছে। একি দৃষ্টি! কিন্তু—কিন্তু এ মুখ—

কি একটা অনুভূতি তাঁহার স্মৃতির আকাশে যেন বিদ্যুৎ-রেখার মত তীব্রবেগে জাগিয়া উঠিয়া গেল। দেখিলেন, রমণী চক্ষু নামাইয়া পাশের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ওকি! সর্ব্বশরীর তাহার কাঁপে কেন! সে যেন আরও—আরও জোরে তাহার অবলম্বনটী আঁকড়াইয়া ধরিল। একটা গভীর যন্ত্রণায় যেন সে একবার ঝুঁকিয়া পড়িয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথার অবশিষ্ট কাপড়টুকু খুলিয়া গিয়া কাঁধের উপর নামিয়া পড়িল। সে আবার দৃষ্টি তুলিল। একি এ! এ কার মূর্ত্তি! কে এ নারী!—অজিতের বুকের ভিতর একটা উন্মত্ত তুফান ফেনাইয়া উঠিয়া তাহার নিঃশ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিল। এ যে ঠিক সেই চাহনি! সেই বালিকার কাতর মুখচ্ছবি! এ যে নীলিমা!

উকীল মহাশয় আবার কাগজপত্র হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন,—"এখন বোধ হয় আমি জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারি ধর্ম্মাবতার!"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে অজিতকুমার একটু চমকিয়া উঠিয়া যথাসম্ভব প্রকৃতিস্থ হইয়া রুমালে ললাটের ঘাম মুছিয়া বলিলেন,—নিশ্চয়, আপনি আরম্ভ করুন।

তখন উকীল আসামীকে প্রশ্ন করিলেন,—"আপনি কি আসামীকে চেনেন?" নীলিমা মুহূর্ত্তের জন্য নীরব থাকিয়া—বুঝি নিজের ভিতর যথেষ্ট বলসঞ্চয় করিয়া লইয়া বলিল,—"হ্যাঁ, চিনি বৈকি! ঐ আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়েছিল। ওরই লোকে সাক্ষী করে"—তার পর কি বলিতে গেল, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। দৃঢ়মুষ্টিতে কাঠগড়া চাপিয়া ধরিয়া আবার বলিল,—"ওগো, তোমরা ত' সব শুনেচ! তার একবর্ণ মিথ্যা নয়! আমায় আটক করে রেখেছিল, কিন্তু—কিন্তু আমি ওর মা!—" বলিয়া চুপ করিয়া হাকিমের পানে অনিমিষে তাকাইয়া রহিল। তারপর সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"আর—আমার স্বামী—"

উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার স্বামী কি জীবিত?" উকীলের দিকে একটা কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিয়া উঠিল,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনি আছেন আছেন!" বলিতে বলিতে আবার অজিতের মুখের উপর তার সবটুকু চাহনি তুলিয়া ধরিল। একি দীপ্তি! একি সতীত্বের অনির্ব্বচনীয় গরিমা! মুহূর্ত্তের জন্য সেই মুখখানিকে অজিতকুমার স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত দেখিতে পাইলেন। অন্য সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

নীলিমা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"আমার স্বামী—আমার স্বামী—" আর বলিতে পারিল না। হঠাৎ তার সংজ্ঞাহীন শীর্ণ তনু মেঝেতে পড়িয়া গেল।

সকলে ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ উকীল হাকিমের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তিনি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বরাবর নামিয়া আসিয়া নীলিমার কাছে দাঁড়াইলেন। প্রধান ফরিয়াদী বৃদ্ধ হারাণ গাঙ্গুলী মহাশয় নীলিমার মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন। একবার—একবার সে চক্ষু চাহিল; দেখিল, সম্মুখেই স্বামী। সে দৃষ্টি অজিতের বক্ষ ভেদ করিয়া তীরের মত ছুটিয়া গেল। দুইটা অক্ষর অজিতের কাণে গেল, মুমূর্ষু ডাকিল—"স্বামী!" তার পর তাহার ঠোঁট-দুখানি কাঁপিয়া কাঁপিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। বৃদ্ধ গাঙ্গুলী মহাশয় হস্তে নাড়ীস্পর্শ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। উকীল তাঁহাকে চুপ করিতে বলিলেন।

'ঠিক সেই সময়ে জুরীর দল "সমস্বরে আসামীকে দোষী' সাব্যস্ত করিলেন।

জজ সাহেবের নেত্রপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু যেন জমাট বাঁধিয়া রহিল। তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া আবার বিচারাসনে উঠিয়া বসিলেন। নতমুখে কি লিখিলেন,—তারপর আসামীর কম্পিত হৃদয় আরও কাঁপাইয়া কঠোর 'রায়' প্রতিধ্বনিত হইল,—"দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড!"

বাঙ্গালার ভাষা ও সাহিত্য।

[অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

বাঙ্গালা ভাষা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে, ক্রমশঃই আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহা যে বড়ই সুখের বিষয় তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বাঙ্গালা ভাষায় যত পুস্তক লিখিত ও প্রচারিত হয়, ভারতবর্ষীয় আর কোনও ভাষায় সেরূপ হয় না, এজন্য সত্যই আমরা গর্ব্ব অনুভব করি। বাঙ্গালার বহু পুস্তক ভাষান্তরে অনূদিত হইয়াছে ও এখনও হইতেছে, ইহাও আমাদের গৌরবের বিষয়। এতদিন পরে বিশ্ববিদ্যামন্দিরেও আমাদের বঙ্গভাষার স্থান হইয়াছে। বঙ্গমাতার সুসন্তান, বঙ্গভাষার ঐকান্তিক ভক্ত স্যর আশুতোষের প্রচেষ্টার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষায় এম-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হওয়ায় বাঙ্গালী জাতি আজ নিজেকে বড়ই গৌরবান্বিত মনে করিতেছে। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও বঙ্গভাষায় এম-এ পরীক্ষা-প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব হইয়াছে। আশা আছে, সেখানেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় এম-এ পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

প্রাচীনতার দাবীতেও আমাদের বাঙ্গালা ভাষা অন্যান্য ভারতীয় ভাষা অপেক্ষা ন্যূন নহে। এতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে রামাই পণ্ডিতের লিখিত 'শূন্য পুরাণ'ই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, "কেও মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে লেখা। কারণ উহাতে "নিরঞ্জনের উষ্মা" নামে যে ছড়া আছে, তাহাতে মুসলমান-আক্রমণের বর্ণনা আছে।"—[অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-শাখার সভাপতির সম্বোধন] শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদকতায় "বৌদ্ধ গান দোহা" নামক যে পুস্তক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে (১) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, (২) সরোজবজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাহ্নুপাদের দোহাকোষ ও (৪) ডাকার্ণব—এই চারিখানি পুস্তক নিবদ্ধ আছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরে লিখিত এই দোহা ও গীতিকাগুলি সংস্কৃত টীকার সহিত নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রচিত। নাথপন্থের যোগীরা ও বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরা এই সকল গীতিকার রচয়িতা। তিনি অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে এই সকল গীতিকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"উহাতে আমরা আমাদের ভাষা হাজার বৎসর পূর্ব্বে কি অবস্থায় ছিল, তাহা বেশ দেখিতে পাই। প্রাচীন কাব্যের একটি দোষ এই যে, যত লোকে ঐ ছড়া কাপি করে, তাহারা অবুঝ অংশ সোজা করিয়া লয়। যে সকল পুরাণ কথার অর্থ বুঝে না, নূতন কথা দিয়া সেগুলিকে বদলাইয়া ফেলে। ক্রিয়াপদগুলিকে ত একেবারে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেয়। এইরূপে গোবিন্দচন্দ্রের গীত ও মাণিকচন্দ্রের গীত এত বদলাইয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাকে আর প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। সিদ্ধাচার্য্যদের গীতগুলি কিন্তু সেইকালের লেখায় সেই কালের টীকার সহিত পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে পরিবর্ত্তন হয় নাই, সুতরাং হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার যে অবস্থা ছিল, তাহার একটা ঠিক ফটোগ্রাফ পাওয়া গিয়াছে। উহাতে পারসী কথার লেশমাত্র নাই। বড় বড় সংস্কৃত কথা একেবারেই নাই। সেকালের ভদ্রলোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, ঠিক সেই ভাষায় লেখা।"

এই বৌদ্ধ গান ও দোহাই যে বাঙ্গালা ভাষার অতি প্রাচীন রূপ, তাহা অনেকে (অনারেবল মিঃ এক বে মোয়াহাম প্রভৃতি) স্বীকার-না করিলেও কেহই ও পর্য্যন্ত যুক্তিপূর্ব্বক দেখাইতে পারেন নাই যে উহা প্রাচীন বাঙ্গালা

সঙ্গে। "আমি তুহু বঙ্গালী ভইলী"—এইরূপ লেখা যখন ঐ সকল গীতিকার মধ্যে পাওয়া যায়, তখন উহাই যে বাঙ্গালীর লেখা প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা, তাহা অস্বীকার করিবার সুষ্ঠু হেতু দেখিতে পাই না।

কত কাল হইতে যে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলা কঠিন। বোধ হয় মানবের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ভাষার সৃষ্টি। পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাঁহার সৃষ্ট মানবকুলের ঐহিক ও পারত্রিক বিবিধ কল্যাণ-সাধনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা করেন। এই বিধিনিষেধাত্মক বাক্যসমূহই বেদ। বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। বেদের ভাষা দুরূহ, বৈদিক অনেক শব্দ অধিক আয়াসে উচ্চারণ করিতে হয়। বেদরচনার অনেক পরে সুখোচ্চার্য্য সুকুমার ভাষায় রামায়ণাদি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই সংস্কৃতের পর আবার প্রাকৃত ভাষা উৎপত্তি লাভ করে। উচ্চারণের দোষেই সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের সৃষ্টি। অপরের উচ্চারিত ভাষা শুনিয়াই ভাষা শিখিতে হয়। কিন্তু বক্তা যেরূপ উচ্চারণ করিবে, শ্রোতা যে ঠিক তাহার অনুকরণ করিতে পারিবে এমন কোনও নিয়ম নাই। প্রমাদ, আলস্য, জিহ্বার জড়তা প্রভৃতি অপরাধে শব্দোচ্চারণের বৈগুণ্য হয় এবং এই ভাবেই শব্দ অপভ্রংশ হইয়া পড়ে। স্ত্রীলোক বালক বা নীচ শ্রেণীর লোকেরা অনেক সময়ে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও যথাযথভাবে শব্দোচ্চারণ করিতে পারে না। "ন্যায়মঞ্জরী"-গ্রন্থে জয়ন্ত ভট্ট লিখিয়াছেন,—"ন হ্যেকান্তেন যাদৃগেব বক্ত্রা শব্দঃ প্রযুজ্যতে তাদৃগেব শ্রোত্রা প্রত্যুচ্চার্য্যতে, কিন্তু প্রমাদালস্যাদিবিবিধাপরাধবিগুণকরণোচ্চার্য্যমাণোঽপভ্রংশতাং স্পৃশন্ দৃশ্যতে * * অপভ্রংশতয়াপি যে স্থিতাঃ স্থাস্যন্ত্যপি বা শাকটিকভাষাশব্দান্তানপি গোপাল[illegible] প্রযুঞ্জানা জরৎপামরাঃ প্রযত্নেনাপি ন যথোচ্চারিতানেব তান্ পঠিতুং শক্নুবন্তীতি" —(৪১৯ পৃঃ)

এই উচ্চারণ-দোষের জন্যই নিষ্ঠুর—নিটঠুর, দাড়িম্ব—দাড়িম; হরিদ্রা—হলদা—এইরূপ বহু প্রাকৃত শব্দ, সংস্কৃত হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। আবার অনেক [illegible] উচ্চারণ করিবার [illegible] হইয়া পড়ে। যেমন 'লবণ' শব্দে কোনও দুরুচ্চার্য্য অক্ষর না থাকিলেও প্রাকৃতে তাহা "লোণ' হইয়াছে।

এই জন্যই প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃতমূলক। হেমচন্দ্র, প্রাকৃত শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—

"প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতং সংস্কৃতমূলকমিত্যর্থঃ।

"প্রাকৃত প্রকাশে" বররুচিও বলিয়াছেন,—"প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্"। "কাব্যাদর্শে" আচার্য্য দণ্ডী লিখিয়াছেন যে, দেবতাদিগের উচ্চার্য্যমাণ ভাষাকেই পাণিনি প্রভৃতি মহর্ষিরা পরবর্ত্তী কালে 'সংস্কৃত এই আখ্যায় ব্যবহার করিতেন। প্রাকৃত ভাষা, সংস্কৃতোৎপন্ন, সংস্কৃততুল্য ও তত্তদ্দেশীয় ভেদে নানা প্রকার (১) জৈন গ্রন্থকার বাগ্‌ভটও স্বকৃত বাগ্‌ভটালঙ্কার গ্রন্থে দণ্ডাচার্য্যের উক্তিরই সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন,—

"সংস্কৃতং স্বর্গিনাং ভাষা শব্দশাস্ত্রেষু নিশ্চিতা।
প্রাকৃতং তজ্জতত্তুল্যদেশ্যাদিকমনেকধা॥"

২য় পরিচ্ছেদ, ২য় শ্লোক।

"সিরিসিদ্ধরাজ সচ্চং সাহসরসিক ত্তি কিত্তণং তুজ্ঝ।"
এই শ্লোকার্দ্ধে 'সাহসরসিক' শব্দ ছাড়া সকলগুলিই সংস্কৃতোৎপন্ন। 'শ্রীসিদ্ধরাজ' হইতে 'সিরিসিদ্ধরাজ', 'সত্যং' হইতে 'সচ্চং' 'ইতি' হইতে 'ত্তি', 'তব' হইতে 'তুজ্ঝ' উৎপন্ন হইয়াছে। 'সাহসরসিক' শব্দ সংস্কৃততুল্য। "সংসারদাবানলদাহনীরং"—এই প্রাকৃত শ্লোকের চরণটাও সংস্কৃত তুল্য অর্থাৎ ইহা সংস্কৃত ও প্রাকৃতে তুল্যভাবেই অবস্থিত থাকে, কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় না।

"পড়িহত্থবিবসহবইব অণে তা বজ্জ উজ্জাণম্"
এই শ্লোকার্দ্ধে 'পড়িহত্থ' শব্দ সম্পূর্ণার্থে ও 'মহবই' শব্দ চন্দ্রার্থে দেশীয়। ইহার ভাষান্তর 'হে সম্পূর্ণবিধুচন্দ্র-বদনে'। কতকগুলি দেশীয় শব্দও সংস্কৃততুল্য আছে। যেমন সংস্কৃত 'এমি' 'এমি' শব্দ কাশ্মীরে ও 'করোমি' শব্দ মহারাষ্ট্রে ব্যবহৃত হয়।

(১) সংস্কৃতং নাম দৈবী বাগন্বাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ।
[illegible] দেশীত্যনেকঃ প্রাকৃতক্রমঃ॥"
১ম পরিচ্ছেদ, ৩৩ [illegible]

রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—“সংস্কৃত যেরূপ অতিপ্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ, প্রাকৃত ভাষা তাহা নহে। পাণিনীয়াদি প্রাচীন ব্যাকরণে প্রাকৃতের উল্লেখও নাই।” (বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, ১০ পৃঃ) প্রাকৃত ভাষা যে প্রাচীন নহে, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। পাণিনীয় মহাভাষ্যে প্রাকৃতের উল্লেখ আছে (২)। এমন কি আমরা বেদেও প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষার উল্লেখ আছে, দেখিতে পাই। যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সময়ে অপভ্রংশ শব্দ প্রয়োগ করিতে নাই, যদি কেহ অপভ্রংশ শব্দ প্রয়োগ করে, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; অন্যথা সে যজ্ঞের বিপরীত ফল হয় (৩)। সংস্কৃত ভিন্ন সমস্ত ভাষাই অপভ্রংশ; আচার্য্য দণ্ডী বলিয়াছেন,—

“শাস্ত্রেষু সংস্কৃতা দন্যদপভ্রংশ তয়োদিতম্।”

(কাব্যাদর্শ, ১ম পরিচ্ছেদ, ৩৬ শ্লোক)

প্রাকৃত ভাষা, সংস্কৃতের ন্যায় দুরূহ নহে। রাজশেখর, “কর্পূরমঞ্জরী” নাটকে লিখিয়াছেন, ‘প্রাকৃত রচনা কোমল আর সংস্কৃত রচনা কঠিন। স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য আছে, প্রাকৃত ও সংস্কৃতেও সেইরূপ পার্থক্য।’ মহাকবি কালিদাসও “কুমারসম্ভবে” লিখিয়াছেন,—

“ দ্বিধাপ্রযুক্তেন চ বাঙ্ময়েন
সরস্বতী তন্মিথুনং নুনাব।
সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং
বধূং সুখগ্রাহ্য নিবন্ধনেন ॥”—

(৭ম সর্গ, ৯০ শ্লোক)

[সরস্বতী, দ্বিবিধ ভাষার দ্বারা পার্ব্বতীকে স্তব করিয়াছিলেন,—সংস্কৃত ভাষার বরকে ও সুখবোধ্য রচনা প্রাকৃত ভাষায় বধূকে স্তব করেন।]

মল্লিনাথ, ‘ সুখগ্রাহ্য নিবন্ধেন ’ ইহার অর্থ করিয়াছেন, সুখেন গ্রাহ্যং নিবন্ধনং রচনা যস্য তেন বাঙ্ময়েন। প্রাকৃত ভাষয়েত্যর্থ।”

প্রাকৃত ভাষা হইতে ক্রমশঃ বঙ্গভাষা উৎপত্তি লাভ করে। অনেকে বলেন, সংস্কৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী. তাঁহারা প্রাকৃত ভাষার মধ্যবর্ত্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। প্রাকৃত ভাষাকে ডিঙ্গাইয়া খাস সংস্কৃত হইতে যে বাঙ্গালা ভাষা আসে নাই, এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে, আজ আমরা সামান্য একটী উদাহরণ দেখাইব। বাঙ্গালায় ‘ চন্দ্রিকা ’ অর্থাৎ জ্যোৎস্না অর্থে ‘ চাঁদিমা ’ শব্দের ব্যবহার হয়। কিন্তু প্রাকৃতকে মধ্যবর্ত্তী না করিলে কখনই চন্দ্রিকার অপভ্রংশ ‘ চাঁদিমা ’ হইতে পারে না। বররুচির “প্রাকৃত প্রকাশে ” সূত্র আছে,—“ চন্দ্রিকায়াং মঃ।” এই সূত্রের বৃত্তিতে ভামহ লিখিয়াছেন,—“ চন্দ্রিকা শব্দে ককারস্য মকরো ভবতি। চংদিমা।” প্রাকৃতে চন্দ্রিকা শব্দের ককারের স্থানে মকার হয়, কাজেই প্রাকৃতে পদ হয় ‘ চন্দিমা ’। প্রাকৃত এই ‘ চন্দিমা ’ হইতেই বাঙ্গালায় “চাঁদিমা” হইয়াছে। যাঁহারা একেবারে সংস্কৃত ভাষাকে বাঙ্গালা ভাষার মূল বলিতে চাহেন, তাঁহারা এখানে বিপন্ন হইয়া পড়িবেন। ‘ চাঁদিমা ’ শব্দ যে প্রাকৃত চন্দিমা হইতে আসিয়াছে, ইহা বুঝিতে না পারায় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ রবিবাবুকে ঠাট্টা করিয়াছিলেন। রবিবাবু “কড়ি ও কোমলে” ‘ চন্দ্রিকা ’ অর্থে ‘ চাঁদিমা ’ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া কাব্যবিশারদ তাঁহার “মিঠে কড়ায়” লিখিয়াছিলেন,—

“ চাঁদিমাটী অপভ্রংশ চন্দ্রিকা কি চন্দ্রমার ?” বাস্তবিকই প্রাকৃতকে মধ্যবর্ত্তী না মানিলে চন্দ্রিকা শব্দ হইতে চাঁদিমা হইতে পারে না, বরঞ্চ ‘চন্দ্রমা’ শব্দ হইতেই কথঞ্চিৎ হইবার সম্ভব।

“ চন্দ্রিকায়াং মঃ ”—এই সূত্র না জানায় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ও এইরূপ অর্থে পড়িয়াছিলেন। তিনি

(২) “একৈকস্য শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ। তদ্ যথা গৌরিত্যেতস্য শব্দস্য গাবী গোণী গোতা গোপোতালিকাদয়োঽপভ্রংশাঃ।” —মহাভাষ্য, ১ম অঃ, ১ম আঃ।

(৩) “তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ।”—মহাভাষ্য ধৃত শ্রুতি।

“তস্মাদ্ ব্রাহ্মণো ন ম্লেচ্ছেৎ।”—শতপথ।

“তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ ম্লেচ্ছো হবা এষ যদপশব্দঃ।”—ব্যাসমঞ্জরীধৃত শ্রুতি।

“আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেৎ।”—মহাভাষ্যধৃত ও ব্যাসমঞ্জরীধৃত শ্রুতি।

লিখিয়াছেন—"চন্দ্রিমা"—চন্দ্রিকা—চন্দ্রকিরণ—জ্যোৎস্না এই অর্থে অনেকে চন্দ্রিমা প্রয়োগ করেন, কিন্তু 'চন্দ্রিমা' এরূপ শব্দই নাই।"—(বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ৩১৪ পৃঃ) এইরূপ প্রাকৃতকে মধ্যবর্ত্তী না মানিলে সংস্কৃত 'যষ্টি' শব্দের অপভ্রংশেও বাঙ্গালায় 'লাঠী' হইতে পারে না। 'যষ্টি' হইতে প্রাকৃত 'লঠ্‌ঠী' হয়। "প্রাকৃত প্রকাশে" সূত্র আছে, "যষ্ট্যাং লঃ" ও "ষ্টস্য, ঠঃ।"

কাজেই প্রাকৃত 'লঠ্‌ঠী' শব্দ হইতেই বাঙ্গালায় 'লাঠী' হইয়াছে। তারপর বাঙ্গালা 'ঘর' শব্দও কখনও সংস্কৃত গৃহ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। প্রাকৃতেই গৃহ শব্দ স্থানে 'ঘর' আদেশ হয়। [সূত্র—"গৃহে ঘরো হ পতৌ।" "প্রাকৃত প্রকাশ" ৪র্থ পরিচ্ছেদ ৩২ সূত্র] আমরা নিম্নে এইরূপ কয়েকটী শব্দের তালিকা দিলাম।—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
লবণ	লোণ	নুন (লুন)
চতুর্দ্দশ	চেদ্দহী	চোদ্দ
হৃদয়	হিঅঅ	হিয়া
শৃগাল	সিআল	শিয়াল
হর্ষ	হরিস	হরিষ
কর্ম্ম	কম্ম	কাম (পূর্ব্ববঙ্গে)
ভর্ত্তৃ	ভত্তার	ভাতার
আত্মা	আপ্পাণ	আপনি
অদ্য	অজ্জ	আজ

তবে ইহাও ঠিক যে, বাঙ্গালায় সকল শব্দই যে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া আসিয়াছে, তাহা নহে;—প্রাকৃতকে মধ্যবর্ত্তী না করিয়াও অনেক বাঙ্গালা শব্দ খাস সংস্কৃত হইতেও অপভ্রষ্ট হইয়াছে। যেমন সংস্কৃত "ধৈর্য্য" শব্দ হইতেই বাঙ্গালায় "ধৈরয" হইয়াছে। প্রাকৃতে কিন্তু "ঈদ্ ধৈর্য্যে" (১।৩৮ প্রাকৃত প্রকাশ)—এই সূত্রানুসারে ধৈর্য্য শব্দের ঐকারের স্থানে ঈকার হয়। আবার কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দ, কোনও দেশে সংস্কৃতের অপভ্রংশ কোনও দেশে বা প্রাকৃতের অপভ্রংশরূপে প্রচলিত। 'স্তম্ভ' শব্দের, অপভ্রংশ পূর্ব্ববঙ্গে "থাম্বা" বা "থাম" ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে। প্রাকৃতেই 'স্তম্ভ' শব্দের স্তকারের স্থানে থকার হয়। পশ্চিমবঙ্গবাসীরা 'স্তম্ভ' শব্দের অপভ্রংশ 'থাম' শব্দের ব্যবহার করেন। ইহা মূল সংস্কৃত হইতেই আগত, এখানে প্রাকৃত মধ্যবর্ত্তী নহে। এইরূপ আবার পূর্ব্ববঙ্গে 'আম' ও 'তামা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা সংস্কৃত 'আম্র' ও 'তাম্র' শব্দ হইতেই আসিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে যে আঁব ও তাঁবা শব্দের ব্যবহার হয়, তাহার মূল প্রাকৃত। কেন না "আম্র তাম্রয়োর্ম্বঃ" (প্রাকৃত প্রকাশ, ৩।৫৩)—এই প্রাকৃত সূত্রানুসারে আম্র ও তাম্র শব্দের মকারের স্থানে বকার হয়।

[ক্রমশঃ]

হুগলী জেলায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্ম।*

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র]

বঙ্গদেশের সমস্ত জাতিকে মোটামুটিভাবে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—অনাচরণীয় ও আচরণীয়। যাহারা হিন্দু সমাজে থাকিয়াও ক্রিয়াকাণ্ডে, আচার-ব্যবহারে সম্পূর্ণ পৃথক, এমন কি যাহাদের পৌরহিত্য-গ্রহণে ব্রাহ্মণগণ পরাঙ্মুখ, এক কথায় বহু সহস্র বৎসর হিন্দু-সমাজের স্নিগ্ধছায়ায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াও যাহারা সমাজ-তরুর পরগাছা মাত্র তাহারাই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; আর যাহারা সমাজের একাংশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গমাত্র তাহারা যে জাতিই হউক না কেন, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিপোষক। আমাদের হুগলী জেলায় উভয় শ্রেণীরই লোক বিদ্যমান। পক্ষান্তরে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হুগলী জেলার প্রাচীন ইতিহাসের সহিত প্রথম শ্রেণীর লোকের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের সহিত সেরূপ সম্বন্ধ নাই। সেইজন্যই কোন কোন ঐতিহাসিক

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, হুগলী শাখার দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

বাগ্দী ও কৈবর্ত্তকে হুগলী জেলার আদিম অধিবাসী বলিয়া বর্ণনা করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে জাতিতত্ত্ব আলোচনা সম্ভবপর নয়। তবে "হুগলী ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়র" পাঠে জানিতে পারা যায় যে, এই উভয় জাতির সংখ্যা অন্যান্য জাতির সংখ্যা অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। ১৯০১ সালের আদম সুমারীতে সমগ্র হুগলী জেলার লোকসংখ্যা দশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার একচল্লিশ বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। তন্মধ্যে কৈবর্ত্তের সংখ্যা এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার আট শত ছিয়াশী এবং বাগ্দীর সংখ্যা এক লক্ষ অষ্টাশী হাজার সাত শত তেইশ ছিল। সুতরাং উভয় জাতির লোক সংখ্যা হুগলী জেলার সমগ্র লোকসংখ্যার প্রায় $\frac{1}{3}$ অংশ। যাঁহারা হুগলী জেলার ইতিহাস-সঙ্কলনে প্রয়াসী তাঁহারা কখনই এই বিপুল জনসঙ্ঘকে পরিত্যাগ করিয়া জেলার সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উভয় জাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, তাহাদের ইতিহাসের সহিত সমগ্র বঙ্গের সামাজিক ও ধর্ম্মের ইতিহাস কিরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাহা বৈচিত্র্যে উপন্যাসের ন্যায় মনোরম, জটিলতায় দর্শনের ন্যায় দুরূহ অথচ তাহা শিশুপাঠ্য গ্রন্থের ন্যায় সরল; কারণ তাহার গতি স্বাভাবিক। সুতরাং প্রথমে এই দুই জাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করিব।

কৈবর্ত্ত:—ইহা একটি প্রাচীন জাতি, কত প্রাচীন তাহা ঠিক করিয়া বলিতে হইলে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। তবে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, মহাভারতেও কৈবর্ত্ত জাতির উল্লেখ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে কঃ বর্ত্ত অর্থাৎ জলজীবী শব্দ হইতে কৈবর্ত্ত শব্দ গঠিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে লেসেন অনুমান করেন যে, ইহা কিম্বর্ত্ত শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। সে যাহা হউক মনুতে কৈবর্ত্তকে প্রতি-নামক বলা হইয়াছে। তথায় আমরা আরও দেখিতে পাই, নিষাদের ঔরসে কৈবর্ত্তের জন্ম। সুতরাং সেই প্রাচীন কাল হইতে কৈবর্ত্ত জাতি নিন্দিত ও ঘৃণিত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় Modern Buddhism পুস্তকের ভূমিকায় বলিয়াছেন, এই কৈবর্ত্ত জাতিই বেদবর্ণিত দস্যু ও দাসজাতি। সাহসিকতায় ও বুদ্ধিতে এই জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা হীন নহে। একাদশ শতাব্দীতে ভীম নামক অনেক বীরের নেতৃত্বে এই জাতি পশ্চিমবঙ্গে এক প্রবল রাজ্য স্থাপন করিয়া পাল রাজগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। এমন কি কিছুদিনের জন্য পাল রাজগণকে পরাজিত করিয়া তাহারা সমগ্র বঙ্গের ভাগ্যবিধাতা হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের সাহায্যে বল্লাল উত্তরবঙ্গ অধিকার করিয়া মহেশ নামক জনৈক কৈবর্ত্ত বীরকে দক্ষিণঘাট রক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করেন এবং মণ্ডলবর উপাধিতে তাঁহাকে ভূষিত করেন। তাঁহারই নামানুসারে দক্ষিণঘাট মণ্ডলঘাট নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। বল্লাল সেন ও কৈবর্ত্ত-ঘটিত উপাখ্যান হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি ইহাদিগকে এক উচ্চ জাতিতে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু লোকমতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হন। রিস্লী সাহেব বলেন যে, এই কৈবর্ত্তজাতি কর্তৃকই তমলুক, তুর্কা, সুজামুটি প্রভৃতি স্থানে কৈবর্ত্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শীতলা ইহাদের প্রধানা উপাস্যদেবী এবং ইহারা অনেক স্থলে ধর্ম্মঠাকুরের পৌরহিত্য করিয়া থাকে। শীতলা ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরে আবার প্রধানা দেবী। ধর্ম্মঠাকুরের অনেক মন্দিরে শীতলামূর্ত্তি ধর্ম্মঠাকুরের মূর্ত্তি অপেক্ষা বৃহত্তর, কিন্তু সর্ব্বত্রই ধর্ম্মঠাকুরের মূর্ত্তির নীচেই রক্ষিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। একণে শুধু এই বলিতে চাই যে, ইহা হইতে ধর্ম্মপূজার সহিত শীতলা পূজার অভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে।

বাগ্দী:—বাগ্দী জাতির কোন প্রাচীন ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল উপাখ্যান প্রচলিত আছে তাহা দ্বারা এইমাত্র বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা পৌরাণিক গল্পের অনুরূপ গল্প সৃষ্টি করিয়া আপনাদিগকে হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছে। সে উপাখ্যানগুলি বড়ই কৌতুককর; সুতরাং তাহাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকিলেও প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য করিবার জন্য দুই একটি ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিব; তজ্জন্য নীরস ঐতিহাসিকের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। কিন্তু তাহারাও এক সময়ে একটা প্রবল জাতি ছিলেন।

সাঁওতালীদিগের তাঁহাদিগের সাদৃশ্যবশ হইয়াছে এবং তাঁহারা তথায় রাজত্ব করিতেন।

১। একদা পার্ব্বতী শিবের অনুরাগ পরীক্ষা করিবার জন্য কেচুনীর ছদ্মবেশে তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা মনোহরণ করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল না—শিব তাঁহাতে আকৃষ্ট হইলেন। পার্ব্বতী গর্ভবতী হন। পরে শিব পার্ব্বতীর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন যে, তাঁহার গর্ভজাত সন্তান মৎসজীবী হইবে। পার্ব্বতীর গর্ভজাত সন্তান বাগ্দী।

২। শিব ভাঙ পানে উন্মত্ত হইয়া এক সময়ে কুচ বিহারে কোচ রমণীগণের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতেছিলেন। পার্ব্বতী ক্রুদ্ধ হইয়া তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য শিব তাঁহার গর্ভে এক যমজ পুত্রকন্যা উৎপাদন করেন। একত্র পালিত হওয়ায় ইহারা বয়োবৃদ্ধি সহকারে একে অন্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে এবং পরে বিবাহিত হয়। বিষ্ণুপুরের বাগ্দী রাজা হাম্বীর ইঁহাদের সন্তান এবং বাগ্দী জাতির আদিপুরুষ।

৩। সীতাদেবীর এক বিধবা দাসী ছিল। একদা রামচন্দ্র ভ্রমক্রমে তাহার সহিত সহবাস করেন—ইহাতে দাসী গর্ভবতী হয়। পরে দাসী-পুত্রের ভবিষ্যৎ রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে পাল্কী বহন করিয়া জীবনযাপন করিবার আদেশ দেন। দাসীর গর্ভজাত পুত্র বাগ্দীদিগের আদিপুরুষ।

৪। একদা স্বর্গে দেব-দেবীদিগের সভা হইয়াছিল। সেই সভায় সমাগতা কোন দেবী গর্ভবতী ছিলেন। সভাস্থলে তাঁহার প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয় এবং তিনি চারি পুত্র প্রসব করেন। লজ্জায় তিনি একটি পুত্রকে তেঁতুলের মধ্যে, দ্বিতীয়টিকে লৌহকটাহের মধ্যে, তৃতীয়টিকে দণ্ডের মধ্যে এবং শেষ পুত্রটিকে জালের মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। তাহারা বাগ্দী জাতির আদিপুরুষ এবং তেঁতুলে বাগ্দী, কুলে বাগ্দী, ওঝা বাগ্দী এবং মেছো প্রভৃতি নামে পরিচিত। হুগলী ও ২৪শ পরগণা জেলার বাগ্দীরা তেঁতুলে, কুসমেটে, মাছুয়া, দুলে প্রভৃতি এই শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত।

হরণ (Marriage by capture) ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

কন্যার গৃহে বর প্রবেশ করিবা মাত্র বরপক্ষীয় লোকের সহিত কন্যাপক্ষীয় লোকের এখনও একটি কৃত্রিম যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে কন্যাপক্ষীয় লোককে পরাজিত করিয়া বর কন্যার হস্তগ্রহণ করেন। ইহার নাম গৌত্রান্তর। তাহার পর সিন্দুর দান। পাত্র পাত্রীর কপালে স্বহস্তে সিন্দুর লেপন করেন। এইখানেই বিবাহের শেষ। বৈদিক মন্ত্রপাঠ বাগ্দী বিবাহে দেখিতে পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত বাগ্দীদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ ও পত্যন্তর (Divorce) গ্রহণ-প্রথা প্রচলিত আছে দেখা যায়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এই জাতি হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত নহে। কোন কারণে তাহারা হিন্দুসমাজে আসিয়া আশ্রয়-গ্রহণ করিলেও, হিন্দু সমাজ আজও তাহাদিগকে অবাধে গ্রহণ করিতে পারে নাই। রিস্লী সাহেব বাগ্দী ও কৈবর্ত্তদিগকে দ্রাবীড় বংশীয় বলিয়া মনে করেন। বাগ্দীরা ধর্ম্মঠাকুরের পৌরহিত্য করিয়া থাকে; তাহাদের প্রিয় দেবতা মনসা। খুব ধুমধাম করিয়া প্রতিমা গড়িয়া হুগলী জেলার কোন কোন স্থানে মনসার পূজা হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে মনসা বৌদ্ধদেবী। নেপালের বড় বৌদ্ধ মন্দিরে আজিও মনসা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় অথচ কোন প্রাচীন ও প্রামাণিক হিন্দু গ্রন্থে মনসাদেবীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু মনসা সর্পদেবী এবং পরবর্ত্তী বৌদ্ধ-ধর্ম্মে প্রধান স্থান অধিকার করে। ধ্যানী বুদ্ধ বা অমোঘ সিদ্ধির আসন সর্প।

উপরে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা' অভাবে কৈবর্ত্ত ও বাগ্দীদিগকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে করি। কেন মনে করি এক্ষণে সেই কথাই বলিব। বঙ্গদেশকে বহু প্রাচীন গ্রন্থে গৌড় জনপদরূপে নিন্দা করা হইয়াছে। এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। শিশু, আর সেই বৌদ্ধধর্ম্মপ্লাবিত সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ নিদর্শনের অভাব লক্ষ্য করিয়া অদ্যমাত্র কালের প্রাঙ্গণ

[illegible] স্রোতের মুখে ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্থির থাকিতে না পারিয়া আপনার আদিম প্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সে ধারা আপনার গতি পরিবর্ত্তন করিতে পারে, কিন্তু তাহা যে এত অল্প সময়ের মধ্যে একান্ত লুপ্ত হইবে এরূপ বিশ্বাসের মূলে কোন যুক্তি টিকিতে পারে না। এই জন্য ঐতিহাসিকগণ ৫০ বৎসর গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বঙ্গদেশে প্রচ্ছন্নভাবে নানা সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম আপনার অস্তিত্ব আজও বজায় রাখিয়াছে।

শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম নিষ্কাশন সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত আছে তাহা ভ্রান্ত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-বিরোধী। ইতিহাসের নীরস আলোচনা পরিত্যাগ করিয়াও বলিতে পারা যায় একজন মানুষের দ্বারা পৃথিবীতে এরূপ ব্যাপার অদ্যাপি সংঘটিত হয় নাই। অধিকন্তু ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, মগধের পাল রাজগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা যে শঙ্করাচার্যের পরবর্ত্তী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হুয়েন সাং সমুদ্র ও মুঙ্গেরের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহে অর্থাৎ রাঢ়দেশে ৭০টি সঙ্ঘবাস ও ১১৫০০ ভিক্ষুর বাসের কথা স্বীকার করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য অন্ততঃ পক্ষে এক কোটি বৌদ্ধ পরিবারের প্রয়োজন। সুতরাং শঙ্করের পর ও বঙ্গদেশে সমগ্র জনসংখ্যার অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ লোক বৌদ্ধধর্মাশ্রয়ী ছিলেন। ইহার পর মুসলমান আক্রমণে বঙ্গদেশ বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। বিজয়ী মুসলমানগণ সঙ্ঘারামগুলির ভূমি আত্মসাৎ করিবার জন্য বৌদ্ধবিহার পোড়াইয়া, বৌদ্ধগ্রন্থ নষ্ট করিয়া এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে হত্যা করিয়া বৌদ্ধধর্মকে যেরূপ মুহ্যমান করিয়াছিলেন তাহাতে বৌদ্ধধর্ম এককালে নষ্ট না হইলেও বঙ্গে আর কখনও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। তাঁহারা মুসলমান ব্যতীত বঙ্গের ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী উভয় পক্ষকেই হিন্দু নামে অভিহিত করিতেন। এইজন্য মুসলমান ঐতিহাসিক গ্রন্থে আর বৌদ্ধদিগের সন্ধান পাওয়া যায় না। [illegible] হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বৌদ্ধেরাও [illegible] ধারণ করিতে [illegible] বৎসর পূর্ব্বেও যে বঙ্গে বৌদ্ধের সংখ্যা একান্ত বিরল ছিল না, সে বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নাই।

স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাঢ়ের পণ্ডিতেরা তিব্বতে যাইয়া বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। ১৩০১ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের জনৈক নৃপতি স্বীয় ব্যয়ে বুদ্ধ-গয়ার মন্দিরের সংস্কার-কার্য্য সাধন করেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতির দ্বারা বৌদ্ধশাস্ত্র অধীত ও আলোচিত হইত। কালায়নী লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাত্যায়ন গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করায় স্বীয় সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সিংহল যাত্রা করেন এবং তথায় পাণ্ডিত্যে নৃপতিকে মুগ্ধ করিয়া বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী উপাধি লাভ করেন। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার অন্তর্গত যজ্ঞোপবীতহীন যে সকল ব্রাহ্মণ শীতলাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি হস্তে করিয়া আজিও বঙ্গের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় তাহারা তাঁহারই বংশধর। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-গ্রন্থে চৈতন্যের জন্ম-সময়ে বঙ্গদেশীয় বৌদ্ধগণ আনন্দ-প্রকাশ করিয়াছিলেন, এরূপ কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। সুতরাং বলিতে হইবে, তখনও বঙ্গদেশে অর্থাৎ নদীয়া জেলার সমীপবর্ত্তী স্থানে—বর্ত্তমান হুগলী ও ২৪শ পরগণা প্রভৃতি জেলায়—বৌদ্ধের বাস ছিল। ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে এক কায়স্থ-সন্তান বৌদ্ধ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অতএব শঙ্করের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম বিনষ্ট হইয়াছিল একথা ইতিহাস-বিরোধী সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, হুগলী জেলার মধ্যে কোথায় আজও বৌদ্ধধর্ম প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

ঐতিহাসিকগণ যে যে পদ্ধতির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের সন্ধান পাইয়াছেন এইবার তাহাদের আলোচনা করিব। যে যে জাতি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং পরে হিন্দুসমাজে আশ্রয়-গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা পরে আচরণীয় জাতি এবং যাহারা বৌদ্ধধর্ম পরি- [illegible]

১। মৌলিক কায়স্থ—মৌলিক শব্দের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় ইহারাই বৌদ্ধযুগের আদিম অধিবাসী। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্ম পরিহার করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য কনোজ হইতে পঞ্চ কায়স্থের বংশধর বঙ্গের কুলীন কায়স্থদিগের নিম্নে তাঁহাদিগের স্থান নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। এই কুলীন পরিবারের সহিত বিবাহের আদান-প্রদানের (Inter-marriage) ফলে তাহাদের পূর্ব্ব সংস্কার বিদূরিত হইলেও আজিও মৌলিক কায়স্থগণের মধ্যে ৮ ঘর ব্যতীত ৭২ ঘরের মধ্যে অনেকে আচার-ব্যবহারে আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। এ সম্বন্ধে পরে অনেক কথা বলিবার আছে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আর তাহার অবতারণা করিব না।

২। নবশাখ—যে সময়ে মুসলমানগণের দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়া বৌদ্ধগণ হিন্দুসমাজে আশ্রয়-গ্রহণ করে সে সময়ে তাহাদিগকে লইয়া একটি নূতন থাক বাঁধা হয়। নবশাখ শব্দ এই অর্থ প্রকাশক। ইঁহারা স্বেচ্ছায় হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিলেও অনেকে তখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের সংস্রবে আসিতে সম্মত হন নাই, তাঁহাদিগের সহিত ইঁহাদের প্রভেদ দেখাইবার জন্য ইঁহাদিগকে আচরণীয় জাতি এবং তখন পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-মতাবলম্বীদিগকে অনাচরণীয় জাতিরূপে গণ্য করা হইয়াছিল। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম পরিহার করেন নাই তাঁহাদিগের মধ্যে সুবর্ণবণিক, কৈবর্ত্ত, বাগ্দী, নমশূদ্র প্রধান। বঙ্গের বণিকজাতি, সুবর্ণ বণিক জাতি এই কারণে বঙ্গে এত হেয়।

৩। যুগী—বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময়ে নাথ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। নাথেরা বৌদ্ধ যোগাভ্যাস করিতেন। এই জন্য তাঁহাদের অপর নাম যোগী। বঙ্গের বহুজাতি আপনাদিগের পূর্ব্ব ইতিহাস বিস্মৃত হইয়াছে; এইজন্য যুগীরা আপনাদিগকে যোগীবর মহাদেবের বংশধররূপে কল্পনা করিয়া নানা মতের সৃষ্টি করিতেছেন।

৪। কর্ত্তাভজা—ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের নামান্তরমাত্র। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে যতগুলি প্রভেদ দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে একটি প্রভেদ এই যে, হিন্দুরা দেবোপাসক এবং বৌদ্ধেরা [illegible] যদি কোন নেপালীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে সে কোন ধর্ম্মাবলম্বী—জিজ্ঞাসা হইলে তাহারা বলিবে দুইটি 'গুভাজু' ও 'দেওভাজু' অর্থাৎ গুরু-উপাসক এবং দেবোপাসক। নেপালীরা আপনাদিগকে 'গুভাজু' বলিয়া পরিচয় দেয়। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের নাম লামাধর্ম্ম এবং তিব্বতীয় ভাষায় লামাশব্দের অর্থ গুরু। কর্ত্তা শব্দের অর্থও গুরু। কর্ত্তাভজা শব্দের অর্থ গুরু-আরাধনা। বৌদ্ধধর্ম্ম নৈতিক ধর্ম্ম, কর্ত্তাভজামত সম্পূর্ণরূপে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা আধুনিক হইলেও আমরা এই সকল বিষয় বিচার করিয়া বলিতে পারি যে, ইহা কোন old cult in a new garb মাত্র। হুগলী জেলার মধ্যে অনেকে এই সম্প্রদায়-ভুক্ত; তাঁহারা গোপনে হিন্দুসমাজে থাকিয়া বৌদ্ধমতই পোষণ করিতেছেন। যাঁহারা হুগলী জেলার ইতিহাস-রচনা করিতে চান, তাঁহাদিগের উচিত কোন উপায়ে এবং কি কারণে বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ত্তাভজায় পরিণত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া ইহার বিস্তৃত ইতিহাস উদ্ধার করা।

৫। ধর্ম্মপূজা:—ধর্ম্মপূজা যে বৌদ্ধধর্ম্মেরই রূপান্তর মাত্র, এ বিষয় লইয়া বঙ্গে কয়েক বৎসর হইতে আলোচনা হইতেছে এবং আমরা যতদূর অবগত আছি তাহাতে বলিতে পারি, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই এই আলোচনার পথ-প্রদর্শক। ১৮৮৪ খৃঃ বঙ্গবাসীর সম্পাদক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বসু ধর্ম্মমঙ্গলের পুঁথি ছাপাইয়া সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি ইহার প্রতি আকৃষ্ট করেন। শূন্যপুরাণ বৌদ্ধধর্ম্মের শূন্যবাদের নামান্তর মাত্র। এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এখানে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হুগলী জেলার বহু স্থানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির ও পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গের গ্রাম্য-দেবতার মধ্যে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ঐতিহাসিকগণ এই ভাবের কথা আমাদিগকে প্রায়ই শুনাইয়া থাকেন। সে কথার অর্থ কি তাহা কতকাংশে বুঝাইবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। যাঁহারা এই ধর্ম্মঠাকুরের পৌরহিত্যে ব্রতী আছেন তাঁহারা অনেকেই ডোম, পোদ, বাগ্দী প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতি। ইহার কারণ হুগলী জেলার ইতিহাস-রচয়িতা সুধীগণকে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে পোদ, বাগ্দী, কৈবর্ত্ত

ইঁহারাই ঘোষ, হালদার প্রভৃতি ভূপতিগণ তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ এই সকল জাতি কেন যে আজ সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়। যে সকল জাতি ব্রাহ্মণের পৌরহিত্য হইতে বঞ্চিত তাহারাই আবার কোন কোন দেবদেবীর পুরোহিত। এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে ইতিহাসের একাংশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা মনে হয় তাহা বলিয়া এই প্রবন্ধটী শেষ করিব।

ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বল্লাল সেন একবার তাঁহার প্রজাদিগের আদম সুমারী গ্রহণ করেন এবং তাহার ফলে তিনি জানিতে পারেন যে, তখন বঙ্গে কনোজ ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধ বংশধর মাত্র আট শত পরিবারে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে তাহা সংমিশ্রণে আজ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কবিবর ৺অক্ষয়কুমার বড়াল।

[শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়]

বঙ্গ-কাব্য-সাহিত্যের বড় দুর্ভাগ্য যে, কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল অক্ষুণ্ণ প্রতিভা ও পরিপূর্ণ শক্তি লইয়া জীবনের অপরাহ্ণ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই লোকান্তরিত হইলেন! ইহা আমাদের শোচনীয় দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলিতে পারি! বাঙ্গালায় কবির অভাব নাই—বরং বাঙ্গালা-সাহিত্য কাব্যভারে পীড়িত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু খাঁটি কবি—ভাবুক কবি—সাধক কবি কয় জন আছেন, তাহা কেহ আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারেন কি?

অক্ষয় কবি প্রকৃত কবি-হৃদয় লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কায়-মনোবাক্যে কবি ছিলেন—কবিতার সাধক ছিলেন। তাই তাঁহার কবিতায় কাব্য-সাধনার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখি—কবি-হৃদয়ের অকপট উচ্ছ্বাস দেখি,—তাহাতে আত্মগোপন নাই; তাহা স্নিগ্ধ, পবিত্র, এবং নির্ম্মল। অক্ষয় কবির কবিতার আর একটি বিশিষ্ট [illegible] গাঢ়ত্ব—যাহা অধ্যাত্ম সুরভি—সে গুণ তাঁহার ন্যায় কবির প্রকৃতিসুলভ। ভাবের সংযম, ভাষার সংযম, ছন্দের সংযম—কুত্রাপি তাল কাটিয়া যায় নাই। এই জন্যই তাঁহাকে বাঙ্গলার কাব্য-সাহিত্যে বিশিষ্ট আসন প্রদান করিয়াছে।

বড়াল কবির কাব্যের সহিত আমাদের পরিচয় আজ তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন এই প্রবন্ধ-লেখক কিশোরবয়স্ক—বিদ্যালয়ের ছাত্র মাত্র। বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশ তখন হেম নবীনের প্রদীপ্ত প্রতিভায় ভাস্বর। তখন রবীন্দ্র-অক্ষয়-কবির কাব্য-গুরু বিহারীলালের মধুর মোলায়েম কবিতা-সুন্দরী সলজ্জা কিশোরী বধূর মত সাহিত্যের অন্তঃপুরেই নিবদ্ধা—সাহিত্যের রাজসভায় আসন-গ্রহণে কুণ্ঠিতা। সুতরাং বিহারীলালকে তখন অনেকেই চিনিতে পারেন নাই। এমনি সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার মাইকেল-হেমচন্দ্রের আলাময়ী কবিতার আদর্শ-গ্রহণ না করিয়া বিহারীলালকে তাহাদের কাব্য-গুরুর পদে বরণ করিলেন।

অক্ষয়কুমারের প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'প্রদীপ'। 'প্রদীপ' কলিকাতার 'পিপল্‌স্ লাইব্রেরী' হইতে ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়—বোধ হয়, তখন মূল্য ছিল ।৹ আনা। এক খণ্ড 'প্রদীপ' কিনিয়া পড়িলাম—নূতন ছন্দ—নূতন সুর—মোলায়েম ভাব; আমাদের যেন একটু আকৃষ্ট করিল। কবি নূতন পথের পথিক—হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের প্রশস্ত রাজবর্ত্ম ছাড়িয়া ছায়াচ্ছন্ন তপোবনের সংকীর্ণ পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তাই ভাল লাগিয়াছিল, কিম্বা আর কোন কারণে ভাল লাগিয়াছিল, ঠিক্ এখন স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না।

"যা বায়ু, তাহার কাছে
সে বুঝি ঘুমায়ে আছে"

ইত্যাদি কবিতা আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের কাব্য-জীবনের আরম্ভ এক সঙ্গে হইলেও, রবির সপ্তাশ্বযুক্ত প্রতিভা-রথ অতি শীঘ্রই কবিভ্রাতাকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়িল। আর প্রভাত শুক্রতারকার মত অক্ষয়কুমারের কোমল-স্নিগ্ধ প্রতিভা কাব্য-সাহিত্যের একাংশ উজ্জ্বল করিয়া রহিল। এইখানেই ছাড়াছাড়ি—এইখানেই উভয়

রবীন্দ্রনাথ গুরুকে অতিক্রম করিয়া অতি শীঘ্রই গীতি-কাব্যের এক স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়া তাহারই সম্রাটের পদ লাভ করিলেন। বড়াল-কবি কিন্তু অন্তরে অন্তরে গুরু বিহারীলালেরই নির্দিষ্ট পথে চলিতে লাগিলেন। গুরু ও শিষ্য উভয়েরই ভাবময় প্রাণ—উভয়েরই জীবন কাব্য-সাধনায় উৎসৃষ্ট।

বিহারীলালের প্রাণের কথা—

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক্ গে এ বসুমতী যার খুসি তার।"

তাই ত বটে! কবি আপন হৃদয়-মাধুর্য্যে আপনি মুগ্ধ—পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে কি আকৃষ্ট করিতে পারে!

শিষ্য অক্ষয়কুমার গুরুর তর্পণে যে কথা বলিয়াছেন—তাহা তাঁহারও নিজ সম্বন্ধে প্রযোজ্য—

'ধন জন মান, যার হয় হবে'
তুমি চির স্বপ্ন লাগি।"

সাধক কবি ভিন্ন অন্তর হইতে এমন কথা আর কাহার বাহির হইতে পারে? বড়াল কবির-প্রতিভার বিশ্লেষণ করিয়া আমরা তাঁহার কাব্য-সৌন্দর্য্যের হানি করিতে চাহি না। কেবল এই মাত্র বলিতে চাই যে, তিনি কবির মত কাব্য রচনা করিয়া—নিপুণশিল্পীর মত অসীম ধৈর্য্য-সহকারে তাহার অঙ্গরাগ করিয়া তবে তাহাকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেন। এই জন্যই তাঁহার ভাষা সুরলয়যুক্ত মধুর সঙ্গীতের মত পাঠকের হৃদয় মুগ্ধ করে। বাস্তবিক যে কবিতা রসে ও সৌন্দর্য্যে ভাবুকের উপভোগ্য হইবে, তাহার প্রসাধন অবশ্য-কর্ত্তব্য। দেখিতে পাই, আজিকালিকার নবীন কবিগণ সেদিকে একেবারেই অমনোযোগী বা তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের সিদ্ধ-হস্ত হইতে যাহা বাহির হয়, তাহার পরিবর্ত্তন বা পরিমার্জ্জন অনাবশ্যক। এ সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তাহা এখানে নাই বা বলিলাম।

বড়াল-কবি সুন্দর কবিতা লিখিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ সুন্দর মনে করিতে পারিতেন না, তাহাকে সুন্দরতর করিবার জন্য সতত চেষ্টা করিতেন—ভাবিতেন, বুঝি বা মনের [illegible] হইল না—[illegible] করিয়া [illegible] কাটিয়াছিলেন, বুঝি তেমনটি হইয়া উঠিল না। সে কথা তিনি তাঁহার সুন্দর ভাষায় নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন;—

"চিত্র-অবশেষে সজল নয়নে
চিত্রকর শূন্যে চায়—
হৃদয়ের ছবি উঠিল না পটে
জীবন বৃথায় যায়।"

এই অতৃপ্তি—এই সংশয় তাঁহার কাব্যে বড় সুন্দর ফুটিয়াছে।

এই তৃপ্তির অভাবেই তিনি চণ্ডীদাস কাব্যখানিকে প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কারণ তিনি স্ব-রচিত কবিতাকে মনের মত না করিয়া কিছুতেই ছাড়িতেন না—এ ক্ষেত্রে তিনি কাহারও উপদেশ শ্রবণ করিতেন না—কাহারও উপরোধ মানিতেন না। তাঁহার শেষ কাব্য ওমর খৈয়ামের কাব্যানুবাদ। মৃত্যুর অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও তিনি শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া ওমরের অনুবাদ আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন। হায়, তাঁহার সহিত আমাদের সেই শেষ সাক্ষাৎ!

কাব্য-সাহিত্যে অক্ষয়-কবির দান প্রচুর নহে, ইহা স্বীকার করি; কিন্তু তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা মহার্ঘ—তাহা বঙ্গবাণীর কণ্ঠে উজ্জ্বল মণিহারের মত চির-দিন ঝলমল করিবে। 'প্রদীপ' 'কনকাঞ্জলি,' 'শঙ্খ,' 'এষা'—অক্ষয় কবির অক্ষয় কীর্ত্তি। হায়, কবির প্রতিভা অস্তাচলে যাইবার পূর্ব্বেই কবির জীবনান্ত হইল! এ দুঃখ আমরা রাখিব কোথায়?

যাও কবি, সেই দিব্যধামে। যাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া ধন, জন, মান ভুলিয়াছিলে—কাব্য-কবিতায় ডুবিয়া পত্নীশোক সম্বরণ করিয়াছিলে—

"———অনন্ত স্বপনে
জেগে রও চিরবাণীর চরণে;
রাজহংস-সম প্রেম-গুঞ্জরণে
চরণ দুখানি ঘেরি।—
করুণাময়ীর করুণ নয়নে
সকরুণ প্রেম হেরি।"

ইংরাজী ইতিবৃত্তে হিন্দু-চরিত্র।

[শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত, বি-এ]

অনেকের মতে ভারতবাসী ও ইংরাজের মধ্যে একটা প্রীত্যভাব ও বন্ধন থাকা আবশ্যক। যখন শাসনকার্য্যের জন্য দুই দেশের মিলন হইয়াছে, তখন পরস্পরের প্রকৃতিগত মনোমালিন্য যত দূরে থাকে ততই উভয়ের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু যে সমস্ত ইংরাজ শাসন বা অন্যান্য কার্য্যের জন্য এদেশে আসেন, তাহারা অনেকে হৃদয়ে কি ভাব পোষণ করিয়া আনেন তাহা মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বিদেশে যাইতে হইলে সেই দেশের লোকের, তাহাদের রীতিনীতি, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয় স্বতঃই জানিবার ইচ্ছা হয়। সুতরাং উক্ত বিষয়ের গ্রন্থপাঠ ছাড়া গত্যন্তর নাই। 'Historian's History of the World' এই শ্রেণীর পুস্তক। এই বৃহদায়তন পুস্তক ঘরে ঘরে বিরাজ করে, সুতরাং যে সমস্ত অভিমত ইহাতে প্রকাশ আছে তাহার মূল্যও বোধ হয় অত্যন্ত অধিক।

এই পুস্তকে হিন্দুর চিত্র যেরূপ উৎকটভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। একটা মিথ্যার খোলসে ঢাকিয়া হিন্দুজাতিকে জগতের সমক্ষে অমানুষিকভাবে দাঁড় করাইয়া লেখক স্বীয় মৌলিক কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। উহা পাঠ করিলে হিন্দুদিগের উপর শ্রদ্ধা কমিয়া যায়। সুতরাং এই শ্রেণীর পুস্তক ভারতবাসী ও ইংরাজের মধ্যে মনোমালিন্যের পথ কতকটা উন্মুক্ত করিয়া রাখে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। নিম্নে আমরা এই গ্রন্থের এক অংশ অনুবাদ করিলাম। এই মিথ্যার বন্যায় ডুবিয়া বেচারা মেকলেও হাবুডুবু খাইয়াছেন।

"হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ও নীতি এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান এত বেশী যে, পাশ্চাত্য লোকের পক্ষে উহা উপলব্ধি করা দুরূহ। হিন্দুজাতি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মপরায়ণ ইহা কোন জোর করিয়া বলা যাইতে পারা যায়। আবার নীতিবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা হীন ইহা বলিলেও অত্যুক্তি প্রকাশ করা হয় না।

"দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের অনুকম্পা লাভ করাই হিন্দুর চরম উদ্দেশ্য। মানুষ মানুষের সহিত ব্যবহার করিবার সময় তাহার পক্ষে সততা অবলম্বন করা নিম্ন মাত্রও যে ভগবানের অভিপ্রেত, এ কথাটা হিন্দুকে বুঝাইবার চেষ্টা কর, সে অবাক হইয়া যাইবে। তাহার জীবনের পবিত্রতা কিংবা তাহার বাক্যের বা চরিত্রের সততা-রক্ষা করার সঙ্গেও যে ভগবানের কোন সংশ্রব আছে একথা বুঝাইতে হইলেও সে বিস্মিত হইবে। আবার প্রতিবেশীর সম্পত্তি চুরি করিলে বা শিশু হত্যা করিলে তাহার সর্ব্বশক্তিমান দেবতার দল যে ক্রুদ্ধ হইতে পারেন এ ধারণাও হিন্দুর পক্ষে বিস্ময়কর।"

বলা বাহুল্য, হিন্দুদের নীতিজ্ঞানসম্বন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতা দেখিয়া আমরাও যথেষ্ট বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। নরহত্যা বা অপহারকের সম্মান হিন্দু সমাজে কতটুকু তাহার জীবনের পবিত্রতার মূল্য সমাজে কিরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, এ জ্ঞানটুকু লেখকের মোটেই নাই। সাহেবের ধারণা যে, হিন্দুরা ধর্ম্মের নামে বাহ্যাড়ম্বর করে, ধর্ম্মের 'খোসা' লইয়া নাড়াচাড়া করে; ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব—যাহার সহিত নীতির এতটা ঘনিষ্ঠতা—তাহা হৃদয়ঙ্গম করা হিন্দু প্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব।

"যদি সে ত্রি-সন্ধ্যা না করে, ধর্ম্মপুস্তক না পড়ে, ধর্ম্মের পালপার্ব্বণে যোগ না দেয়, গোহত্যা করে অথবা নিয়মিত শৌচকার্য্য না করে, তবে তাহার দেবতারা প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া তাহার ধ্বংসসাধন করেন। এই সমস্ত পাপের জন্যই দেবতাদের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হয়। দেবতারা চান, বলিদান দাও, তীর্থপর্য্যটন কর, প্রায়শ্চিত্ত কর, তপস্যা কর, এইরূপ হাজার ধর্ম্মাধিকরণে লিপ্ত থাক, দেবতাদের আর কিছুরই সহিত সংশ্রব নাই। মানুষের বাকী যে সকল কাজ, যথা সাংসারিক, সামাজিক প্রভৃতি কার্য্যকলাপ কিছুটা ঈশ্বরের লক্ষ্যের বহির্ভূত রহিয়াছে।

"মনুর আইনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, এরূপ কি কতক প্রতি-পাপের নিয়মোক্ত প্রায়শ্চিত্ত আছে...

হিন্দুর প্রায়শ্চিত্ত। অর্থাৎ ব্রহ্মবৃত্তি, গোহত্যা প্রভৃতি পাপ অতি সামান্য প্রায়শ্চিত্তে অবসান হইতে পারে। ব্যভিচার দ্বারা পারিবারিক সম্বন্ধ সুতরাং জাতীয়তা গঠনের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্ট হয়, সেইজন্য ব্যভিচার ব্যতিরেকে শারীরিক সমস্ত পাপই হিন্দুর চক্ষে অল্পই দোষজনক। তাহাদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাধিকরণ তাহাদের স্বার্থেরই প্রশ্রয় দেয়। অথচ নিম্নশ্রেণীর লোক প্রণয়-পাত্রী হইলে তাহাদের এ পাপ রাজদ্বারে দণ্ডনীয়। নর-হত্যা দোষের গুরুত্ব বা লঘুত্ব নিহত ব্যক্তির সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। অপর-হত্যা লঘু অপরাধ। কতক ক্ষেত্রে হত্যা মোটেই দূষণীয় নয়, যথা শিশু-বালিকার নিধন।

"বৌদ্ধ দীনশীলতাই হিন্দু প্রকৃতির একমাত্র নৈতিক সম্পত্তি। খামখেয়ালি ও নিষ্ঠুর দেবতাদিগের আনন্দ-বিধানের জন্য যে কঠোর নিয়মাবলী কল্পিত হইয়াছে তাহার মধ্যেও এই দানশীলতা-প্রবৃত্তি প্রবেশ করিয়াছে! এই যে দানশীলতার প্রবৃত্তি ইহা মানুষের প্রকৃত হিত-সাধনের জন্য হিন্দুর প্রকৃতিতে স্থান পায় না। ইহা ঐ কঠোর ধর্ম্মশাস্ত্রকে মোলায়েম করিয়াছে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্ম্মম ও রুক্ষ বিধিনিষেধগুলির মধ্যে প্রেম ও উদারতা-সংযুক্ত করিয়াছে। বৌদ্ধযুগে ভারতের নৈতিক উন্নতি চরম হয় ও তাহার মঙ্গলময় প্রভাব এখনও বিদ্যমান। অবশ্য হিন্দুর কতকগুলি সদ্‌গুণ আছে। সে বিনয়ী, প্রভুভক্ত, পরিজনবর্গের প্রতি স্নেহশীল এবং অসীম সহিষ্ণুতারও পরিচয় দেয়। কিন্তু এগুলি তাহার প্রকৃতিগত চরিত্র, তাহার নীতির সহিত ইহাদের কোন সংস্রব নাই। তাহার অধিকাংশ গুণই নিষ্ক্রিয়। সে আজ্ঞার দাস এবং মাথার উপর মনিব থাকিলে সে অতি সৎ থাকে। কিন্তু পরের উপর আধিপত্য করিবার সময় সে অধার্ম্মিক, দাম্ভিক ও অত্যাচারী হয়। তাহাদের এমন কোন গুণ নাই যাহা এরূপ নীতির ফল, যে নীতি [illegible] দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত এবং যাহা যুগযুগান্তরের ক্রমোন্নতি দ্বারা পরিপুষ্ট।

[illegible] যে হিন্দু-[illegible] ধর্ম-

বিনয় ও প্রেমময়ভাবে তাহাকে [illegible] অভ্যস্ত করিয়াছে এবং এমন জল-হাওয়ায় বাস করিতে অভ্যস্ত করিয়াছে যাহা তাহার সমস্ত উদ্যম নষ্ট করিয়া দিয়াছে। বিবেক-সংস্কারের বাঁধন না থাকিলে তাহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর জাতি হইত।"

নিরামিষ ভোজন।

[শ্রীরাখালরাজ রায়, বি-এ]

সকল বিষয়ে সত্যনির্ণয় ও সত্যপ্রচার মানবের কর্ত্তব্য। ইহার মধ্যে আহার্য্য ও পানীয়ের সহিত শরীর ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ে তথ্য-নির্ণয় বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পুরাকালে ভারতীয় পণ্ডিতেরা সম্ভবতঃ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাই স্থির করিয়াছিলেন, কোন্ মৎস্য খাইতে নাই, কোন্ মাংস পবিত্র, কোন্ কোন্ খাদ্য সাত্ত্বিক, সুরাপান করিলে কত পুরুষ নরকস্থ হয় ইত্যাদি। অবশ্য এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা যাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন তদ্ভিন্ন আহার্য্য ও পানীয় সম্বন্ধে কোনও নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে না এমন নহে। কিন্তু আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক-প্রাপ্তিমাত্র বুঝিয়া ফেলিলাম, মাংস ভোজন ও সুরাপান না করিলে আমরা উন্নত হইব না; কারণ ইংরাজ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি এবং ইংরেজ মাংস-ভোজন ও সুরাপান খুব বেশী করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আমাদের শাস্ত্রেই ত বলিদান করিয়া মাংসাহারের ব্যবস্থা আছে। ইহারই ফলে, কলিকাতার বহু কসাইয়ের দোকানে কালীমাতার আবির্ভাব হয়।

আমরা যখন এইরূপ মাংস-ভোজন ও সুরাপান করিয়া ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি করিতে ব্যস্ত, তখন যাহাদের অনুকরণে আমরা উন্মত্ত, তাহারা কিন্তু আমিষ ভোজন ও [illegible] অপকারিতা-প্রচারার্থ নিযুক্ত। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়

ছিলেন, লণ্ডন নগরে ৭০টি নিরামিষ-ভোজনের হোটেল আছে। কথাটা আর কিছু নহে, য়ুরোপীয়েরা উন্নতিশীল তাই তাহারা যাহা সত্য বলিয়া বুঝে তাহার প্রচারার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করে, আর আমরা রক্ষণশীল অথচ পাশ্চাত্য আলোকপ্রাপ্ত তাই গোটাকতক বুলি আওড়াই—"আপরুচি খানা", "ধর্ম্মের সহিত খাদ্যাখাদ্যের কোন সম্বন্ধ নাই" ইত্যাদি। এখানে অবশ্য আমরা ধরিয়া লইয়াছি 'রিলিজিয়ন'এর প্রতিশব্দ ধর্ম্ম।

আমিষ-ভোজন মানবের পক্ষে প্রশস্ত নহে এই সম্বন্ধে পাশ্চাত্যদেশে দুই প্রকার যুক্তি আছে, বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক। আমাদের দেশের হিন্দুর জন্য আর এক প্রকার যুক্তির প্রয়োজন, সেটা শাস্ত্রীয় যুক্তি অর্থাৎ বলিদানটা যখন হিন্দুর শাস্ত্রে আছে তখন মৎস্য ভোজন না হউক, বলির মাংসভোজন যে প্রশস্ত ইহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যাঁহারা মাংস-ভোজনের জন্য এইরূপ শাস্ত্রীয় যুক্তির দোহাই দেন তাহারা অন্য ক্ষেত্রে কিন্তু শাস্ত্রের কথা মানিতে চাহে না।

দুর্গাপূজা বা কালীপূজা জীববলিব্যতিরেকে যে হইতে পারে তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ শোভাবাজার রাজবাটীর কুমার শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ দেব তাহার "শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজার বলি ও জীববলি" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এই পুস্তকখানি প্রায় দুই বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩২০ সালের আশ্বিন সংখ্যা "প্রবাসী"তে ৺শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহোদয় "শক্তিপূজায় ছাগাদি বলিদান বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণের মত" নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজির কাশী যোগাশ্রম হইতে ১৩২৪ সালে "বলিদানের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত" এবং ১৩২৫ সালে "বলিদান ও আমিষাহার" নামক দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই ৩ খানি পুস্তকই বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে। ইঁহাদের উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু বহু লোকের সমবেত চেষ্টায় যাহা হইতে পারিত তাহার তুলনায় ইহাতে বৎসামান্য ফল হইয়াছে। বোম্বাই নগরীতে একটি সমিতি আছে; ইহার সদস্যগণের চেষ্টায় বহু দেশীয় রাজ্যে বলহত্যায় বলি নিষিদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে সেরূপ কোন সভাসমিতি নাই, কিন্তু থাকা উচিত। যাহা হউক, আমি শাস্ত্রীয় যুক্তিগুলির সারাংশ লিখিতেছি। সমাজের কল্যাণকামীরা একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

মানুষ আদিম অবস্থায় প্রথমে ফলভোজী ছিল। ক্রমে অভাবে পড়িয়া ক্ষুধার তাড়নায় আত্মরক্ষার্থ নিহত পশুর মাংস খাইতে আরম্ভ করে। মানুষের প্রাকৃতিক খাদ্য যে পশু-মাংস নহে, তাহা মাংসভোজী জীবের শরীরের গঠনের সহিত মানবদেহের গঠন তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। মাংস যে সকল পশুপক্ষীর প্রাকৃতিক খাদ্য, মাংসআহরণ করিবার জন্য তাহাদের তদুপযোগী প্রাকৃতিক অস্ত্র আছে, যথা তীক্ষ্ণ নখর দন্ত প্রভৃতি। মানুষ পশুপালন ও কৃষিকর্ম্ম করিয়া যখন কিছু সভ্য হইল, তখন মৃগয়া, যুদ্ধ প্রভৃতি কার্য্য ক্ষত্রিয়দের বৃত্তি হইয়া দাঁড়াইল। রজঃগুণপ্রধান ক্ষত্রিয়দের যথেচ্ছ মাংসাহার কিয়ৎ পরিমাণে সংযত করিবার জন্যই শাস্ত্রে বৈধ হিংসার ব্যবস্থা। তাই শক্তিপূজা ত্রিবিধ; সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। রাজসী পূজার বলিদান ও তামসী পূজায় মাংস-মদ্যের ব্যবহার ছিল এখনও আছে। রাজসী পূজা ক্ষত্রিয় ও তামসী পূজা ইতর লোকের জন্য বিহিত। মৎস্য মাংস ভোজন ও বলিদান যে সত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত নহে, তাহার শাস্ত্রীয় যুক্তি "বলিদান ও আমিষাহার" পুস্তক হইতে গৃহীত হইল,—

অত্রিসংহিতায় ৩৭০ শ্লোকে লিখিত আছে, "মৎস্যমাংসে সদালুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে"। দেবী ভাগবতে একটি শ্লোক আছে—

মাংসাশনং যে কুর্ব্বন্তি তৈঃ কার্য্যং পশুঘাতনম্।
মহিষাজবরাহাণং বলিদানং বিশিষ্যতে॥

এই শ্লোকের টীকায় শৈব শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, এই বলিদান ক্ষত্রিয়ের জন্য, ব্রাহ্মণের জন্য নহে। টীকাটি এই—

মাংসাশনং যে কুর্ব্বন্তীতি। যদ্যপি মাংসাশনং ব্রাহ্মণৈরপি ক্রিয়তে, তথাপি ব্রাহ্মণস্য কালিকাপুরাণাদিষু সাক্ষাৎবলিদানস্য নিষেধ কথনাৎ ক্ষত্রিয় বিষয়ক এবায়ং বিধিরিতি বোধ্যম্।

যে কাজ আমার কর্ত্তব্য' তাহা প্রতিনিধি দ্বারা না

করাইয়া সমস্তটা স্বয়ং করিলে দোষের কথা হইতে পারে না। বরঞ্চ কাজটা যদি দোষের হয়, তবেই আমরা লুকাইয়া অপরকে দিয়া করাইয়া থাকি। ক্ষত্রিয়, ব্যাধ প্রভৃতি জাতি মৃগয়া ও যুদ্ধে নিযুক্ত থাকে, পশু-হনন, বলিদান প্রভৃতি কার্য্য তাহাদেরই অনুষ্ঠেয়। বলিদান কাজটা দোষের বলিয়াই ব্রাহ্মণ জাতি অপরকে ঐ কাজ করিতে দিয়াছেন। আবার পশুহনন করিয়া মাংস বিক্রয় কাজটিকেও আধুনিক সমাজ "কষাই"য়ের কাজ বলিয়া কি দারুণ ঘৃণা-প্রকাশ করে তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। মনু বলিয়াছেন, প্রাণিবধ না করিলে মাংস পাওয়া যায় না, প্রাণিবধ স্বর্গলাভজনক নহে, এজন্য মাংস সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। অনেকে বলিতে পারেন, "পশুবধ কাজটা ত আর আমি করিতেছি না, আমি মাংস খাইতেছি মাত্র।" আধুনিক আইনে যেমন অপরাধী ও তাহার সাহায্যকারী উভয়েই দণ্ড পাইয়া থাকে, মনুও সেইরূপ সকলকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া বলিয়াছেন, পশুহত্যার অনুমোদনকারী, মাংসকর্ত্তনকারী, পশুহত্যাকারী, ক্রেতা, বিক্রেতা, পাচক, পরিবেশনকর্ত্তা ও ভোক্তা ইহারা সকলেই ঘাতক। এই ভাবের কথা মহাভারতে ও কুলার্ণব তন্ত্রেও আছে।

শব্দকল্পদ্রুমধৃত পাদ্মোত্তর খণ্ডে দেবী ভগবতীর উক্তি এই ;—

দেবযজ্ঞে পিতৃশ্রাদ্ধে তথা মাঙ্গল্য কর্ম্মণি।
তস্যৈব নরকে বাসো যঃ কুর্য্যাজ্জীব ঘাতনম্ ॥
সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ বা পরলোকেচ্ছুকঃ পুমান্।
কদাচিৎ প্রাণিনো হত্যাং ন কুর্য্যাৎ তত্ত্ববিৎ সুধীঃ ॥

তারাপ্রদীপের ২য় পটলে আছে, "সাধক কদাচিৎ জীব হত্যা করিবেন না। ইক্ষুদণ্ড, কুষ্মাণ্ড, সুমিষ্ট ফল, পিণ্ডক্ষীর, শালিতণ্ডুলচূর্ণ প্রভৃতি দ্বারা পশুর আকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া বলি প্রদান করিবেন।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রথমে নরবলি দ্বারা দেবগণের যজ্ঞ সম্পাদিত হইত। ক্রমে অশ্ব-বলি, গো-বলি, মেষ-বলি ও ছাগ-বলি হইতে শেষে ধান্যাদি ব্রীহি-দ্বারা পশ্বাকারে গঠিত পুরোডাশ দ্বারা যজ্ঞ-সম্পাদনের ব্যবস্থা হয়।

সকল সময়েই সমাজে প্রধানতঃ দুই প্রকার লোক থাকে। একদল নিষ্ঠুর, দয়ামায়াশূন্য, স্বার্থপর ; আর অপর দল পরদুঃখে কাতর। অন্য এক মধ্যবর্ত্তী উদাসীন দলও থাকে তবে তাহাদিগকে গণনার মধ্যে না আনিলেও চলে। একদল ন্যায়সঙ্গত যুক্তিসঙ্গত কাজ করিতে ও করাইতে অগ্রসর, অপর দল যুক্তি মানে না তর্ক মানে না, স্বার্থ মানে ও খেয়ালের বশে চলে। মাংসভোজন ও বলি-দানের পক্ষে ও বিপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বিপক্ষের প্রমাণগুলিতে যুক্তি আছে, কিন্তু পক্ষের প্রমাণগুলিতে যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কেবল শাস্ত্রের দোহাই। শাস্ত্রকারগণের মধ্যে অনেকে একথা মানিতেন যে,

যুক্তিহীন বিচারণে, ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।

মনুর দুই উক্তিতে এই পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, যেখানে মনু বলিয়াছেন "মাংসভক্ষণ ও মদ্যপানে দোষ নাই, সেখানে বলা হইয়াছে "মানুষের ইহাতেই প্রবৃত্তি"। কিন্তু যেখানে বলা হইয়াছে "মাংস পরিত্যাগ করিবে", সেখানে যুক্তি এই "প্রাণীদিগের হিংসা না করিলে যখন মাংস পাওয়া যায় না এবং প্রাণিবধ যখন স্বর্গলাভজনক নহে তখন মাংস ভোজন করিবে না।"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, একদল মদ্যমাংস আহার করিত ; অপর দল তাহাদিগকে এই তামসিক ব্যবহার হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য নানারূপ যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিত। মদ্যমাংস-ভোজনকারীরা পাল্টা জবাবে মহাদেব বা কালিকাদেবীর দোহাই দিয়া তাঁহাদের বচন উদ্ধৃত করিত। এই দুই দলের বিরোধের ফল ভারতের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত। বৌদ্ধেরা সুরাপান করিত না, প্রাণিবধ করিত না, কিন্তু বুদ্ধ স্বয়ং অপর কর্ত্তৃক প্রদত্ত মাংস ভোজন করিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন দেশে বৌদ্ধেরা মৎস্য মাংস খাইয়া থাকে। জৈনেরা ইহার ত্রিসীমানায় যায় না, বরঞ্চ অপরকেও কার্য্যতঃ নিবৃত্ত করে, বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ ভিন্ন অপর কোন দেশের বৈষ্ণব মাংসভোজন দূরে থাক মৎস্য ভোজনও করে না।

নিরামিষ ভোজনের মূল যুক্তি এই, প্রাণিবধ যদি কর্ত্তব্য

হয় তবে মাংসভোজনে দোষ নাই ; আর তাহা যদি কর্ত্তব্য না হয়; তবে মাংসভোজনও অকর্ত্তব্য। এখনকার যুক্তি দিয়াই আমি দেখাইব যে, প্রাণিবধ অকর্ত্তব্য। ইংরেজীতে একটা প্রচলন আছে "তুমি যেরূপ ব্যবহার চাও, অপরের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার কর।" ইংরেজেরা ইহাকে "সোণার নিয়ম" (Golden rule) বলেন। কথাটা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এখন আমি যদি চাই অপরে আমাকে বিনা অপরাধে হনন না করে, তবে আমি কেন অপরকে বিনা অপরাধে হনন করিব ? কেহ ইহার উত্তরে বলিতে পারেন, "মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, জগতের সমস্ত প্রাণীই মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকিবে, মানুষের জন্য প্রাণ দিবে।" কিন্তু বাস্তবিক ভগবান্ সে উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রাণিজগৎ ও উদ্ভিদ্‌জগৎ সৃষ্টি করেন নাই। তবে "জোর যার মুল্লুক তার" বলিয়া যদি নিতান্তই ভগবানের সৃষ্ট প্রাণি-বধ করিতে উদ্যত হওয়া যায় তাহা হইলে ভগবানের বিরুদ্ধেই যুদ্ধঘোষণা করা হয়! "জোর যার মুল্লুক তার" এই নীতির জয়লাভ ঘটিলে সিংহ ব্যাঘ্র মানুষকে সংসার হইতে নির্ম্মূল করিত কিংবা জার্ম্মান জাতি আজ সসাগরা ধরার অধীশ্বর হইত।

অধিকাংশ কার্য্য করিতে গেলে, তাহা ন্যায় কি অন্যায়, ভগবানের রাজ্যে তাহা বুঝাইবার ব্যবস্থা আছে। যে প্রথম প্রাণিবধে উদ্যত, যাহার হৃদয় এখনও ঘাতকের মত পাষাণ হয় নাই, সে প্রাণীর কাতর রবে বুঝিতে পারিবে কাজটা অন্যায় হইতেছে। কিন্তু সেই মানুষই যদি আত্ম-রক্ষার্থ সিংহ ব্যাঘ্রকে নিহত করে, তখন হৃদয়ে দয়া মায়া প্রবৃত্তির তেমন উদ্রেক হয় না। কোন প্রাণী অপরাধ করিলে দণ্ড দেওয়ার সময়ে হৃদয়ে ক্রোধের উদ্রেক হয়, তখন দণ্ড দেওয়াই প্রশস্ত। অবশ্য পশুর ক্রোধ আছে, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও আছে ; কিন্তু দয়া মায়া নাই, সংযমও নাই। "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।" সেরূপ পণ্ডিত জগতে বিরল হইলেও দেখিতে পাই দয়ামায়া করুণা প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি ভগবান সকল মানুষকেই কিছু না কিছু দিয়াছেন। যেখানে যত সাদৃশ্য ও সাহচর্য্য অধিক, সেখানে উক্ত বৃত্তিগুলি তত অধিক। বাঙ্গালীর প্রতি যত সহানুভূতি হইবে, জাপানীর প্রতি তত হইবে না। ছাগের প্রতি যত সহানুভূতি হইবে একটা ইন্দুরের প্রতি তেমন হইবে না। ইন্দুর প্রাণী বলিয়া আবার যতটুকু সহানুভূতি পাইবে, উদ্ভিদ্ তাহা পাইবেনা। অল্পই হউক আর অধিকই হউক, অপরের প্রাণবধ করিতে সকল মানুষেরই স্বভাবতঃ অনিচ্ছা। ইহাই ভগবানের আদেশ।

মানুষের ধর্ম্ম দুই প্রকার ; আত্মরক্ষা ও সমাজ-রক্ষা। এই দুই কাজের জন্য নিরীহ প্রাণীগুলিকে বধ করিবার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার উত্তরে হয়ত অনেকে বলিতে পারেন (১) ছাগ, মেষ প্রভৃতি প্রাণীকে বধ করিয়া না খাইলে পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণীর স্থান সংকুলান হইবে না (২) জগতে প্রায় সমস্ত প্রাণীই অপর প্রাণীকে বধ করিয়া জীবন ধারণ করে, তবে মানুষ অপর প্রাণীকে খাইবে না কেন ? (৩) আমরা চলিতে ফিরিতে পদে পদে কত ক্ষুদ্র প্রাণীকে বধ করিতেছি, তবে ছাগ মেষ ইত্যাদি প্রাণীকে বধ করিয়া খাইব না কেন ?

আপত্তিগুলির উত্তর একে একে দিতে চেষ্টা করিব। (১) যখন সৃষ্টিকার্য্যে মানুষের কোন হাত নাই তখন ধ্বংস কার্য্যের ভার মানুষ লইবে কেন ? সে অধিকার মানুষের আছে কি ? আত্মরক্ষা বা সমাজরক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়, সিংহ ব্যাঘ্র মার, সাপ মার, কিন্তু যতটুকু না নহিলে নয়, ততটুকু কর। জনৈক ইংরেজ কবি বলিয়াছেন "যে প্রাণ তুমি দিতে পার না, সে প্রাণ হরণ করিও না।" অথচ ইংরেজ জাতির মত মাংসখোর জাতি পৃথিবীতে নাই। পৃথিবীতে স্থান সংকুলান হইবে কি না, সে ভার বিধাতা বা প্রকৃতির হাতে। কত জাতীয় প্রাণী জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, মানুষ তাহাকে রাখিতে পারে নাই। এই যে নূতন নূতন ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া লোকক্ষয় ঘটিতেছে, মানুষ শত চেষ্টা করিয়া তাহা বন্ধ করিতে পারিয়াছে কি ? মানুষের শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রকৃতি আপন কার্য্যসাধন করিতেছে।

(২) যেখানে ইতর প্রাণীর মধ্যে খাদ্যখাদকসম্বন্ধ আছে, সেখানে বলিয়া দিতে হয় না। ক্ষুধা পাইলেই একটা আর একটাকে ধরিয়া খায় এবং কাঁচাই খায়। এইরূপ খাইবার জন্য মারিতে যে অস্ত্রের প্রয়োজন তাহা

প্রকৃতি খাদককে দিয়াছে। ছাগ মেষ যদি মানুষের খাদ্য হইত তাহা হইলে মানবশিশুর, ক্ষুধা পাইলে ব্যাঘ্র-শাবকের ন্যায় ছাগ মেষ বধ করিয়া কাঁচা খাইবার মত, তীক্ষ্ণ নখর, দন্ত ও শক্তি থাকিত।

(৩) চলিতে ফিরিতে পদে পদে কত ক্ষুদ্র প্রাণী আমরা মারিয়া থাকি সত্য, কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতে গেলে যদি অনিচ্ছাকৃত প্রাণিবধ অনিবার্য্য হয় তাহা করিতে হইবে। যদি প্রাণিবধ করা আমার উদ্দেশ্য না হয়, তবে আমার অপরাধ কোথায়? উদ্দেশ্য দেখিয়াই আমার কার্য্যের বিচার হইবে।

শাস্ত্রীয় প্রমাণে একটি কথা পাওয়া যায়, ক্ষত্রিয় জাতির ধর্ম্ম মৃগয়া যুদ্ধ, সুতরাং বলিদান মাংসভোজন সুরাপান প্রভৃতি তাহাদের পক্ষে প্রশস্ত। বাঙ্গালার শাক্তগণ মদ্য-মাংস-উপকরণে শক্তির পূজা করিয়া শক্তিলাভ করিয়াছে এবং বৈষ্ণবেরাই মাংসাহার ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালীকে নিরীহ বানাইয়াছে, তজ্জন্য বাঙ্গালী কাপুরুষ এবং বাঙ্গালী কথায় কথায় পরপদানত। এই রকম কথা অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, কোন একটা জাতিকে জগতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহার ক্ষাত্রধর্ম্ম থাকা উচিত। সুতরাং বাঙ্গালী হিন্দুকেও মাংস খাইতে হইবে। ক্ষাত্রধর্ম্মের দুই অর্থ; প্রথম তমঃপ্রধান রজঃগুণ, তাহাতে পররাষ্ট্রহরণে হিংসা, পরপীড়ন ও প্রাণিবধে আনন্দ হয়। হিংসা ও নিষ্ঠুরতা ইহার প্রধান গুণ। দ্বিতীয় অর্থ, সমাজরক্ষা, বিপন্নকে রক্ষা, এখানে শক্তির সহিত দয়ামায়ার সংযোগ। এই দ্বিতীয় অর্থই ভারতে প্রশংসালাভ করিয়াছে। ভারতের ক্ষত্রিয় নিরস্ত্রকে মারিত না, শরণাগতকে ও বিপন্নকে রক্ষা করিত। ইয়ুরোপের নাইটেরাও একদিন এইরূপ ক্ষত্রিয়ের ব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। দ্বিতীয় অর্থ হিংস্র পশুর পশুত্বের নামান্তর। জার্ম্মানি ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ২য় প্রকার ক্ষাত্রধর্ম্ম দেখাইয়াছে। ভারতে এরূপ ক্ষাত্রধর্ম্ম যখন দেখা দিয়াছিল তখনই পরস্পর যুদ্ধে লোকক্ষয় হইয়া পৃথিবীর ভার লঘু হইয়াছিল। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে এইরূপ ক্ষাত্রধর্ম্মের ধ্বংস হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়গণ যখন তমঃপ্রধান হইয়া পরপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিল, তখন পরশুরাম তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। এরূপ ক্ষাত্রধর্ম্ম কি বাঙ্গালীর বাঞ্ছনীয়? তাহাই যদি হয়, তবে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ খাদ্য মাংস হইতে পারে।

এখন বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলি আলোচনা করিয়া দেখা যাক, মানবের জীবন-ধারণের জন্য মাংসাহার আবশ্যক কি না অর্থাৎ মাংসটা মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য কি না। অথবা মানুষ স্বভাবতঃ শস্যভোজী কি মাংসভুক্। একদিন এই লইয়াই নিরামিষ-ভোজী ও আমিষ-ভোজীতে তর্ক বিতর্ক চলিত। এখন আবার এক নূতন কথা উঠিয়াছে মানুষ মিশ্রখাদ্যভোজী। কিন্তু মাংস যদি মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য না হয়, তাহা হইলে সে মিশ্রখাদ্যভোজীও হইতে পারে না। সুতরাং প্রথমে এই বিষয়েরই বিচার করা যাক।

মাংস যে মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য নয়, তাহার প্রথম প্রমাণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যদি মাংস মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য হইত তাহা হইলে ক্ষুধার সময় মানবশিশু ব্যাঘ্রশাবকের মত ছাগ মেষ বধ করিয়া কাঁচা অবস্থায় খাইত। তাহাকে মশলা দিয়া রাঁধিয়া খাওয়াইতে হইত না এবং ছাগ মেষ বধ করিবার উপযোগী স্বাভাবিক অস্ত্র মানবশিশুরও থাকিত। প্রাণিজগতে দেখা যায়, যাহার যাহা স্বাভাবিক খাদ্য অরন্ধিত অবস্থায় তাহা তাহার সম্মুখে ধরিলে ক্ষুধা পাইলেই সে তাহা খাইবে এবং তাহা সহজেই তাহার জীর্ণ হইবে, মানুষ মাংস সম্বন্ধে সে কথা বলিতে পারে না।

প্রাণী, খাদ্যের প্রকৃতি অনুসারে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, উদ্ভিদ্‌ভোজী ও মাংসভোজী এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য আছে দেখাইতেছি। উচ্চতর জীবমাত্রেই দাঁতে কাটিয়া বা চিবাইয়া অথবা দুই কাজই করিয়া খাদ্য ভোজন করে, গো অশ্ব প্রভৃতি জীব কাটিতে পারে না কেবল চিবায়, সিংহ ব্যাঘ্র কুকুর প্রভৃতি মাংসাশী জীব খাদ্য কাটিতে পারে কিন্তু যাহাকে চিবান বলে অর্থাৎ পাশের দাঁত দিয়া পেষণ করা তাহা তাহারা পারে না। বানরজাতি ঠিক মানুষের মতই কাটিতে ও চিবাইতে পারে, মাংসাশী জীবের চোয়াল আশেপাশে চলে না কেবল

উপর নীচে চলে, উদ্ভিদ্‌ভোজীর চোয়ালে আশে পাশে চলে। মাংসাশী জীবের ঘাম হয় না, উদ্ভিদ্‌ভোজীর ঘাম হয়। মাংসাশী জীব চাটিয়া জল খায়, উদ্ভিদ্‌ভোজী চুমুক দিয়া বা শুঁষিয়া জল খায়। উদ্ভিদ্‌ভোজীর মুখ হইতে অধিক পরিমাণে লালা নির্গত হইয়া শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে এবং মাংসভোজীর বড় যকৃৎ হইতে বেশী পরিমাণে পিত্তরস নির্গত হইয়া মাংস পরিপাকে সহায়তা করে। উদ্ভিদ্‌ভোজীর মুখের লালা ও মাংসভোজীর পিত্তরস যথাক্রমে শ্বেতসার ও মাংস-পরিপাকের পক্ষে যথেষ্ট নহে। মাংসভোজীর অন্ত্রমধ্যে মাংসের জীর্ণাবশিষ্ট দ্রব্যের যত দুর্গন্ধ, নিরামিষ-ভোজীর মলে সেরূপ দুর্গন্ধ নাই। মাংসভোজী জীবের শরীরে পর্য্যন্ত দুর্গন্ধ। কুকুর-শাবক যতদিন স্তন্যদুগ্ধ পান করে ততদিন তাহার গায়ে তত দুর্গন্ধ থাকে না।

এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ সিংহ ব্যাঘ্র কুকুরের সহিত সমশ্রেণীর নহে। বরঞ্চ গো অশ্ব ছাগের সহিত কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। শরীরের গঠন ও খাদ্য সম্বন্ধে বানরের সহিত মানুষের সাদৃশ্য অধিক। গো অশ্ব মেষ প্রভৃতির আহার দেখিলে মনে হয়, বিধাতা ইহাদিগকে উদ্ভিদ্‌ভোজী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। সিংহ ব্যাঘ্র কুকুরের তীক্ষ্ণ নখর ও দন্ত দেখিলে মনে হয় ভগবান্ ইহাদিগকে যথার্থই মাংস-ভোজী করিয়া গড়িয়াছেন। আপনা হইতে ইহাদের খাদ্যের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। সেইরূপ বানরের হাত পায়ের ও আঙ্গুলের গঠন দেখিলে মনে হয়, বানর গাছে চড়িয়া ফল আহরণ করিয়া ভক্ষণ করিবে, ভগবানের ইহাই অভিপ্রায়। সুতরাং অনুমান হয় সুপক্ক ফল মানুষের আদিম প্রাকৃতিক খাদ্য। মানুষ যত প্রকারে আপনার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে, অন্য কোন জীবই তাহা করে নাই। অন্য সকল জীবই ক্ষুধার সময়ে খায়, শরীর অসুস্থ হইলে উপবাস করে, এবং বিনা চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করে। ইহাদের মধ্যে ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু অল্প। কিন্তু মানুষের সকলই উল্টা। মানুষ প্রথমে অভাবে পড়িয়া ক্ষুধার তাড়নায় আত্মরক্ষার্থ নিহত পশুর মাংস খাইয়াছিল। সেই অস্বাভাবিক খাদ্য আজ সভ্য অবস্থায় কাঁচা খাইতে অশক্ত হইয়া অগ্নিপক্ক করিয়া মশলা-সহযোগে খাইতেছে।

দেখা গেল, মাংস মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য নহে। এখন দেখা যাক মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মাংস-ভোজনের প্রয়োজন আছে কি না। মাংস ভোজন না করিলেও যে মানুষ বাঁচে সে কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। কেন না, পৃথিবীতে বহু নিরামিষাশী লোক বাঁচিয়া আছে এবং সুস্থ শরীরে আছে। খাদ্যের প্রয়োজনীয়তাও দুই, শরীর-পোষণ ও উত্তাপ জনন। কাজ করিতে উত্তাপের প্রয়োজন ও কাজ করিতে করিতে শরীর ক্ষয় হইলে তাহার সংস্কার বা পূরণের প্রয়োজন। শ্বেত-সার শর্করা ও তৈল ঘৃত খাইলে শরীরে উত্তাপ জন্মে এবং শরীরের গঠন ও সংস্কারের জন্য ছানাজাতীয় খাদ্যের আবশ্যক। মাংসে ছানাজাতীয় উপাদান ও তৈলজাতীয় উপাদান আছে বলিয়া অনেকে মাংস খাওয়া প্রয়োজন মনে করেন। ডালে ছানাজাতীয় পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে আছে, সুতরাং মাংসের পরিবর্ত্তে ডাল খাইলেই মাংসের প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

মাংস আফিম, সুরা প্রভৃতির ন্যায় বিষাক্ত খাদ্য। নিঃশ্বাস বন্ধ হইলে প্রাণিমাত্রেই মরিয়া যায় কিম্বা বায়ু-সমাগমহীন গৃহে অধিক লোক আবদ্ধ থাকিলে অন্ধকূপ-হত্যার মত ব্যাপার হয় কেন, ইহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন অম্লজান গ্যাসের অভাবেই এইরূপ কাণ্ড ঘটে। পণ্ডিতেরা বলেন, দেহে অম্লজান গ্যাসের সহিত অঙ্গার মিলিয়া দহন কার্য্য হয়, এবং তাহা হইতে উত্তাপ জন্মে, এই উত্তাপের জোরে আমরা দেহরূপ এঞ্জিন চালাই অর্থাৎ কাজ করি। কিন্তু অম্লজানের অভাবে দহন-ক্রিয়া কিয়ৎকাল স্থগিত হইলেই মৃত্যু ঘটে কেন? ইহার প্রকৃত কারণ এই,—জীবদেহের প্রত্যেক জীবকোষ হইতে বিষকণা নির্গত হয়; শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য এই বিষকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া। শ্বাস ত্যাগ না করিলে এই বিষ দেহ হইতে বাহির হইতে পায় না, তাই জীবের মৃত্যু ঘটে। শ্বাস-গ্রহণকালে যে বায়ু বিশুদ্ধ থাকে, শ্বাসত্যাগকালে কোষ-পরিত্যক্ত বিষের সহিত মিলিয়া সেই বায়ুই বিষাক্ত

হয়। যতক্ষণ শ্বাসক্রিয়া চলে ততক্ষণ কোষ হইতে বিষ বাহির হইয়া যায়। কিন্তু শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইলে তাহা বিষাক্ত থাকিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীবদেহ বা মাংস বিষাক্ত খাদ্য। আফিম খাইলে আফিমখোরের শরীর যেমন বিষাক্ত হয়, মাংসভোজীর দেহও সেইরূপ বিষাক্ত হয়। তাই কথায় বলে "কাকের মাংস কাকে খায় না।" উদ্ভিদ্‌ভোজীর দেহ অপেক্ষা মাংসভোজীর দেহ অধিক বিষাক্ত বলিয়াই মানুষে সিংহ ব্যাঘ্র কুকুর বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীর মাংস খায় না। জীবদেহ বা মাংস প্রথমেই বিষাক্ত থাকে; পচন-ক্রিয়া আরম্ভ হইলে তাহা আরও বিষাক্ত হয়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহের পচন-ক্রিয়া আরম্ভ হয়, সেই পচা দেহের কণামাত্র মানুষের শরীরে প্রবেশ করিলে কি কুফল হয় তাহা শবদেহ-পরীক্ষকেরা ভাল রকমেই জানেন। উদ্ভিজ্জ পদার্থ ও মাংস উভয়ই পচে; কিন্তু মাংস অধিক বিষাক্ত বলিয়াই তাহা হইতে অধিক দুর্গন্ধ বাহির হয়। মাংসভুক প্রাণীর অন্ত্র মধ্যে যে জীর্ণাবশেষ বা মল থাকে তাহাও পচা মাংস ব্যতীত আর কিছুই নহে। বাহিরের পচা মাংস যেরূপ বিষাক্ত, মাংসভুক্‌ প্রাণীর মলও সেইরূপ বিষাক্ত, ইহাও যৎসামান্য অন্যের দেহে প্রবেশ করিলে মৃত্যু ঘটায়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যদি মাংস বিষাক্ত খাদ্য তাহা হইলে খাইবামাত্র মানুষ মরিয়া যায় না কেন? বহু বিষাক্ত জীবাণু ও বিষের সহিত মানব দেহকে অনবরতঃ যুঝিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। জীবাণুও বিষ ভুক্ত ফলের অম্লরস ও পাকাশয়ের পিত্তরসে নষ্ট হয়। মাংসের সহিত অন্য বহুপ্রকারের জীবাণু উদরে প্রবেশ করিলে মানবদেহ-নির্গত সামান্য পিত্তরসে সকলগুলি নষ্ট হয় না। সুতরাং বিষ নষ্ট করিবার শারীর যন্ত্রগুলি যথা মূত্রাশয়, যকৃৎ, ফুসফুস্‌ প্রভৃতি, পীড়িত হইয়া পড়ে এবং মাংসের এই সব জীবাণু হইতে কলেরা, টাইফয়েড, বৃহৎকৃমি, যক্ষ্মা, বসন্ত প্রভৃতি পীড়া জন্মে। পীড়িত যন্ত্রের জন্যও গেঁটেবাত, ক্যান্সার, ব্রাইটস্‌ ডিজিজ প্রভৃতি ব্যাধি হয়। মানুষে শস্য ও ফলমূলাদি খাইলে শরীরের অবস্থা অনুসারে মূত্রে ৩ হইতে ১০ গ্রেণ পরিমাণে ইউরিক এসিড নামক বিষ থাকে, কিন্তু মাংস খাইলে ৩২ গ্রেণ পরিমাণে এই বিষ পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে আফিম খাইলে যেমন মানুষ তৎক্ষণাৎ মরে না, মাংস খাইলেও তাহাই হয়। তদ্ভিন্ন জীবদেহের বিশেষতঃ গৃহ-পালিত পশুর, প্রায় কোন না কোন ব্যাধি থাকে। মানুষকে অধিকাংশ স্থলে পীড়িত পশুর মাংস খাইতে হয়। মাংস আবার একটু না পচিলে খাওয়া যায় না এবং যত পচে তত অধিক বিষাক্ত হয়।

মাংস যে রাজসিক ও তামসিক খাদ্য অর্থাৎ সাত্ত্বিক খাদ্য নয় তাহা আমাদের মুনিঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন। অনেকে হয়ত বলিবেন মুনিঋষিরা ত বিজ্ঞান জানিতেন না যে তাঁহাদের কথা শুনিব। কিন্তু পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন জানিতেন না * বলিয়াই যে, খাদ্যবিজ্ঞানসম্বন্ধেও তাঁহাদের কোন ধারণা ছিল না একথা বলা যাইতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরীক্ষালব্ধ ফল হইতেই বিজ্ঞানের সূত্র আবিষ্কৃত হয়। বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের ও ভেষজের গুণাগুণ আমাদের দেশে বহুপূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে। এখন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাও আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মাংসভোজী প্রাণিমাত্রেই "অশান্ত, কলহপ্রিয়, ক্রূর, প্রতিহিংসাপরায়ণ, পরদ্বেষী, ঘৃণাকারী ও হিংস্রক হয়।" "আমিষভোজী প্রায় দুর্দ্দান্ত হিংসাচারী ও ক্রোধী হইয়া থাকে।" (স্বাস্থ্য সমাচার ৬ষ্ঠ বর্ষ চৈত্র)। সকলেই একথা স্বীকার করিবেন, কারণ বন্য মাংসাশী পশুর কথা দূরে থাক্‌, গৃহপালিত কুকুর-বিড়ালের সহিত ছাগ-মেষের তুলনা করিলেই একথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

আমাদের দেশের সাধারণ লোকেও জানে যে, ফল শ্রেষ্ঠ খাদ্য, তাই অসুখ বিসুখে ফলই প্রথম পথ্য। বসন্ত ও কলেরার সময় অনেকে মৎস্য-মাংসাহার প্রায় পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরাও স্নায়বিক ও মস্তিষ্কের পীড়ায় এবং বাতব্যাধি, ক্যান্সার, উপদংশ দুষ্টক্ষত প্রভৃতি রোগে মৎস্য-মাংস-ভোজন নিষেধ করেন। ফলমূলভোজী ব্যক্তির পীড়া হইলে সহজে ও শীঘ্র আরোগ্য

* লেখক মহাশয়ের এই মত আমরা সমর্থন করিতে পারি না। অঃ সঃ।

লাভের সম্ভাবনা বলিয়া অধুনা বহু চিকিৎসক কঠিন অস্ত্র-চিকিৎসা করিবার পূর্ব্বে মাংসভোজীদিগকে কিছুদিন মাংসভোজন হইতে বিরত রাখিয়া তবে অস্ত্র-চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মাণ্ডে সূর্য্যতাপই শক্তির আদিম কারণ। উদ্ভিদ সেই শক্তিকে অপহরণ করে, প্রাণী সাক্ষাৎভাবে তাহা পারে না। প্রাণী উদ্ভিদ খাইয়া সেই শক্তি সঞ্চয় করে। উদ্ভিজ্জ খাদ্য না খাইয়া যাহারা প্রাণিজ খাদ্য ভোজন করে, তাহারা উদ্ভিদের আহৃত শক্তিই সাক্ষাৎভাবে না লইয়া পরোক্ষভাবে গ্রহণ করে। সুতরাং মূলে দেখিতে গেলে উদ্ভিজ্জ খাদ্যই প্রাণীর প্রথম খাদ্য। মাংসভুক্ প্রাণীর বল অধিক, আর উদ্ভিজ্জভোজী দুর্ব্বল একথাও ঠিক নহে। নিরামিষভোজী প্রাণী যে শক্তিশালী হয়, হস্তী, গণ্ডার, সিন্ধুঘোটক ও গরিলা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ফলভোজী বানর ও হনুমানের শক্তির বিষয় সকলেই জানেন। নিরামিষভোজী বল্গা হরিণ শীতপ্রধান দেশে থাকিয়াও যেরূপ দ্রুত গমন করিতে পারে, কোন মাংসভুক প্রাণীই তাহা পারিবে না। ঘোড়া ও বলদের বহুক্ষণ ধরিয়া পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও অজ্ঞাত নাই। অথচ কুকুর একটু দৌড়িলেই হাঁপাইয়া পড়ে।

নিরামিষাশী ও আমিষভোজী মানুষের শ্রমসহিষ্ণুতার পার্থক্যের দৃষ্টান্ত বিলাতের ব্যাপার হইতেই তুলিয়া দিতেছি। (১) একবার ১৫ জন লোক বার্লিন হইতে ভিয়েনা পর্য্যন্ত পথ চলিতে আরম্ভ করে। এই দুই স্থানের দূরত্ব ৩৬১ মাইল। ভ্রমণকারীদের মধ্যে যে দুই জন নিরামিষাশী ছিল তাহারাই সর্ব্বপ্রথমে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হয়। তাহাদের উপস্থিতির ২২ ঘণ্টা পরে সর্ব্বপ্রথম মাংসভোজী উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল। (২) আর একবার বার্লিন হইতে ২২ জনের ১৪ ঘণ্টায় ৭২ মাইল পথ চলিবার প্রতিযোগিতা হয়। নিরূপিত সময়ের মধ্যে ৮ জন নিরামিষাশী ও সর্ব্বশেষে একজন আমিষভোজী উপস্থিত হইয়াছিল। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে উপস্থিত হয়, সে ১২ বৎসরকাল কেবল ফল ভোজন করিত। এই ঘটনা ১৯০২ সালে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। (৩) ১৩২১ সালে শ্রাবণের 'প্রবাসী' হইতে উদ্ধৃত—আমেরিকার বিখ্যাত ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্ভিং ফিশার ৪৯ জন লোককে লইয়া শ্রমসহিষ্ণুতার পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় দেখা গেল যে, যাহারা প্রচুর পরিমাণে মাংসডিম্বভোজী তাহাদের মধ্যে খুব অল্প লোকেই ৫০০ বারের বেশী বৈঠকী করিতে পারে। ৫০০ বার হইবার আগেই কেহ কেহ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। যাহারা মাংস ডিম্ব কম খাইত বা মোটেই খাইত না, তাহারা কেহই এই পরীক্ষা দ্বারা নিজেদের কোন শারীরিক ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে করে নাই। তাহাদের অধিকাংশ ৫০০ বারের বেশী বৈঠকী করিয়াছিল এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তি ১০০০ বারের অধিক করিয়াছিল। একজন দুই বৎসর মাংস ডিম্ব স্পর্শ করে নাই, সে ১০০০ বার বৈঠকী করিয়াছিল এবং তাহাতেও ক্লান্ত না হইয়া ব্যায়ামশালার দৌড়ের রাস্তায় কয়েক পাক দৌড়িয়া ইষ্ট রক নামক শৈলে উঠিয়া নামিয়া আসে। আর একজন ২৪০০ বার বৈঠকী করে। অপর একজন যে মাংস খায় না ও ডিম্ব অল্প পরিমাণে খায়, ৫০০০ বার বৈঠকী করে। (ডিম্বে শ্বাসপ্রশ্বাস চলে না বলিয়া ডিম্ব প্রাণিজ খাদ্য হইলেও মাংসের ন্যায় বিষাক্ত নহে।)

নিরামিষাশী হইলেও যে প্রচুর শারীরিক শক্তি থাকিতে পারে মথুরার পালোয়ান চৌবেরা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। বিখ্যাত পালোয়ান গয়ার গোলাম হোসেন ও ছাপরার সুচিত সিংহ মাংসভোজী ছিলেন। তাঁহারা অল্প বয়সেই মারা যান, কিন্তু মথুরার পালোয়ান চৌবেদের মধ্যে বহু দীর্ঘজীবী দেখিয়াছি। বৈদিকযুগে যখন বর্ণভেদ হয় নাই, কিন্তু যখন ব্রাহ্মণ বর্ণের যজন-যাজন-অধ্যাপনই বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল, তখন হইতে ব্রাহ্মণবর্ণ কার্য্যে ও আহারে সাত্ত্বিক হইলেন। তাঁহারা অধিকাংশই জীবহিংসায় বিরত থাকিতেন ও মাংসভোজন সাত্ত্বিক খাদ্য নহে বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা হিংসার সহচর অস্ত্রশস্ত্র রাখিতেন না। বনে জঙ্গলে তপশ্চর্য্যা করিলেও আত্মরক্ষার প্রয়োজন হইলে ক্ষত্রিয় রাজাদের ডাকিতেন। এই নিরামিষাশী মুনিঋষিদের যে মানসিক শক্তিও প্রচুর ছিল ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মাংস উত্তেজক খাদ্য। মানসিক শক্তি যেমন সুরাপায়ীর

একচেটিয়া নহে, সেইরূপ মাংসভোজীরও একচেটিয়া নহে।

জিহ্বা ও নাসিকা উদর-গহ্বরের প্রহরীস্বরূপ। যে খাদ্য স্বভাবতঃ দুর্গন্ধযুক্ত বা বিস্বাদ তাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। সেরূপ খাদ্য বর্জ্জন করিবার জন্যই প্রকৃতি প্রায় সকল উচ্চতর প্রাণীর এই দুইটি যন্ত্র উদর-গহ্বরের প্রবেশ পথে স্থাপিত করিয়াছেন। কোন সুপক্ক ফল শিশুর নিকট ধরা হউক যদি তাহার দুর্গন্ধ থাকে, শিশু খাইবে না। যদি দুর্গন্ধ না থাকে, শিশু মুখে দিয়া দেখিবে; বিস্বাদ না হয় খাইবে। সমস্ত প্রাণীর প্রাকৃতিক খাদ্য এইরূপে নির্ণীত হয়। মৎস্য মাংস অপক্ক অবস্থায় শিশুর নিকট লইয়া গেলে সে কিছুতেই তাহা খাইবে না। তাই মসলাসহযোগে রাঁধা মাংস শিশুর নিকট ধরা হয়, শিশুও খাইতে অভ্যাস করে। কোন্ কাজ ভাল কি মন্দ তাহা স্থির করিবার ভার অধিকাংশ সময়ে মানুষের নিজের উপরেই থাকে; কিন্তু যে মৎস্য-মাংস-ভোজনের সহিত দেহের ও মনের খুব নিকট সম্পর্ক সেই মৎস্য-মাংস-ভোজন প্রশস্ত কি না তাহা মাংস খাইবার পূর্ব্বে কোনদিনই মানুষকে প্রায় স্থির করিতে হয়না। মৎস্য-মাংসভোজী পরিবারের শিশু ভাল-মন্দ বিচার না করিয়াই বাল্যকাল হইতে মৎস্য-মাংস-ভোজনে অভ্যস্ত হয়। ইয়ুরোপীয়েরা সুরাপান ও বিহারের ইতর জাতি তাড়ি খাওয়া কাজ নিন্দনীয় মনে করে না। তাহাদের বালকেরা তাই বাল্যকাল হইতেই এইরূপ মাদক দ্রব্য-পানে অভ্যস্ত হয়, কাজটা ভাল কি মন্দ তাহা বিচার করিবার অবসর তাহারা পায় না। আমাদের দেশের মুনিঋষিরা যেমন কেহ কেহ সুরাপান ও মাংস-ভোজন অনুচিত বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আজকাল ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাও সেইরূপ সুরাপান ও মাংস-ভোজনের অনিষ্টকারিতা বুঝাইবার জন্য সভাসমিতি স্থাপন করিয়া প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। অভ্যাস হইবার পূর্ব্বে অনিষ্টকারিতা বুঝিলে অনেকেই বোধ হয় সুরাপান ও মাংসভোজন করে না। কিন্তু অভ্যাস হইয়া গেলে অনিষ্টকারিতা বুঝান কঠিন ব্যাপার, তখন অসাধারণ চরিত্রবল ব্যতীত সফলতা লাভ হয় না। মানুষের দুর্ব্বলতা এই যে, যে কাজ সে অভ্যাসবশে করিয়া থাকে তাহা অন্যায় হইলে সে শত শত যুক্তি-প্রয়োগে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করে। মৎস্য-মাংস-ভোজীর মৎস্য-মাংস-ভোজনের সপক্ষে যুক্তিগুলি সেই কারণেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাঁহারা মাংস-ভোজনের বিপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ দেন তাঁহারা দয়া-মায়ার সমর্থন করেন। আর যাঁহারা মাংস-ভোজন করেন তাঁহারা নিষ্ঠুরতার সমর্থন করেন।

আমাদের দেশে মৎস্য-মাংস-ভোজীর সংখ্যা শত বৎসর পূর্ব্বে যত ছিল, ইংরেজের অনুকরণে মাংস-ভোজীর সংখ্যা তাহা অপেক্ষা আজ বাড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ইংরেজের দেশে ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝাইবার জন্য এক শ্রেণীর লোক আছে, আমাদের দেশে তাহার অভাব, বাঙ্গালাদেশে সেইরূপ একটি সভাসমিতি হইতে পারে না কি? আমেরিকায় Good Health Society নামে এক সমিতি আছে তাহার সদস্যেরা আমাদের দেশের শাস্ত্র পর্য্যন্ত পড়িয়া মাংস-ভোজনের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলি সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রচার করিতেছেন আর আমরাই কি চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিব? বাঙ্গালীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যাঁহারা সর্ব্বদা ভাবিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ নিরামিষাশী থাকেন তবে তিনি আমার কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন। চুরি করিলে, মিথ্যা কথা বলিলে সমাজ দণ্ড দেয়, আমার মনে হয় মাংস ভোজন করিলে প্রকৃতি দণ্ড দেয়। দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া, পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে হইবে যে, মৎস্য-মাংস-ভোজন প্রশস্ত নহে। বাঙ্গালী জাতির উন্নতির জন্য এরূপ চেষ্টা নিন্দনীয় নহে। ব্যক্তিগত চেষ্টায় কিছুই ফল হয় না, সমবেত চেষ্টা ব্যতীত কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা দেখি না।

ত্যাগ।

কেবল ত্যাগের দ্বারাই এই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে, ত্যাগই মহাশক্তি। যাহার ভিতর এই মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, সে সমগ্র জগৎকে পর্য্যন্ত গ্রাহ্যের ভিতর আনে না।—বিবেকানন্দ।

সঙ্কলন।

মধুর যত্ন।

মধু ভালরূপে ঢাকা না দিয়া খুলিয়া রাখিলে বাতাস হইতে জল টানিয়া লয় ও পাতলা হয় এবং পরে ঢাকা দিলেও মাতিয়া বা গাঁজিয়া উঠিবে এবং টক হইবে। ইহাতে খারাপ গন্ধও হইতে পারে। চীনামাটি, কাচ এবং টিনের পাত্রে মধু বেশ থাকে, পাত্রের মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়, যাহাতে হাওয়া ঢুকিতে না পারে। মধু ভিজা বা সেঁতসেঁতে জায়গায় না রাখিয়া শুকান খটখটে গরম জায়গায় রাখিতে হয়। যে জায়গায় ও যে অবস্থায় লবণ জল না হইয়া ভাল থাকে, মধুও সেখানে ভাল থাকিবে। অনেকেরই ধারণা, মধু বেশী দিন ভাল থাকে না। ইহার কারণ, ভাল মধু পাইলেও এবং ইহা বোতলে রাখিলেও বোতলের মুখ প্রায় বন্ধ করা হয় না। মাটির পাত্রে মুখ বন্ধ রাখিলেও মধু কখনও ভাল থাকিতে পারে না। ভাল করিয়া রাখিলে মধু যত দিন ইচ্ছা, ভাল রাখিতে পারা যায়।

সব ভাল মধু বেশী দিন রাখিলে জমিয়া যায়। যেখানে বেশী শীত, সেখানে এইরূপে জমিয়া শক্ত হইতে পারে। কোন কোন দেশে এইরূপ শক্ত মধু ইটের মত কাটিয়া কাগজে মুড়িয়া বিক্রয় করা হয়। জমা মধু রোদে কিম্বা গরম জলে বসাইয়া রাখিলে গলিয়া পাতলা হয়। যখন গরম জলে বসাইয়া মধু গলান হয়, তখন দেখা উচিত, যেন জলটি না ফুটে। ফুটন্ত জলে গরম করিলে মধুর গুণ নষ্ট হইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, মধুর কতকটা জমিয়া গিয়াছে এবং কতকটা পাতলা আছে। এইরূপ হইলে সমস্ত গলাইয়া মিশাইয়া তবে পাত্র হইতে মধু বাহির করা উচিত। পাতলা ও জমাট অংশের গুণে কিছু তফাৎ হয়। মধু বিক্রয় করিবার জন্য ছোট ছোট জ্যাম বা জেলির বোতল ভাল, যাহাদের মুখে প্যাঁচওয়ালা টিনের ঢাকনা থাকে কিম্বা এরূপ পাত্র বা বোতল যাহাদের মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করা যায়। বোতল সহিত বিক্রয় করিতে হয়।

—কৃষক (আষাঢ় ও শ্রাবণ)

দন্তের যত্ন।

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া, উত্তমরূপে দন্ত-মার্জ্জনী দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করিয়া, মুখ-গহ্বরে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া আহার করিবেন।

আহারের পর প্রতিবার সাধারণভাবে দন্তমার্জ্জনী দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করিলে, মুখগহ্বর পরিষ্কার ও আরামপ্রদ মনে হয়। যদি দন্তের ফাঁকে খাদ্যাংশ জমিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা ferment করে; এবং এই প্রকারে দন্ত ক্ষয় হইতে থাকে। ক্রমশঃ যন্ত্রণা হয়, এবং চর্ব্বণ করিবার শক্তি কমিয়া যাইতে থাকে। সুতরাং দন্তের আশে পাশে খাদ্যকণা রাখিবার প্রয়োজন কি? এই সকল অবহেলার নিমিত্তই মুখ-গহ্বর বিষাক্ত এবং দুর্গন্ধময় হয়।

নিদ্রার পূর্ব্বে দন্ত পরিষ্কার করিলে, আপনারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপকৃত হইবেন। রাত্রিকালে লালার নালিগুলি বিশ্রাম লাভ করে; সুতরাং রাত্রিকালে দন্ত পরিষ্কৃত থাকিলে, দন্ত সুস্থ অবস্থায় থাকে। এইরূপ দুই এক দিন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিবেন, প্রাতঃকালে মুখগহ্বর কতদূর আরামপ্রদ বোধ হয়। রাত্রিকালে দন্ত পরিষ্কার করা এত আবশ্যক যে, আপনি যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার দন্ত পরিষ্কার করেন, তাহা হইলে তাহা শয়ন করিবার পূর্ব্বেই করিবেন।

—ভারতবর্ষ (শ্রাবণ)

পাপ পুণ্য।

[শ্রীদীননাথ মজুমদার, এম-এ]

মধু গন্ধে মুগ্ধ করা বকুল কাননে,
অলস আরামে কাটে পাপ সারাদিন;
কঠিন কঙ্কর শৈলে সশঙ্ক বিজনে
খাটে পুণ্য স্বেদ-সিক্ত বিরাম-বিহীন।
নিশীথে বিনিদ্র পাপ স্বপ্ন-তাড়নায়
সত্রাসে আতঙ্কে কাঁপে ফেলি অশ্রুজল,
পুণ্য সুখে সুপ্তি লভি কঠোর শয্যায়
নবীন উষায় জাগে লভি নব বল।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

১৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

আশ্বিন, ১৩২৬

২য় সংখ্যা

চিন্ময়ীর আগমনে।

[শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
এম-এ, এম-আর-এ-এস বিদ্যাকর।]

প্রকৃতি আজ একেবারে বড়ৈশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠিয়াছে। সদ্যঃস্নাতা প্রকৃতির গায়ে আজ রাশি রাশি ফুল, সবুজ ঘাসের, সবুজ ধানের ক্ষেতের মকমল পরিচ্ছদ, রৌদ্রোজ্জ্বল শত শত নদীর অসংখ্য হীরকালঙ্কার, রেশমী কাশফুলের উড়ন্ত উড়নী। প্রকৃতির আজিকার নব সাজ সমগ্র জগৎ সহসা নয়ন মেলিয়া দেখিতেছে। বিহগের কলকাকলীতে, মলয়ানিলের ধীরসঞ্চরণে, মধুরোজ্জ্বল রৌদ্রকিরণে, শেফালিকার পুষ্পবৃষ্টিতে প্রকৃতির মহোৎসবের সূচনা হইয়া গিয়াছে। নদীবক্ষে পাল তুলিয়া নৌকাগুলি গ্রামের ঘাটে হাস্যমুখ প্রবাসীকে নামাইয়া দিতেছে। অসংখ্য পণ্য বহিয়া আজ নৌকাগুলি কোন্ এক সমারোহের উদ্দেশ্যে ধীরগতিতে থামিয়া থামিয়া চলিতেছে। ঐ আজ নগরে পণ্যবীথিকায় আর জিনিষ ধরে না। বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণের বস্ত্রে ও বিলাস দ্রব্যে চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে। যত রকমের রঙ হইতে পারে তাহার সম্মিলন, যত প্রকারের উজ্জ্বলতা হইতে পারে তাহার সম্মিলন। আজ মহানন্দের শরৎকাল সমাগত।

আজ দশ দিক ঐশ্বর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। হেমকান্তিতে অতসী কুসুমবর্ণে প্রকৃতি আজ ভগবতী। সরোবরে আজ পদ্ম হাসিতেছে, মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়াছেন। স্নিগ্ধোজ্জ্বল শারদ জ্যোৎস্নায় আজ লক্ষ্মী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন। ঐ দেখ গঙ্গাতীরে কুন্দেন্দুধবল হাঁসের সারি ভাসিয়া যাইতেছে, পূতদেহ ব্রাহ্মণগণ বেদান্তপাঠ করিতেছেন, কেহ বা পিতৃপক্ষে অতীন্দ্রি পিতৃগণকে মন্ত্রদ্বারা তর্পণ করিতেছেন। কেহবা দীপ জ্বালাইয়া দেবদেবীর আরাধনা করিতেছেন। সাক্ষাৎ সরস্বতীর মূর্ত্তি ঐ দেখ প্রকৃতির মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে।

আজিকার দিনে "বিক্রমকালে" বীরগণ বিজয় কামনায় বাহির হইতেছেন। শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশের অ... নাই। বালকগণ পর্য্যন্ত শারীরিক শক্তির সহিত মহোৎসাহের যোগ করিয়া দিতেছে। কুমারগণ আজ নানা বর্ণের পরিচ্ছদে আবৃতদেহ হইয়া আনন্দে বিচরণ করিতেছে। প্রকৃতিতে কুমারের আর কোথায় সম্ভব? আজ সাক্ষাৎ কুমারমূর্ত্তি দিকে দিকে প্রকাশিত হইতেছে।

ঐ দেখ নৃপতিগণ বিজয়যাত্রার পূর্ব্বে মঙ্গলার্থ হস্তীকে কি করিয়াই না সাজাইতেছেন? কেহবা শ্বেত হস্তীকে পূজা করিতেছে। গণের অগ্রে ঐ গণপতি শুণ্ড তুলিয়া যাইতেছে। আজ চারিদিকে কুললক্ষ্মীগণ মঙ্গলশঙ্খ ঘণ্টা বাজাইতেছে। প্রকৃতি আজ পরম মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

প্রকৃতিতেই যে এই সব ভাব দেখিতেছি তাহা নয়। সকলেই যেন আজ এককালে এই সব ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সকলেরই মধ্য হইতে এক বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত হইতেছে। সকলেরই উজ্জ্বলতা বাড়িয়াছে। গৃহে গৃহে ভগবতীর আবির্ভাব হইয়াছে। কেহ বা প্রতিভার অবতার, কেহ বা লক্ষ্মীর অবতার। কেহ দেখ বীরত্বের দ্বারা পরিচিত হইতেছে, কাহাকেও বা

দেখিলেই সর্ব্বশুভ হইয়া যাইতেছে। আজ সকলেই মূর্ত্তিমান ও মূর্ত্তিমতী।

হে বিশ্বজননী, তোমার যে ভাবময়ী মূর্ত্তি আজ আমরা সম্মুখে স্থাপন করিতে যাইতেছি, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে তাহার অধিষ্ঠান কর। আমরা যেন শক্তিতে তোমার মত, জ্ঞানে তোমার মত, বৈভবে তোমার মত, বীরতায় তোমার মত, মাঙ্গল্যে তোমার মত হইতে পারি। আমাদের হৃদয় আছে, মস্তিষ্ক আছে, দেহের আবরণ আছে, বাহু পদ আছে, মুখ আছে। নাই শুধু তোমার সর্ব্বব্যাপিনী শক্তির অধিষ্ঠান। তোমার কণিকাও যদি পাই তবে, হে হৈমবতী গৌরী, আমাদের হৃদয় শক্তিমান হইবে, মস্তিষ্ক বিদ্যার স্থান হইবে, দেহ কান্তিতে পূর্ণ হইবে, বাহু বীরত্বের ঘোষণা করিবে, মুখে চির মঙ্গল বিরাজ করিবে।

ভিক্ষাবসান।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত]

(১)

আমার খরস্তাঙ্ বা কার্সিয়ঙের মিত্র-লাভ অধ্যায়ের প্রথম মিত্র যাকাপো লামা। আমরা তাহার নামকরণ করিয়াছিলাম ফুচুং লামা। কারণ হিমালয়ের তুষার-রাশির উপর প্রথম অরুণ-কিরণের মাখামাখির সঙ্গেই দ্বারদেশে তাহার কঠোর কণ্ঠের সঙ্গীত শুনা যাইত,—সে সঙ্গীতের মধ্যে ফুচুং কথাটারই প্রাদুর্ভাব অধিক। আমি কাচের-জানালা-ঘেরা বারান্দায় একটা পশমী সোয়েটারের উপর কম্বল জড়াইয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া দার্জ্জিলিং চা প্রস্তুত করিতেছিলাম। আমার সহধর্ম্মিণী আমার পুত্রের অপ্রশস্ত র‍্যাপার জড়াইয়া হালুয়া প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং বালক ও বালিকা শয্যায় শুইয়া মহা সমারোহে বাক-বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল—আহার্য্য প্রস্তুত হইলে কে আমাদের দ্বিতীয় পেয়ালাটিতে চা পান করিবে। আর কে এনামেলের গ্লাসটি পান-পাত্ররূপে ব্যবহার করিবে তাহাদের জননী যখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আঃ! সকাল বেলা তোরা দুজন বিদেশে কি কিচিংমিচির লাগালি"—তখন আমার কন্যা মানু বলিল—"বাবা আমি কাপে তা কাব না ?"

ঠিক সেই সময় ঘণ্টায় ঢং ঢং ঢং ঢং তাল দিয়া লামা গাহিয়া উঠিল—"ফুচুং ফুচুং চুঙ্ চুঙ্ চুঙ্ লামা ফুচুং।" পুত্র জিৎ বলিল—"ঐ মানুষকে ধরবে—লামা এসেছে।"

পুত্র কন্যা যথাসম্ভব লেপের মধ্যে আত্মগোপন করিল। অথচ লামাকে দেখিবার বিষম আগ্রহটুকু প্রকাশিত হইল তাহাদের লেপের ভিতর হইতে প্রকটিত মিটির মিটির চাহনীতে। স্ত্রী বলিলেন—তুমি বাইরে গিয়ে ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওগে। আমি উঠ্‌তে পারি নি।

কিন্তু সেই দারুণ শীতে কম্বল ছাড়িয়া বাহিরে যাইবার কষ্ট সহ্য করিতে মোটেই স্বীকৃত হইলাম না—লামা বন্ধুর সহিত বাক্যালাপ করিবার সুখে প্রলোভিত হইয়াও আমাদের নানী বা পরিচারিকা রঞ্জী সদর দরজা খুলিয়া লামাকে বারান্দায় লইয়া আসিল। সহধর্ম্মিণী ছেলের র‍্যাপারে যথাসম্ভব আব্রু রক্ষা করিলেন।

লামা প্রথমে আসিয়া তাঁহাকেই অভিবাদন করিল—ছিলাম মা লক্ষ্মী, মুমুক্কার মা।

লামা উচ্চে পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি। লাল বনাতের তিব্বতীয় জামা পরিধানে—কোমরে কোন এক সাহেবের পরিত্যক্ত ড্রেসিং গাউনের দড়ি বাঁধা। লাল জামা—অবশ্য নূতন অবস্থায় লাল ছিল এখন তাহার সাধারণ বর্ণ লাল ও ধূসর ধূলার মিশ্রণে যে বর্ণ হয় তাহাই, মাঝে মাঝে রামধনুকের রঙ। লামার দেহের বর্ণ-বিন্যাসের ধরণটাও তদনুরূপ। হস্ত, পদ রৌদ্র-পক্ক-হরিদ্রা, কিন্তু ঢিলা জামার ফাঁকের ভিতর দিয়া যে বর্ণের আমেজ দিতেছেন তাহা হরিদ্রাভ সাদা। মুখ বেশ চকচকে—গণ্ড ও অধরোষ্ঠ খুব টুকটুকে লাল। শৈলবাসী মানুষমাত্রেরই পায়ের গুলি খুব দৃঢ় ও গোলাকার হয়—যাকাপোর পায়ের গুলি খুব দৃঢ়, যেন একটি পিতলের ভাঁটা। তাহার বাম হস্তে একটি দণ্ড—দণ্ডের শিরে নানাবর্ণের ছিন্ন বস্ত্রের ফালি এবং একটি চিতাবাঘের লাঙ্গুল বাঁধা। দক্ষিণ হস্তে একটি ঘণ্টা ও বৌদ্ধদের প্রার্থনা করিবার একটি চক্র।

যাকাপো লামার সহিত আমার বন্ধুত্ব হইবার প্রধান কারণ এই যে, সে বাঙ্গালা বলিত। অবশ্য সে বাঙ্গালা বাঙ্গালীর ভাষা নয়, এমন কি "সবুজ পত্রের"ও তথাকথিত বাঙ্গালা নয়—তবে তাহা কতকটা বোধগম্য। ভুটিয়াদের হিন্দুস্থানী একেবারে অস্পষ্ট।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—লামা তোমার নামের মানে কি?

সহধর্ম্মিণী একটু ব্যঙ্গ করিয়া ভ্রূকুটি করিলেন।

লামা বলিলেন—যাকুকো এক রকম আদমী—যাককোর ধন বহুৎ।

আমি বলিলাম—ওঃ! যক্ষ।

সে বলিল—হাঁ। তার পো—ছেলে পুত্তুল।

"আর লামা।"

তাহার ক্ষুদ্র বাদামী চক্ষু দুটি মুদিয়া রক্ত অধরে একটু ম্লান হাসি হাসিয়া যক্ষপুত্র বলিল—বাবু লামা—আমলা সুবই লামা—সব বিক্কু এখনি লামা।"

তাহার বাঙ্গালায় সে লামার যে অর্থ বিবৃত করিল তাহা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝিলাম—লামা অর্থে ত্রিকালদর্শী পুরুষ। আত্মার এ পৃথিবীতে বাস করিবার পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে এবং পরে যাহা ঘটিবে সে কথা যে অবগত, যে লা এবং এ জগতের রহস্য কথা জানে সে মা। লামা দুঃখ করিয়া বলিল যে, আজকাল প্রত্যেক ভিক্ষুই আপনাকে লামা বলিয়া পরিচয় দেয়; কিন্তু লামা নামের উপযুক্ত লোক সমস্ত তিব্বত, ভুটান, দার্জ্জিলিঙ, খরসাঙ্গে কেহ নাই।

নানারূপ গল্পের পর এক আনা পয়সা লইয়া লামা চলিয়া গেলেন। আস্তে আস্তে এদিক ওদিক চাহিয়া লেপের ভিতর হইতে মান্নু বাহির হইল। জিৎ বলিল—"ঐ লামা।"

মাছরাঙ্গা পাখীর মত চীৎকার করিয়া মান্নু আবার লেপের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার জননী উভয়কে তিরস্কার করিয়া তাহাদিগকে শয্যা হইতে টানিয়া বাহির করিয়া দিল!

(২)

প্রাতর্ভ্রমণ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমরা বাহিরের ঘরে বসিতাম। ঘরটি পাঙ্খাবাড়ী রাস্তার উপর, ঘরে মেঘ প্রবেশ করিয়া আসবাবপত্র—বিশেষ দেওয়ালের মলিন কাগজ স্যাঁৎসেঁতে করিয়া দিবে, এই আশঙ্কায় আমরা দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রাখিতাম। জানালায় কাঁচ দেওয়া—পাঙ্খাবাড়ী রাস্তার উপর দিয়া সর্ব্বদা লোক যাতায়াত করিত—আমরা আলস্য-জড়িত নিদ্রাতুর চক্ষে পথের জনসমাগম নিরীক্ষণ করিতাম। চা-বাগানের সাহেব মেমেরা বেগবান অশ্বে চড়িয়া গর্ব্বভরে ছুটিয়া যাইত, তাহাদের শিশুগণ গর্দ্দভে চড়িয়া চলিত। সেই সময় আমাদের ক্ষুদ্র পরিবারে একটা ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি হইত। জিৎ জিদ্ ধরিত গাধার উপর নিশ্চয় চড়িবে—মান্নু বলিত—"দাদা গাদা, আমিও গাদা তড়ব।" তাহার দাদার ভাষাজ্ঞান একটু বেশী সে বলিল—"দেখলে বাবা মান্নু আমাকে গাধা বললে। এক গাঁট্টা মারব।"

কিন্তু আমি চারিদিন গাধাওয়ালার তোষামোদ করিয়া পুত্র-কন্যার জন্য রাসভ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। তাহারা স্বীকৃত হয় কিন্তু কাজের সময় গর্দ্দভ লইয়া সাহেবদের কুঠীতে এবং হোটেলে চলিয়া যায়। এ বিপদ হইতেও আমাকে যাকাপো লামা উদ্ধার করিল। তাহার আজ্ঞায় প্রত্যহ প্রাতে দুইটি করিয়া গর্দ্দভ আসিয়া আমার পুত্র-কন্যার গাধা চড়িবার সাধ মিটাইল।

বলিতেছিলাম পাঙ্খাবাড়ী পথের কথা। যাহাদের গল্প বলিবার জন্য এ আখ্যায়িকা আরম্ভ করিয়াছি তাহাদের কথা বলি। যখন তন্দ্রা-জড়িত অলসচক্ষে পথের দিকে চাহিয়া স্ত্রী পুরুষের অতীতের মুণ্ডপাত করিতাম এবং ভবিষ্যতের গাত্রে জ্যোৎস্না লেপিতাম, তখন তাহারা আসিয়া জানালার কাঁচে টোকা মারিত। আমরা লামার আগমনে যেমন আনন্দিত হইতাম তাহাদের আগমনে তেমনি প্রসন্ন হইতাম। তাহারা দুইজন পাহাড়ী রমণী—ভুটিয়া নয়, লেপচা নয়, হিন্দু পাহাড়ীয়া—বোধ হয় পূরবীয়া গুর্খা। একজনের নাম কাঞ্চী, দ্বিতীয়ার নাম তীস্তা। আগুন লাগিলে যেমন ঝড় উঠে, দারিদ্র্য তীব্র হইলেই যেমন আত্মসম্ভ্রমের মুখোস পরিয়া কমলাপ্রিয় লোকের উপর ঈর্ষা ও অশ্রদ্ধা আসে, প্রয়োজন হইলেই যেমন আয়োজন আসিয়া জুটে, কাঞ্চী আসিলেই তেমনি তীস্তা

আসিত, তীস্তা আসিলেই কাঞ্চী আসিত। আমার স্ত্রী তাহাদিগকে বড় ভালবাসিত; আদর করিয়া বলিত—ইহারা লব কুশ। আমি বলিতাম ইহারা অশ্লেষা মঘা। উভয়েরই বয়স প্রায় ২০ বৎসর। খরসাঙ্গের হাটে বাজারে, পথে ও চা বাগানে প্রত্যহ শত শত পাহাড়িয়া স্ত্রীলোক দেখিতাম, কিন্তু কাঞ্চী ও তীস্তা আমাদের যেমন আকর্ষণ করিয়াছিল এমন আকৃষ্ট কেহ করিতে পারে নাই। তাহার কারণ তাহাদের সখীত্ব এবং তাহাদের চক্ষের অপরূপ ভাব ও ভাষা। "একটা ভয়ঙ্কর বিভীষিকা যেন সর্ব্বদা তাহাদের চক্ষের সম্মুখে ভীমমূর্ত্তিতে বিদ্যমান, আর সেই বিভীষিকাই যেন তাহাদের উভয়কে প্রণয়সূত্রে বাঁধিয়াছে। তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে পারিব না কেন তাহাদের সম্বন্ধে আমার এমন ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু যেদিন আমি তাহাদিগকে প্রথম দেখি সেই দিনই আমার মনে বিস্ময় হইয়াছিল যে, এত ছোট চক্ষুর পক্ষে এত বেশী ভাবপূর্ণ হওয়া কিরূপে সম্ভবপর। তাহাদের সম্পর্ক জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা পরস্পরের দিকে চাহিত, মনে এমন ভাব দেখাইত যেন সে বিষয় তাহারা আপনারাই জানে না। আমরা কিন্তু তাহাদিগকে প্রত্যহ জিজ্ঞাসা করিতাম কি সূত্রে তাহারা এমন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। এক দিন তীস্তা কাঞ্চীর গায়ে ঠোনা মারিয়া বলিল,—দুস্মন। কাঞ্চী হাসিয়া বলিল—এ দুষমন।

(৩)

তখন আমাদের খরসাঙ্গ-বাস মাসাধিক কাল হইয়া গিয়াছিল। আমাদের বাটীর সম্মুখের পাহাড়টার নাম "ঈগল ক্রেগ।" কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা হইয়া গিয়াছে, পাহাড়ের কুয়াসাগুলা খুব অধিক মাত্রায় ফিকা হইয়া আসিয়াছিল। আমরা দ্বিপ্রহরে সেই "ঈগল ক্রেগ" শৈলের শিখরে গিয়া বসিয়াছিলাম। আমাদের উত্তর ও পশ্চিমে খরসাঙ্গের বাড়িগুলার মাথা দেখা যাইতেছিল। নিম্নে ঝুড়ি-বাঁধা চা-বাগানের কুলি রমণীগুলা মানুষ খেলা করিয়া কর্ত্তা, গৃহিণী, ছোট বউ, বড় বউয়ের মত প্রতিভাত হইতেছিল। আমরা কিন্তু যে উদ্দেশে শৈলশিখরে বসিয়াছিলাম সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই; কারণ এক মস্ত বেয়াদব মেঘ যবনিকার মত হিমালয়ের পদপ্রান্তে শায়িত বাঙ্গালার সমতল ভূমিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

ইংরাজ কবি বলিয়াছিলেন—"হায় নির্জ্জনতা তোমার কুহক কোথায়!" প্রথমে প্রণয়ের আবেগে প্রায়ই ভাবিতাম আত্মীয়-স্বজন-পরিপূর্ণ গৃহ ছাড়িয়া স্ত্রী লইয়া নির্জ্জন-বাস করিতে পারিলে জীবনের মাধুরী খুব ফুলিয়া উঠাই সম্ভব। কিন্তু দুইটি কলহ-পরায়ণ শিশু লইয়া স্ত্রী-পুরুষের প্রবাস-বাস যে কত ভীষণ তাহা ভুক্তভোগীই বুঝিতে পারে। বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের সহিত আলাপ পরিচয় করি নাই। শৈল-শিখরে বসিয়া যখন আর সময় কাটে না, তখন অকস্মাৎ আমাদের অবসাদ দূর করিবার জন্যই যেন কুয়াসার ভিতর হইতে একটা মনুষ্য মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। সর্ব্বনাশ! তীস্তা! তীস্তা! এখানে কোথা—

কথা না ফুরাইতে ফুরাইতেই কুয়াসার কক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইল—কাঞ্চী। স্ত্রী হাসিল—বলিল, কৈসা আয়া? কাঁহাসে আয়া!

তাহারা আমাদের বাটীতে ফুলকপি বেচিতে গিয়াছিল, আমাদের সন্ধান লইয়া এখানে খোঁজ করিতে আসিয়াছে।

ফুলকপি?

"কোঠিমে ছোড় আয়া হায়। আওর কোয়াস।"

দাম?

আগে জিনিস দেখুন তবে দাম।

আমরা চায়ের সরঞ্জাম আনিয়াছিলাম, কিন্তু আলস্যবশতঃ কাঠি জ্বালাইয়া জল গরম করিতে পারি নাই। সুবিধা বুঝিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, "এবার অশ্লেষা মঘার দ্বারা জলটা গরম করে নাও না।

পার্ব্বত্য রমণী কায়িক পরিশ্রম করিতে ভয় পায় না। কাঞ্চী তাড়াতাড়ি নীরদমালার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ইন্ধন সংগ্রহ করিবার জন্য। তীস্তা মানুর জন্য বড় বড় প্রজাপতি ধরিতে লাগিল।

আমার মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, রমণীদ্বয় পরস্পরের সম্মুখে আত্মপরিচয় দিতে চাহে না। যদি কখন তাহাদের জোড় ভাঙ্গিতে পারি তাহা হইলে কৌতূহল নিবারণ করিবার অবসর পাইব। তীস্তাকে একাকিনী পাইয়া

সাধ মিটাইতে বাসনা হইল। তাহাকে প্রথমে দুইটা সিগারেট দিলাম। পার্ব্বত্য রমণীর শ্রদ্ধা লাভ করিবার অমন উপায় আর নাই। তাহার পর দুইখানা বিস্কুট। তীস্তা বসিল। মাহুকে পৃষ্ঠে লইল। আমি বলিলাম—নানী কাঞ্চী তোমারা কোন হায়?

তীস্তা এদিক ওদিক চাহিল। আমার স্ত্রী বলিল—বহিন?

সে বলিল—না মারি বহিন নেহি। দুসমন—সয়তানী।

সে ভয়ে আবার পরদার মত মেঘের দিকে চাহিল। আমার বুদ্ধি খুলিয়া গেল। আমি বলিলাম, সতিনী?

ঠিক অনুমান করিয়াছিলাম। সে হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আদমী?

সে ম্লানমুখে উপর দিকে চাহিল। বড় কাতরভাবে জিৎকে ক্রোড়ে টানিয়া লইল। আমি কথাটা উল্টাইয়া লইবার জন্য তাহাকে বলিলাম, তোমাদের পুত্র-কন্যা নাই?

সে এবার পৃষ্ঠদেশে লম্বমানা মাহুকে ক্রোড়ে টানিয়া লইল। অকস্মাৎ তাহার ক্ষুদ্র অর্দ্ধভরা আঁখি দুইটি অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইল। সে বলিল—তাহার একটি মাত্র পুত্র রণবীর। কাঞ্চীও এক পুত্রের জননী। তাহার পুত্র লালবীর। রণবীর ও লালবীর উভয়ে গুর্খা পল্টনের সহিত জার্ম্মান সয়তানদের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছে। এখন তাহারা কোথায় আছে জননীদ্বয় জানে না।

তাহার গল্প শেষ হইতে না হইতে যবনিকার মত সম্মুখের মেঘখানা উড়িয়া গেল। আহা! কি দৃশ্য! একখানা বহুমূল্য কার্পেটের মত বাঙ্গালার বিস্তৃত প্রাঙ্গণ চক্ষের সম্মুখে মোহিনী মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার চারু অঙ্গে কোমল অলঙ্কারের মত দুই তিনটা স্রোতস্বতী নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে—সূর্য্যকিরণে তাহাদের তরল সৌন্দর্য্য কত লীলা-তরঙ্গের সৃষ্টি করিতেছিল। ঠিক সেই সময় নীরস শুষ্ক কাষ্ঠ লইয়া কাঞ্চী আসিয়া উপস্থিত হইল। আর তাহাদের কাহিনী জানিতে পারা গেল না। আর জানিবার সে সময় সাধও রহিল না। শস্যশ্যামল জননীর শ্যাম অঙ্গের মাধুরী সকল চিন্তা, নির্জ্জনতার সকল কঠোরতা কাড়িয়া লইয়াছিল।

(৪)

এখন আর মানুষ লামাকে ভয় করে না, যে মন্ত্রে পৃথিবী জয় করা যায় লামা মানুষ ও জিতের উপর সেই মন্ত্রের সাধনা করিয়াছে। সে তাহাদিগকে অতি মধুর-ভাবে ভালবাসিয়াছে এবং প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ মাঝে মাঝে রস্তা, সেব, মটরশুঁটি প্রভৃতির উপঢৌকন দিয়াছে। যে দানে তেত্রিশ কোটী দেবতাকে লইয়া বিশ্ববিজয় করিবার একটা পল্টনের সৃষ্টি করা যায়, সে দানও কঠোর-দর্শন লামা মোলায়েম প্রাণে লইয়া আসে গন্ধপুষ্প। সেদিন ঢং ঢং শব্দ করিয়া যখন লামা আসিল তখন দেখি-লাম তাহার হস্তে এক রাশি গোলাপ ফুল। শিশুদের ত সমর-ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। আমি তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া লামাকে বসিতে বলিলাম।

আমি তাহার কোমল হৃদয়ের সুখ্যাতি করিলাম। লামা মিষ্টবাক্য বলিয়া আমার স্ত্রীকে শিশুদ্বয় লইয়া স্থানা-ন্তরে যাইতে বলিল, আমাকে একাকী পাইয়া বলিল—বাবু কোমল হৃদয়ের কথা বলছেন। হৃদয় এক দিনে কোমল হয় না। আত্মা এক দিনে মুক্ত হয় না।

আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। সে জন্মান্তর-রহস্য ও কর্ম্মফল সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বলিল, বাবু আমার দণ্ডে ব্যাঘ্রের লাঙ্গুল দেখিতেছেন? আমার হৃদয় এক দিন এই শার্দ্দুলের হৃদয়ের মত কঠোর ছিল। বুদ্ধ ভগ-বান যিনি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন একদিন তিনিও ব্যাঘ্র ছিলেন।

আমি জাতক কথা কিছু কিছু জানিতাম। ভগবানের ব্যাঘ্র-জীবনের গল্পটা বলিলাম।

লামা প্রসন্ন হইল। সে বলিল,—বাবু আপনার দাস এই ভিক্ষু যাকাপোও বাঘের মত এই জীবনে নরহত্যা করিয়াছে।

আমি নিজের অজ্ঞাতে একটু শিহরিলাম। বিস্ময়ে লামার মুখের দিকে চাহিলাম। লোকটা চক্ষু মুদিয়া হস্তের প্রার্থনা-চক্র ঘুরাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিল। তাহার মুখে শান্ত প্রফুল্ল ভাব বিরাজ করিতেছিল।

কিন্তু যেন একটা অজানা শক্তি আমাকে এই পাহাড়ী সাধুর জীবনের ইতিহাসের মধ্যে প্রবিষ্ট করিতে প্রণোদিত করিতেছিল। সেই নরহত্যার কাহিনী শুনিবার জন্য আমার কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল। অথচ তাহাকে স্পষ্ট প্রশ্ন করিতে কুণ্ঠাবোধ করিলাম। ইতস্ততঃ করিয়া মাউ শৈলের দিকে চাহিলাম। পাহাড়ের কোমর বেড়িয়া দার্জ্জিলিঙের আঁকা বাঁকা রাস্তা—তাহার উপর দিয়া একখানা রেলগাড়ী মন্থর সর্পের গতিতে চলিয়া যাইতেছিল।

লামা আপনিই বলিল নরহত্যার কথা। আমি সংক্ষেপে বাঙ্গালা ভাষায় তাহা বিবৃত করিতেছি।

সে আজ বহুদিনের কথা। তখন উডবরণ সাহেব বাঙ্গালার লাট। যাকাপো তখন বাণিজ্য করিত। তিব্বত হইতে মৃগনাভি, ফিরোজা প্রভৃতি তিব্বতীয় মাল লইয়া কলিকাতা ও দার্জ্জিলিঙে বিক্রয় করিত এবং কলিকাতা হইতে বিলাতী গরম কাপড়, নকল মুগা, প্রবাল প্রভৃতি পণ্য লইয়া তিব্বতে ফিরিত। তখন সে মদ্য পান করিত; উদ্দাম যৌবনের সকল দাবীই গ্রাহ্য করিয়া রাজসিক প্রকৃতির সেবা করিত। সেই সময় সে নরহত্যা করিয়াছিল। কিন্তু সেই পাপের ভিতর দিয়া সে কল্যাণময় জীবনের দ্বারদেশে আসিয়াছে।

লামা বলিল—ঐ দেখুন একটা নগ্ন পাহাড়, শিরে মাত্র তিনটি মহীরুহ। ঐ স্থলে ইংরাজ ও নেপাল রাজ্যের সীমা। ঐ শৈলের গাত্রে অনেক পাহাড়ী বস্তি আছে—নীচে ঝরণা আছে, নদী আছে। একদিন প্রেমের দায়ে ঐখানে একটা রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ পাহাড়ের পশ্চাতে উঁকি মারিয়াছে মাত্র। আমি নির্জ্জন পথে যাইতেছিলাম, পশ্চাতে একটা গুর্খা ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইল। একটু মদ্যপান করিয়া লোকটা আপনাকে অনেকটা মুক্ত বলিয়া মনে করিতেছিল। পাহাড়ীয়ারা আমাদিগকে ভুটিয়া বলে, দেখাইতে চায় আমরা অস্পৃশ্য অথচ তাহাদের রমণীদের মধ্যে অনেকেই আমাদের প্রণয়লাভে লুব্ধ হয়। আমাদের উভয় জাতির সম্মিলনেই লেপচা জাতি অমন সুন্দর।

গুর্খাটা তাহাকে গালি দিল। অস্পৃশ্য ভুটিয়াকে হিন্দু গ্রামে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। যাকাপো ছাড়িবার পাত্র নয়—বিশেষ সেই গুর্খাটা সবল-কায় ও সুন্দর। যাকাপোর অস্ত্রের মধ্যে তিব্বতীয় ছুরিকা এবং গুর্খার কটিদেশে সংবদ্ধ খুক্‌রী।

"তবু আমি প্রথমে আক্রমণ করি নাই। সে প্রথমে আমাকে আক্রমণ করিল। আমি আপনাকে রক্ষা করিলাম—তাহার ভোজালি আমার শোণিত আস্বাদন করিল। আজ অবধি তাহার চিহ্ন আমার অঙ্গে বিদ্যমান"।

লামা তাহার বক্ষ খুলিয়া দেখাইল। উঃ! ভীষণ চিহ্ন! সে অস্ত্র ভিতরে প্রবেশ করিলে আজ আর তাহার নির্ব্বিকার মুখে সে কাহিনী শুনিতাম না।

যাকাপো সেই অপমানের প্রতিশোধস্বরূপ গুর্খাকে ধরিয়া পাশের ঝরণায় নিক্ষেপ করিয়াছিল। লোকটার কর্ম্মফলে সে একখানা বড় পাথরের উপর পড়িল। তাহার ভারে উপল-খণ্ড স্থানচ্যুত হইয়া গড়াইতে লাগিল; তাহার আত্মরক্ষার চেষ্টার ফলে আরও অনেকগুলি প্রস্তর স্খলিত হইয়া দুর্ভাগ্যকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

(৫)

নরহত্যা করিয়া লোকে অমন অম্লানবদনে নির্ব্বিকার ভাবে দোষ স্বীকার করিতে পারে এ ধারণা পূর্ব্বে আমার ছিল না। পরের হত্যা-কাহিনী বিবৃত করিতেও লোকের মুখে চোখে উত্তেজনার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু এ লোকটার মুখে কোনও চিহ্ন প্রকটিত হইল না। এই কয়েক দিনের বন্ধুত্বে আমার উপর তাহার বিশ্বাসও হইয়াছিল অপার। তাহা না হইলে যে কথা বলিলে সে অক্লেশে ফাঁসি কাঠে চড়িয়া ভব-ব্যাধি পার হইতে পারে সে কাহিনী সে আমার নিকট বলিত না।

আমি বলিলাম—যে লোকটাকে হত্যা করিলে তাহার পারিবারিক অবস্থা কি রকম তা' জেনেছিলে?

লামা তাহার শান্ত মুখে একটু হাসিয়া বলিল—ভাবিতেছেন বাঙ্গালার মত স্বামী মরিলে স্ত্রীপুত্র সকলে অনশনে প্রাণত্যাগ করে? সকল পাহাড়ী জাতির মধ্যেই স্ত্রীপুরুষ উপার্জ্জন করে। সুতরাং সে চিন্তার কারণ নাই।

আমি বলিলাম—লোকটার স্ত্রী পুত্র ছিল?

লামা বলিল—দুইটি রমণী তাহার ছিল, কোনটিই স্ত্রী নহে। দুইটি স্ত্রীলোক দুই গ্রামে থাকিত, প্রত্যেকেরই বিশ্বাস ছিল যে লোকটা তাহারই একান্ত অনুরক্ত। ইহাতেও তাহাদের তিন জনের কাহারও দোষ ছিল না; কারণ লোকে কর্ম্মফল ভোগ করে। ভগবান বুদ্ধও।

সত্য কথা বলিতে কি লোকটাকে ভণ্ড বলিয়া বিশ্বাস হইল না। তাহাকে পরে অনেকবার ঘৃণা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, পারি নাই। কতবার আপনার উপর অভিমান হইয়াছে নরঘাতককে ঘৃণা করি নাই বলিয়া; তাহাকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করি নাই বলিয়া। সে আমার উপর কি একটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যাহার ফলে সকল প্রবৃত্তি নির্জ্জীব হইতেছিল।

লামা বলিল—যে নালার নিম্নে সুরথ বাহাদুরের লাস পাওয়া গিয়াছিল সেই স্থলে উভয় গ্রামের রমণীরা জল লইতে আসে। প্রভাতে তাহার মৃতদেহ জড়পিণ্ডবৎ সেই স্থলে নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মুক্ত আত্মা কর্ম্মফলের অনুরূপ স্থলে ঘুরিতেছিল। এমন সময় এক গ্রামের এক রমণী জল লইতে আসিল। ঠিক সেই সময় অপর বস্তীর আর এক রমণী জল লইতে আসিল। তাহারা উভয়ে এক সঙ্গে সেই শবের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, উভয়ে ছুটিয়া গিয়া সেই জড়পিণ্ড ধরিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। কর্ম্মফলে জড়পিণ্ডের ভিতর হইতে অমর আত্মা পলাইয়াছে, তাহার জন্য বিলাপ—

এবার আমার ক্রোধ হইল। স্পর্দ্ধার একটা সীমা আছে। কিন্তু সে সময় কৌতূহল এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, আমার যৌবনের নরহত্যার গল্প শুনিবার জন্য প্রাণ অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং যুক্তিতর্কের গোলোক ধাঁধার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া আমি বলিলাম—তার পর তার পর?

যাকাপো বলিলেন—যখন প্রথম বিষাদের মোহ-ঘোরটা কাটিয়া গেল তখন শব ছাড়িয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিল, উভয়েই বলিল—এ আমার লোকের, তুমি কে? ধীরে ধীরে উভয়েরই মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল যে সুরথ বাহাদুর বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছে। মূর্খ রমণীরা কর্ম্মফলের কথা জানিত না, বুঝিত না। তাহারা পরস্পরের সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিল—টানাটানি কামড়া-কামড়ি মারামারি করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম—তার পর? তার পর?

লামা বলিল—মূর্খ রমণীদ্বয় প্রভুর আদেশ জানে না—অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

লোকটা আমাকে পরিহাস করিতেছিল নাকি? মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সেই শান্তভাব। সে যেন আমার মনোভাব বুঝিয়া বলিল—আমিও মূর্খ ছিলাম। আমিও হিংসা করিয়াছিলাম। তাহার পর অনেক সাধনা করিয়াছি। সেইদিন হইতে পৃথিবী ছাড়িয়া ভিক্ষু হইয়াছি। দালাই লামার বিহারে তপস্যা করিয়াছি। এখন গুরুর আদেশে দেশে দেশে ভিক্ষা করিতেছি।

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—থাক সে কথা; সে রমণীদ্বয়ের কি হইল?

"তখন ঝরণায় জল লইতে অনেক রমণী আসিয়াছিল। তাহারা কলহ মিটাইল, তাহা না হইলে স্ত্রীহত্যা হইত। তখন তাহারা উভয়ে উভয়কে দোষারোপ করিল। প্রথম রমণী বলিল—দ্বিতীয়া রমণী সুরথ বাহাদুরকে মারিয়াছে—দ্বিতীয়া রমণী বলিল—প্রথমা রমণী হত্যাকারিণী। কিন্তু দুই গ্রামের লোক বিশ্বাস করিল যে, উভয় রমণী মিলিয়া সুরথ বাহাদুরকে হত্যা করিয়াছে।"

আমি বলিলাম—পুলিস?

সে বলিল—তাহার পর যে রমণীদ্বয় কোথা চলিয়া গেল তাহা কেহ জানিল না। বিশ বৎসর হইয়া গিয়াছে সে কাহিনী এখন সকলে বিস্মৃত হইয়াছে। কে জানে কে কোথা গিয়াছে শেষে সব এক স্থলে যাবে—

হোম্ মণিপথে হোম্।

(৬)

প্রতি রবিবারে খরসাঙে হাট বসে, পাহাড়ের ভিন্ন ভিন্ন বস্তী হইতে এবং নিম্নের অনেক গ্রাম হইতে লোকে ফল-মূল তরিতরকারী নানা প্রকার পদার্থ লইয়া এই হাটে বিক্রয় করিতে আসে। প্রায় সকল লোক পাঙ্খাবাড়ি রাস্তার উপর দিয়া যায়। হাটের দিন প্রবাসীদের জীবনে আলস্যটা কতক মাত্রায় অপসারিত করে। আমি সেদিন বেলা বারোটা অবধি বাজার করিয়া গৃহে আসিয়া স্নানাহ

করিলাম। শীতটা দিন দিন বেশ পড়িতেছিল। দিক্‌গুলি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতেছিল। প্রায় বেলা দেড়টার সময় সপরিবারে বাহির হইলাম।

আমরা যে বাটীতে বাস করিতেছিলাম সেটি যদুপতি বাবুর। পাঙ্খাবাড়ি রাস্তার উপর দিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেই পাহাড়টার প্রান্তে আসা যায়। সেই স্থলে বসিবার একখানি বেঞ্চ আছে, দক্ষিণে আম ছুটিয়ার নামিয়া যাইবার রাস্তা, বামের রাস্তা পাঙ্খাবাড়িতে নামিয়া গিয়াছে। সম্মুখে পাহাড়ের কোনটা কালেক্টার সাহেবের প্রাসাদ।

আমরা সেই বেঞ্চের উপর বসিলাম। সমতল-ভূমির সৌন্দর্য্য আজ অপারমেয়। নীচে চিল উড়িতেছিল আকাশের বর্ণ ঘন নীল। পাহাড়ী রমণীরা হাটে ফলমূল বেচিয়া, বিলাতী বেগুন, সিগারেট প্রভৃতি কিনিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। হঠাৎ মাল্লু ও জিৎ করতালি দিয়া নাচিয়া উঠিল, উভয়েই ছুটিল। আমি চাহিয়া দেখিলাম, রমণীদ্বয় আসিতেছে—কাঞ্চী ও তীস্তা। তাহারা দুইজনে দুইজন শিশুকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইল। দুইজনকে দুইটা পেয়ারা খাইতে দিল।

তাহারা আজ তেমন প্রফুল্ল নয়। তীস্তা বলিল, বাবু লড়াইকা খবর কিয়া হায়?

বুঝিলাম পুত্রের জন্য তাহাদের চাঞ্চল্য বাড়িয়াছে। আমি বলিলাম, যুদ্ধ জয় হইতেছে। এবার তোমাদের পুত্রেরা ফিরিবে।

কাঞ্চী বলিল, বাবু অনেকে ফিরেছে, আমার পুত্রের সংবাদ কেহ দিতে পারে না। বড় ভয় হয় বাবু।

তীস্তা বলিল, বাবু তুমি আমাদের বন্ধুত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্য হও, এই ছেলেদের জন্যই আমাদের এত বন্ধুত্ব। তাহা না হইলে সতিনীদের মধ্যে সৌহৃদ্য হয় না।

আমি তাহাদের গল্প শুনিবার জন্য বহুদিন ব্যস্ত। আজ সহানুভূতি দ্বারা উৎসাহিত করিয়া তাহাদের কথাগুলি টানিয়া বাহির করিলাম। বিধবা হইবার পর তাহারা ভিন্ন গ্রামে বাস করিত, বালাসান নদীর দুই পার্শ্বের দুই গ্রামে। পরস্পরে ভাব ছিল না, কিন্তু মিত্রের সংবাদ অপেক্ষা লোকে শত্রুর সংবাদ অধিক রাখে তাই তাহারা উভয়ে উভয়ের সন্ধান জানিত। রণবীর-ও লাল-বীর পরস্পর পরস্পরকে জানিত না, এখন তাহারা বোধ হয় পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা যে এক পিতার পুত্র তাহা তাহারা জানিত না। মাতার অনুমতি না লইয়াই যুবকদ্বয় পল্টনে নাম লিখাইয়াছিল।

আমার কৌতূহল বাড়িতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের বয়স?

একজনের বয়স একুশ বৎসর, লালবীরের বয়স বাইশ। পিতার নাম? জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। পিতার মৃত্যু হইল কিরূপে? এবারও সাহস হইল না। হাঃ ভগবান! জোটপাট, ওলটপালট করিয়া, কোথাকার মানুষ কোথায় আন, রঙ্গময়, লীলাময়, নটরাজ বলিহারি তোমার যোগাযোগ! আমার সন্দেহ রহিল না যে, এই দুই রমণী এবং আমার সিদ্ধপুরুষ খাকাপো মামা এক নাটকের অভিনেতৃ ও অভিনেতা। আমি মুগ্ধ হইয়া তাহাদের আখ্যায়িকা শুনিলাম। কিন্তু এ রহস্যের মধ্যে নটরাজ খাকাপোকে আনিলেন কেন সে প্রশ্নের কোনও উত্তর মনের মধ্যে পাইলাম না।

তাহাদিগকে প্রশ্ন করিলাম, যদি এতদিন তাহারা শত্রু ছিল হঠাৎ এমন সখ্য জন্মিল কোথা হইতে?

উত্তরও পাইলাম বড় নূতন রকম। একটা কিম্বদন্তী আছে যে, হিমালয় পাহাড়ে দেবতারা লীলাখেলা করিয়া বেড়ান। ইহার মধ্যেও দেবতাদের খেলা আছে। যখন তীস্তা দেখিল রণবীর পলাইয়াছে, তখন তাহার বড় যন্ত্রণা হইল। সে একটু তৃপ্তি পাইল একথা শুনিয়া যে লাল-বীরও পলাইয়াছে। কাঞ্চীর মনেও ঠিক সেই ভাব উদিত হইয়াছিল, প্রথম বিষাদ পরে হিংসাজনিত সুখ। কিন্তু যে পুত্রকে কষ্ট করিয়া পালন করিতে হয়, যে পুত্রের মুখে শত চন্দ্র সম্মিলিত, যে পুত্রের কণ্ঠে শত বীণার সমাবেশ, সে পুত্রের যুদ্ধযাত্রা-জনিত বিষাদকে কি সতিনীর দুঃখের স্মৃতি একেবারে মজাইতে পারে! তাহারা বড় কষ্টে বাস করিতে লাগিল, উভয়েই ক্রন্দন করে, উভয়েই দেবতাদের ডাকে, কিন্তু শান্তি পায় না।

ভাদ্রের শেষে সমস্ত দিন জল পড়িয়াছে, বিদ্যুৎ হাসিয়াছে, ঘনঘটাচ্ছন্ন পাহাড় অতীব ভীম মূর্ত্তি ধারণ করি-

য়াছে। সেদিন তাহাদের নির্জ্জনতা অপরিমেয় যাতনা আনিয়া তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিয়াছে। কাঞ্চী ভাবিল আর ত একেলা থাকিতে পারি না, তীস্তা ভাবিল নির্জ্জনতা বিসর্জ্জন করিবে। ঠিক একই সময়ে উভয়ের মনে এই ভাব উঠিল, ঠিক একই সময় এক জনের মনে হইল অপরে কি রকম নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে দেখিয়া আসিবে। উভয়েই গৃহ ছাড়িয়া চলিল। মেঘের ভিতর দিয়া, কুয়াসার ভিতর দিয়া, ভীমা প্রকৃতির কক্ষের ভিতর দিয়া উভয় গ্রামের মধ্যে অকস্মাৎ বজ্র হানিল, বিদ্যুৎ চমকাইল। বিদ্যুতের আলোকে কাঞ্চী দেখিল তীস্তা, তীস্তা দেখিল কাঞ্চী; ভয়ে উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিল; উভয়েরই একই ভীষণ শত্রুর বৈরিতায় তাহাদের সামান্য বৈরিতা বাষ্পের মত উপিয়া গেল। সেই আলিঙ্গনই তাহাদের সখীত্বের ভিত্তি। দেবতা তাহাদিগের মিলন ঘটাইয়াছে; এ মিলনে বিচ্ছেদ মানুষ আনিতে পারে না।

(৭)

ছুটি ফুরাইতে আর তিন দিন বাকী ছিল। আবার পুনর্মূষিক হইতে হইবে। খরসাঙে তো দার্জ্জিলিঙের মত আমোদ-কৌতুক নাই, সমাজ নাই, লোকের একমাত্র আনন্দ ট্রেণ যাইবার আসিবার সময় পোষাক-পরিচ্ছদ [প]রিয়া ষ্টেসনে বেড়াইতে যাওয়া। জিনিষপত্র গুছাইতেছিলাম বাড়ি ফিরিবার জন্য; শৈলবাসের সকল কথাগুলা আমার মানস-পটে প্রতিভাত হইতেছিল। একটা কথা বারম্বার মনে হইতেছিল কি উদ্দেশে জগদীশ্বর আমাকে হত্যাকারী লামা ও নিহত সুরয বাহাদুরের বিধবাদের সংস্রবে লইয়া আসিলেন। এক একবার সন্দেহ হইতেছিল আমি তো নির্দ্ধারণ করি নাই তাহারা সুরয বাহাদুরের বিধবা কি না। কিন্তু এই যোগাযোগটা অপূর্ব্ব বলিয়াই আর সন্দেহ ছিল না যে, এই অভাগিনী রমণীদ্বয় নিহতের প্রণয়পাত্রী ছিল। কিন্তু লামা তো তাহাদের পুত্রের কথা [ব]লে নাই। ঠিক সেই সময় লামা আসিল।

লামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম লামা সুরয বাহাদুরের পুত্র ছিল?

লামা আমার আকস্মিক প্রশ্নে একটু বিস্মিত হইল। কিন্তু তাহার শিক্ষার গুণে সে আপনার দেহের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছিল। তাহার মুখের শান্ত ভাব বিচলিত হইল না, সে হরিদ্রা-সাগর উদ্বেলিত হইল না। সে বলিল, হাঁ দুইজনের দুইটি শিশু পুত্র ছিল।

আমি বলিলাম, লামা তুমি তাহাদের সন্ধান লও নাই।

সে বলিল, তাহা হইলে তো ভিক্ষা শেষ হয়। বিহারে বসিয়া তপস্যা করি।

আমি বলিলাম, কেন?

সে বলিল গুরুর আদেশ। যতদিন না তাহাদের সাক্ষাৎ পাইব—উভয়ের একসঙ্গে—ততদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব।

এবার বুঝিলাম কেন জগদীশ্বর আমার জীবনের সঙ্গে ইহাদের জীবন মিলাইয়াছেন। এই অনুতপ্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ভিক্ষাবসানের জন্য আমরা পাপীকে ঘৃণা করি, দূরে ফেলিয়া দিই, অস্পৃশ্য জ্ঞান করি। ভগবান তাহা করেন না। অনুতপ্ত পাপীকে তিনি মঙ্গলময় পুণ্যের পথ দেখাইয়া লইয়া যান।

ধন্য লীলাময়! ঠিক সেই সময় কাঞ্চী ও তীস্তা আসিল। দেহে পরিষ্কার বেশ, কপালে চন্দন ও আতপ তণ্ডুল। এত প্রফুল্ল তাহাদের কোন দিন দেখি নাই। উভয়ে উভয়ের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া যাইতেছিল। আমাদিগকে দেখিয়া থামিল। তীস্তা বলিল, বাবুজি ঠারো, আমি লড়্কা আয়েগা হায়—টিরেণ মে। লে আতা!

মুখে একমুখ হাসি! কি আনন্দ! আমি বলিলাম সুরয বাহাদুরের লেড়কা।

তাহারা বলিল, হাঁ বাবুজি। সুরয বাহাদুরকা দো বেটা—লালবীর রণবীর। আয়েগা বাবুজি মায়িজিকে দেখলায়গা হায়।

এবার সাধুর শান্ত বদন প্রফুল্ল হাস্যে উদ্ভাসিত হইল। বিশ বাইশ বৎসরের সাধনার ফল হাতে পাইয়াছে। আজ তাহার শান্তভাব বর্জ্জন করিবারই কথা। সে দুই হাতে দুই জনকে ধরিল। বিস্মিত রমণীদ্বয় সলজ্জ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

লামা তাহার কটিদেশ হইতে একটা বড় থলি বাহির করিল। তাহার ভিতর হইতে সে অনূন পাঁচ শত মোহর

স্থির করিয়া দুইটি রমণীকে সমানভাগে বণ্টন করিয়া ন। তাহারা বলিল, কেন?

লামা বলিল, তোমাদের পুত্র দুইটীকে দিলাম।

দূরে গোরার বাজনা বাজিয়া উঠিল। ট্রেন আসিয়াছে, স্টেন নামিতেছে, রমণীরা আর কোন কথা ভাবিল না, জ্ঞাসা করিল না। লামার দান লইয়া উন্মত্তার মত শনের দিকে ছুটিল।

লামা বলিল, খুন করিয়া সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছিলাম প্রায়শ্চিত্তের জন্য। গুরুর আদেশে আজ তাহা হাদিগকে দিলাম। আজ হইতে আমার ভিক্ষাবসান। বার বিহারে বসিয়া তপস্যা করিব। হোম্ মণিপথে হোম! হোম মণিপথে হোম।

আশীর্ব্বাদ করিয়া লামা বিদায় হইল। আমি বিস্মিত হইয়া তাহার মহাপ্রস্থান দেখিতে লাগিলাম।

স্ত্রীজাতি বিষয়ে দার্শনিক শোপেন্‌হাউয়ের।

[অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুপদ শাস্ত্রী, এম-এ, বি-এল]

সভ্যতাদীপ্ত ইয়ুরোপ স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সমান অধিকার, সমান সম্মান দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ইউরোপেও এমন মনীষী আছেন স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে যাঁহাদের মত রক্ষণশীল হিন্দুদিগের অপেক্ষাও সহস্রগুণে সঙ্কীর্ণতর। জগদ্বিখ্যাত জর্ম্মন দার্শনিক শোপেন হাউয়ের (Schopenhauer) স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যে সঙ্কীর্ণ মতের পোষণ করিতেন, তাহাই বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে উপহার দিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। এই মত আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি স্ত্রীজাতির উপর আক্রোশের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহাদের দোষকীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার এই অদ্ভুত মতের মূলে একটী সত্য ঘটনা আছে। কথিত আছে যে, তাঁহার অধিকৃত দুইটী কক্ষের বাহিরে তিনি একদা তিনটী রমণীকে কথোপকথননিরতা দেখিতে পান এবং তাহাদিগের নিকট এই অঙ্গীকার করাইয়া লন যে তাহারা এরূপ কার্য্য আর কখনও করিবে না। কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় সেই তিনটী রমণীকে ঠিক সেই অবস্থায় দেখিতে পান। তিনি তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে আদেশ করেন; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে একজন তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করে। তিনি তাহাকে কটিদেশে ধরিয়া একেবারে বাহিরে নিক্ষেপ করেন। সেই রমণী সীবন-কার্য্যের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। শোপেন্‌হাউয়েরের এই নিষ্ঠুরতার ফলে সে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যাবজ্জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় এবং ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ করিয়া দার্শনিক-প্রবরের নিকট হইতে আজীবন খোরপোষ আদায় করে। এই কারণে স্ত্রীজাতির উপর শোপেনহাউয়ের হাড়ে হাড়ে চটিয়া যান। তাঁহার তুল্য দার্শনিক যখন স্ত্রীজাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর তখন অবশ্য যুক্তিতর্কের অভাব হয় নাই। যাহাই হউক মোটামুটি তাহার মত নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল:—

"স্ত্রী-আকৃতি দর্শনমাত্রেই আমাদের এই শিক্ষা হয় যে কোনও গুরুতর মানসিক বা দৈহিক পরিশ্রমের জন্য নারীর সৃষ্টি হয় নাই। সে জীবনের পাপভার বহন করিতেছে— কার্য্যানুষ্ঠানে নয় কিন্তু ক্লেশ সহনে, গর্ভধারণের যন্ত্রণায়, সন্তান-পালনের দুঃখে, এবং পুরুষের অধীনতায়। তীব্রতম দুঃখ বা আনন্দ বা শক্তির বিকাশ তাহার ভাগ্যে নাই। তাহার জীবনধারা পুরুষের তুলনায় আরও শান্তভাবে, আরও সামান্যভাবে, আরও কোমলভাবে প্রবাহিত হয়, কিন্তু পুরুষের অপেক্ষা অধিকমাত্রায় সুখের সহিতও নয় বা অসুখের সহিতও নয়।

স্ত্রীলোক বাল্যস্বভাবাপন্ন, সরল ও সঙ্কীর্ণদৃষ্টি বলিয়াই —এক কথায় বলিতে গেলে সারা জীবনটাই তাহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিশুর তুল্য বলিয়াই—মানবশিশুর ধাত্রী ও শিক্ষায়িত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত—তাহারা শিশু ও প্রৌঢ় পুরুষের অন্তরালবর্ত্তী সোপানস্বরূপ, কারণ পুরুষই প্রকৃত মনুষ্যজাতীয় জীব। শুধু কোনও বালিকার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করুন, দেখুন কেমন করিয়া দিনের পর দিন সে একটি শিশু লইয়া ক্রীড়া করে, তাহার সহিত নৃত্য

করে, পান করে এবং ভাবিয়া দেখুন সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন কোনও পুরুষ তাহার স্থানে কিরূপ ব্যবহার করিত। যাহাকে নাটকীয় ভাষায় "চমকপ্রদ প্রভাব" (startling effect) বলা যাইতে পারে তাহারই বিস্তারের জন্য প্রকৃতিদেবী নারী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তাহাকে সমগ্র শেষ জীবনের বিনিময়ে মাত্র কয়েক বৎসরের জন্য প্রচুর সৌন্দর্য্য, মোহিনীশক্তি এবং পূর্ণতা দিয়াছেন যাহাতে সে এই কয় বৎসরে পুরুষের মনকে এতদূর মজাইতে পারে যে পুরুষ কোনও না কোনওরূপে নারীর সারাজীবনের ভারই গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়; এই কার্য্যে কেবল পুরুষের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকের দ্বারা প্রণোদিত কখনই হইতে পারে না। এই জন্যই প্রকৃতিদেবী অন্যান্য জীবের মত নারীকেও উপযুক্ত সময়েই তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য এ বিষয়েও তিনি তাঁহার স্বাভাবিক মিতব্যয়িতার সহিতই প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কারণ যেমন স্ত্রী-পিপীলিকা সঙ্গমের পর তাহার পক্ষে অতঃপর নিষ্প্রয়োজন এবং সন্তানোৎপাদনের পক্ষে প্রকৃতই বিপজ্জনক পক্ষ হইতে বিচ্যুত হয়, সেইরূপ দুই একবার প্রসবের পরই এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই নারী সাধারণতঃ তাহার সৌন্দর্য্য হারায়।

উপরে যাহা বলা হইল তদনুসারেই প্রাপ্তযৌবনা বালিকারা মনে মনে গৃহস্থালী বা অন্যান্য কার্য্যকে তুচ্ছ ব্যাপার এমন কি পরিহাস মাত্র বলিয়া মনে করে। প্রণয় প্রেমের বিজয় এবং তৎসম্বন্ধ যাহা কিছু—যেমন বেশবিন্যাস, নৃত্য প্রভৃতি তাহারই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মানিয়া লয়।

যে পদার্থ যত ভাল, যত পূর্ণ, সে পদার্থের পরিণতি তত বিলম্বে তত ধীরে ধীরে হয়। পুরুষের বিবেক ও ধীশক্তির পরিণতি অষ্টাবিংশ বর্ষের পূর্ব্বে বড় একটা হয় না কিন্তু স্ত্রীলোকের আঠার বৎসরেই হয়। এই জন্যই স্ত্রীলোকের বিচারশক্তি বড়ই সীমাবদ্ধ। এই জন্যই যাবজ্জীবন স্ত্রীলোক শিশুই থাকে আপনার নিকটতম বস্তু ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না, বর্ত্তমানকে আঁকড়াইয়া ধরে, পদার্থের উপরের ভাবটাকেই বাস্তব বলিয়া ধরিয়া লয় এবং গরিষ্ঠ বিষয় অপেক্ষা তুচ্ছ বিষয়কেই বাঞ্ছনীয় মনে করে। বিচারশক্তি তাহাই যাহার প্রভাবে মানুষ পশুর মত শুধু বর্ত্তমান লইয়া থাকে না কিন্তু উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তা করে; এই কারণেই তাহার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি, তাহার উদ্বেগ, তাহার বিষণ্ণতা। দুর্ব্বলতর বুদ্ধিনিবন্ধন এই বিচারশক্তি-জনিত সুফলও যেমন স্ত্রীলোকে অল্পমাত্রায় ভোগ করে, কুফলও তদ্রূপ। নারীবুদ্ধিবিষয়ে অপ্রসর-দৃষ্টিসম্পন্ন, (myope) নিকটস্থ বস্তু সে তাহার বিচার-নিরপেক্ষ (Intuitive) ধীশক্তির দ্বারা স্পষ্টই দেখিতে পায় কিন্তু তাহার দৃষ্টি দূরাবগাহিনী নহে, এই জন্য দূর বস্তু তাহার দর্শন-পথের গোচর হয় না। সুতরাং যাহা অনুপস্থিত, অতীত বা ভবিষ্যৎ তাহা নারীকে ততটা বিচলিত করিতে পারে না যতটা আমাদিগকে পারে। এই জন্যই যে স্ত্রী-জাতিতে অমিতব্যয়িতা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সময়ে সময়ে উন্মত্ততা হইতে বড় বেশী পৃথক নহে। স্ত্রীলোকেরা মনে করে যে পুরুষের জন্ম অর্থোপার্জ্জনের জন্য আর স্ত্রীলোকের সেই অর্থ নিঃশেষিত করিবার জন্য; যদি সম্ভব হয় পুরুষের জীবদ্দশাতেই, অন্ততঃ তাহার মৃত্যুর পরে। তাহাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যখন পুরুষেরা স্বোপার্জ্জিত অর্থরাশি সংসার-চালনের জন্য তাহাদের হস্তে সমর্পণ করে! এই অর্থ-সমর্পণে অসুবিধা অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু সুবিধা এই যে স্ত্রীলোক বর্ত্তমান লইয়া সন্তুষ্ট থাকায় বর্ত্তমানটাকে ভাল করিয়াই উপভোগ করিতে পারে—এই জন্যই তাহারা আনন্দময়ী এবং এই জন্যই তাহারা উদ্বেগখিন্ন পুরুষের চিত্তবিনোদন এবং সান্ত্বনার উপযোগিনী।

প্রাচীন জর্ম্মনদিগের রীতি-অনুসারে সঙ্কটকালে স্ত্রীলোকের পরামর্শ লওয়া অসঙ্গত নয়। কারণ আমরা একভাবে বিষয়টাকে গ্রহণ করি—তাহারা অন্যভাবে করে। তাহারা গন্তব্যস্থানে যাইবার ক্ষুদ্রতম পথ ধরিতে ভালবাসে এবং যাহা তাহাদিগের নিকটতম তাহার উপর দৃষ্টি রাখে, কিন্তু আমরা যাহা নিকটতম তাহা আমাদের করায়ত্ত বলিয়াই ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যাই। এরূপ অবস্থায় সেই নিকটতম বস্তুর নিকটে আমাদিগকে আবার ফিরাইয়া আনা দরকার যাহাতে সেই বিবেচ্য বিষয়ের সহজ ও ঘনিষ্ঠ

দর্শন মিলে। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, স্ত্রীলোক আমাদিগের অপেক্ষা অনেক বেশী বহির্মুখী (objective) এই জন্য বস্তুতে যাহা প্রকৃতপক্ষে আছে তাহা অপেক্ষা অধিক দেখে না ; কিন্তু আমরা যখন ষড়্‌রিপুর বশীভূত হই তখন যাহা প্রকৃতপক্ষে আছে তাহাকে আমরা অনায়াসে বড় করিয়া দেখি অথবা তাহাতে কাল্পনিকের সংযোগ করি।

এই একই কারণবশতঃ স্ত্রীলোকের অনুকম্পা অনেক বেশী, অতএব তাহারা পুরুষের অপেক্ষা অধিক মাত্রায় আর্ত্তের প্রতি মানবীয় প্রেম ও সমবেদনা দেখাইতে পারে, কিন্তু ন্যায়পরতা, সাধুতা ও বিবেকানুবর্ত্তিতায় (conscientiousness) তাহারা পুরুষের পশ্চাৎবর্ত্তী। তাহাদের দুর্ব্বলতর ধীশক্তির জন্য যাহা বাস্তব, যাহা দৃশ্যমান, যাহা বর্ত্তমান হিসাবে প্রকৃত—তাহাই স্ত্রীলোকের উপরে যতটা প্রভাব বিস্তার করে তাহার তুলনায় সূক্ষ্ম (abstract) জ্ঞান, সনাতন নীতি (maxims), দৃঢ় সঙ্কল্প, ভূত ও ভবিষ্যৎ পরোক্ষ (absent) ও বিপ্রকৃষ্ট (distant) বিষয়ে আলোচনা বড় করিতে পারে না।

সুতরাং ধর্ম্মের প্রথম ও প্রধানতম উপাদান তাহাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান ; কিন্তু গৌণ ও সদাপ্রয়োজনীয় যে উপকরণ তাহা নাই। এই বিষয়ে তাহাদিগকে এরূপ একটী জীবশরীরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে যাহাতে যকৃৎ বিদ্যমান, কিন্তু পিত্তকোষের অভাব। * *

যাহা বলা হইল, তদনুসারে আমরা দেখিতে পাই ন্যায়পরতার অভাবই স্ত্রী চরিত্রের প্রধান দোষ। ইহা তাহাদিগের উপরি-লিখিত বিচারশক্তি ও বিমর্শের (reflection) অভাব হইতে সদ্য উৎপন্ন হয় এবং এই কারণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যে তাহাদের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন স্বভাবই তাহাদিগকে শক্তির পরিবর্ত্তে ধূর্ত্ততার সহায়তা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত করায়। এইজন্যই তাহাদিগের সংস্কারগত বিশ্বাসঘাতকতা এবং এইজন্যই তাহাদিগের প্রতিকারবিহীন মিথ্যাপরায়ণতা। কারণ প্রকৃতি যেমন সিংহকে দংষ্ট্রা ও নখরের দ্বারা, হস্তী ও বন্যবরাহকে দন্তের দ্বারা, বৃষভকে শৃঙ্গের দ্বারা এবং sepia নামক জলজন্তুকে জলের কৃষ্ণতা-সম্পাদক মসীর দ্বারা সশস্ত্র করিয়াছেন, সেইরূপ স্ত্রীলোককে আত্মরক্ষার জন্য প্রবঞ্চনা-শক্তিতে সজ্জিত করিয়াছেন এবং দৈহিক বল এবং বিচার শক্তিরূপে যাহা তিনি পুরুষকে দিয়াছেন তাহাই নারী বিষয়ে প্রবঞ্চনা-শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং প্রতারণা স্ত্রীজাতির স্বতঃসিদ্ধ এবং তাহা চতুর ও নির্ব্বোধ উভয় প্রকার নারীরই সাধারণ সম্পত্তি। এই জন্য প্রত্যেক স্থান বিশেষেই সেই শক্তির ব্যবহার নারীর পক্ষে ততটা স্বাভাবিক, আক্রান্ত হইলে জন্তুর পক্ষে অস্ত্রপ্রয়োগ যতটা এবং নারী যখন এই শক্তির ব্যবহার করে তখন সে কতকটা অনুভব করে যেন সে নিজের অধিকার মতই কাজ করিতেছে। এই কারণেই সম্পূর্ণ সাধু ও ছলনাবিহীন স্ত্রীলোকের অস্তিত্ব অসম্ভব বলিলেও চলে। এই কারণেই তাহারা এত সহজে অপরের প্রতারণা ধরিয়া ফেলে যে, তাহাদের প্রতি প্রতারণা করিতে না যাওয়াই ভাল। উল্লিখিত দোষটী প্রধান এবং যাহা কিছু তাহার সহযোগী (accessories), তাহা হইতেই কৃত্রিমতা অননুবর্ত্তিতা (disloyalty), বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকেই অধিক সময়ে মিথ্যাসাক্ষ্য-প্রদানের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া থাকে এবং বাস্তবিক ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তাহাদিগকে শপথ-গ্রহণ করান উচিত কি না। এরূপ ঘটনাও সময়ে সময়ে সর্ব্বত্র ঘটিয়া থাকে যে, যাঁহার কিছুরই অভাব নাই এরূপ মহিলাও বিপণীতে প্রবেশ করিয়া কোনও বস্তু দেখিবার ছলে অপহরণ করিয়া পলাইয়াছেন।

পুরুষে পুরুষে স্বাভাবিক বিরোধ নাই কিন্তু নারীদ্বয়ের মধ্যে তাহা আছে। পথে সাক্ষাৎ হইলে তাহারা অহিনকুলবৎ পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করে। প্রথম পরিচয়ে তাহারা অধিক মাত্রায় অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। এই জন্য তাহাদের সৌজন্যবিনিময় (Mutual Complimenting) বেশী উপহাসজনক। নিম্নশ্রেণীর স্বজাতির প্রতি তাহাদের ব্যবহার নৃশংস এবং গর্ব্বিত। ইহার একটী কারণ থাকিতে পারে। প্রকৃতি প্রায় সকল স্ত্রীলোককেই এক ছাঁচে গড়িয়াছেন। তাহাদের তারতম্য বড়ই অল্প। তাই তাহারা শ্রেণীগত পার্থক্যটাকে

জোর করিয়া বাড়াইয়া তুলিতে চায়।

এই খর্ব্বাকারা, সঙ্কীর্ণস্কন্ধা, বিশালনিতম্বা, ক্ষুদ্রচরণা স্ত্রীজাতিকে পুরুষেরা সুন্দর দেখে শুধু তাহাদের বুদ্ধি কামপ্রবৃত্তির [illegible] কুহেলিকাচ্ছন্ন বলিয়াই। পুরুষের কামপ্রবৃত্তিতেই নারীর সকল সৌন্দর্য্য নিহিত। সঙ্গীত বিদ্যায়ই বলুন অথবা কাব্যে [illegible]ে—রমণীর না আছে জ্ঞান, না আছে ধারণাশক্তি; যেটুকু আছে তাহাও পুরুষকে মুগ্ধ করিবার জন্য। কারণ পুরুষ যেমন সোজা-সুজি কোনও বস্তুকে লাভ করিতে চেষ্টা করে, নারী সেরূপ করে না। সে চায় পুরুষের সাহায্যে অভীষ্ট সম্পাদন করিতে। কাজেই পুরুষকে বশীভূত করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য—অপর সকল বস্তুকেই সে পুরুষকে মজাইবার উপকরণ বলিয়া গণ্য করে। এই জন্যই সঙ্গীতাদি সুকুমার কলার চর্চ্চায় তাহার আকর্ষণ না থাকিলেও সে সেইরূপ দেখায়—না দেখাইলে যে পুরুষ ভুলিবে না! যদি [illegible] কথায় কাহারও সন্দেহ থাকে তাহা হইলে তিনি একবার রঙ্গালয়ে গিয়া মহিলাদিগের [illegible] রাখিলেই নিঃসন্দেহ হইবেন। একবার [illegible] যে, যখন শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির উৎকৃষ্টতম অংশ অভিনীত হয় তখন কিরূপ শিশুর মত নিরুৎসুক-ভাবে তাঁহারা গল্প করিতে থাকেন। [illegible]কেরা রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোকদিগকে প্রবেশ করিতে দিত না। আমার মনে হয়, তাহারা ভালই করিত। অন্ততঃ তাহাদিগের রঙ্গালয়ে কিছু শুনিবার সম্ভাবনা থাকিত—[illegible] অর্থহীন কলরবে উত্যক্ত হইতে হইত না। তারপর অঙ্কন-বিদ্যায় স্ত্রীলোকেরা কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে একবার বিবেচনা করুন। অঙ্কন-বিদ্যার প্রণালী পুরুষের যতটা উপযোগী নারীর পক্ষেও ঠিক ততটাই, আর এ বিষয়ে তাহারা পরিশ্রমও যথেষ্ট করে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কি তাহারা একখানিও এমন চিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছে যাহার স্থায়িত্ব আছে? ইহার কারণ চিত্রবিদ্যার যাহা দরকার সেই চিত্তের বহির্মুখত্ব তাহাদের একেবারেই নাই। তাহারা নিজের মনের মধ্যেই বাস করিয়া থাকে। Huaite বলিয়াছেন যে কোনও উচ্চতর কার্য্যেই স্ত্রীলোকের যোগ্যতা নাই। তাহারা সকল বিষয়েই সঙ্কীর্ণচিত্ত। এই জন্যই সমাজের অসঙ্গত ব্যবস্থায় তাহারা পুরুষের উপাধি ও উচ্চ-পদের অংশীদার হইয়া পুরুষকে জঘন্য কার্য্যে ব্রতী করায়। এই জন্যই তাহাদিগের প্রভাব ও আধিপত্য আধুনিক সমাজের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছে। প্রকৃতি যখন মানব-জাতিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন তখন ঠিক মধ্য-স্থল দিয়া ভাগ করেন নাই। পুরুষ ও নারীর যে শুধু গুণগত পার্থক্য আছে তাহা নহে, পরিমাণগত পার্থক্যও আছে। এ কথা প্রাচ্যদেশবাসীরা বেশ বুঝিয়াছিল, এই জন্য তাহাদিগের সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান বিলুপ্ত হয় নাই। আমাদের স্ত্রীচিত্তানুবর্ত্তিতা ও কুরুচিসঙ্গত নারী-পূজা জর্ম্মন-খৃষ্টীয় নির্ব্বুদ্ধিতার চরম ফল। ইহার ফলে নারী আরও বেশী উদ্ধত ও অসার হইয়া উঠিয়াছে। বারাণসীর বানর দল যেমন মনে করে যে তাহারা পবিত্র ও অবধ্য, সুতরাং তাহারা যাহা খুসী করিতে পারে, আমাদের নারী পূজার ফলে স্ত্রীলোকের অবস্থা ও অনেকটা সেইরূপ হইয়াছে।

প্রতীচ্য জগতে 'মহিলা' নামক জীবটী স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। কারণ স্ত্রীলোকের এমন কিছু গুণ নাই যাহাতে সে পুরুষের সম্মান ও ভক্তির পাত্রী হইতে পারে, পুরুষের অপেক্ষা মস্তক উন্নত রাখিতে পারে, এমন কি অধিকার হিসাবে পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে। নারী যে স্থানের উপযুক্ত নয় আমরা তাহাকে সেইস্থানে বসাইয়াছি। এই স্থানভ্রংশের কুফলও যথেষ্ট দেখা যায়। অতএব আমাদের উচিত নারী বিষয়ে এই নির্ব্বুদ্ধিতার অবসান করিয়া দেওয়া এবং স্ত্রীলোককে তাহার স্বাভাবিক পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। আমাদের বোকামী দেখিয়া সমগ্র এসিয়া হাস্য-সম্বরণ করিতে পারে না। ইউরোপীয় 'মহিলা' নামক জীবের অস্তিত্ব না থাকাই উচিত, থাকা উচিত গৃহলক্ষ্মীর এবং সেই সকল বালিকার যাহারা কালে গৃহলক্ষ্মী হইবার আশা রাখে এবং সেইভাবেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। ইউরোপে মহিলা আছে বলিয়াই নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা বড়ই অসুখে জীবন কাটায় এবং নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। প্রাচ্যজগতে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের অবস্থা এত শোচনীয় নহে।

ইউরোপীয় বিবাহের আইনগুলি স্ত্রীলোককে পুরুষের

সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করে। কিন্তু এটা একটা বিষম ভুল। ইউরোপে একসঙ্গে একাধিক বিবাহের প্রথা নাই। সুতরাং ইউরোপে বিবাহের অর্থ, অধিকারগুলিকে অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া দেওয়া এবং কর্ত্তব্যগুলিকে দ্বিগুণ করা। আইন যখন স্ত্রীলোককে পুরুষের তুল্যাধিকার দিয়াছিল, তখন যদি স্ত্রীলোককে পুরুষের ধীশক্তিও দিত তাহা হইলে ভাল হইত! *কতকগুলি স্ত্রীলোককে যে অনুপাতে অধিক সম্মান ও অধিকার দেওয়া হইবে অধিকাংশ স্ত্রীলোককে সেই অনুপাতে তাহাদের স্বভাবিক অধিকার হইতে রক্ষিত করা হইবে। কারণ, আমাদিগের এক বিবাহ-প্রথা নারীকে যে উচ্চ অস্বাভাবিক পদে স্থাপিত করিয়াছে তাহাতে কোনও বিজ্ঞ এবং সতর্ক পুরুষই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চান না—কারণ বিবাহের অর্থ, মহান্ স্বার্থত্যাগ করা এবং বিসদৃশ সর্ত্তে আবদ্ধ হওয়া। তাহাতে এই ফল হয় যে মাত্র কয়েকটী ভাগ্যবতীর বিবাহ হয় এবং অধিকাংশ স্ত্রীলোকই হয় অনূঢ়া অবস্থায় জীবন কাটায়, আর না হয়, অতি জঘন্য জীবনযাপন করিয়া পুরুষের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে এবং প্রকৃতপক্ষে পুরুষের কামাগ্নিতে আপনাদিগকে আহুতিস্বরূপ নিক্ষেপ করে। তাহার ফলে যে সকল ভাগ্যবতী বিবাহিত বা বিবাহের আশা রাখে, তাহারা পুরুষের প্রলোভন হইতে বাঁচিয়া যায়। একমাত্র লণ্ডন মহানগরীতেই হতভাগিনী নারীর সংখ্যা ৮০,০০০। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল হতভাগিনী নারী ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত মহিলার অস্তিত্বেরই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ। প্রাচ্যদেশে একই পুরুষ অনেক বিবাহ করিতে পারে। তাহাতে সকল স্ত্রীলোকেরই একরূপ তত্ত্বাবধান করিবার লোক থাকে। সুতরাং ইউরোপে বহু-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইলে বাস্তবিকই খুব উপকার হয়। যদি আমরা বহুবিবাহপ্রথা স্বীকার করি তাহা হইলে স্ত্রীজাতিকে তাহার স্বাভাবিক পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং 'মহিলা' নামক জীবের অস্তিত্ব থাকে না। থাকে কেবল 'নারী', থাকে না হতভাগিনী রমণী যাহার দ্বারা ইউরোপ এখন পরিপূর্ণ।

হিন্দুস্থানে কোনও স্ত্রীলোকই স্বতন্ত্র নহে, মনুর বিধান অনুসারে তাহারা পিতা, পতি, পুত্র বা ভ্রাতার অধীন থাকে। সতী মৃত পতির চিতায় আপনাকে দগ্ধ করে এ দৃশ্য শোচনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু "আপনার সন্তানের জন্য সংস্থান করিতেছি" এই মনে করিয়া স্বামী জীবনব্যাপী কঠোর পরিশ্রমে যে সম্পত্তির উপার্জ্জন করেন, বিধবা সেই সম্পত্তি তাহার উপপতির সহিত নষ্ট করিতেছে—এ দৃশ্য আরও শোচনীয়। প্রাচীন এবং আধুনিক, প্রায় সকল জাতির মধ্যেই স্ত্রীগত উত্তরাধিকারী নাই। কেবল ইউরোপেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া পুরুষ যে সম্পত্তি-অর্জ্জন করে, সে সম্পত্তি শুধু অপব্যয়ের জন্য স্ত্রীলোকের হস্তগত হয় এটা মহা অবিচার। সম্পত্তি অর্জ্জন করে পুরুষ, নারী নয়, সুতরাং সম্পত্তির পূর্ণাধিকার তাহাদের পাওয়া কোনও রূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে—বড় জোর সেই সম্পত্তির উপস্বত্বভোগ করিবার অধিকার দেওয়া যাইতে পারে। স্ত্রীলোকেরই অভিভাবক থাকা দরকার, সুতরাং তাহাদিগকে সন্তানের অভিভাবক হইতে দেওয়া উচিত নহে। অ্যারিষ্টটল দেখাইয়াছেন যে, স্পার্টানদিগের অবনতির প্রধান কারণ এই যে, তাহারা নারীকে অত্যধিক মাত্রায় অধিকার দিয়াছিল। ফরাসী দেশেও ত্রয়োদশ লুইয়ের সময় হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত নারীর প্রভাব রাষ্ট্রবিপ্লবের মূল কারণ নহে কি?

যখন আমরা দেখি যে, স্ত্রীলোক কোনও রক্ষক ভিন্ন থাকে না, যখন দেখি যে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতারূপ অস্বাভাবিক পদে স্থাপিত করিলেও সে আপনাকে কোনও না কোনও পুরুষের সম্পর্কে জড়াইয়া ফেলে, তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া থাকিতে পারি না যে, স্ত্রীজাতি পুরুষের আদেশপালন করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, নারী যুবতী হইলে সে পুরুষ তাহার প্রণয়াস্পদ, আর বৃদ্ধা হইলে সে পুরুষ তাহার ধর্ম্মোপদেষ্টা।"

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

[শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র]

বাঙ্গালীর উদ্ভাবিনী শক্তি।

পৃথিবীর অনেক ায় টাইপরাইটার যন্ত্র নির্ম্মিত প্রচলিত হইয়াছে এমন কি হিন্দী ভাষায় টাইপরাইটার ও দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে। ভারতবর্ষের যাবতীয় ভাষায় মধ্যে বঙ্গভাষা সর্ব্বপ্রকারে প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করিলেও বাঙ্গালায় একটা "টাইপরাইটার যন্ত্র" নাই বলিয়া বরাবর মনে একটা ক্ষোভ ছিল এবং আমাদের এই ক্ষমহীনতার জন্য মনে একটা আত্মগ্লানি ছিল। আজ আনন্দের সংবাদ, যে আমাদের সেই অভাব দুরীভূত হইতে চলিয়াছে। গত চৈত্র মাসের 'সৌরভ' পত্রে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চাকলাদার মহাশয় যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। উহা পাঠে জানিতে পারিলাম যে বাঙ্গালীর দ্বারা বাঙ্গলার টাইপরাইটার যন্ত্রের পরিকল্পনা ও উদ্ভাবন হইয়াছে ইহা সমস্ত ময়মনসিংহ জেলাবাসী কেন, সমগ্র বঙ্গবাসীর শ্লাঘার বিষয়। ইহাটী সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ করিতে হইলে, অর্থের প্রয়োজন। আমরা আশা করি বাঙ্গালার লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ বাঙ্গালায় টাইপরাইটার কলের নির্ম্মাতাকে যথোপযুক্ত অর্থ-সাহায্যে উৎসাহপ্রদান করিয়া দেশের কল্যাণ ও মুখোজ্জ্বল করিবেন।

বাঙ্গালা টাইপরাইটার যন্ত্র।

বাঙ্গালা ভাষায় টাইপরাইটার হইতে পারে কিনা, তাহা লইয়া বিগত কয়েক বৎসর হইতে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। গ্রীক টাইপরাইটার কোম্পানী একটী বাঙ্গালা লিখন-যন্ত্র এদেশে বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত করিয়াছিল। ঐ যন্ত্রে বাঙ্গালা কতকগুলি অক্ষর দেওয়া হইল মাত্র, বাঙ্গালা ভাষায় জটিল যুক্তাক্ষরগুলি তাহাতে লিখিবার উপায় ছিল না, হসন্ত দ্বারা যুক্তাক্ষর লিখিতে হইত। বলা বাহুল্য, তদ্রূপ প্রণালী প্রচলিত সংযোগ-বিধির বিরুদ্ধ হওয়ায়, তাহা সাহিত্য-ক্ষেত্রে ব্যবহারের নিতান্ত অনুপযোগী সাব্যস্ত হইয়াছে। ফলে ঐ যন্ত্র অধিক বিক্রয় হয় নাই।

ময়মনসিংহবাসীর পক্ষে বড় আনন্দের সংবাদ, শুধু আনন্দের কেন গৌরব করিবার বিষয় যে, এরূপ গুরুতর সমস্যা একজন ময়মনসিংহবাসী দ্বারা সমাধান হইয়াছে। কিশোরগঞ্জের অধীন ধনকুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন মজুমদার বাঙ্গালা ভাষার যুক্তাক্ষর লিখন-প্রণালী সমাধান করিয়া একটি বাঙ্গালা টাইপরাইটার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালার জটিল যুক্তাক্ষরগুলি অতি সুন্দররূপে লিখা হয়। অনেকে মনে করিতে পারেন যে এ যন্ত্র বোধ হয় বৃহদাকার এক বিরাট জিনিষ হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। প্রচলিত ইংরাজী টাইপরাইটার যন্ত্রটী যেরূপ, ইহার আয়তনও তদ্রূপ; তবে কলকব্জায় কতক পার্থক্য আছে। সত্যবাবুর যন্ত্রসাহায্যে লিখিত কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের একটী সঙ্গীতের প্রতিলিপি নিম্নে মুদ্রিত হইল। তদ্দৃষ্টেই যুক্তাক্ষর লিখন ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

তুমি সুন্দর হৃদিরঞ্জন, তুমি নন্দন-ফুলহার।
তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার।
নীল অম্বর-চুম্বন-নত, চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে শতবার।
ঝলকিছে শত ইন্দুকিরণ, পুলকিছে ফুলগন্ধ,
চরণভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ।
ছিঁড়ি মর্ম্মের শত বন্ধন, তোমাপানে ধায় যত ক্রন্দন,
লহ হৃদয়ের ফুল চন্দন, বন্দন-উপহার।

সত্যবাবুর যন্ত্র সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ বলিয়া তিনি বলেন না। ইহার আরও উৎকর্ষ হইতে পারে এবং তাহা করিতে হইবে। কিন্তু অর্থাভাব সে উৎকর্ষ-সাধনের পক্ষে পরিপন্থী হইয়াছে। সত্যবাবু বিগত ৭ বৎসর কাল নানারূপ পারিবারিক বিপদে জড়িত থাকিয়াও এ সাধনায় একনিষ্ঠ-ভাবে ব্রতী ছিলেন এবং ভগবানের কৃপায় তাঁহার নবাবিষ্কৃত প্রণালী-অনুযায়ী এই যন্ত্রটী প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে যুক্তাক্ষর সহ লিখন চলে। এখন উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলেই এ আবিষ্কার সর্ব্বাঙ্গ-

সুন্দর হইবে। বিগত ৭ বৎসর কাল তিনি নিজশক্তি অনুসারে অর্থব্যয় করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে কতক পরিমাণে ঋণও করিতে হইয়াছে; নিজ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের কথা তো বলাই বাহুল্য। একজন সাধারণ অবস্থার চাকুরীজীবের পক্ষে কল-কব্জা সম্বন্ধীয় শিক্ষা ব্যতীত, শুধু মস্তিষ্ক-চালনা দ্বারা একার্য্য সাধন করা অল্প কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। ইহাতে আবিষ্কারকের উদ্ভাবনী শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সে শক্তির বিকাশ ও পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে উপযুক্ত ক্ষেত্র ও অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এতদুভয়েরই অভাব।

একবার আমেরিকার এক সংবাদপত্রে "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবিষ্কার" (minor inventions) শীর্ষক এক প্রবন্ধে দেখিয়াছিলাম, তথাকার জনৈক দরিদ্র যুবক "নেকটাইর" কি একটা উন্নতি সাধন করিয়া বিভিন্ন সমিতি ও ব্যক্তি হইতে ১০,০০০ডলার কেবল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জাপান প্রভৃতি দেশে সাধারণ বিষয়ের আবিষ্কার করিতে পারিলে রাজশক্তি সর্ব্বপ্রকারে আবিষ্কারের সাহায্য করিয়া থাকেন। সত্যবাবুর এ আবিষ্কারকে minor invention বলা যায় না। বাঙ্গালীর জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য এ আবিষ্কারে কতদূর উপকৃত হইবে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু কয় জন লোক বা কয়টা সমিতি এ আবিষ্কারকে অর্থসাহায্য দ্বারা উৎসাহিত করিবেন, তাহা দেখিবার বিষয়।

আমরা বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি এ বিষয়ে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি। ভরসা করি, বঙ্গীয় মন্ত্রিসভার দেশীয় সদস্য, কবি ও সাহিত্যিক, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ-বাহাদুর এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া গবর্ণমেন্ট হইতে সত্যবাবুকে উপযুক্ত বৃত্তিপ্রদানক্রমে যাহাতে তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহার যত্ন ও চেষ্টার ক্রটী করিবেন না। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের সাহিত্য সমিতি সমূহের এবং সাহিত্যরথীদিগের দৃষ্টিও আমরা এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

পারাবতের দৌত্য।

আমাদের দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় পারাবত যে দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইত একথা কাহারও অজ্ঞাত নহে। দৌত্য-কার্য্যে পারাবত চিরপ্রসিদ্ধ। বিগত মহাসমরে বিজ্ঞান-বলে বলীয়ান তার ও বে-তারবার্ত্তায় দক্ষ যুধ্যমান জাতিগুলিও পারাবতকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া মামুলী প্রথার মানরক্ষা করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি এক খানি ইংরাজী দৈনিকে একটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম—

"পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লোকে "পায়রা উড়ানো"কে 'নীচ ক্রীড়া' মনে করিত। অধুনা ইহা অপ্রশংসনীয় নহে। সম্রাট হইতে সমাজের সকল শ্রেণীর লোক এখন অবাধে এই ক্রীড়ায় যোগদান করিয়া থাকেন।

আমাদের সম্রাটের সৈন্য ও নৌ-বিভাগে পারাবত পালিত হয়; এই পারাবতগুলিকে যুদ্ধক্ষেত্রে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বিশেষ সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে।

ঘোড়দৌড়ের মত বিলাতে 'পায়রা দৌড়ের' ক্রীড়ার প্রচলন আছে। এই শ্রেণীর 'দৌড়ে'র পারাবত প্রায় দুই সহস্র আছে। ইহাদের পালক সাধারণতঃ শ্রমজীবী। বিগত যুদ্ধে তাহারা তাহাদের সখের পারাবতগুলিকে দেশ-মাতৃকার মহান রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল!

এই শ্রেণীর পারাবতের দৌত্যকার্য্যে কয়মাস ধরিয়া উত্তর সমুদ্রে দিকপ্রদর্শনী জাহাজ ও উপকূলে স্থিত 'মাইন' সরাইবার জাহাজের মধ্যে বার্ত্তা-বিনিময়ের একমাত্র অবলম্বন ছিল।

'সুইপার্স হোপ' (Sweeper'e Hope) নামক একটী পায়রা জেপেলিনের আক্রমণ-সংবাদ লইয়া ১৬০ মাইল উড়িয়া গিয়াছিল! ফলে "সি প্লেন" প্রেরণ করিয়া আক্রমণকারীকে বিদূরিত করা হয়। 'মাইন সুইপারে'র নাবিকদের নিরাপদে অবস্থিতির সংবাদ একটী পারাবতই আনয়ন করিয়াছিল!

অধুনা বহু সহস্র ব্যক্তি দৌড়ের পারাবতের অধিস্বামী। যুদ্ধের পূর্ব্বে এইরূপ পারাবত-প্রতিপালকের সংখ্যা চার লক্ষ ছিল। বিগত যুদ্ধে তাহাদের বিশেষ কার্য্যকুশলতার

পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া লোকে এখন অত্যন্ত উৎসাহের সহিত 'পায়রা দৌড়ে'র ক্রীড়ায় লাগিয়াছে।

অতঃপর সুশিক্ষিত পারাবতের অধিস্বামীরা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। 'ন্যাশন্যাল ফ্লাইং ক্লব' বা 'জাতীয় উড্ডয়ন সমিতি' বিলাতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পারাবতের ক্লব। সেখানে বিগত ৩০শে অগষ্ট দৌড়-প্রতিযোগিতা হইবার কথা। ২৫ হাজারের উর্দ্ধ সংখ্যা পারাবতের নামক রেজেষ্ট্রী হইয়াছে। পুরস্কার মোটের উপর ৯০০ পৌণ্ড। সমস্ত উড্ডয়ন সমিতির হিসাব একত্র করিলে বলা যায় যে, বর্ত্তমান দৌড়-প্রতিযোগিতায় প্রতিসপ্তাহে ১০ হইতে ২০ সহস্র পারাবত উড়িতেছে এবং তিন লক্ষ পারাবত এই দীর্ঘ দৌড়ে যোগদান করিবার কথা। আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট এই ক্রীড়ার বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট 'জাতীয় উড্ডয়ন সমিতি'র প্রেসিডেণ্ট। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে বুঝা যায় যে,তাঁহারা এই ক্রীড়ায় পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহদান করিয়া দেশের কত উপকারসাধন করিয়াছেন।

সম্প্রতি Naval Pigeon Service ২৪৪ জন পারাবত-প্রতিপালককে তাহাদের পারাবতগুলি বিগত মহা-সমরে যে কার্য্যকুশলতা দেখাইয়াছে তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সনন্দ প্রদান করিয়াছিল। ৬৩৯ জন পারাবত-প্রতিপালক তাহাদের পারাবতগুলিকে যুদ্ধকার্য্য শিক্ষা দান করিতেছেন। ৬৮৩৩টী পায়রা এইরূপ নিযুক্ত আছে এবং নৌ-বিভাগের জন্য ৩১৪৭টী পারাবত প্রদত্ত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর ও বঙ্গভাষা।

'এডুকেশন গেজেটে' 'বিদ্যাসাগর ও বঙ্গভাষা' শীর্ষক একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত আছে। উহাতে কতকগুলি জ্ঞাতব্য কথা আছে। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

"বিদ্যাসাগর" এই পবিত্র শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গবাসীর হৃদয়ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-রসের সঞ্চার হয়। বিদ্যাসাগর উপাধিবিশিষ্ট বহু পণ্ডিত পূর্ব্বেও ছিলেন এবং বর্ত্তমানেও আছেন; কিন্তু কোন নাম নির্দ্দেশ না করিয়া শুধু 'বিদ্যাসাগর' এই শব্দ দ্বারা একমাত্র সেই পরম কারুণিক বঙ্গভাষা-সংস্কারক স্বর্গগত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই উপলক্ষিত হইয়া থাকেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পদ্যগ্রন্থ একরূপ থাকিলেও গদ্যসাহিত্য ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ৩০০ বৎসর পূর্ব্বের একখানি গদ্য পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহার ভাষার নমুনা দিলাম—"তাঁহার রূপ কি। স্বরূপ প্রকৃতিতে জড়িতা, বাহ্যজ্ঞান রহিত, তেঁহ নিত্য চৈতন্য তাঁহাকে জানিব কেমনে"। ইহা অবশ্য পুষ্টাঙ্গ ভাষার পরিচায়ক নহে। ক্রিয়া, অব্যয়, বিশেষণ প্রভৃতির যথাবিন্যাসে ও যথা-প্রয়োগে ভাষার পুষ্টি, অপুষ্টির বিচার হয়। ইহাতে তাহার সম্যক অসদ্ভাব। নরোত্তম দাস নামক এক-ব্যক্তি ইহার লেখক। বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপনাকালে বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধনকল্পে এবং কলেজের ছাত্রদিগের পাঠার্থ "বাসুদেবচরিত" নামক একখানি বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইহা তাঁহার রচিত সর্ব্বপ্রথম পুস্তক। "বাসুদেবচরিতের" পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার কোনখানিই ভাষার পরিপাটীত্বে "বাসুদেবচরিতের" সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। "বাসুদেবচরিত" হইতে কিঞ্চিৎ . শ করিতেছি—"কংস দেবর্ষি নারদের বাক্য শুনিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সপুত্র বাসুদেব দেবকীকে আনাইয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে পুত্রের প্রাণনাশ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কারাগারে নিগড়-বন্ধনে রাখিলেন।" অন্যত্র—"অনন্তর অষ্টম মাস পূর্ণ হইলে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে ভগবান্ ত্রিলোকনাথ দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তৎকালে দিকসকল প্রসন্ন হইল, গগনমণ্ডলে নির্ম্মল নক্ষত্রমণ্ডল উদিত হইল, গ্রামে নগরে নানা মঙ্গল বাদ্য হইতে লাগিল, নদীতে নির্ম্মল জল ও সরোবরে কমল প্রফুল্ল হইল।"—কি সুন্দর রচনা! সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ পণ্ডিত হইলেই বাঙ্গালা ভাল লিখিতে পারিবেন একথা স্বীকার করিতে পারি না। রাজা রাম-মোহন, রাজা রাজেন্দ্রলাল, ও পাদরী কৃষ্ণধন বন্দ্য

ইঁহারাও ত সংস্কৃত ভাষায় অল্পবিস্তর অভিজ্ঞ ছিলেন। ইঁহারাও বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের পুষ্টিসাধনমানসে সামান্য প্রয়াস পান নাই; তাঁহারাও কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় পুস্তক-প্রণয়নে সমর্থ হয়েন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই যে ভাষার প্রকৃত সংস্কারক তদ্বিষয়ে প্রমাণ করিবার জন্য তৎপূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের ভাষার সহিত তাঁহার ভাষার তুলনা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের ভাষার একটু নমুনা প্রকাশ করিলাম। রামমোহন রায়ের পথ্য প্রদান হইতে:—"বাস্তবিক ধর্ম্মসংস্কারক অথচ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নাম গ্রহণ পূর্ব্বক যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সমুদয়ে দুই শত পৃষ্ঠ সংখ্যক হইবে তাহাতে দশপৃষ্ঠপরিমিত ভূমিকা গ্রন্থারম্ভে লিখেন।" (২) কৃষ্ণ বন্দ্যের বিদ্যাকল্পদ্রুম হইতে:—"এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাস পুস্তকে অনেক অনেক নরপতি ও বীরদিগের দেবপুত্ররূপে বর্ণনা আছে, ইহাতে বোধ হয় পুরাকালীন লোকদের সত্যাপেক্ষা অদ্ভুত বিবরণে অধিক আদর ছিল।" (৩) রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' হইতে:—"পরন্তু এতদ্দেশীয় মহাশয় জনসকল যদি একত্র হওত ঈষদনুগ্রহাবলোকনে স্বদেশীয় মঙ্গল-বৃদ্ধির উৎসাহ জন্মাইবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নানা উপায়ে তদভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে।" ইঁহাদের গ্রন্থ হইতে অনেক সারকথার শিক্ষা লাভ হয় সন্দেহ নাই; ভাষাও অনেকটা ব্যাকরণ-দোষশূন্য; কিন্তু ভাষার প্রাঞ্জলতা ও বিশদতার অভাব জন্য ইঁহাদের রচনা যে অনেকটা দুর্ব্বোধ হইয়া রহিয়াছে তদ্বিষয়ে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না। বাগ্‌বিন্যাসের দীর্ঘতা ও ছত্র-সন্নিবেশের বিশৃঙ্খলতা হেতু এই সকল রচনা মনোহারিণী হইতে পারে নাই। অনেকটা ইংরাজী প্রণালীর অনুবর্ত্তী হওয়ায় ইঁহাদের লিপিপদ্ধতি অনেকটা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। কেরী, মার্শম্যান, প্রভৃতি মিশনরীগণও বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক লিখিয়াছেন। এখানে মিশনরী ভাষারও একটু উল্লেখ করিতেছি:—"এক বড় বিলেতে অনেক বেঙ্গের বসতি ছিল; তাহার ধারে কতকগুলি বালক হঠাৎ খাপরা খেলা খেলিতে লাগিল।" যে অংশ উদ্ধৃত হইল তাহাতে বুঝা যায় ভাষা সরল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ইংরাজী ভাবভঙ্গী। বিজাতীয় লেখকের নিকট ইহার অধিক আশা করা যায় না। এখানে কয়েকখানি পুস্তকের মাত্র উল্লেখ করিলাম। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার প্রকৃষ্টতা ও বঙ্গভাষার চরম পুষ্টিকারিতা কতক উপলব্ধি হইবে। 'বাসুদেবচরিত' রচিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জানিতে যাঁহাদের কৌতূহল আছে তাঁহারা পাদরী ইয়াটস সাহেবের "বঙ্গভাষার 'উপক্রমণিকা" (ইনট্রোডাক্‌সান্ টু বেঙ্গলী ল্যাঙ্গোয়েজ) নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ পর্য্যন্ত যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশেরই ভাষার নমুনা সাহেব উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—"প্রকৃত বাঙ্গালা অতি সম্ভ্রান্ত ভাষা। এমন কোন ভাব নাই যাহা ন্যায়তঃ তেজের সহিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারা যায় না। তবে বাঙ্গালা পাঠ্য বিরল।" আজ যদি তিনি জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তাহার মনের ক্লেশ অনেকটা দূর হইত। বিদ্যাসাগরের ভাষা বুঝাইতে হইলে প্রাচীনতম সাহিত্যের একটু আলোচনা করা কর্ত্তব্য। কতকটা কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কয়েকখানি পুস্তকের উল্লেখ করিতেছি! (১) "তোতা ইতিহাস" ইহার লিপিপ্রণালী বিশুদ্ধ নয়, ভাষাও গ্রাম্যদোষ বর্জ্জিত নয়, স্থানে স্থানে বিজাতীয় ভাবব্যক্তিরও অভাব নাই। সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে অযথা গ্রাম্যশব্দ-প্রয়োগে অনেক স্থানই "গুরুচণ্ডাল" দোষযুক্ত। একটু নমুনা দেখুন:—পূর্ব্বকালে বলবানদের মধ্যে আমদ সুলতান নামে একজন ছিলেন; তাহার প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তর সৈন্যসামন্ত ছিল।" (২) কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের "পুরুষ পরীক্ষা।" ইহার নমুনা একটু দেখুন:—"বঞ্চক কহিতেছে ভো রাজকুমার! আমি স্বাভাবিক লুব্ধ বণিক; তোমার ধন লইয়া, বাণিজ্যার্থ বৃহন্নৌকারোহণে সাগর-পারে গিয়াছিলাম"।

ভাষার যে সকল নমুনা দেওয়া হইল তাহাতে ১৮০০—১৮৪০ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গদ্যের যে কয়েকটি ক্রম হইয়াছে তাহার কতক আভাষ পাওয়া যায়। প্রথম পাদরীদের ক্রম; দ্বিতীয় এদেশীয় লেখকদিগের তোতা ইতিহাস

প্রভৃতি; তৃতীয় পুরুষ পরীক্ষা প্রভৃতি। "বাসুদেব চরিতে'র ভাষা এ গুলির অপেক্ষা কতই সুন্দর! ইহার প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন। এমন বিশুদ্ধ ও সুখবোধ্য বাঙ্গালা পূর্ব্বে কোন গ্রন্থেই ছিল না। উত্তরকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়-রচিত অনেক গ্রন্থেই সংস্কৃতপ্রণালীমতে দীর্ঘ-সমাসযুক্ত শব্দ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেই সকল বাক্য এমনই যথাযথ ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে তাহা কোনরূপেই শ্রুতিকটু হয় নাই, বরং তাহা মধুর মৃদঙ্গ নিনাদবৎ পাঠক ও শ্রোতার কর্ণমূলে এবং হৃদয়ের অন্তঃস্তলে অপূর্ব্ব সুখ সঞ্চার করিয়া থাকে। লিপি-পদ্ধতি একরূপ হইলেও বিষয়ের লঘুতা ও গুরুতা অনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকাবলীতে ভাষা প্রয়োগের সারল্য ও গাম্ভীর্য্যের তারতম্য বহু প্রকারে দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায় ব্যর্থ বাক্যপ্রয়োগ অতীব বিরল, তিনি যেখানে যে বাক্যটি প্রয়োগ করিয়াছেন সেই স্থানে তাহা তুলিয়া তৎসমসংজ্ঞক অন্য বাক্যপ্রয়োগ দুরূহ। এ শক্তির পরিচয় প্রথম হইতেই তাঁহার বাসুদেব চরিতে। ভাষা-পুষ্টিকারিদিগের কৃতিত্ব বিদ্যাসাগরের অনুবাদেই প্রারম্ভ। বিলাতের জনসন্ মিল্টন্ স্কট্ প্রভৃতি সকলেই প্রায় প্রতিপত্তিশালী লেখক। ইঁহাদেরও প্রথম প্রথম অনুবাদেই হাত পাকাইতে হইয়াছিল। প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কিরূপে অবিকল সুন্দর অনুবাদ করিতে হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাহার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। বিদেশী ভাব ও ভাষাকে তিনি কেমন বঙ্গীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া সম্পূর্ণ নিজস্ব করিতে পারিতেন "ভ্রান্তি বিলাস" তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পুস্তকখানি সেক্সপীয়ারের "কমেডি অফ্ এরর্স" পুস্তকের অনুবাদ। ভ্রান্তি বিলাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত শেষ পুস্তক। তাঁহার সমস্ত পুস্তকই প্রায় মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় দুইখানি অতি উপাদেয় পাঠ্য লিখিত হইয়াও প্রকাশিত হয় নাই! এক "বাসুদেবচরিত", অপরখানা 'রামের রাজ্যাভিষেক।" ১৮৬৯ অব্দে ইহার ৬ ফর্ম্মা মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সময় শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "রামের রাজ্যাভিষেক" প্রকাশিত হয়। তজ্জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন বন্ধ করিয়া দেন। যে ছয় ফর্ম্মা মুদ্রিত হইয়াছিল তাহার একটু নমুনা দেখুন। "আমি দীর্ঘকাল অকণ্টকে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিলাম। লোকে যে সমস্ত সুখসম্ভোগের কামনা করে আমি তদ্বিষয়ে পূর্ণাভিলাষ হইয়াছি, এইরূপ সর্ব্বসুখসম্পন্ন হইয়াও এক বিষয়ে বিষম অসুখী ছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, সংসারশ্রম-সংক্রান্ত সকল সুখের সারভূত পুত্রমুখ সন্দর্শন সুখে বঞ্চিত থাকিব।" কি মনোমোহিনী ভাষা! কি অব্যাহতগতি ভাবব্যক্তি! কালের নিত্য পরিবর্ত্তনশীল গতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই যে বঙ্গের প্রতিভাশালী লেখক বঙ্কিমচন্দ্র ভাষাকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মূলে কিন্তু এই বিদ্যাসাগরী ভাষা। রামমোহন, অক্ষয় দত্ত প্রভৃতি মহাত্মাগণ যে ভাষায় বীজরোপণ করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর তাহাকে বৃহন্মহীরুহে পরিণত করিয়াছেন। যেখানেই যেরূপেই হউক, যে প্রকারেই বিদ্যাসাগরের ভাষার আলোচনা করুক, ভাষা সম্বন্ধে কীর্ত্তিমান গ্রন্থকারগণকে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণী থাকিতেই হইবে।

ভাবপূর্ণ সংযমিত শব্দপ্রয়োগে যিনি নিপুণ, তিনিই সুলেখক নামে প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে এ প্রতিষ্ঠা ছিল তাহা তাঁহার ভাষান্তরিত ও প্রণীত পুস্তক পাঠ করিলে সহজে উপলব্ধি হয়। এক্ষণে তৎপ্রণীত বাঙ্গালা পুস্তকগুলির নাম প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

১। বর্ণপরিচয়। ২। কথামালা ৩। বোধোদয় ৪। চরিতাবলী। ৫। আখ্যান-মঞ্জরী ৬। বাঙ্গালার ইতিহাস। ৭। জীবনচরিত। ৮। বেতাল পঞ্চবিংশতি ৯। শকুন্তলা, ১০। সীতার বনবাস ১১। ভ্রান্তিবিলাস ১২। মহাভারত। ১৩। সংস্কৃতভাষাপ্রস্তাব। ১৪। বিধবাবিবাহবিচার। ও ১৫। বহুবিবাহবিচার।'

আবাহন।

[শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়]

যতেক দৈন্য করিয়া শূন্য এস গো জননী আবার বঙ্গে,
এস মা ভবানী, এস মা শিবানী, লক্ষ্মী গণেশ লইয়া সঙ্গে।
এস তপনের কিরণ-ভাতিতে, শেফালীর মৃদু মধুর গন্ধে,
এস ভক্ত-হৃদয়ে দানিয়া শান্তি, বিহগের কলকাকলী ছন্দে।
আঁধার গগন করিয়া দীপ্ত, পুণ্য-প্রভায় 'উজলি' বঙ্গে,
এস মা শুভ্র কাশের ক্ষেত্রে—বিল্লি-বিতানে শষ্প-অঙ্গে।
জননী তোমার শ্রীপদ-পরশে হাসিয়া উঠুক সারাটি পল্লী,
প্রকৃতি আজিকে দিউক ভূষিয়া শ্যামা ধরণীর অঙ্গবল্লী।
এস আবাহন-গীতের ছন্দে আজিকার এই শরৎ-প্রাতে,
এস মা কল্যাণী করুণারূপিণী, স্কন্দ বীণাপাণি লইয়া সাথে।
তোমারি করুণাগন্ধ বহিয়া আসুক পবন সঘনে ছুটিয়া,
হউক স্বর্গ আজি এ বঙ্গ তোমার চরণ-পরশ লভিয়া।
লক্ষ বিহগ-কণ্ঠ ঘোষিছে তব আগমন মোহন ছন্দে,
আনন্দময়ী আসিছ বলিয়া হাসিছে বঙ্গ বিপুলানন্দে।
এস পুষ্পগন্ধে, ধান্যশীর্ষে, শিশুর হাস্যে, মাতার স্নেহে,
দুঃখ-দৈন্য মুছায়ে জননী এস গো আবার মোদের গেহে।
মানস-তিমির নাশিয়া জননী এস গো মোদের সাধন-কুঞ্জে,
দিব মা ঢালিয়া চরণে তোমার ভকতি-পুষ্প গুঞ্জে গুঞ্জে।
আরতি করিয়া গুঞ্জরে অলি, বঙ্গে তুমি মা আসিছ বলিয়া,
পল্লী মুখর করিয়া তুলেছে বালকবালিকা আনন্দে মাতিয়া।
সারাটি বঙ্গ লুটায়ে পড়ুক আজি মা তোমার চরণে হরষে,
ধন্য হউক বাঙ্গালী মা তোর ও রাঙ্গা চরণ-কমল-পরশে।
হতাশের তরে আন মা আশা, ক্ষুধিতেরে আজি বিতর অন্ন,
ভয়ার্ত্তে আজি দাও মা অভয়, জীবন তাদের হউক ধন্য।
বেদনাতুরে দাও মা শান্তি, দে মা মুছায়ে নয়ন-লোর,
পীযূষ স্তন্য দাও মা তৃষিতে, জানাব বেদনা চরণে তোর।
দাও মা ভক্তি, এস মা শক্তি, বিতরি বঙ্গে পরম শান্তি,
আঁধার বঙ্গ উজল করিয়া এস মা ছড়ায়ে বিমল কান্তি।
পুণ্য-প্রভাতে পূত পরশে পুলকিত আজ মোদের প্রাণ,
এস মা দুর্গা দুর্গতিহরা বিশ্বে অভয় করিতে দান।

গিরিবালার কৃতিত্ব।

[মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন]

ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায় অভুক্ত অবস্থায় সমস্ত দিন ঘুরিয়া রাত্রি আটটার সময়ে বাড়ীতে ফিরিয়া গৃহিণী ভবানীকে বিষণ্ণমুখে বলিলেন,—"না, কিছুই হইল না, কেহই ধার দিতে রাজি হইল না, সকলেই বলে এ দুর্ব্বৎসর টাকা পাইব কোথায়? সংসার চালানই কঠিন হইয়াছে।"

ভবানী,—মায়ের ইচ্ছা, তাঁর ইচ্ছা না হলে তাঁকে কি জোর করে আনা যায়? সমস্ত দিন কিছুই খাও নাই। শীগ্‌গির করে হাতে মুখে জল দিয়ে সন্ধ্যাটা সেরে নাও। উনুনে জল তুলে রেখেছিলাম; তোমার সাড়া পেয়ে চাউল ফেলে দিয়েছি।

ভবানীচরণ,—না, আর আমি খাব না। আমার প্রপিতামহ মহারাজা নবকৃষ্ণের দক্ষিণহস্ত ছিলেন। এই মণ্ডপে সেই অবধি পূজা; কখনও বন্ধ হয় নাই। আমার যখন পাঁচ বৎসর বয়স, সেই সময়ে আমার পিতৃবিয়োগ হয়। পুত্রশোকার্ত্তা আমার বৃদ্ধা পিতামহী অপোগণ্ড আমাকে লইয়া ও আমার বিধবা মাকে লইয়া অকূল সাগরে ভাসিলেন। যা কিছু ছিল, পিতাকে মানুষ করিতে পিতামহীর তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। যখন তিনি মানুষ হইয়া উপার্জ্জন করিবেন, সেই সময়েই ভগবানের আর সহ্য হইল না; তখনই তিনি তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন। পিতার শিক্ষাদান ও প্রতিপালনেই পিতামহীর সমস্ত গহনাপত্রগুলি গিয়াছিল; এক্ষণে প্রপিতামহের আমলের ভারি ভারি কতকগুলি তৈজসপত্র আছে; খাট, চৌকি, বাক্স ডেক্‌স আছে; তাহাই তিনি বিক্রয় করিতে সুরু করিয়া দিলেন। তদ্দ্বারা অতি সন্তর্পণে আমাদিগের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এদিকে দুর্গাপূজার সময় নিকটবর্ত্তী হইল। পিতামহী এক একবার মণ্ডপের দিকে তাকান আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। পূজার সময়ে পিতামহের জন্য এক জোড়া ও মায়ের জন্য এক জোড়া কাপড় ও আমার ধুতি, চাদর, জামা, জুতা শোভাবাজারের রাজবাড়ী হইতে দিয়া থাকে। পিতামহী আমার ধুতি, চাদর, জামা, জুতা লইলেন; নিজের ও পুত্রবধূর না লইয়া তাহার

মূল্য লইলেন। সেই টাকা ও বাসন বিক্রীর কিছু টাকা দিয়া কোন ক্রমে পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। প্রপিতামহের মহাসমারোহের পূজার সময়ে কলিকাতার সমস্ত বড় লোককে নিমন্ত্রণ করা হইত; আমাদের বাড়ীর সন্মুখের মাঠটা বড় বড় গাড়ীতে ভরিয়া যাইত, তা ত হ'বার সম্ভাবনাই নাই। পাড়ার সকলকেও তিনি নিমন্ত্রণ করিতে পারিলেন না। কোন রকমে শঙ্খ, ঘণ্টা বাজাইয়া চক্ষুঃজলে সিক্ত হইয়া মায়ের পূজাটী সারিলেন; বন্ধ করিলেন না। ছেঁড়া কাপড় পড়িয়া সম্বৎসর কাটাইলেন। এই ভাবের পূজা, তাই আমার ভাগ্যে বন্ধ হইয়া যাইতেছে, কোন্ মুখে আমি ভাত দিব? পূজার কয়েক দিন উপবাস করিয়াই কাটাইব।"

ভবানী।—তা কি করিবে? সময়ে সব করিতে হয়, সেদিন আর নাই।

তুমি না খাইয়া থাকিলে মায়ের আসন টলিবে না। জান ত, পাষাণের মেয়ে পাষাণী। হেম পত্রে কি লিখিয়াছে?

ভবানীচরণ।—হেম আর কি লিখিবে? আজ ছয় মাস সাসপেণ্ড অবস্থায় আছে। বড় সাহেব তার কাগজপত্র দেখিবার জন্য একজন অডিটার নিযুক্ত করে'ছেন। দুইশত টাকা মাহিনার চাকুরী আমার কপালে বুঝি গেল। সিমলার খরচ কি করিয়া যে চালিতেছে বলিতে পারি না। সে দুঃখ করিয়া খুব একখানা বড় পত্র লিখিয়াছে।

ভবানী।—যাহা হয় হইবে। তুমি আগে দু'টী ভাত মুখে দেও।

ভবানীচরণ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেন; অন্ততঃ আমি একবার পাতে না বসিলে গৃহিণী একটু জলবিন্দু পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে না। আমার এই দুঃখের ভাব ব্যক্ত করিয়া আর ও বেচারীকে কেন কষ্ট দিই? তিনি তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় পরিবর্ত্তন করিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিয়া যাইলেন। পরে অন্যমনস্কভাবে দুই চা'র গ্রাস মুখে দিয়া আচমনান্তে একেবারে গিয়া শয্যায় আশ্রয় লইলেন। অবশ্য চোখে ঘুম আসিল না। এপাশ ওপাশ করিয়া রাত্রি কাটাইলেন; ব্রাহ্মণীরও কষ্টের সীমা ছিল না; তাহারও চোখে ঘুম আসে নাই। শেষরাত্রে জানালা দিয়া শীতল বাতাস ঘরে ঢুকিয়া আস্তে আস্তে উভয়ের মাথায় পড়িয়াছিল, তাহাতেই তাঁহারা একেবারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। পরদিন ঢাকের শব্দে উভয়েরই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; তাঁহারা তাড়াতাড়ি চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখেন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ঘুমের ঘোরে কোথায় ঢাক বাজিতেছিল আগে বুঝিতে পারেন নাই। এক্ষণে বুঝিলেন তাঁহার নিজের বাড়ীতেই ঢাক বাজিতেছে, তাঁহারা বিস্মিত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। ঠাকুরমণ্ডপের কাছে গিয়া দেখেন, সেদিন ষষ্ঠী, ঠাকুর-মণ্ডপে কল্পারম্ভের ঘট বসিয়াছে, পূজা হইয়া গিয়াছে। পুরোহিত তর্কবাগীশ মহাশয় চণ্ডী পাঠ করিতেছেন। আর বধূমাতা পট্টবাস পরিধান করিয়া পূজার আয়োজন করিয়া দিতেছেন। বধূমাতা কি করিয়া বাড়ীতে আসিলেন তাহা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বুঝিতে পারিলেন না। দুর্গামণ্ডপে গিয়া দেখেন, ধৌত চৌকির উপরে ঝল্‌মল্ করিয়া প্রতিমা বসিয়াছে আর সমস্ত ঘর আলোকিত হইয়াছে। ঢাকি মনের সুখে বাহিরে বসিয়া ঢাক বাজাইতেছে। এমন সময়ে হেমবাবু আসিয়া পিতামাতার চরণে প্রণিপাত করিলেন ও বলিলেন, সাহেবকে বুঝাইয়া বলিয়া কয়েক দিনের জন্য ছুটী লইয়া আসিয়াছি; এখনও আমার হিসাবের শেষ হয় নাই। আমার বিজয়ার দিনই রওনা হইয়া যাইতে হইবে। টাকার জন্য চিন্তা করিবেন না, আমি টাকা সঙ্গে আনিয়াছি। ভোরে ট্রেণ হইতে নামিয়াই একখানি ভাল গাড়ী করিয়া এখানে আসিয়াই উহাকে নামাইয়া দিয়াছি, আমি নামি নাই; ঐ গাড়ীতেই কুমারটুলি গিয়াছিলাম, তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাড়ীতে খবর দিয়া, ঠিকা মজুর করিয়া ও বাজার করিয়া একেবারে এখানে আসিয়াছি। আপনার মনে কষ্ট হইবে বলিয়া কোন ক্রমে আসিয়া পড়িয়াছি। বহুদিনের পূজা না হইলে আমারও মনে কষ্ট হইত।

ভবানীচরণ পুত্রকে পাইয়া তাহার মুখে এই সমস্ত শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "বাবা তোমার মঙ্গল হইবে, অল্পদিনেই তোমার সমস্ত দোষ কাটিয়া যাইবে। এ কয়েক দিন তোমার ও বধূমাতার আহার-নিদ্রা হয় নাই; তুমি শীঘ্রই কাপড় ছাড়িয়া

কিছু জলযোগ করিয়া লও। বধূমাতাও কিছু খাইয়া লউক।

হেম।—(একটু হাসিয়া) তা কি হইতে পারে? এখনও অনেক কাজ বাকি; আর আমি অঞ্জলি না দিয়া যাইব না ও ও খাইবে না, ভোগ রান্ধিবে বলিয়াছে। মা বুড়ো মানুষ, তাঁর কি এ সময়ে কাজকর্ম্ম করা চলে? আমাদের রাস্তায় কোনও কষ্ট হয় নাই।

পুত্রকে ও পুত্রবধূকে পাইয়া গৃহিণীরও মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বধূ গিরিবালা অতি ক্ষিপ্রতার সহিত সমস্ত কাজকর্ম্ম আরম্ভ করিয়া দিলেন। দিনে মায়ের যথাসম্ভব ভোগ হইয়া গেল, সায়ংকালে বিল্ববরণ ও অধিবাস হইয়া গেল, সপ্তমী হইতে মহা সমারোহে মায়ের পূজা হইতে লাগিল। একা গিরিবালার হাতের গুণে নৈবেদ্য, চন্দন ঘসা হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের সহিত অল্প সময়ে মায়ের ভোগ প্রস্তুত হইল। দিবা এগারটা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিতের সমাগমে বাড়ী ভরিয়া গেল। সকলেরই মুখে "দীয়তাং" "ভুজ্যতাম্"। মায়ের প্রসাদ খাইয়া সকলেই পঞ্চমুখে রন্ধনকারিণী গিরিবালার প্রশংসা করিতে লাগিল। মুখে প্রশংসা ধরে না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী শুনিয়া আনন্দে অধীর হইলেন। এইভাবে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী কাটিয়া গেল। দশমীর দিবসে দর্পণ-বিসর্জ্জনের সময়ে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী মায়ের বিচ্ছেদ হইতেছে ভাবিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অপরাহ্নে প্রতিমা বিসর্জ্জন হইয়া গেল; সায়ংকালে সকলে বাড়ীতে ফিরিলেন। হেমচন্দ্র নিজের পত্নীর সহিত আসিয়া পিতামাতার চরণ-বন্দনা করিলেন ও বলিলেন "প্রসন্নমুখে আমাদিগকে বিদায় দিন, পাঞ্জাব মেলের সময় হইয়াছে।" পিতামাতার অনুরোধে একটু মিষ্টিমুখ করিয়া দুই জনে গাড়ীতে উঠিলেন। পিতা বলিলেন, "সিমলায় পৌঁছিয়াই একখানি টেলিগ্রাম করিবে। তাহার দিন তিনেক পরে একখানি লম্বা টেলিগ্রাম আসিল ও টেলিগ্রাম মণিঅর্ডারে হাজার টাকা আসিল। টেলিগ্রাম পড়িয়া বৃদ্ধ ভবানীচরণ সেই টাকা ও টেলিগ্রাম লইয়া অন্তঃপুরে গৃহিণীর কাছে গিয়া বলিলেন, "এই টাকা ও এই হেমের টেলিগ্রাম। আমি কথায় কথায় তোমাকে অর্থ করিয়া দিতেছি, "বাবা আপনাদের আশীর্ব্বাদে এবার আমি নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইয়াছি, আমার কার্য্যকারিতায় দুই শত টাকার বেতনের উপরে আরও পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়াছে, ৬ মাসের বেতন একযোগে পাইয়াছি, দুই শত টাকা বাসা খরচের জন্য রাখিলাম, আর হাজার টাকা আপনার নিকট পাঠাইলাম। আপনি পূজা করিতে পারিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। যদি দুই চা'র দিন পূর্ব্বে আমি নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইতাম ও বেতন পাইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় শ্রীচরণ-নিকটে উপস্থিত হইতাম। যদি আপনি ধার কর্জ্জ করিয়া পূজা করিয়া থাকেন তবে অবশ্য এই টাকার দ্বারা তাহা পরিশোধ করিতে পারিবেন। আর যদি পূজা না হইয়া থাকে, তবে আর কি বলিব, সে আমার অদৃষ্টের দোষ!"

বল ত গিন্নী, একি ব্যাপার? হেম আসিল, বৌমা আসিয়া ভোগ রাঁধিল, আবার একি! আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছি।

ভবানী।—তুমি বোঝ আর না বোঝ, আমি একটু একটু বুঝিয়াছি। এই ছয় মাসের ভিতরে বৌমা এত পাকা রাঁধুনি হইয়া উঠিল কি করিয়া? আমি এমন সুতারের অন্নব্যঞ্জন কখনই খাই নাই।

ভবানীচরণ।—কি বলিতেছ গিন্নী, কি বলিতেছ, এ মায়ের কৃপা, মায়ের কৃপা! আমি এত পাপী, তাপী আমার উপর এত কৃপা! হায় কি হইল, কি হইল! দেখিয়া শুনিয়া ধরিতে পারিলাম না।

অঙ্গুলী-সমস্যা।

[শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল বি, এল্]

(১)

আশ্বিন মাস, প্রভাত-সূর্য্যের রক্তিম রশ্মিরেখা ঝলকে ঝলকে হিমালয়-শৃঙ্গে নিপতিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে বর্ণ-

বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিতেছিল—আর সেই আলোকমালা সমগ্র কার্সিয়ংকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছিল। সেই মধুর প্রাতে মিষ্টার বোসের ড্রয়িংরুমে পিয়নো-সহযোগে-মিস্ বোস ওরফে শ্রীমতী লীলাসুন্দরী গাহিতেছিল,—

মন্দিরে মম কে
আসিলে হে!
সকল গগন অমৃত-মগন
দিশি দিশি গেল মিশি অমানিশি
দূরে দূরে,
সকল দুয়ার আপনি খুলিল
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সকল বীণা বাজিল
নব নব সুরে।

গান চলিতেছিল আর শ্রীমান অতুলকৃষ্ণ আত্মহারা হইয়া কিশোরী গায়িকার রক্তিম মুখপানে চাহিয়াছিল। গান থামিলে তাহার চমক ভাঙ্গিল, বলিল, "চমৎকার গান! ঠিক এই সুরের একখানা হিন্দী গান একবার শুনেছিলাম, বোধ হয় সেই গানের সুরটা।

লীলা হাসিয়া বলিল, "থাম, থাম ওস্তাদজী ও সুরই হচ্ছে না।" অতুলকৃষ্ণ সপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া উঠিল।

লীলা—আর বাজনা ভাল লাগে না। অত করে তোমার খোসামুদি কর্লাম, একবার আমায় বন্দুক ছোঁড়াটা শিখিয়ে দাও। না হয় শীকার নাই করি—তা বলে কি"—

উত্তরের অবসর পাইয়া অতুল এবার বলিল—থাম, থাম বীরাঙ্গনা! বাঙ্গালীর মেয়ে আজ না হয় পাহাড়েই বেড়াচ্ছ তা বলে কি জাতের ধর্ম্ম"—

লীলা বাধা দিল, বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, তোমার শেখাতে হবে না। চল একটু ঘুরে আসি। একটু থামিয়া বলিল, না, আজ আবার কে আস্ছেন এখানে, বাবা ষ্টেসনে গেছেন তাঁকে আন্‌তে, শুনলাম তিনি ডাক্তার।"

"ডাক্তার? বিলাত-ফেরত নাকি?"

লীলা হাসিয়া বলিল, "তার চেয়েও বেশী, আমেরিকার ফেরত।"

কথাটা অতুলের কর্ণে বেশ মোলায়েম সুরে ধ্বনিত হইল না। শুধু বলিল, "ও"।

লীলা।—আচ্ছা অতুল দা' তুমিও কেন বিলাত ঘুরে এস না। মা সেদিন বল্‌ছিলেন—

সহসা সে থামিয়া গেল। অতুল অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, "খুড়ীমা কি বলছিলেন?"

কিশোরীর রক্তিম কপোল তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। পাছে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিলে বেচারী লজ্জায় কথাটা না বলে, তাই দৃষ্টি ফিরাইবার ভাণ!

লীলা প্রথমে বলিতে চাহিল না, শেষে অতুলের প্রশ্নের হাত এড়াইবার জন্য বলিল,—"মা বল্‌ছিলেন আইন পাশ কর্‌তে, তা'তো তুমি দিলে না। তা' এম, এ পাশ করে একশো দেড়শো টাকার চাকরী করে কি আর দুঃখ ঘুচ্‌বে? যদি বিলেতটা গিয়ে কোন কাজ শিখে আস্‌তে পার"—

অতুলের হৃদয়-তন্ত্রী ঠিক সুরেই ঝঙ্কৃত হইতেছিল, তাই ব্যগ্রভাবে বলিল, "তা হলে কি হবে?"

কিশোরী এইবার চটিল, বলিল, "কি হবে? খেতে পাবে আর কি!" বলিয়াই মুচকাইয়া হাসিয়া ফেলিল।

চারিচক্ষের মিলন হইতেই অতুলও হাসিয়া ফেলিল!

দ্বারের বাহির হইতে মিষ্টার বোস ডাকিলেন, "মা!"

লীলা ফিরিয়া দেখিল, সম্মুখে পিতা আর তাহার পশ্চাতে শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত দিব্য গোলাকার একখানা মুখ!

মিঃ বোস। লীলা! ইনিই ডাক্তার এস এস দে এম্-ডি (সিকাগো)। এঁর বাপ ডাক্তার নীলমাধব আমার বাল্যবন্ধু ছিল। এস শশাঙ্ক, এই আমার মেয়ে লীলা।

আলাপের ঘটা দেখিয়া অতুল সরিয়া পড়িল।

(২)

এইখানে একটু পূর্ব্ব পরিচয় আবশ্যক। মিষ্টার বোস বিবাহ করিয়া অপুত্রক শ্বশুরের বিপুল সম্পত্তির মালিক হ'ন ও সেই পয়সায় কনট্রাক্টরী শুরু করেন। পয়সায় পয়সা আসে এই বাক্যের সার্থকতা কিন্তু মিষ্টার বোসের জীবনে খাটে নাই। শ্বশুরের মত ধনী মুরব্বীর জোরে ও অর্থের মহিমায় খুব ধুমের সহিত কাজ করিতে থাকিলেও

বৎসর দশেকের মধ্যে গোটা কয়েক মোটা দাঁও মারিয়া প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণমাত্রেই ভগ্ন স্বাস্থ্যের অছিলায় ব্যবসা গুটাইয়া তিনি স্ত্রী আর একমাত্র কন্যা লীলাকে লইয়া কখনও সিমলা, কখনও ওয়াল্টেয়ার, কখনও কার্সিয়ং দার্জ্জিলিং ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কলিকাতায় তাঁহার শ্বশুর বাটীর পার্শ্বেই অতুলকৃষ্ণের বাটী। উভয় পরিবারের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠতা ছিল যে, অতুল বাল্যকাল হইতেই নিঃসঙ্কোচে বোসেদের অন্দর-মহলে গিয়া খুড়ী-মা বলিয়া দাঁড়াইত—আর একটু পরে লীলার হাত ধরিয়া নিজেদের বাটি আসিয়া ছোট ভগ্নীর পুতুল লুকাইয়া লইয়া লীলাকে উপহার দিত। পরে ভগ্নী আসিয়া বিবাদ বাধাইলে মাতার মধ্যস্থতায় সব মিটমাট করিয়া লইত। বাল্যের মধুর দিনগুলা এমনই হাস্য ও রৌদ্রের মধ্যে কাটিয়াছিল। পরে অতুল যখন একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী ডিঙ্গাইতে লাগিল, আর ওদিকে লীলা বাল্য হইতে কৈশোর সীমায় পদার্পণ করিল, তখন অতুল ও লীলার মাতা পরস্পরের নিকট একটি গোপনীয় বাক্যের আদান-প্রদান করিয়া ফেলিলেন।

মিঃ বোস কিন্তু অতুলকৃষ্ণকে সুনয়নে দেখিতে পারিতেন না। মানুষের একটা দৌর্ব্বল্য সময়ে সময়ে বড় স্পষ্ট হইয়া উঠে। শ্বশুরের পয়সাই তাঁহাকে সমাজে এত উচ্চ আসন দিয়াছে, একথা তিনি কখনও ভুলিতে পারেন নাই। বোধ হয় তিনি স্বীয় শ্বশুরবাটী-সম্পর্কীয় এই যুবকটিকে কিছুতেই পছন্দ করিতে পারিতেন না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে যখন লীলার মাতা স্বামীর নিকট নিজ গোপনীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন, তখন মিঃ বোস স্পষ্টভাবে জানাইলেন, "আমি উপার্জ্জনক্ষম জামাতা করিতে চাই। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী ডিঙ্গান সংসারানভিজ্ঞ যুবক লইয়া কি হইবে? তা ছাড়া লীলা আর একটু বড় না হইলে বিবাহ দেওয়া হইবে না।"

সেইদিন হইতে লীলার মাতার মুখ বন্ধ হইয়া গেলেও তিনি আশাডোর একেবারে ছিন্ন করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ তিনি অতুলকে বরাবর পুত্রের মত আদর করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং ঐ বাটিতে অতুলের অবাধগতি পূর্ব্বের মতই চলিতেছিল। এমন কি বোস-পরিবারের বিদেশবাসকালেও কলেজ বন্ধ হইলেই খুড়ী-মা'র নিকট হইতে তাহার নিমন্ত্রণ-পত্র আসিত।

মনে মনে বিরক্ত হইলেও পত্নীর এই স্নেহের পাত্রটির আগমন রোধ করিবার মত সাহস মিষ্টার বোসের ছিল না।

(৩)

সমস্ত দিনটা রৌদ্রময় থাকিলেও বৈকাল বেলা মিষ্টার বোস যখন বেড়াইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন সহসা একখণ্ড কাল মেঘ দুঃস্বপ্নের মত সমস্ত কার্সিয়ংয়ের বুকের উপর ঘেরিয়া আসিল, আর ঝর ঝর ধারে বারিপাত আরম্ভ হইল। অগত্যা মিঃ বোস ক্ষুণ্নহৃদয়ে শশাঙ্ককে লইয়া বৈঠকখানায় বিশ্রম্ভালাপ সুরু করিলেন। লীলা মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া কড়াইশুঁটির চপ ভাজিতে লাগিয়া গেল, আর অতুলকৃষ্ণ প্রথমে অন্দর তৎপরে বাহির মহলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন মিঃ বোস নিবিষ্টচিত্তে শশাঙ্ককে বুঝাইতেছিলেন যে, বিবাহটা মনুষ্যজীবনের একটা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাই আর্য্যঋষিরা বলিয়াছেন, সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ করিবে।

শশাঙ্ক ধীরে ধীরে বলিল, "সব সত্য, কিন্তু ধর্ম্মাচরণ করিবার মত স্ত্রী কৈ? এই দুঃসময় জীবনে আদর্শ গৃহিণী সুদুর্ল্লভ।"

বোস। ও সব বাজে কথা। অবশ্য প্রথমে উভয়-পক্ষে মতের সামঞ্জস্য কর্ত্তে একটু গোলমাল ঠেক্‌তে পারে; কিন্তু ভদ্র শিক্ষিত ঘরের মেয়ে এনে তাকে ঠিক পথে চালাবার একটু চেষ্টা কর্লেই সফলকাম হতে পারা যায়। ঠিক এই কারণেই লীলাকে সাধ্যমত সুশিক্ষা দিয়েছি। তাকে আমি রান্না থেকে সুরু করে গান-বাজনা সেলাই এমন কি ছবি আঁকা পর্য্যন্ত শিখিয়েছি।" বলিতে বলিতে তিনি বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করিলেন। আমার এমন মেয়ে যার ঘরে যাবে তার বহু ভাগ্য।

শশাঙ্ক।—লীলার বিবাহ কোথাও স্থির হয়েছে?

মিঃ বোস।—এ বাজারে মনোমত পাত্রে কন্যাদান যে কত কঠিন তাহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি। বিবাহ

খাত্র ঢের আছে, কিন্তু তারা সবাই যে উপার্জ্জনক্ষম হবে তার আশা কৈ?

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই লীলা আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল। প্রথমেই সে অতুলের মুখপানে চাহিল, দেখিল তাহার মুখখানি বেশ ম্লান! সে ধীরে ধীরে তাহার পিছনে গিয়া বলিল, "মা ডাকছেন।"

মিঃ বোস কন্যাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন, "কি মা জলখাবার হল? তোমার হাতের রান্নাটা ডাক্তারকে খাইয়ে দাও।"

কন্যা ফিরিয়া বলিল, "জলখাবার হয়েছে।"

মিঃ বোস।—এইখানেই পাঠিয়ে দাও।

লীলা কক্ষ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে আবার অতুলকে বলিল, "মা তোমার জন্য বসে আছেন অতুল দা'।"

অতুল দাঁড়াইয়া উঠিলে শশাঙ্ক মিঃ বোসকে বলিল, "আমি পরশ্বই কলিকাতা ফিরিব। সেখানে পত্র লিখিয়া দিয়াছি।"

মিঃ বোস।—সে কি? এই তো মোটে দিন দশেক এসেছ। আর দিন কতক থাক—এ জায়গার উপকার বোঝ—তার পর আর যাবারই ইচ্ছা কর্ব্বে না।

শশাঙ্ক।—সেখানে কাজের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে। আর অতুলবাবুও যাচ্ছেন, এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।

মিঃ বোস।—অতুলের পড়াশুনা ক্ষতি হচ্ছে ওর পরীক্ষা এগিয়ে আসছে ও যাক্ না।

দ্বারদেশ হইতে লীলা আবার ডাকিল, "মা জলখাবার নিয়ে বসে আছেন, অতুল দা'।"

অতুল পলায়নের সুযোগ খুঁজিতেছিল।

মিঃ বোস কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা ডাক্তারের ও আমার জলখাবার শীঘ্র পাঠিয়ে দাও।"

(৪)

লোকের সহিত মিশিবার ক্ষমতাটা ভগবান অতুলকৃষ্ণকে বেশ দিয়াছিলেন। কার্সিয়ংয়ে দিন কয়েকের মধ্যেই সে শশাঙ্কের সহিত এমন মাখামাখি করিয়া লইয়াছিল যে, উহাদের একসঙ্গে দেখিলে মনে হইত উহারা বাল্যবন্ধু! কলিকাতায় আসিয়াও সে শশাঙ্কের সঙ্গে খুব মিশিতে আরম্ভ করিল। তাহার ডিস্পেন্সারী, রাসায়নিক কক্ষ সমস্তই সে দিন কয়েকের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া লইল। তারপর সে শশাঙ্ককে পরীক্ষা করিতে সুরু করিল। এইবার কিন্তু বেচারীকে বড় ঘা খাইতে হইল। দুটা মনের কথা কহিতে গিয়াই সে বুঝিল যে, শশাঙ্ক মনোমধ্যে এক নূতন আশা পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সেদিন কথায় কথায় শশাঙ্ক স্পষ্ট বলিল যে, সে এইবার সংসারী হইবার চেষ্টায় আছে। অতুল চিন্তিত হইয়া পড়িল। ভাবিল, তাহার জীবনের সাধ বুঝি শুধু বাসনারাশিতেই পর্য্যবসিত হয়!

একে তো মিঃ বোস তাহাকে কোন দিন সুদৃষ্টিতে দেখেন নাই; কিন্তু তবুও আশা ছিল বুঝি লীলার মাতার সাহায্যে অবশেষে তাহারই জয়লাভ হইবে। কিন্তু আজ! এই আমেরিকা-প্রত্যাগত উপার্জ্জনক্ষম যুবক ডাক্তার—আর সে!

সে ডাক্তারের বাটী গমনাগমন ত্যাগ করিল।

মাঘ মাসের শেষ। তখনও কলিকাতা অঞ্চলে বসন্তদেব উত্তর বায়ুর সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখনও তাঁহার বাহন মলয়বায়ু প্রবাহিত হইতে গিয়া উত্তর বায়ুর ধাক্কায় প্রহত হইয়া ঘুরিতেছিল—ফিরিতেছিল—আবার অগ্রগমনের চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় অতুলকৃষ্ণ লীলার মাতার নিকট হইতে এক পত্র পাইল। তাহার সারমর্ম্ম এই যে, ডাক্তার শশাঙ্কশেখরকে দেখা করিবার জন্য মিঃ বোস কার্সিয়ংয়ে ডাকিয়েছেন খুব সম্ভবতঃ নিজ কন্যার সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ পাকা করিবার জন্য। লীলার মাতার মত কিন্তু অন্যরূপ। এ অবস্থায় অতুল তাহার মাতার অনুমতি লইয়া যেন পত্রপাঠ কার্সিয়ং যাত্রা করে।

অতুল বসিয়া পড়িল। তাহার জীবনব্যাপী সাধনা—পুঞ্জীভূত বাসনা সবই কি আকাশ-কুসুমে পর্য্যবসিত হইবে!

তাহার দিব্য চক্ষে ভাসিয়া উঠিল এক কিশোরীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখ—তাহার সফরীনিন্দিত চক্ষু—তাহাতে মধুর চাহনী—তাহার রক্তিম কপোল তদুপরি কুঞ্চিত কেশদাম—আর তাহার গোলাপী অধরোষ্ঠ তাহাতে প্রাণ-

যাতনা সলজ্জ হাসি! সে আর ভাবিতে পারিল না। জামাটা স্কন্ধে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তারের বাটী দৌড়িল।

শশাঙ্কের বাটী গিয়া সে আর এক ধাক্কা খাইল। দেখিল, ডাক্তার ডিস্‌পেন্‌সারি, মেটেরিয়া মেডিকা ছাড়িয়া বৈঠকখানার তক্তায় বসিয়া; তাহার ক্রোড়ে এক হার্ম্মোনিয়ম আর সম্মুখে এক স্বরলিপির খাতা! শুনিল, শশাঙ্ক অশিক্ষিত অঙ্গুলী-সঞ্চালনে রিডের পর রিড টিপিতেছে আর আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে, "আ—আ—আ"

এমন অবস্থায় সহসা বন্ধুকে দেখিয়া শশাঙ্ক একটু অপ্রস্তুত হইলেও হার্ম্মোনিয়ম রাখিয়া তাহাকে বসিতে বলিল। অতুল একেবারে কাজের কথা পাড়িল, "বলিল, কার্সিয়ংয়ের কোন খবর আছে?"

শশাঙ্ক একটু হাসিল, অসন্দিগ্ধচিত্তে বলিল, "আগামী রবিবার বোধ হয় আমার দার্জ্জিলিং মেলে কলিকাতা ছাড়িতে হইবে। মিঃ বোসের সঙ্গে আমার এক জরুরী পরামর্শ আছে।"

অতুল আর বিস্মিত হইল না। সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছিল; তাই কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি যে আজই সেখানে যাচ্ছি।"

"সে কি? কলেজ কামাই ক'রে?"

"হাঁ, আমার খুড়ীমার কাছে বিষয়-সংক্রান্ত একটা জরুরী দরকার আছে। আর লীলারও চিঠি পেয়েছি, সে লিখেছে যে এখন সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড় মনোরম।"

শেষ কথা কয়টায় অতুলের মনোমত ফলই ফলিল; কারণ শশাঙ্কের হৃদয়বীণার পঞ্চম তারেই ঘা লাগিয়াছিল। তার ঝঙ্কৃত হইল। বিবর্ণমুখে শশাঙ্ক বলিল, "তা হ'লে চল দুজনে এক সঙ্গেই যাই। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবারের বারবেলা।"

"আপনি ওসব মানেন না কি?"

শশাঙ্ক বেহারাকে ব্যাগ সাজাইতে বলিল।

রণে ও প্রেমে বিলম্ব নারাত্মক!

(৫)

তাহারা কার্সিয়ং পৌঁছিয়া শুনিল, মিঃ বোস সিকিমপ্রান্তে বেড়াইতে গিয়াছেন, রবিবার নাগাইদ ফিরিবেন। শশাঙ্কের আগমনে মিঃ বোসের বাটীর সকলে একটু বিচলিত হইলেও কেহ তাঁহার আদর-অভ্যর্থনায় ত্রুটি প্রকাশ করিল না; যদিও সে নিজেই একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল।

শুক্রবার প্রাতে কিন্তু শশাঙ্ক এক নূতন বিপদ গণিল। জামা জোড়া পরিয়া জুতা পায়ে দিবার সময় সে তাহার দুই জোড়া জুতার এক জোড়াও খুঁজিয়া না পাইয়া বড়ই বিব্রত হইল। কলিকাতায় চাকর হয়ত ভ্রমবশতঃ এক জোড়া জুতা ব্যাগে দিতে ভুল করিতে পারে, কিন্তু যে জোড়া সে পায়ে দিয়া আসিয়াছে তাহা কোথা গেল? তার পর মিঃ বোসের খানসামা শপথপূর্ব্বক বলিল যে, সে গত রাত্রে ডাক্তার বাবুর দুই জোড়া জুতাই তাঁহার শয়নকক্ষে রাখিয়াছিল।

নানাস্থানে অনুসন্ধানের পর লুপ্ত দ্রব্যের পুনঃপ্রাপ্তিসম্বন্ধে শশাঙ্ক যখন নিরাশ হইয়া পড়িল, তখন অতুল সহানুভূতি-সূচক-স্বরে জানাইল যে, তাহার জুতার নম্বর ৬, আর ডাক্তারের জুতার নম্বর ৮, অনেক তফাৎ; নচেৎ তাহার এক জোড়া জুতা শশাঙ্ক ব্যবহার করিলে দোষ হইত না। জুতা ব্যতীত শীতপ্রধান দেশে বাস চলে কি করিয়া!

লীলার মাতা সমস্ত শুনিয়া অবশেষে অতুলকে বলিলেন, "দেখ দেখি বাবা, তোমার কাকাবাবুর জুতা যদি ওঁর পায়ে হয়? ভদ্রলোক আমার বাড়ীতে জুতা হারালেন! কি লজ্জার কথা!"

কথাটা কাহারও মন্দ লাগিল না। শশাঙ্ক অতুলের সঙ্গে মিঃ বোসের ড্রেসিংরুমে গেল। সেখানে সারি সারি রকমারি দশ বারো জোড়া জুতা সাজান ছিল। অতুলের অনুরোধে অগত্যা শশাঙ্ক এক জোড়া ডার্ব্বি-সু নামাইয়া পরিবার চেষ্টা করিল। তাহার দক্ষিণ পদটি বেশ সরলভাবে জুতার মধ্যে চলিয়া গেল। শশাঙ্কও একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল—পায়ে মন্দ ফিট্ করে নাই।

কিন্তু বিধাতা তাহার অদৃষ্টে এখনও দুঃখ লিখিয়াছিলেন। বাম পদটি জুতার মধ্যে প্রবেশ করাইতে গেলে আধখানা পা তন্মধ্যে গিয়া আর প্রবেশ করিতে চাহিল না। জোর করিতে গিয়া যন্ত্রণায় কাতর হইয়া শশাঙ্ক বলিল, "ও

জুতার ভেতর এ শক্ত মতন কি হে?" অতুল হাত তুলিয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ, থামুন থামুন! ও হবে না। কি আশ্চর্য্য আমার বা খুড়ীমার কারও খেয়াল ছিল না যে, খুড়ার জুতা আর কাহারও ব্যবহারের জন্য নয়। তাঁর জন্য আলাদা জুতা ফরমাইস দিতে হয়।"

"কি রকম?"

"খুড়ার আমার বামপদের একটা অঙ্গুলিও নাই। সে জন্য জুতা তৈয়ার করিবার সময় মুচিরা বাঁ পাটি কাঠের টুক্‌রা দিয়া আধখানা বন্ধ করিয়া দেয়।"

"পায়ের একটী অঙ্গুলিও নাই। কি হ'ল আঙুল-গুলা?"

"তা তো জানি না। বহুদিন পূর্ব্বে সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিষম ধমক খাইয়াছিলাম।"

"তোমার খুড়িও জানেন না?"

"তিনি জানলে লীলা জানত, আমিও জানতাম। আর আপনি কি লক্ষ্য করেন নাই যে, খুড়া বাম পদটি একটু টানিয়া চলেন।"

শশাঙ্ক এক মিনিট স্থিরভাবে কি ভাবিল, পরে মিঃ বোসের বামপদের জুতাগুলি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিল, বাস্তবিকই ত প্রত্যেকের ভিতর মাত্র আধখানা পদ যাইতে পারে সবটা নয়। পরীক্ষার পর শশাঙ্কের কপোল দেশ সঙ্কুচিত হইল। শেষে বাধ্য হইয়া অতুলের এক জোড়া চটির ভিতর আধখানা পা কোনক্রমে দিয়া সে বাহিরে আসিল ও উচ্চস্বরে জানাইল যে, সেই দিনই একটার রেলে তাহাকে কলিকাতা ফিরিতে হইবে, বিশেষ কাজ আছে।

লীলার মাতা অতুলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তারের পায়ে জুতা হোল না?" অতুল হাঁফ ছাড়িয়া বলিল, "না।"

(৬)

দুইদিন পরে মিষ্টার বোস কার্সিয়ংয়ে ফিরিলেন ও শশাঙ্কের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন। সে লিখিয়াছে —"কোন বিশেষ গোপনীয় কারণে আমি আপনার মত লোকের কন্যাকে বিবাহ করিতে অক্ষম—তজ্জন্য আপনার নিকট ক্ষমা চাহিয়া বিদায় লইতেছি। ইতি—প্রণত শশাঙ্ক।"

কিছু বুঝিতে না পারিয়া মিঃ বোস বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে পত্নীর পানে চাহিলেন ও পত্রখানি তাহার দিকে ছুড়িয়া দিলেন।

অপমানে তাঁহার মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল।

লীলার মাতা পত্রখানি পড়িলেন। পড়া শেষ হইলে উহা মুড়িলেন, আবার খুলিলেন; শেষে স্বামীর মুখপানে না চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "এ অপমান তুমি যে গায়ে পেতে নিলে। ঘরে জামাই মজুত থাকতেও লাফিয়ে গেলে কি না সুশিক্ষিত রোজগারী জামাই খুঁজতে! ওঃ কি স্পর্দ্ধা এর"—

সেইদিনই মিঃ বোস উক্ত পত্রের এক কড়া জবাব লিখিয়া তবে কথঞ্চিৎ আরাম বোধ করিলেন।

* * *

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি এক নির্ম্মল প্রভাতে—শশাঙ্কশেখর লাল একখানি খাম পাইলেন। তন্মধ্যে যে পত্র ছিল তাহার সারমর্ম্ম এই, আগামী সপ্তাহে অতুলের সহিত লীলার বিবাহ। বিবাহ মিঃ বোসের কলিকাতার বাটী হইতেই হইবে।

বরপক্ষের নিকট হইতে নিমন্ত্রণপত্র আসিয়াছিল।

বিবাহের পরদিন মধুর সানায়ের সুরের মধ্যে বরকন্যা-বিদায়ের উদ্যোগে মিঃ বোস খুব ব্যস্ত; এমন সময় ডাক পিয়ন আসিয়া বাটির চাকরের হস্তে এক পার্শ্বেল দিল। অন্দর মহলে অতুলের হস্তে পড়িতেই সে সর্ব্বসমক্ষে উহা উন্মোচন করিল, তাহার ভিতর হইতে পুরাতন সংবাদ-পত্র মোড়া একটি বোতল ও একখানি পত্র বাহির হইল। পত্রে ছিল,—

"অতুল বাবু,

ঘটনাসূত্রে বাধ্য হইয়া এই পার্শ্বেল মারফৎ আপনার মাননীয় শ্বশুর মহাশয়ের পদাঙ্গুলী কয়টি পাঠাইতেছি। নিঃসন্দেহ বহুকাল পরে তিনি নষ্টদ্রব্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিবেন।

ইতি—শশাঙ্ক।"

প্যাঠান্তে সে খাশুড়ীর হস্তে উহা দিল ও বোতলের ঢাকা খুলিল; তখন সকলে বিস্ফারিতনয়নে দেখিল, বোতলের মধ্যে আরক আর তন্মধ্যে সদ্য-কর্ত্তিত পাঁচটি পায়ের আঙুল! সকলে শিহরিয়া উঠিল, নারীমহলে একটা বিষম আন্দোলন দেখা দিল। এমন সময় মিঃ বোস ঘরে উপস্থিত হইলেন। তিনি অঙ্গুলী কয়টির পানে চাহিতেই অতুল কম্পিতহস্তে পুরাতন সংবাদপত্রখানি প্রদান করিল। তাহাতে ছিল,—প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বের এক লোমহর্ষণ ঘটনার বিবরণ। এক গৃহস্থের বাটিতে অন্ধকার রাত্রে এক যুবতী বিধবার কক্ষে জন তিনেক লম্পট প্রবেশ করে। যুবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে বদমায়েসের দল তাহার প্রতি অত্যাচারের চেষ্টা করে। হতভাগিনীর চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া জনকয়েক সাহসী প্রতিবাসী টাঙ্গী কুড়ুল ইত্যাদি লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে। তখন গুণ্ডাদের সঙ্গে তাহাদের লড়াই বাধে। ফলে সেই নৈশযুদ্ধে বিধবাটি মারাত্মকভাবে আহত হয় আর গুণ্ডার দল বাতায়ন-পথে পলায়ন করে। তবে এক প্রতিবেশীর টাঙ্গীর আঘাতে জনৈক লম্পট জুতা-সমেত বাম পদের অঙ্গুলীকয়টি রাখিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

শেষ কথা কয়টি লাল কালিতে দাগ মারা ছিল।

সংবাদের শেষে লেখা ছিল, উক্ত অঙ্গুলীর অধিকারী এখনো পলাতক। ইহার নীচে সাক্ষর ছিল ডাক্তার নীলমাধব।

মিঃ বোস পারিয়া চারিদিকে চাহিয়া জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর মানে কিহে? নীলমাধব তো শশাঙ্কের বাপের নাম।"

অতুলকৃষ্ণ মাথাচুলকাইয়া ঘামিয়া উঠিল, শেষে মাটি-পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, শুনুন তবে। শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লে আমি প্রায়ই তার বাটিতে যাইতাম। সেইখানে তার ডিস্পেন্সারীতে এই অঙ্গুলীকয়টি দেখি ও ইহাদের ইতিহাস সংগ্রহ করি। তার পর মাসখানেক পূর্ব্বে যখন তাহাকে লইয়া কার্সিয়ং যাই—আপনি তখন সিকিম গিয়াছিলেন, সেখানে তাহার জুতা চুরী যায়—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে লীলার মাতার মুখপানে চাহিল।

লীলার মাতা।—সে আমাদের খুব মনে আছে। সেই রাগেই সে বোধ হয় কলিকাতায় চলে আসে।

অতুল সাহস পাইয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, "খুড়ীমার সঙ্গে পরামর্শ করে যদি আপনার কোন জুতা তার পায়ে হয় এই ভেবে তাকে আপনার ড্রেসিং রুমে নিয়ে যাই। তবে তার আগে আপনার সমস্ত জুতার বাম পাটির আধ-খানা আমি কাঠ ও পিস্‌বোর্ডের টুক্‌রা দিয়ে বন্ধ করে দি'। ফলে বুদ্ধিমান ডাক্তার আপনার জুতার বাম পাটিগুলি পরীক্ষা করে শেষে স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয় যে,—"

"যে আমিই বিশ বৎসর পূর্ব্বের সেই গুণ্ডা নারীহন্তা যার পায়ের আঙুল শশাঙ্কের বাপ সযত্নে আরক দিয়ে ডিস্পেন্সারীতে রেখে দিয়াছিল! রাস্কেল—পাজী তোমরা পরামর্শ করে"—অতিমাত্র ক্রোধে মিঃ বোসের স্বর বন্ধ হইয়া গেল!

দুইবার কাসিয়া আরক্তিমচক্ষে পত্নী ও কন্যার পানে ফিরিয়া শাসাইতে গিয়া দেখিলেন, তাহারা দুইজনে মুখে হাতখানেক অঞ্চল প্রবেশ করাইয়াও হাসি দমন করিতে না পারিয়া রক্তবর্ণ মুখে বসিয়া আছে—আর জামাতা! সে করুণ নয়নে একবার মিঃ বোসের মুখপানে আর একবার উপস্থিত নারীবৃন্দের মুখপানে চাহিতেছে!

যক্ষের পণ

[শ্রীচণ্ডীদাস গুপ্ত, বি-এ]

(১)

অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়া রত্নাকর বাবু একদিন তাঁহার পুত্র গোবিন্দকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন, "তুই কি মনে ক'রেছিস বলত?"

গোবিন্দ উত্তর করিল—"কেন, কি করেছি আমি? রোজ রোজ বকাবকি ভাল লাগে না আর।"

রত্নাকর বাবু বারুদের মত জলিয়া উঠিলেন, "না ভাল লাগে বেরো বাড়ী থেকে। চোট্‌পাট্ দেখ না! গণ্ডমূর্খ

কোথাকার! বাপের ভারি পয়সা দেখেছিস যে। খালি নবাবী।"

গোবিন্দ উত্তর করিল,"কত টাকা দিয়েছ তুমি আমার হাতে?"

রত্নাকর বাবু চশমাটি আরও নামাইয়া দিয়া উপরে চোখ তুলিয়া বলিলেন "তাই জন্যে চারিদিকে দেনা ক'রেছিস্?—মুদীর দোকানে ধার, মহাজনের কাছে ধার, এমনকি জগা পোদ্দারও তাগাদার জ্বালায় অস্থির ক'রে তুলেছে।"

এই হিসাব কিতাবের বিবরণ শুনিয়া গোবিন্দ যেন একটু দমিয়া গেল। আর একবার জোর করিয়া বলিল, "তা' হ'য়েছে কি?"

বৃদ্ধ রত্নাকর বাবু গলা চড়াইয়া কহিলেন "পাজি, ন'চ্ছার, ষোল বছর বয়স হ'তে চল্‌ল এক পয়সা রোজগার করবার ক্ষমতা নেই আর দেনায় ডুবে আছিস? দেখি কে তোকে খালাস করে।"

অবশ্য পাওনাদারগণকে ডাকাইয়া দাইহাটীর ধনী রত্নাকর বাবু তাহাদের কাণাকড়িটি পর্য্যন্ত চুকাইয়া দিয়াছেন।

গোবিন্দ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রত্নাকর বাবু একেবারে চীৎকার করিয়া ক্রমশঃ নরম সুরে বলিলেন, "তোকে নিয়ে আমার অনেক নিগ্রহ আছে দেখ্‌ছি। কোথায় এক পয়সা সাশ্রয় হবে তা না খালি বাজে খরচ।"

তারপর 'খতিয়ান বহি'খানা টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে অতি নিম্নস্বরে কহিলেন, "এই সব উড়ো খরচ আমি এখন কি করে পুষিয়ে দি' বল্‌ত?"

বৃদ্ধ পাওনাদারদের শোধ করিয়া দিয়াছেন বুঝিয়া সে গোঁয়ারের মত উত্তর করিল "টাকা আমি তা'দের শোধ ক'রে দেব এখন।" এই বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল।

রত্নাকরবাবু চশমাটি খুলিয়া রাখিয়া ডাকিলেন "শুনে যা,' হতভাগা"

গোবিন্দ একটু ঘুরিয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সে আমি নিজে বুঝ্‌ব।—তোমায় কিছু ভাব্‌তে হবে না। তোমার টাকাও চাই না আমি।"

রত্নাকর বাবু রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এক দৃষ্টিতে গোবিন্দের চোখের উপর তাকাইয়া বলিলেন, দ'রে আয় হতভাগা।

গোবিন্দ দুই পা অগ্রসর হইয়া পুনরায় পিছাইয়া গেল।

রত্নাকর বাবু তাঁহার কম্পিত হস্ত পাতিয়া বলিলেন, "দে দু'শ টাকা দিয়ে যা। কত টাকা আছে তোর, পাজি, ছুঁচো?

মাদুরের উপর একরাশি দলিল ছড়ান ছিল। রত্নাকর বাবু কতকগুলি কাগজ তুলিয়া লইয়া সজোরে গোবিন্দের উপর নিক্ষেপ করিলেন "বেরো আমার সাম্‌নে থেকে, অসভ্য, ভূত কোথাকার,—এই বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে যেন পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

গোবিন্দ রাগে গর গর করিতে করিতে অন্য ঘরে গিয়া চন্নকে ডাকিয়া বলিল, "এক গেলাশ জল নিয়ে এস ত—শিগ্‌গির, শিগ্‌গির"। পিসিমা হরকালী কহিল, "যা' না, বাছা, এক গেলাশ জল দিয়ে আসতেও কুঁড়েমি।" গোবিন্দের এগার বার বছরের বৌ চন্ন। জল ও পান লইয়া যখন সে হাজির হইল তখন গোবিন্দ দু'একখানি কাপড় ও জামা লইয়া হন্ হন্ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল। চন্ন বলিল, "জল খাবে না!"

গোবিন্দের আদৌ তৃষ্ণা পায় নাই। গেলাশ-শুদ্ধ জল ও ডিবা-শুদ্ধ পান ফেলিয়া দিয়া বলিল, "তোমাদের বাড়ীর চাকর আমি? ডেকে ডেকে গলা চিরে গেলেও কেউ তাকিয়ে দেখ না।"

চন্ন মহাবিভ্রাটে পড়িল। একবার দূরে নিক্ষিপ্ত গেলাস ও ডিবার দিকে, আর একবার বিক্রমকেশরী উদ্ধত স্বামীর দিকে তাকাইতে লাগিল।

এইবার চন্নের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া গোবিন্দ নিজেই খাটিয়ার বিছানায় শুইয়া পড়িল।

চন্ন গোবিন্দের বুকের উপর হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ঠাণ্ডা জল নিয়ে আস্‌ব?"

গোবিন্দ সোজা হইয়া বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "বাবার কাছে আমার নামে কি সব মিথ্যে কথা ব'লে এসেছ?"

চন্নন বড়ই বিস্ময়ের সহিত উত্তর দিল "বাবাকে আমি কেন ব'লব—ওরাই ত সব কাগজ-পত্তর দেখিয়ে কি ব'লছিল।"

গোবিন্দ পাশ বালিসটা কোলের উপর রাখিয়া দুই হস্তে মস্তক চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি না ব'ললে বাবা কারও কথা বিশ্বাস করে না। সে দিন বাবা আমাকে সকলের সামনে কাণ ম'লে নাকে খৎ দিতে ব'ললে। এর চেয়ে অপমান আর কি আছে! যাও, চ'লে যাও এখান থেকে"—বলিয়া দুই হস্তে মাথা আরও চাপিয়া ধরিয়া মুখ নামাইয়া বসিয়া রহিল।

চন্নন একটু অপ্রতিভ হইয়া অতি সন্তর্পণে গোবিন্দের হস্তধারণ করিয়া তাহার সুকোমল করপল্লবে অভিমানী নির্দ্দয় স্বামীর মুখ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল। গোবিন্দ কিছুতেই মুখ দেখাইবে না।

চন্নন নিকটে বসিয়া বলিল, "শুনবে না আমার কথা!" তার পর সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি কাঁদছ?"

গোবিন্দ পাশ বালিসটা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্ববৎ জামা ও কাপড় লইয়া বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া চন্নন প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। গোবিন্দ তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আমার শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েছ তোমরা? দেখ, আমি কি করি"—বলিয়া কাপড়-চোপড় যাহা লইয়াছিল চন্ননের উপর ফেলিয়া দিয়া সে ঘর হইতে তীরের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

(২)

"হর, ও হর, কি কাজ ক'রছিস্ রে?"

নীচের দাওয়ায় বসিয়া রত্নাকর বাবুর বিধবা ভগিনী সন্ধ্যাপূজা সারিতেছিল। সেদিন ছিল মহামায়ার ষষ্ঠীর বোধন। অতএব পূজায় সত্যই তাঁহার মন লাগিয়াছে। কিন্তু রত্নাকর বাবুর পুনঃ পুনঃ আহ্বানে তাঁহার আসন টলিল। সেইরূপ ভাবে বসিয়া উপরের জানালায় তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আবার কি চাই?"

কেমন যেন একটু বিকৃত কণ্ঠস্বরে রত্নাকর বাবু কহিলেন, "আমার মা কোথায় গেল রে?"

হরকালী উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "চন্নন, দাদা ডাকছে যে! কি জানি কোথায় থাকে মেয়ে—ওরে ও চন্নন"—পুনরায় আচমন করিয়া ধ্যানে বসিলেন।

চন্নন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া রত্নাকর বাবুর পায়ের তলায় গিয়া বসিল। দৈনিক কার্য্য ভুলিয়া গিয়াছিল ভাবিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া একেবারে পা' টিপিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

রত্নাকর বাবু চঞ্চল হইয়া বলিলেন, "মা আমার, আজ ষষ্ঠীর দিন পায়ে হাত দিস্‌নি।"

তার পর চন্ননের ছোট্ট কচি হাত ধরিয়া আরও টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "আজ তোর কোলে মাথা দিয়ে শোব, কেমন ত?"

চন্নন কোল পাতিয়া দিয়াই যেন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

ভীষ্মের শরশয্যার অভিনয় রত্নাকর বাবু যেন আজ চোখের সাম্‌নে দেখিতে পাইতেছিলেন। তন্ময় হইয়া সেই ছবির সহিত এক হইয়া গেলেন। সর্ব্বাঙ্গে যা' বেদনা হইয়াছিল তাহা যেন পুঞ্জীভূত হইয়া অন্তরের শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিতেছিল। তাঁহার বুকজোড়া ভালবাসার দাবী করিবার আর কেহ ছিল না, এই কচি মেয়েটি ছাড়া।

চন্ননের কথাগুলি আজ স্পষ্ট ফুটিতেছিল। "মাথা টিপে দেব বাবা।"

রত্নাকরবাবু অন্যমনস্কভাবে ধরা গলায় কহিলেন, "মা রে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, ঠিক সত্যি বল্‌বি।"

চন্নন বৃদ্ধের শিথিল থসথসে হাত লইয়া খেলা করিতে করিতে উত্তর করিল, "কি, শুনি আগে!"

রত্নাকরবাবু চুপি চুপি কথাগুলি বলিতে গিয়া জড়াইয়া ফেলিলেন। একটু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "গোবিন্দ সেই সকালে বাড়ীথেকে বেরিয়ে গেছে আর ফিরে আসে নি, তা' হ'লে?"

ক্রমশঃ রাত হইয়া আসিতেছিল। জানালা হইতে বাহিরের ঘন অন্ধকার দেখিয়া চন্ননের বুকের পাঁজরের প্রতি রক্তবিন্দু যেন হিম হইয়া গেল।

উত্তর দিল, "সত্যি বাবা।"

রত্নাকরবাবু পাশ ফিরিয়া বলিলেন, "আমার এত বড়

বাড়ী, এত বড় জমিদারী, সেখানে একটা ছেলে আমার, তাও থাকবার যায়গা পেলে না.?"

চন্নন আঁচলে বৃদ্ধের ঘর্ম্মসিক্ত মুখ মুছাইয়া দিয়া বেশ মৃদু, সুললিতকণ্ঠে বলিল, "পিসিমা কত বারণ করলে, কিছুতেই শুনলে না—বল্‌লে বাবা বাড়ীথেকে বেরিয়ে যেতে বলেছে, আমি আর একদণ্ডও থাক্‌ব না।"

চন্ননের কোল হইতে মাথা উঁচু করিয়া রত্নাকরবাবু কান খাড়া করিয়া শুনিতেছিলেন। শেষ কথাটির পর হতাশ হইয়া ধুপ্‌ করিয়া তাহার কোলে মাথা ফেলিয়া দিলেন।

"তাই ত। দারোয়ান এসে কি বল্‌লে?" চন্নন পড়া পাখীটির মত এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বলিয়া বুঝাইয়া দিল দাইহাটীর কোন স্থানে তাহাকে পাওয়া যায় নি।

বৃদ্ধ খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া ঘরের বাহিরে যাইতেছিলেন। টলিতে টলিতে দরজা ধরিয়া বলিলেন, "মা আমার, লাঠিগাছটা দাও ত।"

চন্নন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। বাবা ত সহজ অবস্থায় এমন টল্‌তে টল্‌তে যায় না। ডাকিল, "ফিরে এস। বাইরে বড় অন্ধকার। পিসিমাকে আলো ধ'র্‌তে ব'ল্‌ছি!"

রত্নাকরবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি একবার নিজে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখব রে' পাগলী।"

চন্নন ধীরভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এত নির্জ্জন সব! ঘর, বাড়ী, সমস্ত সংসার যেন আজ হরিশ্চন্দ্রের শ্মশানের মত বৃদ্ধের সামনে ধূ ধূ করিতে লাগিল। তাঁহার কানের মধ্যে কতদূরের একটা কাহার তৃষ্ণার্ত্ত ক্ষুধার্ত্ত কণ্ঠস্বর থাকিয়া থাকিয়া সবলে আঘাত করিতেছিল।

রত্নাকরবাবু ছুটিয়া আসিয়া চন্ননের বুকের ভিতর মাথা গুঁজিয়া একেবারে ছোট ছেলেটির মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তার পর ক্লান্ত হইয়া তাহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন।

চন্ননের চোখ আপনিই ভিজিয়া আসিল। কোন কোন সময়ে বয়সকে হার মানাইয়া বুদ্ধি সজাগ হইয়া উঠে। ছোট মেয়েটি এই চন্নন এক একদিন বড় বৈষয়িক রত্নাকরবাবুকেও স্তম্ভিত করিয়া দিত! আজ যেন অজ্ঞাতসারেই তাহার ছোট হাত দু'খানি বৃদ্ধের মস্তকে ধীরে প্রকালিত হইতে লাগিল। রত্নাকরবাবু নির্জীবের মত আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া রহিলেন।

হরকালী নানাপ্রকার অমঙ্গল হইয়াছে স্থির নিশ্চয় করিয়া সবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল এবং পার্শ্বে আলোটি রাখিয়া বলিল, "কি হ'য়েছে, চন্নন?"

চন্নন উত্তর করিল "তা জানি না—তবে বাবার অসুখ ক'রেছে আজ।"

কি অসুখ! কৈ আমাকে ত কিছু বলনি, দাদা! গোবিন্দের কি আক্কেল?—এমনি করে চ'লে যেতে হয়।

রত্নাকর বাবু একবার হরকালীর দিকে তাকাইয়া উপরে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

হরকালী জিজ্ঞাসা করিল, কোন খবর পাওয়া গেল না কি?

রত্নাকর বাবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, কি খবর পেয়েছিস রে?

"তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি।"

রত্নাকরবাবু দুই ঘরের মেজের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে হঠাৎ চক্ষু মুদিত করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

হরকালী বলিল "কাল সকালে থানায় খবর দিলে হয় না?"

রত্নাকর বাবু নির্ব্বাকের মত বসিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া হরকালীর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "তা' হয়।"

"কা'কে পাঠান যায় বল ত?"

যা'কে ইচ্ছে।

রত্নাকর বাবুর এমন ঔদাস্যের সুর চন্ননের অন্তঃকরণে বিঁধিয়া যাইতে লাগিল। নানারূপ অশুভ চিন্তায় হরকালী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। আর একটু নরম করিয়া মিনতির সহিত বলিল, "তুমি নিজে গেলেই ভাল হয় না?"

"তা' হয়।"

"না হয় সরকার মশায়কে পাঠিয়ে দেব"

"তাই দিও"

হরকালী কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তেমনি ভাবেই রত্নাকর বাবু বসিয়া রহিলেন। একটি অশ্রুবিন্দুও তখন ছিল না! নিশ্বাসের শব্দে পাছে তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া যায় সেই জন্যই যেন তা'ও প্রতি পলে পলে সভয়ে বন্ধ হইয়া যাইতেছিল।

চন্নন পালঙ্কের উপর হইতে একটি বালিস আনিয়া বলিল, "শোও বাবা।"

রত্নাকর বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ শোব বৈ কি মা।"

(৩)

বিশু চণ্ডালের চৌদ্দ পুরুষ দাইহাটির ধনী মুখুজ্যে জমিদারদের রায়ত। তাহাদের গ্রামটি সেখান হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ অন্তরে। তাহাদের জমি জমা এখন নিষ্কর। ইহা অনন্ত পূর্ব্বে ছিল না। রত্নাকর বাবুর পিতার আমলেই এরূপ হইয়াছিল। যেদিন গোবিন্দের জন্ম হইল, সেই দিন হইতে প্রতি সপ্তাহে এই পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বিশু চণ্ডাল অন্ততঃ একবার করিয়া গোবিন্দের "সোণামুখ" দেখিতে আসিত। কি জানি কিসের একটা নিগড় দিয়া সে যেন তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। বিশুর কেই বা ছিল? একটা ছোট ছেলে—তাও শুধু একটি বছরের হাসি-কান্নার, মায়া-মমতার অভিনয় করিয়া বেশ একদিন নীরবে চক্ষু বুজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। বিশুর ক্ষেত ছিল, আটচালা ছিল, ছোট কুঁড়ে ছিল। যত ফল-ক'ল হইত, তাহার অর্দ্ধেক রত্নাকর বাবুর বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিত। পাড়ার রামা ডোম বলিত, জমিদারের খোসামুদ কর্ত্তে জানে বটে।

বিশু চাঁড়াল একদিন জোর করিয়া তা'র মুখের উপর বলিয়াছিল, "বেশ কর্‌ব খোসামুদ কর্‌ব—তোদের কি?" তা'র পর কুঁড়ের দাওয়ায় একলাটি বসিয়া সেই রাত্রেই সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "গোবিন্দরে, প্রাণে মর্‌ব তবু তোর আশা ছাড়ব না।"

অত বড় জমিদার সদ্ব্রাহ্মণ তাঁর ছেলেকে হৃদয়ের প্রতি রক্তকণা দিয়ে ভালবাসে একটা চাঁড়াল! রত্নাকর বাবুর বন্ধু নরুর রায় প্রায় তাহাকে বলিত "যা' যা, যেরো, ছুঁস্‌নে গোবিন্দকে—চাঁড়ালের আস্পর্দ্ধা দেখ না—রাধে মাধব, রাধে মাধব!"

গোবিন্দ তখন পাঁচ বছরের শিশু। বিশু চণ্ডালের সেদিন আসিবার কথা। ঘনঘোর অমাবস্যা। গগন ভেদ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িয়া দিগ্‌বিদিক আলোড়িত করিয়া দিতেছিল। গোবিন্দ দরজার অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিল—যেন এক অন্ধের মত কা'র জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সেই সময়ে বিশুও হাজির। গোবিন্দ ছুটিয়া গিয়া তাহার কোলে উঠিয়া পড়িল। সেদিন নিকটে আর কেহ ছিল না। বিশু গোবিন্দকে নিজের বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে চুম্বনে চুম্বনে ভরাইয়া দিল।

নরুর রায় উপর হইতে দেখিতেছিল। রত্নাকর বাবুকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ হে, বেটার আস্পর্দ্ধাটা দেখ। হতভাগা চাঁড়াল কোথাকার—। রাধে মাধব, রাধে মাধব!"

রত্নাকর বাবুও সেদিন একটু চটিয়াছিলেন। তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ, বিশে, তুই বড্ড বাড়িয়েছিস—কিছু বলি না ব'লে বড্ড বাড়িয়েছিস। রায়জা একটু রসান দিয়া বলিল, "একে চণ্ডাল, তোকে ছুঁলে ত জাত যায়। তা'তে জমিদারের ছেলের সঙ্গে এত পেয়ার কিসের?—ছোট লোক ছোট লোকের মত থাক্‌বি, যা।"

কিন্তু রত্নাকর বাবু একটু বিচলিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ছি, কি ব'লছ নরুর?"

ছোটলোক চাঁড়াল আর এক দণ্ডও সেখানে ছিল না। ভীষণ দুর্য্যোগ আদৌ লক্ষ্য না করিয়া বিশু নিজের গ্রামের দিকে ছুটিয়া চলিল। সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে। সে এক দানবিক মূর্ত্তি! নিজের কুটীরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সে পঙ্কিল পথে অলস, ক্লান্তদেহে অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। সেই অবধি সকলেই জানে, বিশু চাঁড়াল আর গোবিন্দকে দেখিতে আসে না। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলে ইহা কিছুতেই লুকাইয়া রাখিবার জো থাকিত না যে, প্রায় নদীতে স্নান করিবার সময় গোবিন্দ বালুর চড়ায় লুকাইয়া বসিয়া কাহার সহিত শান্ত ধীরচিত্তে কত কথাই না কহিতেছে!

আজ বহুদিন পরে হঠাৎ গোবিন্দকে আবার একেলাই

পথিমধ্যে পাইয়াছে। বিশু চাঁড়াল কাঁদিতে কাঁদিতে সব শুনিল—কি বুঝিল, সেই জানে।

গোবিন্দ বলিল, "আমাকে আর কেউ দেখ্‌তে পারে না বিশু, বাবাও এক কথায় তাড়িয়ে দিলে।

একেবারে উপু হইয়া রাস্তায় বসিয়া বিশু বলিল, "ওঠ্ ত', গোবিন্দির কাঁধের ওপর ওঠ্‌ত একবার দেখি।"

গোবিন্দ নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার স্কন্ধে উঠিয়া বসিল।

প্রমত্ত হস্তীর ন্যায় বিশু ছুটিয়াছে। তাহার বয়স হইয়াছিল। কিন্তু অপরিসীম শক্তি তাহার! সে তন্ময় হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছিল।

গোবিন্দ হাঁকিল, "আর কতদূর, বিশু?" বিশুর এখন চমক ভাঙ্গিল।

চণ্ডালের ধমনীতে তখন কি এক অসুরের বিক্রম ফেনাইয়া উঠিতেছিল। সে আরও ছুটিল। হায়, তার প্রাণের অমূল্য নিধি আজ সে মাথায় পাইয়াছে! নিজের কুটীরের দাওয়ায় গোবিন্দকে নামাইয়া দিয়া বিশু একটি তালপাতার পাখা আনিয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

অনেক ক্ষণ মৌন থাকিয়া বিশু বলিল, "হাঁ, গোবিন্দির, তুই আসবার সময় চন্নন কি বল্‌ল রে?"

"ছেলে মানুষ, সে আর কি ব'লবে? বাবা আদর দিয়ে একেবারে মাথায় তুলে দিয়েছে।"

"অমন কথা বলিস নি'। তোরে কি ভালবাসে না জমিদার মশাই?"

গোবিন্দ সে কথায় আর কান না দিয়া বলিল, "ঐ চালাটা কতদিনের বিশু? ও ক্ষেত কার?"

ফলে ফুলে সেই ক্ষেত তখন ভরিয়া উঠিয়াছিল।

বিশু উত্তর দিল, "যেদিন তুই ছুটে এসে আমার কোলে চ'ড়ে ব'সলি, সেদিন থেকে তোর নামে ঐ ক্ষেতে আবাদ দিয়েছি।"

গোবিন্দ বলিল, "তা' হ'লে ওটা আমার?"

বিশু আর কি উত্তর দিবে! তা'র গলার স্বর কেমন ভাঙ্গিয়া বসিয়া যাইতেছিল; বলিল, "কোন্‌টা তোর নয়, গোবিন্দির?"

চাঁড়াল কাঠ-কুঠরা জ্বালাইয়া ভাত রাঁধিল। গোবিন্দকে কলা পাতায় বাড়িয়া দিয়া সম্মুখে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। গোবিন্দ সেদিন প্রাণ ভরিয়া বড়ই তৃপ্তির সহিত খাইল। বিশুও কিছু খাইল। তার-পর সেই রাত্রে দুইজনে মেটে দাওয়ার উপর শুইয়া গল্প করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

অতি প্রত্যুষে রামা ডোম তামাক খাইতে আসিয়া বলিল, "এ ছাবাল কা'র রে, বিশু?"

বিশু সোজা উত্তর দিল, "ও আমার ভেয়ের ছেলে, কাল রাত্তিরে এসেছে।"

রাত্রে ঘুমাইবার সময় গোবিন্দ পৈতাগাছটি কোমরে জড়াইয়া রাখিয়াছিল।

রামা ডোম চলিয়া যাইবার পর গোবিন্দ বলিল, "বিশু, পৈতাগাছটি তুলে রেখে দাও ত'।"

বিশুর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। অধমাধম চণ্ডাল সে!—ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র সে তাহার অপবিত্র হস্তে কলঙ্কিত করিবে! এতক্ষণ তাহার এরূপ কোন বিকারই ছিল না। হায় ভগবান, এ আবার কি ক'র্‌লে!

বিশু কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "গোবিন্দির, বাপ আমার, তোকে বুকের ভেতর থুয়েছি যে, কিন্তু—"

গোবিন্দ বুঝিয়াছিল বিশু মরিয়া গেলেও শুধু পৈতা-গাছটা কখন আলাদা স্পর্শ করিবে না। বলিল, "আচ্ছা আমি নিজেই পুকুরে ভাসিয়ে দেব।"

বিশু সে কথায় আদৌ কান দিল না। সে অন্য কি ভাবিতেছিল।

(৪)

"শুনছ হে মণ্ডল, বুড়োর আক্কেলের কথাটা একবার শুনছ। ছেলেটাকে কি না তাড়িয়ে দিলে। না হয় কিছু কর্জ্জই করেছিল?"

মণ্ডল হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া বলিল "তা টাকাটিও ত' বড় কম নয়—অনেক টাকা দেনা যে।"

নফর বলিল, "রত্নাকরেরই বা টাকার অভাবটা কি? হাড় কিপ্পন বটে!"

মণ্ডল কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিল, "তা আমাদের কি, রায় মশাই। ও সব কথায় থেকে কাজ কি?"

"না, এমনি কথার কথা ব'লছিলুম। আমার আর কি ছাই! সে আমার ধারে, না আমি তা'র ধারি?" কথাটা ক্রমশঃ গড়াইতেছে, ইহা মণ্ডল বেশ বুঝিল। একটু ঝুঁকিয়া বলিল, "তা যাক, ও সব কথায় আর কাজ নেই।"

"না আমাদের আর কি দরকার? কিছু দশ বিশ টাকা লাভও হবে না যে, আমরা এদের কথায় থাকব। তবে রাগও হয় কি না, মুখুজ্যেকে একবার আচ্ছা ক'রে ক'লে শুনিয়ে দিতে পারি ত আমার গায়ের ঝালটা মেটে।"

মণ্ডল আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না।

রায়জা এইবারে মহা উত্তেজিত হইয়া বলিল, "না, শোনা'ব না! আমি আর শোনা'ব না! তোমার মত গাধা হ'য়ে বসে থাকব।"

(৫)

প্রায় দু' বছর কাটিয়া গিয়াছে। রত্নাকরবাবু গোবিন্দের আর কোন সন্ধানই জানিতে পারেন নাই। তাঁ'র লোক-

লক্ষর এক রকম সকল রায়তের ঘরেই সন্ধান করিয়াছিল। সেই দিনটি বিশুর বড়ই বিপদের দুশ্চিন্তায় কাটিয়াছে। তা'র গোলার পাশেই মস্ত বাঁশ বন। বিশু সেইখানে গোবিন্দকে লুকাইয়া রাখিল। সেই একটা দিনের ফাঁড়া নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যাইবার পর বিশু ভগবানের পায়ের নীচে তা'র সব বোঝাটুকু ঢালিয়া দিয়া বেশ দৃঢ় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিল।

একদিন হরকালী রত্নাকরবাবুকে বলিল, "একটা কিছু বিহিত কর। না হয় জনকতক গোয়েন্দা লাগিয়ে খোঁজবার চেষ্টা কর"।

রত্নাকরবাবু বলিলেন, "যাক সে হতভাগা; ইচ্ছে হয় আস্‌বে। আমার অত টাকা সস্তা নয়।"

হর কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "টাকাই কি এত বড় হ'ল দাদা?"

রত্নাকর বাবু একেবারে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "বড় ছোটর অত হিসেব আমি রাখিনি। তা'র এত কি গুমোর, যে দু'বছরের মধ্যে একবারও আস্‌তে পার্‌লে না। আমি তাকে মাফ কর্ব্ব না। সে বেল্লিক।"

কি একটা ভাবিয়া হরকালীর চক্ষু জলে ভিজিয়া আসিতেছিল। সে ভাঙ্গা স্বরে উত্তর দিল, "আসা দূরে থাক্, বেঁচে আছে কি না তাও ত' সন্দেহ।"

কথাটা শুনিয়া রত্নাকর বাবুর বুকের ভিতর ছনাৎ করিয়া উঠিল। তিনি জানালার দিকে তাকাইয়া ছিলেন। যতদূর দেখা যায়,আকাশের ভিতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। তার প্রতি পরতে পরতে যা' ছিল, সব যেন নিমেষে স্বচ্ছ হইয়া রত্নাকর বাবুর চ'খের সামনে ফুটিয়া উঠিল।

তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া হর বলিল "চুপটি ক'রে ব'সে থাক্‌লে ত' চ'লবে না, দাদা। রায় গিন্নীও সেদিন বেড়া'তে এসে কত কথাই না ব'লে গেল।"

রত্নাকর বাবু হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কি ব'ললে রে, হর। আমাকে বুঝি খুব কতকগুলো গালিগালাজ করে গেল—কিপ্পন, নিষ্ঠুর, আরও না জানি কত কি। কিরে, আর কথা নেই যে।"

নামাবলীটা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া হরকালী উত্তর দিল, "না, ওসব কিছু না। তবে এমনি পাঁচটা কথা বলে বৈ কি।"

রত্নাকর বাবু বলিলেন, "আর ভাবিসনে, হর, যা' হবার তাই হবে।"

হরকালী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দাইহাটার বৃদ্ধ জমিদার সেদিন একেলা বসিয়া সত্যই পাগলের অভিনয় করিতেছিলেন। তিনি পালঙ্ক হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্র বিকট স্বরে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। চোখে একটা বিকারের ভাব কেমন আপনিই জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া সটান বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

আর ভাবিতে পারিলেন না। গাঁয়ের লোকদের বিদ্রূপবাণী আজ সত্যই যেন এক একটা খাঁড়ার মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহার আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি একেবারে সোজা বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন, "মা রে, মা জননী!"

চন্নন ঘরে প্রবেশ করিতেই রত্নাকর বাবু কহিলেন, "এক ডাকে সাড়া দেয় এমন কার মা আছে বল্‌ত'?"

চন্নন পালঙ্কের উপর বসিয়া বলিল, "কি কাজ ক'র্ত্তে হবে বাবা?"

"কাজ ছাড়া কি আর কথা নেই, মা?"

চন্নন নিশ্চিন্ত হইয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল।

রত্নাকর বাবু বলিলেন "হ্যাঁ মা, রায় গিন্নী নাকি সেদিন আমার নামে কি সব মিথ্যে গাল দিয়ে গেছে।"

চন্নন যাহা শুনিয়াছিল তাহার একটী কথাও বাদ না দিয়া সোজা বলিয়া গেল। রত্নাকর বাবুর কাছে সে কখনও মিথ্যা কথা বলে নাই। তা'রপর একটু বসিয়া থাকিয়া বলিল, "স'ন্ধ্যে হ'চ্ছে আলোটা জ্বেলে আনি।"

রত্নাকর বাবু সব শুনিলেন। মুমূর্ষের ন্যায় কান খাড়া করিয়া শেষ কথাটী পর্য্যন্ত শুনিলেন। চন্নন আলো লইয়া ফিরিয়া আসিলে রত্নাকর বাবু বেশ স্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "আজ ত' আর বেড়া'তে যাওয়া হ'ল না, চন্নন?"

চন্নন কহিল, "আজ আর গিয়ে কাজ নেই—তোমার শরীরটা খারাপ।"

চন্ননদের বাড়ীর কিনারায় তা'দের যে "বাঁধা পুকুর" ছিল সেখানে প্রায়ই সন্ধ্যার সময় রত্নাকর বাবুকে লইয়া সে বেড়াইত যাইত।

রত্নাকর বাবু নীরব হইয়া রহিলেন। "দরজায় খিল দিয়ে দাও ত' মা"

চন্নন দ্বিরুক্তি না করিয়া তখনই খিল আঁটিয়া দিল।

রত্নাকর বাবু তেমনই বসিয়াছিলেন। আজ তাঁহার ললাটে কোন চিন্তার রেখা ছিল না—তাঁহার সেই সময়কার ভাব দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইত যে, তাঁহার দেহে একটা অঙ্গহীনের শ্লথ শক্তি ব্যতীত যেন আর কিছুই ছিল না।

তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "মা আমার, একটা জিনিষ দেখ্‌বি?" চন্ননের কোন আগ্রহ না থাকিলেও ধীরে উত্তর দিল, "কি?"

ঘরের মধ্যস্থলে একটী ছোট কার্পেট পাতা ছিল। রত্নাকর বাবু তাহা টানিয়া ফেলিয়া দিলেন। তাহার নিম্নে

একটা পাতলা লোহার পিঁড়ি! কড়া ধরিয়া টানিতেই তাহা উঠিয়া আসিল। চন্নন দেখিল, নিম্নে অন্ধকার সুড়ঙ্গ। রত্নাকর বাবু আলো আনিয়া বলিলেন, "চল্ আমরা দু'জনেই নামি। কোন ভয় নেই রে।"

চন্নন দেখিল, অসংখ্য মাটীর কলসী রহিয়াছে।

রত্নাকর বাবু টলিতে টলিতে তথায় বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "এই দেখ্ রে আমার দৌলত। শুধু এর জন্মেই আমায় এত গাল শুনতে হয়। তা'রা বলে আমি চামার—দয়া নেই, মায়া নেই—একখণ্ড পাথর আমি। যত পারিস্ নে'—আঁচল ভ'রে তুলে নিয়ে যা, যত ইচ্ছে বিলি ক'রে দে। এ সব তোর জন্মেই রেখেছিলাম।"

চন্নন জানিত বৃদ্ধ এক একদিন এত উত্তেজিত হইয়া উঠিত যে, সত্যই তাঁহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইত। সে খপ্ করিয়া রত্নাকর বাবুর হাত ধরিয়া বলিল, "উপরে চল,—এখানে আর এক দণ্ডও থাকা হবে না।"

রত্নাকর বাবু কাঠের পুতুলের মত তা'র সঙ্গে উপরে চলিলেন।

(৬)

গোবিন্দ বলিতেছিল, "বিশু, আজ আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছে না। কি করি বল ত'।" বিশু সোজা হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন রে, গোবিন্দির?"

"কি ক'রে ব'লব। আজ সত্যিই মনটা আমার কেমন আনচান্ ক'রছে।"

"কিছু ব্যামো স্যামো হয় নি ত'?"

গোবিন্দ একেবারেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আমার এখানে থাকতে আর ভাল লাগ্‌ছে না!"

বিশু তাহার হাত ধরিয়া নীচের দিকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, গোবিন্দির এখনি' চ'লে যাচ্ছিস্ নাকি রে।"

গোবিন্দ হাত ছাড়াইয়া বলিল, "তুমি আমায় রেখে এস আজ। কদিন ধ'রেই চন্ননকে দেখতে বড় ইচ্ছে হ'চ্ছে। বাবা আর পিসিমা না জানি কত কাঁদ্‌ছেন।"

"এখনি কি যাবি, গোবিন্দির? রাত্তির যে ঘ'নিয়ে আসছে রে?"

গোবিন্দ বলিল, "না, এখনি চল, বিশু।"

বিশু একটা কথাও কহিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর হঠাৎ বলিল, "তবে একবার কাঁধে ওঠ ত দেখি, গোবিন্দির।"

গোবিন্দকে স্কন্ধে লইয়া সেই রাত্রে বিশু ছুটিল। খানিক দূর গিয়া গোবিন্দ বলিল, "কাজ নেই, বিশু, ফিরে চল।"

সে স্থানটি জঙ্গল—বেশ নিবিড়, আঁধার জঙ্গল। গাছের প্রত্যেক পাতাগুলো যেন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া ছিল। বিশু গোবিন্দকে সেইখানে নামাইয়া দিল। সে আর এক পাও চলিতে পারিতেছিল না—কথা কহিবে কি! চ'খের জল বুকে নামিয়া আসিয়া যেন তাহার শ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিতেছিল। সে গোবিন্দকে একেবারে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "গোবিন্দির রে, আমায় পরখ করবার জন্মে কি অমন কথা বলেছিলি।"

গোবিন্দ কহিল "কি ক'রছ বিশু,—পাগল হ'লে না কি?"

চণ্ডাল একটু অন্যমনস্কভাবে কহিল "আর যা'বার কথা বল না, গোবিন্দির। এই যেন শেষ।

সেই রাত্রে বিশুর মেটে দাওয়ায় দুই জনে শুইয়া রহিল। ফুর ফুর করিয়া বাতাস আসিতেছিল। কিন্তু গোবিন্দর কিছুতেই ঘুম হইল না। সে বিশুর গলা জড়াইয়া শুইয়া রহিল। তার কেবলই ভয় হইতেছিল, আজ বিশু বুঝি তা'কে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইবে। সে আর কোন উপায় করিতে না পারিয়া বিশুকে আরও জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকের ভিতরে মাথা গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

তখনও ভোর হয় নাই। বিশু উঠিয়া তামাক খাইতেছিল।

সত্যিই ত' চন্ননের কথা একবারও ভাবিনি। গোবিন্দিরকে একবার তা'র সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু মন যে বোঝে না আমার! বিশু যতই ভাবিতে লাগিল, তার মাথার প্রতি রক্তবিন্দু যেন জমাট হইয়া আসিল। ওঃ সে বড় ভয়ানক!—একবার চ'লে গেলে যদি আর না আসে,—তা হলে! সে হুঁকা হাতে করিয়া এক দৃষ্টে গোবিন্দরে মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। গোবিন্দ তখন জাগিয়াছে। বলিল, "কি দেখছ, বিশু?"

"একবার তোর সঙ্গে চন্ননের দেখা করিয়ে দিতে পারি!—লুকিয়ে, লুকিয়ে—বুঝ্‌লি, গোবিন্দির—চেষ্টা কর্ব্ব না কি?"

গোবিন্দ তেমনিই শুইয়া রহিল। খানিক ভাবিয়া উত্তর দিল "না, বিশু, কাজ নেই—তোমায় ছেড়ে আর যা'ব না আমি।"

বিশুর বড় বড় চোখ দু'টি একবার জ্বলিয়া উঠিল—সে আর ব'লবে কি! চ'খের জলে তা'র বলবার কথাগুলো জড়িয়ে গিয়ে আপনি থেমে গেল।

(৭)

রত্নাকরবাবু একেলা বসিয়াছিলেন। এমন সময়ে চন্নন

আসিয়া বলিল "আজ একটু পুকুর পাড়ে বেড়াতে যাবে, বাবা।" রত্নাকর বাবু অনেকক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিলেন "আজ আর আমার হাত পা ন'ড়ছে না কেন বল্ ত, মা—সব যেন আল্‌গা হয়ে আস্‌ছে—আমায় ধ'রে ধ'রে নিয়ে যেতে পারিস ত চলি।"

চন্নন হাত বাড়াইয়া দিল। রত্নাকর বাবু উঠিয়াই তাহার স্কন্ধে ভর দিয়া যাইতে লাগিলেন।

নিজের সখের পুকুর সেটি—কি স্বচ্ছ তার জল!—কিবা তার গাছে গাছে ঘেরা সৌন্দর্য্য!.

চন্নন যেদিন মা লক্ষ্মী সাজিয়া ছেলের বৌ হ'য়ে তাঁর ঘরে আসিল, সেই সময়ে বিবাহের একটা স্মৃতির জন্য পদ্ম দিয়ে সাজান এই পুকুরটি রত্নাকর বাবু খনন করাইয়াছিলেন। চন্নন নিজের আঁচল খুলিয়া একটা সিঁড়ির মধ্যস্থল ঝাড়িতে ঝাড়িতে "বলিল এইখানে বোস, বাবা।"

রত্নাকর বাবু ঝুপ করিয়া বসিয়া বলিলেন "তুই দাঁড়িয়ে থাকবি রে?"

চন্নন আর একটা নীচের সিঁড়িতে বসিয়া পড়িল। সুন্দর শোভা সে সময়ের! গোধূলিও নহে, ঠিক বৈকালও নহে—ভারি চমৎকার সে দৃশ্য!

কর্ত্তা বাবুকে কিছু ফল-ফসল দিবার জন্য বিশু সেদিন অনেক দিব্য দিয়া গোবিন্দকে ঘরে রাখিয়া দাইহাটিতে আসিতেছিল। কিছু দূর হইতে সে দেখিল চন্নন একেলাই পুকুর-পাড়ে কি একটা কুড়াইয়া লইতেছে। সে বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইল কর্ত্তা বাবু চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "যেয়োনা, মা জননী, আর যেয়োনা, বড় পেছল ওখানে।"

"না, এখনি ফিরে যাচ্ছি, বাবা" বলিতে বলিতে কেমন নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া চন্নন গড়াইতে গড়াইতে জলের ভিতর চলিয়া গেল। তারপর হাঁফাইয়া ভাসিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ রত্নাকর বাবু একেবারে তিন চারিটা সিঁড়ি একত্রে ডিঙ্গাইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিলেন; কিন্তু কি করিবেন! অথর্ব্ব শক্তিহীন তিনি যে! চীৎকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,"কে আছিস রে, র'ক্ষে কর চন্ননকে র'ক্ষে কর,—আমার যা আছে সব দিয়ে দেব, র'ক্ষে কর র'ক্ষে কর।" বলিতে বলিতে তিনি তাঁহার সরু সরু দশটা আঙুলে আকাশ আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে করিতে সেইখানেই রক্তহীন নির্জ্জীবের মত পড়িয়া গেলেন।

বিশু ধামাটা নামাইয়া রাখিয়া একেবারে ছুটিয়া জলে আসিয়া পড়িল। কাজটা বিশুর নিকট অতি সোজা। যেন কিছুই না। সে চন্ননকে উঠাইয়া বেশ কৌশলে তা'র জ্ঞান সঞ্চার করিল।

রত্নাকর বাবু একটু সংজ্ঞা পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। "কে রে, বিশু না কি?"

বিশু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চন্ননের অর্দ্ধ অচেতন দেহ নিজের স্কন্ধে ফেলিয়া বলিল, "চল কর্ত্তা বাবু।"

বৃদ্ধ যেন চোখ বুজিয়াই তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল।

রত্নাকর বাবু বলিতেছিলেন "বিশে এ বাড়ী-ঘর, টাকা কড়ি সব এখন তোর। আমার পণ মিথ্যে হবে না। আমাদের শুধু চার্‌টি চার্‌টি খেতে দিস্।"

বিশু রত্নাকর বাবুর পায়ের তলায় মাথা গুঁজিয়া কহিল, "কি ব'লছ, কর্ত্তাবাবু। চাঁড়ালের টাকায় কি দরকার?"

সেই মুহূর্ত্তেই বিশু ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া গেল। গোবিন্দকে স্কন্ধে লইয়া ঘণ্টা চারেক পরে যখন সে আবার ফিরিয়া আসিল, তখন বেশ রাত্রি হইয়াছে।

সে অতি স্পষ্ট উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিল,"কর্ত্তাবাবু, কর্ত্তাবাবু আর কিছু চাই নি—গোবিন্দির আমার কাছে থাক্‌বে বলে দাও, ফিরে যাচ্ছি।"

বৃদ্ধ রত্নাকর বাবু সেদিন যৌবনের বল পাইয়াই যেন উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। সেখানে নির্ব্বাকের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর দুই পা অগ্রসর হইয়া একেবারে বিশুর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "চাঁড়াল, চাঁড়াল, আমার পণ মিথ্যে হয় না। গোবিন্দ তোরই রইল।"

রত্নাকর বাবু সেখানে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বলিলেন, "গোবিন্দরে, তোকে পেয়েও পেলুম না।"

তিনি প্রায় অচেতন হইয়া সেখানে পড়িয়া রহিলেন।

সাহিত্য-সমাচার।

শিলং-পাহাড়—অনেকগুলি হাফটোন্ চিত্র-সবলিত অভিনব গ্রন্থ। ছাপা, কাগজ পরিপাটী—শিল্কে বাঁধান। মূল্য ১৷৹

বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থখানি পূজার সময় পাঠক-সাধারণকে উপহার দিয়াছেন। তাঁহার এই দান পাঠক-বর্গ সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিয়া স্বজনকে উপহার দিলে, পূজার সময়টা সুখেই কাটিবে।

আলোচ্য গ্রন্থখানিকে ঠিক ভ্রমণ-কাহিনী বলা চলে না। সেইজন্যই সম্ভবতঃ গ্রন্থখানির 'শিলং-ভ্রমণ' নামকরণ হয় নাই। ইহাতে একাধারে ইতিহাসের জ্ঞান ও ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সমাবেশ হইয়াছে। পাহাড়ের খাসিয়া জাতির ইতিহাসটুকু শিক্ষাপ্রদ। চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা প্রভৃতি তীর্থস্থানের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন একটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিল। লেখকের পর্য্যবেক্ষণের শক্তি সূক্ষ্ম, অনুসন্ধিৎসা প্রবল এবং ঐকান্তিকতা প্রশংসনীয়।

গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল, বর্ণনা মনোহর। উপন্যাসের মত কৌতূহলোদ্দীপক ও পাঠেচ্ছাবর্দ্ধক। আশা করি, পুস্তকখানি সাধারণ্যে যথেষ্ট আদর লাভ করিবে।

-পরিবেশণ ও সমালোচনী।

১৯শ ভাগ
৬ষ্ঠ খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩২৬

২য় সংখ্যা

বিশ্বব্যাপী কুসংস্কার।

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্যবিশারদ।]

অনেকে মনে করেন, আমাদের দেশই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন; কিন্তু তাহা নহে। য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানেও এদেশের স্থায় অনেক কুসংস্কার আছে। পূর্ব্বকালে যেরূপ এদেশে ধর্ম্মের জন্য নর-বলি দেওয়া হইত—খন্দজাতি শস্যলাভের আশায় মানুষ চুরি করিয়া দেবতার নিকট বলি দিত, প্রাচীন ফিনিসীয়গণও সেইরূপ আপনাদের বাণিজ্য-জাহাজ চড়ায় ঠেকিয়া বদ্ধ হইলে অথবা ব্যবসায়-কার্য্যের কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইলে দেবতার প্রীতির নিমিত্ত নর-বলি প্রদান করিত।

সেকালে মেক্সিকোবাসীরাও অভিষ্টসিদ্ধির জন্য তাহাদের প্রসিদ্ধ রণ-দেবতা "Huitzilopochtle"র সম্মুখে নর-বলি প্রদান করিয়া মানুষের হৃৎপিণ্ডগুলি অলঙ্কাররূপে দেবতার অঙ্গে সাজাইয়া দিত।

পরীতে সন্তান লইয়া যাওয়ার কথা ভারতের স্থায় পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও প্রচলিত আছে। য়ুরোপবাসীরা মনে করে, যে সকল বালক-বালিকা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই তাহারাই পরীদ্বারা অধিক আক্রান্ত হয়। নব বিবাহিতা বধূর প্রতিও পরীর দৃষ্টি পড়ে। স্কটল্যাণ্ডের লোকেরা পরীর নজর হইতে সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য শিশুর অঙ্গে "Toad Stone" নামক এক প্রকার পাথর বাঁধিয়া দিত। এখনও আয়ারল্যাণ্ডের অজ্ঞ লোকেরা প্রসবান্তে প্রসূতীর পাঁচুড়ে রোগ (Puerperal disease) হইলে তাহাকে পরীতে পাইয়াছে বলিয়াই মনে করে।

ডাইনীর উৎপাতের কথাও শুধু ভারতে নিবদ্ধ নহে। ইটালীতে এখনও ডাইনীর ভয় বিলক্ষণ আছে। পাছে ডাইনীরা গৃহপ্রবেশ করে এই ভয়ে তথাকার অধিবাসীরা দ্বারে গরুর শিং ঝুলাইয়া রাখে। কেহ কেহ বা আত্মরক্ষার জন্য দেহে এক টুকরা শৃঙ্গ ধারণ করিয়া থাকেন। একবার ইটালীর বিখ্যাত রাজনীতিক ধীমান্ ক্রিস্‌পী মহোদয় কোন সভায় তর্কে পরাজিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"আজ আমি শৃঙ্গ ধারণ করিয়া আসি নাই বলিয়াই পরাজিত হইলাম।"

এক সময়ে ইংলণ্ডও ডাইনীর উৎপাতে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ল্যাঙ্কাশায়ারেই ডাইনীদের প্রধান আড্ডা ছিল। তাই তখন "Lancashire witches"-নামে লোক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত। রাজা James ডাইনীর হস্ত হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য এক কঠোর আইন বিধিবদ্ধ করেন। Hopkins নামক জনৈক মহাবলশালী রাজপুরুষ তৎকালে ডাইনী ধরিবার জন্য নিযুক্ত হন। তিনি নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া ডাইনী বুড়ীদের খুঁজিয়া বাহির করিতে লাগিলেন এবং পরীক্ষার জন্য হস্তপদ বন্ধন করতঃ জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যে হতভাগিনী ভাসিয়া উঠিত তাহাকেই ডাইনী বলিয়া নিশ্চয় করা হইত। সেই উপলক্ষে ইংরাজ কবি Butler এই গীত গাহিয়াছেন,

"Fully empowered to treat about
Finding revolted witches out.
And has he not, within this year;

. threescore of them in one shire?
...me only for not being drowned,
And some for sitting above ground."

এ দেশের ন্যায় দুষ্ট ভূতকে তুষ্ট করা এবং তাহাদের কুদৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করার কথাও পাশ্চাত্যদেশে শুনিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে স্কটল্যাণ্ডের গৃহস্থগণ গৃহের সন্নিকটে অনিষ্টকারী ভূতের জন্য এক এক খণ্ড জমি ফেলিয়া রাখিতেন। ঐ জমির নাম "Goodman's Acre"। তখন কাহারও চাষ-আবাদে বা অপর কোন কার্য্যে ঐ জমি ব্যবহার করিবার সাধ্য ছিল না।

এখনও স্থানে স্থানে সাধারণ লোকেরা প্রত্যহ মধ্যাহ্ন-ভোজনকালে দুষ্ট ভূতের জন্য কিছু কিছু মাংস রাখিয়া দেয়। তাহারা মনে করে এইরূপ ভোজ্য দান করিলে ভূত তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে।

মন্ত্রপাঠে ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগাইবার প্রথা ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। য়ুরোপেও যে এ প্রথা একেবারেই ছিল না, তাহা মনে করিবেন না। সম্রাট Catoর রাজত্বকালে রোমানেরা হস্ত-পদাদি ভগ্ন হইলে মন্ত্র পাঠ করিতে বসিত। জার্ম্মানির হস্তলিখিত পুরাণেও বর্ণিত আছে, Woden ও Balder নামক দুই ব্যক্তি অশ্বারোহণে মৃগয়ায় বাহির হইলে দৈবক্রমে Balderএর অশ্বটি খঞ্জ হইয়া যায়। তখন Woden বন্ধুর বাহনটিকে নিরাময় করিবার জন্য অনেক মন্ত্রপাঠ করিয়াছিলেন।

"R. Chamber's Popular Rhymes of Scotland"-পাঠে অবগত হওয়া যায়, সে দেশে কাহার হাত পা মচকাইয়া যাইলে অমনই মন্ত্রবিৎ ডাক্তারকে আহ্বান করা হইত। তিনি নয়টি গ্রন্থিযুক্ত একটী কৃষ্ণবর্ণের সূতা লইয়া পীড়িত স্থানে জড়াইতে জড়াইতে অনুচ্চস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতেন। পাঠক দেখিবেন, সে মন্ত্রের ভাব অনেকটা আমাদের "ঝাড়ান" মন্ত্রের ন্যায়।

"Our Lord rade,
His foal's foot slade,
Down he lighted,
His foal's foot righted.
Bone to bone.
Sinew to sinew,
Blood to blood,
Flesh to flesh
Heal in name of the Father, Son and Holy Ghost."

এদেশে দেখা যায়, বালকবালিকারা হাঁচিলে প্রাচীনারা তৎক্ষণাৎ "জীব সহস্র" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। দুই হাজার বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে গ্রীকদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহার সন্তান হাঁচিলেই "Zeus protect thee" বলিয়া ভগবানের নিকট তাহার মঙ্গল কামনা করিত। এখনও বিলাতের সন্তান-পালিকারা শিশু হাঁচিবামাত্র "Bless the child"—শব্দ উচ্চারণ না করা মহা অন্যায় কার্য্য বলিয়া মনে করেন।

আমরা প্রাতে শয্যাত্যাগের পর অথবা কোন কার্য্যানুষ্ঠানের অব্যবহিত পূর্ব্বে যাহার মুখদর্শন করি, তাহারই শুভাশুভত্বের উপর সেই দিনের সুখ-দুঃখ বা সেই কার্য্যের মঙ্গলামঙ্গল নিরূপণ করিয়া থাকি। পাশ্চাত্য দেশবাসীরাও এ নিয়ম অমান্য করেন নাই। তাঁহারা ইহাকে "first foot" বলেন। সে দেশে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের "first foot" বা প্রথম মুখদর্শন বিশেষ অশুভজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে যে সকল রমণীর চরিত্রে একবার কলঙ্ক-কালিমা পড়িয়াছে তাহাদের দর্শনে কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই লোকে বিশ্বাস করে।

এদেশে যেমন প্রবাদ আছে বামন বা শ্মশ্রুহীন ব্যক্তির দর্শন ঘটিলে আর গৃহের বাহির হইতে নাই, য়ুরোপেও সে প্রবাদ আছে কি না জানি না; কিন্তু তথায় কোন কোন কার্য্যে পুরোহিতদর্শন নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া গণ্য হয়। কথিত আছে, পূর্ব্বযুগে শিকারীরা যাত্রাকালে পুরোহিত দেখিলে আর সে দিবস কোন ক্রমেই শিকার মিলিবে না মনে করিয়া ম্লানমুখে গৃহে ফিরিয়া আসিত। এখনও নাবিকেরা জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বক্ষণে ধর্ম্মযাজকের মুখ দর্শন করিলে সমুদ্র-পথে ঝড় বা সেইরূপ কোন একটা বিপদের আশঙ্কা করে।

আমাদের দেশের "কাকচরিত্রের" ন্যায় রোমানেরাও একদিন পাখীর স্বরে বা উহাদের উড়িয়া বসিবার ভঙ্গীতে নিজ নিজ প্রশ্নের উত্তর পাইত। [illegible]

দক্ষিণে উড়িয়া বসিলে তাহারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে বলিয়া মনে করিত, কিন্তু বামে কার্য্যহানির সম্ভাবনাই বুঝিত।

প্রাচীন রোমের অধিবাসীর যুদ্ধযাত্রায় পিঞ্জরাবদ্ধ মুরগীদিগকে বাহিরে আনিয়া শস্য দিয়া আপনাদের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিত। মুরগী আনন্দিতমনে শস্য খাইলে নিশ্চয়ই যুদ্ধে জয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিত; আর শস্য ত্যাগ করিয়া উড়িয়া যাইলে কোন ক্রমেই জয়াশা নাই বুঝিয়া তাহারা সে দিবস যুদ্ধযাত্রায় কোন উদ্যোগই করিত না।

আমেরিকার আদিম অধিবাসী রণপ্রিয় আরেকান্ (Arancans) জাতিরাও ঐরূপ "কাকচরিত্রের" সাহায্যে আপনাদের ভাবী শুভাশুভ পরিজ্ঞাত হইত।

আমাদের যেমন "আষাঢ়ে ধনধান্যভোগরহিতা নষ্টপ্রজা শ্রাবণে" ইত্যাদি বিবাহে মাস নিষেধ আছে, য়ুরোপেও সেইরূপ শুভবিবাহের দিনস্থিরকালে নিষিদ্ধ মাস ও বারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার প্রথা আছে। তথাকার স্ত্রীলোকেরা মাসের মধ্যে "মে" মাস এবং বারের মধ্যে শুক্রবারটি বিবাহকার্য্যে বিশেষ অশুভ বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের এই বিশ্বাস এতাদৃশ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, মহাজ্ঞানী পুরুষেরাও হঠাৎ ইহার বিপক্ষাচরণ করিতে সমর্থ হ'ন্ না।

এ দেশের ন্যায় য়ুরোপেও "পাল-পার্ব্বণ" লাগিয়া আছে। সেণ্ট্ বা পীরের আবির্ভাব ও তিরোভাব উপলক্ষে নানা ক্রিয়ানুষ্ঠানের অভাব নাই। আমরা যেমন মনে করি দশহরায় মেঘ ডাকিলে সে বৎসর সর্পভয় থাকে না, বৎসরের অমুখ তারিখে দুই ফোঁটা জল পড়িলে বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হ'ন, বিলাতের লোকেরাও সেইরূপ মনে করেন—

"If St. Paul's day be fair and clear,
It doth betide a happy year;
If blustering winds do blow aloft;
Then wars will trouble our realm ful oft;
And if it chance to snow and rain,
Then will be dear all sorts of grain."

আমরা বিশ্বাস করি, শনি-মঙ্গলবারে বৃষ্টি নামিলে সপ্তাহ কাল বারিবর্ষণ হয়; য়ুরোপবাসীদেরও বিশ্বাস আছে জুন মাসের St. Vitus's day নামক দিনে বৃষ্টি হইলে এক মাস ধরিয়া বৃষ্টি হইতে থাকে।

পরাজয়

[শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল, বি-এস্-সি]

(১)

বুঝি বা লালু সেখ তাহার জানের জান, কলিজার কলিজা প্রথমা পত্নী দিলজানের অকাল মৃত্যুতেও বক্ষে এত ব্যথা পায় নাই, যেমন ব্যথা আর একমাত্র কন্যার নিরুদ্দেশে তাহার বক্ষে বাজিয়াছিল। সে যে তাহাকে তাহার মৃতা জননীরই স্নেহধারা দিয়া এই সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছিল। প্রভাতে উঠিয়া যখন লালু সেখ দেখিল তাহার কন্যার কক্ষদ্বার মুক্ত, শয্যা শূন্য, দ্রব্যাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, তখনি তাহার মস্তিষ্কে এক ঝলক উত্তপ্ত রক্ত ঠেলিয়া উঠিয়া তাহার বুকখানাকে তোলপাড় করিয়া দিল; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার হইয়া আসিল। দারুণ শীতের প্রভাতেও সে তার পাণ্ডুবর্ণ ললাটদেশ স্বেদযুক্ত করিয়া কম্পিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে ডাকিতে লাগিল, 'রাজা বৌ! এদিক দিয়ে আয় ত'।

প্রসাধনকার্য্যনিরতা রাজা-বৌয়ের মুখ চোখে যেন একটা তৃপ্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল। সুদক্ষ অভিনেত্রীর মত কিন্তু হঠাৎ সে হাসির স্থানে একটা বিষম উৎকণ্ঠার চিহ্ন ফুটাইয়া তুলিয়া লালু সেখের সম্মুখীন হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেনে কি হয়েছেক গা?"—লালু একটা ভীত-ত্রস্ত দৃষ্টির সহিত নিতান্ত অসহায়ের মত কম্পিত প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কি রাজা বউ, এত ভোরে পরী গেল কোথা?" রাজা বউ বজ্রাহতের মত কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া নিস্পন্দনেত্রে ঘরের ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তাই ত! হ্যাঁগা! এ সব কি? রাত্রে একজন্তর খাটপানে দেখে আসি।"

লালু সেখ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মস্তিষ্কের ভিতর একটা প্রবল ঘূর্ণী বায়ু উঠিয়া, বিশ্বের প্রান্ত হইতে প্রচণ্ড আঘাতে যেন তাহাকে কোন দূর শূন্য আঁধারের

. threescore of them in one shire ?
...me only for not being drowned,
And some for sitting above ground."

এ দেশের ন্যায় দুষ্ট ভূতকে তুষ্ট করা এবং তাহাদের দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করার, কথাও পাশ্চাত্যদেশে শুনিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে স্কটল্যাণ্ডের গৃহস্থগণ গৃহের সন্নিকটে অনিষ্টকারী ভূতের জন্ত এক এক খণ্ড জমি ফেলিয়া রাখিতেন। ঐ জমির নাম "Goodman's Acre"। তখন কাহারও চাষ-আবাদে বা অপর কোন কার্য্যে ঐ জমি ব্যবহার করিবার সাধ্য ছিল না।

এখনও স্থানে স্থানে সাধারণ লোকেরা প্রত্যহ মধ্যাহ্ন-ভোজনকালে দুষ্ট ভূতের জন্য কিছু কিছু মাংস রাখিয়া দেয়। তাহারা মনে করে এইরূপ ভোজ্য দান করিলে ভূত তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে।

মন্ত্রপাঠে ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগাইবার প্রথা ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। য়ুরোপেও যে এ প্রথা একেবারেই ছিল না, তাহা মনে করিবেন না। সম্রাট Catoর রাজত্বকালে রোমানেরা হস্ত-পদাদি ভগ্ন হইলে মন্ত্র পাঠ করিতে বসিত। জার্ম্মানির হস্তলিখিত পুরাণেও বর্ণিত আছে, Woden ও Balder নামক দুই ব্যক্তি অশ্বারোহণে মৃগয়ায় বাহির হইলে দৈবক্রমে Balderএর অশ্বটি খঞ্জ হইয়া যায়। তখন Woden বন্ধুর বাহনটিকে নিরাময় করিবার জন্য অনেক মন্ত্রপাঠ করিয়াছিলেন।

"R. Chamber's Popular Rhymes of Scotland"-পাঠে অবগত হওয়া যায়, সে দেশে কাহার হাত পা মচকাইয়া যাইলে অমনই মন্ত্রবিৎ ডাক্তারকে আহ্বান করা হইত। তিনি নয়টি গ্রন্থিযুক্ত একটী কৃষ্ণবর্ণের সূতা লইয়া পীড়িত স্থানে জড়াইতে জড়াইতে অনুচ্চস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতেন। পাঠক দেখিবেন, সে মন্ত্রের ভাব অনেকটা আমাদের "ঝাড়ান" মন্ত্রের ন্যায়।

"Our Lord rade,
His foal's foot slade,
Down he lighted,
His foal's foot righted.
Bone to bone.
Sinew to sinew,
Blood to blood,
Flesh to flesh
Heal in name of the Father, Son and Holy Ghost."

এদেশে দেখা যায়, বালকবালিকারা হাঁচিলে প্রাচীনারা তৎক্ষণাৎ "জীব সহস্র" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। দুই হাজার বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে গ্রীকদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহার সন্তান হাঁচিলেই "Zeus protect thee" বলিয়া ভগবানের নিকট তাহার মঙ্গল কামনা করিত। এখনও বিলাতের সন্তান-পালিকারা শিশু হাঁচিবামাত্র "Bless the child"—শব্দ উচ্চারণ না করা মহা অন্যায় কার্য্য বলিয়া মনে করেন।

আমরা প্রাতে শয্যাত্যাগের পর অথবা কোন কার্য্যানুষ্ঠানের অব্যবহিত পূর্ব্বে যাহার মুখদর্শন করি, তাহারই শুভাশুভত্বের উপর সেই দিনের সুখ-দুঃখ বা সেই কার্য্যের মঙ্গলামঙ্গল নিরূপণ করিয়া থাকি। পাশ্চাত্য দেশবাসীরাও এ নিয়ম অমান্য করেন নাই। তাঁহারা ইহাকে "first foot" বলেন। সে দেশে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের "first foot" বা প্রথম মুখদর্শন বিশেষ অশুভজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে যে সকল রমণীর চরিত্রে একবার কলঙ্ক-কালিমা পড়িয়াছে তাহাদের দর্শনে কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই লোকে বিশ্বাস করে।

এদেশে যেমন প্রবাদ আছে বামন বা শ্মশ্রুহীন ব্যক্তির দর্শন ঘটিলে আর গৃহের বাহির হইতে নাই, য়ুরোপেও সে প্রবাদ আছে কি না জানি না; কিন্তু তথায় কোন কোন কার্য্যে পুরোহিতদর্শন নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া গণ্য হয়। কথিত আছে, পুরাযুগে শিকারীরা যাত্রাকালে পুরোহিত দেখিলে আর সে দিবস কোন ক্রমেই শিকার মিলিবে না মনে করিয়া ম্লানমুখে গৃহে ফিরিয়া আসিত। এখনও নাবিকেরা জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বক্ষণে ধর্ম্মযাজকের মুখ দর্শন করিলে সমুদ্র-পথে ঝড় বা সেইরূপ কোন একটা বিপদের আশঙ্কা করে।

আমাদের দেশের "কাকচরিত্রের" ন্যায় রোমানেরাও একদিন পাখীর স্বরে বা উহাদের উড়িয়া বসিবার ভাবভঙ্গীতে নিজ নিজ প্রশ্নের উত্তর পাইত। [illegible]

দক্ষিণে উড়িয়া বসিলে তাহারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে বলিয়া মনে করিত, কিন্তু বামে কার্য্যহানির সম্ভাবনাই বুঝিত।

প্রাচীন রোমের অধিবাসীর যুদ্ধযাত্রায় পিঞ্জরাবদ্ধ মুরগীদিগকে বাহিরে আনিয়া শস্য দিয়া আপনাদের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিত। মুরগী আনন্দিতমনে শস্য খাইলে নিশ্চয়ই যুদ্ধে জয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিত ; আর শস্য ত্যাগ করিয়া উড়িয়া যাইলে কোন ক্রমেই জয়াশা নাই বুঝিয়া তাহারা সে দিবস যুদ্ধযাত্রায় কোন উদ্যোগই করিত না।

আমেরিকার আদিম অধিবাসী রণপ্রিয় আরেকান্ (Arancans) জাতিরাও ঐরূপ "কাকচরিত্রের" সাহায্যে আপনাদের ভাবী শুভাশুভ পরিজ্ঞাত হইত।

আমাদের যেমন "আষাঢ়ে ধনধান্যভোগরহিতা নষ্টপ্রজা শ্রাবণে" ইত্যাদি বিবাহে মাস নিষেধ আছে, য়ুরোপেও সেইরূপ শুভবিবাহের দিনস্থিরকালে নিষিদ্ধ মাস ও বারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার প্রথা আছে। তথাকার স্ত্রীলোকেরা মাসের মধ্যে "মে" মাস এবং বারের মধ্যে শুক্রবারটি বিবাহকার্য্যে বিশেষ অশুভ বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের এই বিশ্বাস এতাদৃশ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, মহাজ্ঞানী পুরুষেরাও হঠাৎ ইহার বিপক্ষাচরণ করিতে সমর্থ হ'ন্ না।

এ দেশের ন্যায় য়ুরোপেও "পাল-পার্ব্বণ" লাগিয়া আছে। সেণ্ট্ বা পীরের আবির্ভাব ও তিরোভাব উপলক্ষে নানা ক্রিয়ানুষ্ঠানের অভাব নাই। আমরা যেমন মনে করি দশহরায় মেঘ ডাকিলে সে বৎসর সর্পভয় থাকে না, বৎসরের অমুক তারিখে দুই ফোঁটা জল পড়িলে বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হ'ন, বিলাতের লোকেরাও সেইরূপ মনে করেন—

"If St. Paul's day be fair and clear,
It doth betide a happy year;
If blustering winds do blow aloft ;
Then wars will trouble our realm ful oft;
And if it chance to snow and rain,
Then will be dear all sorts of grain."

আমরা বিশ্বাস করি, শনি-মঙ্গলবারে বৃষ্টি নামিলে প্রায় কাল বারিবর্ষণ হয় ; য়ুরোপবাসীদেরও বিশ্বাস আছে জুন মাসের St. Vitus's day আরম্ভ হইলে এক মাস ধরিয়া বৃষ্টি হইতে থাকে।

পরাজয়

[শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল, বি-এস্-সি]

(১)

বুঝি বা লালু সেখ আহার জানের জান, কলিজার কলিজা প্রথমা পত্নী দিলজানের অকাল মৃত্যুতেও বক্ষে এত ব্যথা পায় নাই, যেমন ব্যথা তার একমাত্র কন্যার নিরুদ্দেশে তাহার বক্ষে বাজিয়াছিল। সে যে তাহাকে তাহার মৃতা জননীরই স্নেহধারা দিয়া এই সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছিল। প্রভাতে উঠিয়া যখন লালু সেখ দেখিল তাহার কন্যার কক্ষদ্বার মুক্ত, শয্যা শূন্য, দ্রব্যাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, তখনি তাহার মস্তিষ্কে এক ঝলক উত্তপ্ত রক্ত ঠেলিয়া উঠিয়া তাহার বুকখানাকে তোলপাড় করিয়া দিল ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার হইয়া আসিল। দারুণ শীতের প্রভাতেও সে তার পাণ্ডুবর্ণ ললাটদেশ স্বেদযুক্ত করিয়া কম্পিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে ডাকিতে লাগিল, 'রাজা বৌ! এদিক দিয়ে আয় ত'।

প্রসাধনকার্য্যনিরতা রাজা-বৌয়ের মুখ চোখে যেন একটা তৃপ্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল। সুদক্ষ অভিনেত্রীর মত কিন্তু হঠাৎ সে হাসির স্থানে একটা বিষম উৎকণ্ঠার চিহ্ন ফুটাইয়া তুলিয়া লালু সেখের সম্মুখীন হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেনে কি হয়েছেক গা?"—লালু একটা ভীত ত্রস্ত দৃষ্টির সহিত নিতান্ত অসহায়ের মত কম্পিত প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কি রাজা বউ, এত ভোরে পরী গেল কোথা?" রাজা বউ বজ্রাহতের মত কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া নিস্পন্দনেত্রে ঘরের ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তাই ত! হ্যাগা! এ সব কি? রও একবার ঘাটপানে দেখে আসি।"

লালু সেখ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মস্তিষ্কের ভিতর একটা প্রবল ঘূর্ণী বায়ু উঠিয়া, বিশ্বের প্রান্ত হইতে প্রচণ্ড আঘাতে যেন তাহাকে কোন দূর শূন্য আঁধারের

লইয়া চলিয়াছিল ; তাহার পদতল হইতে সরিয়া যাইতেছিল। কিয়ৎপরে ললাটে করাঘাত করিতে করিতে গ্রামখানি সরগরম করিয়া রাঙা বউ ফিরিয়া আসিল।

রুক্ষস্বরে লালু বলিয়া উঠিল, "চুপ কর্—চেঁচাসনি রাঙা বৌ! ভাল করে চারধারে ঢুঁড়ে দেখ্—ঠাণ্ডা হয়ে আমায় বুঝিয়ে বল্ দেখি।" রাঙা বৌ ক্ষণেক স্থির থাকিয়া, হঠাৎ লালুর হাত দুখানা ধরিয়া, তার সুরমাটানা চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিল, "মাথা খাও, মোর কিরে, একবার চুপি চুপি সাদেকদের ঘরকে গিয়ে আব্দুল ছোঁড়ার খবর নিয়ে এস'—হারে নসীব!"

(২)

বড় গর্ব্ব করিয়া লালুসেখ গ্রামে বলিয়া বেড়াইত, 'এমন ঘরে পরীর বে দেব' যারা হীরে জহরতে বেটীকে আমার ঢেকে রেখে দেবে, বড় আদর করিয়াই কন্যার অপরিসীম রূপরাশি দেখিয়া লালু তার নামকরণ করিয়াছিল—পরিজান। কখন সে স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই যে, তার এত আদরের এত সোহাগের, যৌবনের সুখস্বপ্ন দিলজানের শেষস্মৃতিটুকু তার শিরে এমন করিয়া কলঙ্ক ঢালিয়া দিয়া একটা নিঃসম্বল যুবকের সহিত গৃহত্যাগ করিবে! লজ্জায়, ঘৃণায়, লালু সেখের মাটির মধ্যে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল। তাহার মুখ সে পুড়াইয়া দিয়া গিয়াছিল—লোকসমাজে মুখ দেখাইবার উপায় ছিল না! একটা ভীষণ অন্তর্দ্দাহ তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়াইয়া খাক করিয়া দিতেছিল। সে যে তাকে তার স্নেহপক্ষ দিয়া সযত্নে বক্ষে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, সে যে একাধারে তার পিতা মাতা! যে কন্যা জন্মাবধি তাহাকেই জীবনের কেন্দ্র করিয়া সুখে দুঃখে এই দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছে, যে ক্ষণিক চক্ষের অন্তরাল হইলে কন্যা-চক্ষে অন্ধকার দেখিত,—দিবসের ক্লান্তির পর যে বালিকা অজস্র চুম্বনে তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিত, সেই কন্যা তার এত নিষ্ঠুর কেমন করিয়া হইল?—এমন ঘৃণিত কার্য্যে কেমন করিয়া সে লিপ্ত হইল? তারা কি কিছুই চায় না—চায় শুধু লালসার বিনিময়ে সম্ভোগ।

(৩)

—"লাল মিঞা! যখন তারা গাঁয়ে ফিরেছে, আর তাদের শাদিও হয়েছে, তখন আর কেন? যা হবার তা ত' হয়েছেই, তা বলে কি আর নিজের বালবাচ্ছার ওপর চিরদিন গোসা রাখা চলে"?

"চাচা! ওকথা আমায় বল'না, আমার মেয়ে মরে গিয়েছে—আমার মেয়ে ছিল না। লালু সেখের কথাও যা কাজও তাই"।

নানা চেষ্টায় বৃদ্ধ কাসেম কোনমতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, অগত্যা স্থির হইয়া ফরসীতে টান দিতে লাগিল। বিশেষতঃ লালু সেখ গ্রামের মোড়ল,—কার সাধ্য তার উপর কথা কয়?

দীর্ঘ দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। পরী আব্দুলের সহিত গ্রামেই তার জীর্ণ বেড়া-ঘেরা কুঁড়েখানিতে বাস করিতেছে। সেই তার পিতার গ্রাম, তার বাল্যের ক্রীড়াভূমি!—গ্রামের সঙ্গে কত সুখস্মৃতি জড়িত। তাহার মনে পড়িত,—তাহার পিতার অগাধ স্নেহ, পিতার অজ্ঞাতে তাহার বিমাতার তাড়না,—সুন্দর দরিদ্র বালক আব্দুলের প্রতি সহানুভূতি হইতে স্নেহ এবং অবশেষে সেই স্নেহের বিনিময়ে গভীর প্রেমের স্ফুরণ হইল। পরে কেমন করিয়া হঠাৎ একদিনের মোহের তাড়নায় ও তাহার বিমাতার প্ররোচনায় তাহার পিতার মনোনীত পাত্রের সহিত নিজ বিবাহসম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার প্রয়াসে তার স্নেহময় পিতার শিরে বজ্র হানিয়া নিজের জীবন-স্রোতের গতি ফিরাইয়া দিল। সে অনুশোচনা করিত অমন স্নেহশীল পিতার মাথা নীচু করাইতে কেন সে গৃহত্যাগ করিল!

গ্রামে ফিরিয়া কতদিন কত সুযোগ অন্বেষণ করিয়া সে পিতার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছে, কিন্তু সে পায় নাই! লাল মিঞার কঠোর প্রতিজ্ঞা স্নেহকে সবলে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার পিতৃগৃহে তাহার প্রবেশাধিকার নাই, এমন কি পিতার ভয়ে গ্রামের কেহই তাহাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিত না। পরী পুনঃ পুনঃ পিতার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাহাদের নিজের সেই কুঁড়েখানির ক্ষুদ্র সংসারটিতেই নিজকে নিবদ্ধ করিল।

অভিমানে লজ্জায় তাহার তরুণ হৃদয়খানা থাকিয়া থাকিয়া গুমরিয়া উঠিত ; প্রাণের মাঝে সদাই একটা অসন্তোষের ছায়া হাহাকার করিয়া বেড়াইত।

আব্দুল সে দিন সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরিয়া বড়ই কাতরভাবে পরীর হাত দুখানি ধরিয়া বলিল, "পরি! ভাবিস্ না, খোদাকে ডাক্। আর যাস্নে, ভিখারীর মত লোকের দোরে দোরে দয়া কুড়িয়ে বেড়াস নি। না খেতে পেয়ে আল্লার নাম করতে করতে মর্তে হয় সেই ভাল, আয় ফিরে আয়, ভিক্ষেয় কাজ নেই।'

অশ্রুপূর্ণনয়নে পরী বলিল, "আমাদের জন্য ত' একটু ভাবি না আব্বু! ভাবি শুধু এই সোনার বাছুটার জন্য। ওকে কেমন করে বাঁচাব, এ বছর ফসলের আশাও ত' গেল!"

এই বলিয়া পরী পার্শ্বস্থ নিদ্রিত শিশুপুত্রটার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তার হৃদয়খানা মথিত করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস শূন্যে মিশিয়া গেল।

(৪)

শক্তি-প্রভাবে পরকে শাসন করা চলে, চোখ রাঙ্গিয়ে পরের উপর কঠোর হওয়া চলে, কিন্তু সমস্ত শক্তিতে দুর্দ্দম প্রবৃত্তির টুটী চাপিয়া ধরিলেও বুঝি বা সে অন্তর্নিরুদ্ধ নিষ্পেষিত প্রবৃত্তি গুমরিয়া ফুঁপাইয়া উঠিয়াও আবার নিজের পথে ছুটিতে চায়। লালু সেখ সুদীর্ঘ চারি বৎসর কাল নিজের প্রতি এত কঠোর হইয়াও হৃদয়-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইযাও তাহার অন্তর্নিরুদ্ধ সঞ্চিত স্নেহটুকুকে অপসারিত করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রাণপণ প্রয়াসেও সে তাহার হৃদয়কে বশে আনিতে পারে নাই ; জনসাধারণের সম্মুখে কন্যার মৃত্যু-কামনা করিলেও নিভৃতে, শয়নে, স্বপনে সেই অনাবৃতা কন্যার সরল মধুর মুখখানি তাহার মানস-চক্ষে দিবা-রাত্রি ভাসিয়া উঠিত। মাঝে মাঝে হৃদয়ের নিভৃত গুহায় একখণ্ড ক্ষুদ্র কালো মেঘ জমাট বাঁধিয়া তাহার চতুর্দ্দিক বিলোড়িত করিয়া তুলিত ; আর সেই সজলকৃষ্ণ মেঘরাশি ভেদ করিয়া প্রথম যৌবনের পরিস্ফুট রূপরাশি লইয়া দিলজান তাহার বড় আদরের দুলালী পরীকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত।

গোধূলির ম্লান আলোকের উপর যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঝাঁপাইয়া পড়িত, সেই সময় লালু সেখ প্রত্যহ গ্রামের কবরভূমিতে দিলজানের কবরের পার্শ্বস্থ শ্যামল তৃণরাজির উপর তাহার পরিশ্রান্ত দেহখানিকে এলাইয়া দিয়া কত ভাবিত। ইঁটে গাঁথা কবরভূমির উপর সন্ধ্যা-বায়ু-আন্দোলিত দীপশিখাটী মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে কখন লালু সেখের অজ্ঞাতে মিশিয়া যাইত! পূর্ব্বে এই ক্ষুদ্র ভারটী পরিজানের পরই ন্যস্ত ছিল। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে বালিকা পরিজান মাতার কবরভূমির উপর ক্ষুদ্র দীপটী জ্বালিয়া দিত, কত রকমের কত ফুল সংগ্রহ করিয়া সজলনেত্রে কবরভূমিটী সাজাইয়া দিত।

লালু সেখ ভাবিত সেই সব পুরাতন দিনের পুরাতন কাহিনী! কত কথা! কত সুখস্মৃতি একসঙ্গে লালু-সেখের হৃদয়-তারে ঝঙ্কার দিয়া উঠিত ; তার প্রাণখানা হাহাকার করিয়া সেই সম্মুখের বেড়া-ঘেরা কুটীরখানার মধ্যে ছুটিয়া যাইতে চাহিত। অজ্ঞাতে লালু সেখ মা মা বলিয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিত, চক্ষু সজল হইয়া আসিত। লালু সেখ সজোরে তার বিশাল বক্ষখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সেই ঘনীভূত অন্ধকারে অদূরস্থ কুটীর-নির্গত ক্ষীণ আলোক-রশ্মির পানে অনিমিষে চাহিয়া থাকিত।

সেদিন যথা সময়ে লালু সেখ সমাধিভূমিতে প্রবেশ করিয়া দেখিল দিলজানের কবরের উপর দীপ জ্বলিতেছে এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য সুগন্ধি পুষ্প কে থরে থরে সাজাইয়া রাখিয়াছে। হঠাৎ লালু সেখ ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিল, অনতিদূরে এক মলিনবসনা নারীমূর্ত্তি দ্রুত সমাধিস্থল অতিক্রম করিয়া বাহিরে যাইতেছে। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই লালু সেখের উন্মুখ হৃদয়খানা সাড়া দিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের জন্য তার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল,—সর্ব্বশরীরে সে স্পন্দন অনুভব করিল। লালু-সেখ বুঝিল এ দুর্ব্বলতা মাত্র,—সংযত হইয়া কঠোরস্বরে প্রশ্ন করিল,—"কেও ?"

নারীমূর্ত্তি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লালু সেখ একটু অগ্রসর হইয়া সেইরূপ রুক্ষস্বরে হাঁক দিল, "কে উত্তর দাও।"

রমণী উত্তর করিল—"আমি"

এ কি ? স্বর যে পরিচিত—বড়ই মধুর!—এই স্বরের ঝঙ্কারই যে এতদিন লালু সেখের শুষ্ক হৃদয়খানিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল।

লালু সেখ তথাপি প্রশ্ন করিল,—"আমি ?"

এইবার বড় স্নেহ-করুণ কণ্ঠে উত্তর আসিল, "বাপ-জান! আমি।" কিন্তু লালু সেখের হৃদয় স্নেহস্বরে শীতল হওয়ার পরিবর্ত্তে গুপ্ত আগ্নেয়গিরির মত ফুলিয়া ফুঁসিয়া উঠিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "কেও কসবি ?—কার হুকুমে তুই দিলের কবরে ফুল দিতে আসিস্। কসবির হাতের ফুল দিল পরে না"—এই বলিয়া লালু সেখ দিলজানের কবরস্থিত পুষ্পরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল।

পরী দুই হাতে তাহার বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া উত্তর করিল, "ওঃ! কস্‌বি খোদা!" দুই মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া

…কণিনীর মত গর্জিয়া উঠিল। বলিল, "ও ঘরের গর্ভে …বি জন্মগ্রহণ করে না। আমি তাঁর মেয়ে—তাঁরই …নে তাঁর কবরে ফুল দিয়েছি!"

লালু মিঞা নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নারীমূর্ত্তি চঞ্চল চরণে উদ্ভ্রান্তের মত …োদ্দেশে প্রস্থান করিল।

(৫)

আজ মাসাবধিকাল পরী ও আব্দুলের শিশুপুত্রটী …াক্রান্ত। প্রাণপণ করিয়াও,—সর্ব্বস্ব তাহাদের …ম সম্বল ঘটীবাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া, তাহার চিকিৎসা …াইয়াও তাহাকে সুস্থ করিতে পারিল না; বরং রোগ …রোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আজ সন্ধ্যা হইতে …াগের প্রকোপ খুব বৃদ্ধি পাইল, মৃত্যুর পাণ্ডুর গাঢ় ছায়া …ই বেদানা রংএর শিশুর সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিল। …হারা নিঃসম্বল, শিশুর পথ্যের পর্য্যন্ত কোন উপায় …রিতে পারিল না। সংসার অনভিজ্ঞ যুবক-যুবতী প্রমাদ …ণিল। তাহাদের এ বিপদে যে সাহায্য করিতে কেহ …ল না। প্রতিবেশীরা সংবাদ রাখে, কিন্তু কেহই তাহা-…র সাহায্যার্থ এমন কি সহানুভূতি দেখাইতেও আসিল …। পলকহীন নেত্রে উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে তাহারা তাহা-…র বড় আদরের সেই শিশুপুত্রটীর পাণ্ডুরবর্ণ মুখের পানে …হিয়া রহিল। আব্দুলের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল,—সে …ন্ত নিঃসহায়ভাবে পরীর হাত দুখানা ধরিয়া কম্পিত-…ণ্ঠে বলিল, "পরি! এই শেষবার, আর একবার তোর …পের কাছে যা, পায় ধরে নিয়ে আয়, দেখ্ যদি ছেলেটা …চে। খোদা আমাদের প্রতি বিরূপ, পাপের শাস্তি …তেই হবে।"

পরীর ভিতরেও তখন একটা তীব্র জ্বালা!—চক্ষু দিয়া …রি-বর্ষণ হইতে লাগিল। রুদ্ধস্বরে বলিল, "চুপ কর, …ণ থাকতে তা পার্ব্ব না। যদি আমাদের না হয়, কেও …থকে পার্ব্বে না, কেঁদ না, খোদাকে ডাক"।

"আর যে পারি না, পরি! চোখের উপর না খেতে …য়ে ছেলেটা মর্ব্বে?" আব্দুলের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া …সিল, সে বালকের মত ক্রন্দন করিতে লাগিল।

পরি স্থিরভাবে উত্তর করিল, "যতক্ষণ প্রাণ আছে …ক দুখ আছে তার পর আল্লা!"

তখন ভোরের আলোয় রাত্রির অন্ধকার একেবারে …হয় নাই,—শীতের পাণ্ডুর জোৎস্না গ্রামের ক্ষুদ্র কবর-…মির সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ম্লান জ্যোৎস্নার …লোকে কবরভূমিটা ঠিক যেন বিভীষিকার মত প্রতীয়-…ন হইতেছিল। আর সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া …র বক্ষ হইতে আর্ত্তনাদের মত একটা শব্দ পল্লীর কুক-…পালিত কুক্কুটের তীক্ষ্ণ চীৎকারের সঙ্গে শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছিল।

লালু মিঞার অর্দ্ধজাগরিত সুষুপ্তির ঘোরে এই তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ কর্ণে পৌঁছিবামাত্র যেন তাহাকে জোরে কশাঘাত করিয়া জাগরিত করিয়া তুলিল। ঐ যে আবার! লালু মিঞা তন্দ্রাঘোর ঝাড়িয়া ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—যতদূর দৃষ্টি যায় আব্দুলের বাঁশে-ঘেরা কুটীরের দিকে চাহিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। কিন্তু ওদিকে ত' নয়! শব্দ যে কবরভূমির দিকে! লালু সেখ ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে আর্ত্তস্বর লক্ষ্য করিয়া নিকটে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হৃদকম্প উপস্থিত হইল, হৃদয়ের সমস্ত শোণিত যেন জমাট বাঁধিয়া গেল। লালু সেখ দেখিল, আব্দুল কবরের মাটী কাটিতেছে আর পার্শ্বে বসিয়া মৃতপুত্রক্রোড়ে তাহারই একমাত্র কন্যা পরিজান!

লালু সেখ নির্নিমেষলোচনে দেখিতে লাগিল,—সেই অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি! কি করুণ মর্ম্মভেদী দৃশ্য!—লালু সেখ আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িল। নিজেকে আর সংযত করিতে পারিল না। দীর্ঘ চারি বৎসরের পুঞ্জীভূত উন্মুখ স্নেহ-রাশি এককালে উন্মত্ত বন্যার মত বাঁধ ভাঙ্গিয়া চলিল। ক্ষণেক প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস তাহার হৃদয়খানাকে শূন্য করিয়া দিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে লালু সেখ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "খোদা!"

ঠিক সেই সময়ে আব্দুল পুত্রশোকাতুরা পরীজানের ক্রোড় হইতে তাহাদের বক্ষরতন পুত্রটীকে ছিনাইয়া লইয়া স্বহস্তরচিত মৃত্তিকা-শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল, পরী হাহাকার করিয়া উঠিল; লালু সেখ উন্মত্তের মত ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "পরি! পরি! মা আমার আজ এ কি দেখাতে আমায় এখানে টেনে আনলি মা? দে ভাইজানের পাশে আমার জন্যও একটু স্থান করে দে"। বলিতে বলিতে লালু সেখ সংজ্ঞাশূন্যপ্রায় ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। পরী সমস্ত ভুলিয়া আপন ক্রোড়ে পিতার মস্তক তুলিয়া লইল।

বাহু-বন্দী।

[শ্রীশ্রীজীব কাব্যতীর্থ]

অরণ্যের প্রান্তদেশে। অদূরে উচ্চ আরাবলী পর্ব্বত—হরিণশিশু মুখে করিয়া একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র চলিয়া গেল। সেখানে দাঁড়াইয়া এক বৃদ্ধ সর্দ্দার রাজা ও একটি ক্ষত্রিয়…

যুবক অধোবদনে করিতেছিলেন। অন্ত কথা বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ যুবককে আদেশ করিলেন—রণেন্দ্র, সত্বর বাঘটা শীকার করিয়া আন। যুবক দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

তখন সন্ধ্যার প্রাক্কাল। অস্তগমনোন্মুখ রবি-বিম্বের স্নিগ্ধ আলোহিত কিরণগুলি শ্যামল তরুশ্রেণীকে এক অপূর্ব্ব শোভায় সাজাইতেছিল—বৃদ্ধের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। যুবকের ফিরিবার পথে বৃদ্ধ উৎসুকভাবে চাহিয়া আছেন। দিনের আলোকে নিবিয়া গেল—অরণ্যে অন্ধকার প্রবেশ করিল। অচিরেই যুবক ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে, একহস্তে ধনুর্ব্বাণ ও অপর হস্তে এক মৃত হরিণশিশু লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিল—"মহারাজ, আপনার আদেশমাত্র আমি দ্রুতপদে বাঘটার অনুসরণ ক'রে অব্যর্থ শরসন্ধানে তার মুখ হ'তে এই হরিণ শিশুকে কেড়ে এনেছি—এই দেখুন মহারাজ!"

বৃদ্ধ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর আসল শীকারটা!" যুবক মস্তক নত না করিযাই বলিল—"মহারাজ, বাঘটা শীকার করিতে পারি নাই!"

রণেন্দ্র! পার নাই? আর একটা মৃত হরিণশিশুর জন্ম সগর্ব্বে কথা ব'লছ?

যুবক অপ্রতিভ না হইয়া বলিয়া ফেলিল—"মহারাজ, বনপথ অতি দুর্গম, পথে আমার পদস্খলন হ'য়েছিল, সেই অবসরে বাঘটা পর্ব্বতের উপর লাফাইয়া পড়িল, আমি নিম্ন হ'তে বাঘটাকে লক্ষ্য ক'রে বাণক্ষেপ ক'রলাম কিন্তু সে বাণ তার হৃদয় বিদ্ধ করিতে পার্‌লে না, সজোরে মুখের উপর আঘাত ক'র্‌লে—আর হরিণশিশুটা নিম্নে পতিত হ'ল। তবে—আমার বাণ কখনও ব্যর্থ হয় না।"

বৃদ্ধ কুপিতস্বরে বলিলেন—"যুবক, গর্ব্ব করিবার আগে নিজের অক্ষমতার বিষয় চিন্তা কর।"

যুবক তথাপি উত্তর করিল—'আমার মত বালকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।'

—কি? তুমি বালক? তোমার বয়স কত?

"মাত্র বাইশ বৎসর।"

"মাত্র বাইশ বৎসর? ধিক্ যুবক, তোমাকে উপযুক্ত পাত্র মনে ক'রে আমি বহুদিন হ'তে মনে মনে স্থির ক'রেছিলাম যে, আমার একমাত্র কন্যা সিকতা-দেবীকে তোমার হস্তে অর্পণ ক'রব। কিন্তু আজ"—

"মহারাজ যদি পুনরায় আদেশ করেন তা' হ'লে আমি এখনই অরণ্য হ'তে সে বাঘটা শীকার ক'রে আনি, যদি প্রাণ দিতেও হয়, তথাপি পশ্চাৎপদ হ'ব না।"

"না, না, সে আদেশ আর করি না। কিন্তু, রণেন্দ্র, আজ হ'তে সিকতার আশা ছাড়িয়া দাও। তুমি ক্ষত্রিয় নও—তুমি কাপুরুষ। যে পুরুষ নিজের লক্ষ্য স্থির রাখ্‌তে না পেরে এমন নির্লজ্জের মত ব্যবহার করে—তাকে আমি ঘৃণা করি।"

এবার যুবক একটু উত্তেজিতভাবে বলিল, "পারি নাই বটে, কিন্তু, তার মুখের গ্রাস কেড়ে এনেছি—এই হরিণ-শিশু।"

"লজ্জা করে না? একটা মৃত হরিণশাবক—সেটা হয়ত' তার মুখ হ'তে আপনা আপনি প'ড়ে গিয়েছিল, তার জন্ম এত শ্লাঘা? সিকতার মত উচ্চহৃদয়া কন্যাকে তোমার মত কাপুরুষের হাতে দেওয়া পিতার কার্য্য নহে। যে রমণী ভোগলোলুপা, যশ অপেক্ষা স্বামীর জীবনকে মূল্যবান্ মনে করে, সেইরূপ অসার রমণীই তোমার উপযুক্ত। যাও—আজ হ'তে আর সিকতার কথা হৃদয়ে আনিও না। আমিও আজ হ'তে তোমার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিলাম।

বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়রাজ মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। যুবক নিতান্ত দুঃখিতভাবে বলিল,—"আপনাকে আমি আর বিরক্ত কর্‌তে চাই না, আমার একটীমাত্র অনুরোধ আমার প্রতি আপনার অসন্তোষের কথা সিকতাকে ব'লবেন না—সে বড় দুঃখিতা হ'বে।

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে একপথে চলিয়া গেলেন, যুবক অন্য-পথে প্রস্থান করিল।

(২)

একলিঙ্গেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে আজ মহা-উৎসব। চিতোরের সামন্ত মহারাজ শালুম্ব্রা সপরিবারে আজ মহাদেবের অর্চ্চনা করিতে আসিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে নীরব আনন্দ—সৈন্তগণ ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারিতেছে না। মহারাজের আদেশ অনিবার্য্য [illegible]

[illegible] ফণিনীর মত গর্জিয়া উঠিল। বলিল, "ও মায়ের গর্ভে [illegible] কি জন্মগ্রহণ করে না। আমি তাঁর মেয়ে—তাঁরই হুকুমে ত্াঁর কবরে ফুল দিয়েছি।"

লালু মিঞা নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নারীমূর্ত্তি চঞ্চল চরণে উদ্ভ্রান্তের মত [illegible]আবেগে প্রস্থান করিল।

(৫)

আজ মাসাবধিকাল পরী ও আব্দুলের শিশুপুত্রটী জ্বরাক্রান্ত। প্রাণপণ করিয়াও,—সর্ব্বস্ব তাহাদের শেষ সম্বল ঘটীবাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া, তাহার চিকিৎসা করাইয়াও তাহাকে সুস্থ করিতে পারিল না; বরং রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আজ সন্ধ্যা হইতে রোগের প্রকোপ খুব বৃদ্ধি পাইল, মৃত্যুর পাণ্ডুর গাঢ় ছায়া সেই বেদানা রংএর শিশুর সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিল। তাহারা নিঃসম্বল, শিশুর পথ্যের পর্য্যন্ত কোন উপায় করিতে পারিল না। সংসার অনভিজ্ঞ যুবক-যুবতী প্রমাদ গণিল। তাহাদের এ বিপদে যে সাহায্য করিতে কেহ ছিল না। প্রতিবেশীরা সংবাদ রাখে, কিন্তু কেহই তাহাদের সাহায্যার্থ এমন কি সহানুভূতি দেখাইতেও আসিল না। পলকহীন নেত্রে উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে তাহারা তাহাদের বড় আদরের সেই শিশুপুত্রটীর পাণ্ডুরবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া রহিল। আব্দুলের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল,—সে একান্ত নিঃসহায়ভাবে পরীর হাত দুখানা ধরিয়া কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "পরি! এই শেষবার, আর একবার তোর বাপের কাছে যা, পায় ধরে নিয়ে আয়, দেখ্ যদি ছেলেটা বাঁচে। খোদা আমাদের প্রতি বিরূপ, পাপের শাস্তি পেতেই হবে।"

পরীর ভিতরেও তখন একটা তীব্র জ্বালা!—চক্ষু দিয়া অগ্নি-বর্ষণ হইতে লাগিল। রুদ্ধস্বরে বলিল, "চুপ কর, প্রাণ থাকতে তা পার্ব্ব না। যদি আমাদের না হয়, কেও রাখতে পার্ব্বে না, কেঁদ না, খোদাকে ডাক"।

"আর যে পারি না, পরি! চোখের উপর মা খেতে পেয়ে ছেলেটা মর্ব্বে?" আব্দুলের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে বালকের মত ক্রন্দন করিতে লাগিল।

পরি স্থিরভাবে উত্তর করিল, "যতক্ষণ প্রাণ আছে বুকে দুধ আছে তার পর আল্লা।"

তখন ভোরের আলোয় রাত্রির অন্ধকার একেবারে দূর হয় নাই,—চাঁদের পাণ্ডুর জোৎস্না গ্রামের দূরে কবর-ভূমির সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ম্লান জ্যোৎস্নার আলোকে কবরভূমিটা ঠিক যেন বিভীষিকার মত প্রতীয়মান হইতেছিল। আর সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া তার বক্ষ হইতে আর্ত্তনাদের মত একটা শব্দ পল্লীর সুপালিত কুক্কুটের তীক্ষ্ণ চীৎকারের সঙ্গে শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছিল।

লালু মিঞার অর্দ্ধজাগরিত সুষুপ্তির ঘোরে এই তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ কর্ণে পৌঁছিবামাত্র যেন তাহাকে জোরে কশাঘাত করিয়া জাগরিত করিয়া তুলিল। ঐ যে আবার! লালু মিঞা তন্দ্রাঘোর ঝাড়িয়া ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—যতদূর দৃষ্টি যায় আব্দুলের বাঁশে-ঘেরা কুটীরের দিকে চাহিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। কিন্তু ওদিকে ত' নয়! শব্দ যে কবরভূমির দিকে! লালু সেখ ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে আর্ত্তস্বর লক্ষ্য করিয়া নিকটে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল, হৃদয়ের সমস্ত শোণিত যেন জমাট বাঁধিয়া গেল। লালু সেখ দেখিল, আব্দুল কবরের মাটী কাটিতেছে আর পার্শ্বে বসিয়া মৃতপুত্রক্রোড়ে তাহারই একমাত্র কন্যা পরিজান!

লালু সেখ নির্ণিমেষলোচনে দেখিতে লাগিল,—সেই অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি! কি করুণ মর্ম্মভেদী দৃশ্য!—লালু সেখ আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িল। নিজেকে আর সংযত করিতে পারিল না। দীর্ঘ চারি বৎসরের পুঞ্জীভূত উন্মুখ স্নেহ-রাশি এককালে উন্মত্ত বন্যার মত বাঁধ ভাঙ্গিয়া চলিল। ক্ষণেক প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস তাহার হৃদয়খানাকে শূন্য করিয়া দিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে লালু সেখ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "খোদা!"

ঠিক সেই সময়ে আব্দুল পুত্রশোকাতুরা পরীজানের ক্রোড় হইতে তাহাদের বক্ষরতন পুত্রটীকে ছিনাইয়া লইয়া স্বহস্তরচিত মৃত্তিকা-শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল, পরী হাহাকার করিয়া উঠিল; লালু সেখ উন্মত্তের মত ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "পরি! পরি! মা আমার আজ এ কি দেখাতে আমায় এখানে টেনে আন্‌লি মা? দে ভাইজানের পাশে আমার জন্যও একটু স্থান করে দে"। বলিতে বলিতে লালু সেখ সংজ্ঞাশূন্যপ্রায় ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। পরী সমস্ত ভুলিয়া আপন ক্রোড়ে পিতার মস্তক তুলিয়া লইল।

বাহু-বন্দী।

[শ্রীশ্রীজীব কাব্যতীর্থ]

অরণ্যের প্রান্তদেশ। অদূরে উচ্চ আরাবলী পর্ব্বত—দক্ষিণদিক মুখে করিয়া একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র চলিয়া গেল। সেখানে দাঁড়াইয়া এক দৃঢ় কর্ম্মার রাজা ও একটি ক্ষত্রিয়

বৃদ্ধ কথোপকথন করিতেছিলেন। অত কথা বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ যুবককে আদেশ করিলেন—'রাজেন্দ্র, সত্বর বাঘটা শীকার করিয়া আন। যুবক দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

তখন সন্ধ্যার প্রাক্কাল। অস্তগমনোন্মুখ রবি-বিম্বের স্নিগ্ধ আলোহিত কিরণগুলি শ্যামল তরুশ্রেণীকে এক অপূর্ব্ব শোভায় সাজাইতেছিল—বৃদ্ধের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। যুবকের ফিরিবার পথে বৃদ্ধ উৎসুকভাবে চাহিয়া আছেন। দিনের আলোকে নিবিয়া গেল—অবণ্যে অন্ধকার প্রবেশ করিল। অচিরেই যুবক ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে, একহস্তে ধনুর্ব্বাণ ও অপর হস্তে এক মৃত হরিণশিশু লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিল—"মহারাজ, আপনার আদেশমাত্র আমি দ্রুতপদে বাঘটার অনুসরণ ক'রে অব্যর্থ শরসন্ধানে তার মুখ হ'তে এই হরিণ শিশুকে কেড়ে এনেছি—এই দেখুন মহারাজ।"

বৃদ্ধ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর আসল শীকারটা!" যুবক মস্তক নত না করিয়াই বলিল—"মহারাজ, বাঘটা শীকার করিতে পারি নাই!"

রণেন্দ্র। পার নাই? আর একটা মৃত হরিণশিশুর জন্য সগর্ব্বে কথা ব'লছ?

যুবক অপ্রতিভ না হইয়া বলিয়া ফেলিল—"মহারাজ, বনপথ অতি দুর্গম, পথে আমার পদস্খলন হ'য়েছিল, সেই অবসরে বাঘটা পর্ব্বতের উপর লাফাইয়া পড়িল, আমি নিম্ন হ'তে বাঘটাকে লক্ষ্য ক'রে বাণক্ষেপ ক'রলাম কিন্তু সে বাণ তার হৃদয় বিদ্ধ করিতে পারলে না, সজোরে মুখের উপর আঘাত ক'রলে—আর হরিণশিশুটা নিম্নে পতিত হ'ল। তবে—আমার বাণ কখনও ব্যর্থ হয় না।"

বৃদ্ধ কুপিতস্বরে বলিলেন—"যুবক, গর্ব্ব করিবার আগে নিজের অক্ষমতার বিষয় চিন্তা কর।"

যুবক তথাপি উত্তর করিল—'আমার মত বালকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।'

—কি? তুমি বালক? তোমার বয়স কত?

"মাত্র বাইশ বৎসর।"

"মাত্র বাইশ বৎসর? ধিক্ যুবক, তোমাকে উপযুক্ত পাত্র মনে ক'রে আমি বহুদিন হ'তে মনে মনে স্থির ক'রেছিলাম যে, আমার একমাত্র কন্যা সিকতাকে তোমার হস্তে অর্পণ ক'রব। কিন্তু আজ"—

"মহারাজ যদি পুনরায় আদেশ করেন তা' হ'লে আমি এখনই অরণ্য হ'তে সে বাঘটা শীকার ক'রে আনি, যদি প্রাণ দিতেও হয়, তথাপি পশ্চাৎপদ হ'ব না।"

"না, না, সে আদেশ আর করি না। কিন্তু, রণেন্দ্র, আজ হ'তে সিকতার আশা ছাড়িয়া দাও। তুমি ক্ষত্রিয় নও—তুমি কাপুরুষ। যে পুরুষ নিজের লক্ষ্য স্থির রাখতে না পেরে এমন নির্লজ্জের মত ব্যবহার করে—তাকে আমি ঘৃণা করি।"

এবার যুবক একটু উত্তেজিতভাবে বলিল, "পারি নাই বটে, কিন্তু, তার মুখের গ্রাস কেড়ে এনেছি—এই হরিণ-শিশু।"

"লজ্জা করে না? একটা মৃত হরিণশাবক—সেটা হয়ত' তার মুখ হ'তে আপনা আপনি প'ড়ে গিয়েছিল, তার জন্য এত শ্লাঘা? সিকতার মত উচ্চহৃদয়া কন্যাকে তোমার মত কাপুরুষের হাতে দেওয়া পিতার কার্য্য নহে। যে রমণী ভোগলোলুপা, যশ অপেক্ষা স্বামীর জীবনকে মূল্যবান্ মনে করে, সেইরূপ অসার রমণীই তোমার উপযুক্ত। যাও—আজ হ'তে আর সিকতার কথা হৃদয়ে আনিও না। আমিও আজ হ'তে তোমার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিলাম।

বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়রাজ মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। যুবক নিতান্ত দুঃখিতভাবে বলিল,—"আপনাকে আমি আর বিরক্ত করতে চাই না, আমার একটীমাত্র অনুরোধ আমার প্রতি আপনার অসন্তোষের কথা সিকতাকে ব'লবেন না—সে বড় দুঃখিতা হ'বে।

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে একপথে চলিয়া গেলেন, যুবক অন্য-পথে প্রস্থান করিল।

(২)

একলিঙ্গেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে আজ মহা-উৎসব। চিতোরের সামন্ত মহারাজ শালুম্ব্রা সপরিবারে আজ মহাদেবের অর্চ্চনা করিতে আসিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে নীরব আনন্দ—সৈন্যগণ ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারিতেছে না। মহারাজের আদেশ শুনিবার জন্য নিস্তব্ধ

মন্দিরের নিকটে উৎকর্ণ হইয়া ঘুরিতেছে।

যখন বৃদ্ধ মহারাজ শালুম্ব্রা মন্দিরাভ্যন্তরে শিবধ্যানে নিমগ্ন, তখন পূজার জন্ত তাহার কন্তা সিকতাসুন্দরী মন্দির পার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র উদ্যানে পুষ্পচয়নে নিযুক্ত। সিকতার মাতা ও সখীগণ অনতিদূরস্থ চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে পূজা করিতে গিয়াছেন। কাজেই সিকতা একাকিনী উদ্যান মধ্যে পুষ্পচয়ন করিতেছেন। 'সিকতা'

সিকতা মুখ তুলিয়া দেখিল সম্মুখে রণেন্দ্রর ক্লান্তি ম্লান, নয়ন নিষ্প্রভ, মুখে বিষাদমাখা গম্ভীরতা। 'সিকতা বিদায়'—

সহসা সিকতার হস্ত হইতে ফুলের সাজি ভূতলে পতিত হইল।

সিকতা কাতরভাবে বেদনাব্যঞ্জকস্বরে বলিল—"একি রণেন্দ্র এ কঠোর বজ্রবচনে কেন আমায় দগ্ধ ক'রছ? তোমার শরীরের দিকে চেয়ে আর তোমার কথা শুনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্ছে যে।"

রণেন্দ্র ধীরে ধীরে উদ্যানে প্রবেশ করিল। হৃদ্গৎ চাপিয়া মনের আবেগ রুদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিল, 'সত্যই সিকতা আমি চলিলাম। আমার সহিত আর দেখা হ'বার আশা ক'র না। তুমি আজ যে বেশে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছ,—দেবপূজার পুষ্পসাজিহস্তে, পট্টবস্ত্র পরিধান ক'রে আমার মত ভীরু কাপুরুষ সৈনিকের কাছে যেমন আজ দেবতার মত অস্পৃশ্যা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছ,—সেই বেশেই সেইরূপ দেবতামূর্ত্তিতেই তুমি চিরদিন থাক, আমি তোমার অনুপযুক্ত।"

সিকতা তৃণশ্যামল উদ্যান মধ্যে বসিয়া পড়িল ও বলিল, "রণেন্দ্র আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তোমার সে ভালবাসা কোথায় গেল? তোমার সে কমনীয় কান্তি, সদাসহাস্যবদন সে মধুর মূর্ত্তি কোথায় রাখিয়া আসিলে?

"সিকতা তুমি ভ্রমে প'ড়েছিলে। আমার কিছুই ছিল না, এখনও কিছুই নাই। আমি চলিলাম যেখানে শত শত সেনা ধর্ম্মের জন্য সমরানলে প্রাণবিসর্জ্জন দিতেছে—আর সেই বীরহৃদয়ের আঘাতে সমরাগ্নিও ধক্ ধক্ ক'রে উঠ্‌ছে সেই দেশে আমি চলিলাম। সেই সেনার কার্য্য গ্রহণ ক'রতে আমি চলিলাম।" এই বলিয়া রণেন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিল। সিকতা হাতযোড় করিয়া করুণকণ্ঠে বলিল—"আমার বাচালতা ক্ষমা কর রণেন্দ্র। যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি, আমায় দাসী ব'লে ক্ষমা কর। রণেন্দ্র, তুমি বিদেশে যাবে, আমি তোমার সঙ্গে যাব না? কেন রণেন্দ্র, তুমি প্রাণবিসর্জ্জন দিবে? এ প্রেমপূর্ণ স্নিগ্ধ-হৃদয় কেন তুমি তুচ্ছ সমরানলে আহুতি দিবে? ধর্ম্ম রসাতলে যা'ক্, তুমি বেঁচে থাক রণেন্দ্র! কিসের জন্য তুমি প্রাণ দিতে চাও? যশঃ, সম্মান, ধর্ম্ম—তুচ্ছ; দেশ তুচ্ছ। তুমি আমার হৃদয়ে বন্দী হ'য়ে থাক, আমি অন্য কিছু চাহি না।"

সিকতা আপনার কোমল বাহুদ্বয়ে প্রাণপণে রণেন্দ্রের পাদদ্বয় চাপিয়া ধরিল। রণেন্দ্রের গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

"রণেন্দ্র, তোমায় আমি অনেক দিন বুঝ্‌তে পেরেছি বটে, কিন্তু আমার কন্যাকে আমি চিনিতে পারি নাই।"

রণেন্দ্র ও সিকতা চমকিত হইল। মন্দিরাভ্যন্তর হইতে বৃদ্ধ মহারাজ জলদগম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"রণেন্দ্র! তোমায় আমি অনেক দিন চিনেছি, কিন্তু আমার কন্যাকে চিনিতে পারি নাই। আমি মন্দির হ'তে সব শুনেছি—সিকতা তোমারই যোগ্যা!"

"এই শিবমন্দিরে ব'সে বল্‌ছি আজ আমি তাকে তোমায় দান কর্‌লাম। কিন্তু, এই পর্য্যন্ত—আর সে আমায় পিতা ব'লে না ডাকে। সে আমার কন্যা নহে—সে আমার বংশের কলঙ্ক। আজ হ'তে তোমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হ'ল। উঃ—মহাদেব!"

বৃদ্ধ ক্ষত্রিয় মহারাজের দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে অর্চ্চনার দীপ নির্ব্বাপিত হইল।

কোন একটা উদ্যানে ভূমিকম্পে যেমন দুইটী দূরবর্ত্তী তরুলতা একত্র মিলিত হয়, সেইরূপ বৃদ্ধ মহারাজের ক্রোধাবেগে রণেন্দ্র ও সিকতা চিরদিনের জন্য সংযুক্ত হইল।

ভুল-বোঝা। *

[শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, বি-এ।]

জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ বন্ধ হইয়াছে। বিশ্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় জার্ম্মাণ কৈসার য়ুরোপে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা নিভিয়াছে। সিপাহি-সৈনিকদের কাজ প্রায় ফুরাইয়াছে—এখন জগতের বড় বড় রাজনীতিজ্ঞদের কাজ আরম্ভ হইয়াছে—জানি না এখন এই রাজনৈতিক লড়াইয়ে কে জিতিবে। কিন্তু তার জন্ত আমরা সৈনিকের দল—আমাদের মাথা ঘামাবার কোন দরকার নাই কাজেই আমাদের ছুটি।

আমি ও আমার মত আরও তিন চা'র জন অফিসার যাঁরা প্রায় যুদ্ধের প্রথম হইতেই ছিলেন—পরামর্শ করিয়া একখানা সেকেলে রকমের জাহাজে পৃথিবী-ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। এ জাহাজেরও কোন তাড়া নাই—আমাদেরও তথৈবচ। আমরা চাই সুদীর্ঘ বিশ্রাম—নিয়মিত আহার-নিদ্রা, গল্প-গুজব, আর উদার আকাশের নীচে, অনন্ত নীল সমুদ্রের কোলে, মাতৃবক্ষে শিশুর মত আরাম লাভ করিতে; কর্ম্মহীন শান্ত দিনের পর অলস সন্ধ্যা—তার পর সমুদ্রের দোলায় নিরুদ্বেগ সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা।

প্রতি রাত্রে ডিনারের পর, আমরা কয়েক জন যাত্রী ডেকের উপর আরাম-কেদারায় পড়িয়া পড়িয়া নানাবিধ গল্প করিতাম—জাহাজের কাপ্তেনও সেই সময় আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। সে গল্প যে প্রায় যুদ্ধ সংক্রান্ত—তাহা বলা বাহুল্য। তার সঙ্গে মৃত, জীবিত বন্ধু-বান্ধবদের স্মৃতি। ডিনারের পর চুরুটের ধোঁয়ার সঙ্গে যে বাস্তবের সহিত কল্পনা মিশিয়া না যাইত—এমন কথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি না।

এমনি এক দিন অলস সন্ধ্যায় গল্প হইতেছিল—মানুষের ভুল-বোঝা লইয়া। কাপ্তেন ডোবিয়েন একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছিলেন যে, ভুল বুঝিয়া কত লোকের সমস্ত জীবন একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আমি এতক্ষণ চুপ করিয়া গল্প শুনিতেছিলাম—কিন্তু ডোবিয়েনের এই শেষ মন্তব্যটুকু শুনিয়া, আমি নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন তাঁর কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম—"আমি এমন ঘটনা জানি, যাহাতে ভুল বুঝিয়াই একটা জীবন সার্থক হইয়াছিল।" কথাটা শুনিয়াই বন্ধুবর্গ সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন—"কি রকম?" তখন আর আমার পিছাইবার উপায় নাই—কাজেই গল্পটা বলিতে হইল।

"তোমাদের মধ্যে অনেকেই কর্ণেল পিটকে জানতে—অন্ততঃ তার নাম শুনেছ—কেন না, এ যুদ্ধে প্রথম প্রথম যাহারা "ভিক্টোরিয়া ক্রস্" পাইয়াছে—পিট তাহাদের মধ্যে একজন। তোমরা ত জান যে, সে বেচারা একদল ষ্টাফ্-অফিসরের প্রাণ-রক্ষা করিতে গিয়া—নিজে চির জীবনের মত পৃথিবীর অর্দ্ধেক সুখের নিদান দৃষ্টিশক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

"পিট ও আমি ইটনে এক সঙ্গেই পড়িতাম—তারপর অক্সফোর্ডেও একত্র কলেজে পড়িতাম—সে কেবল আমার বাল্যবন্ধু ও সতীর্থ ছিল না—আমরা দু'জনে অভিন্ন হৃদয় ছিলাম। কলেজে আমাদের নাম ছিল,—"ডামন ও পিথিয়াস।

"অল্প বয়সেই পিট একজন লম্বা চৌড়া জোয়ান হইয়া উঠিয়াছিল, তার বা'ড় ছিল বয়স ছাড়া। সুদৃঢ় বলিষ্ঠ গঠন—দৌড়-ঝাঁপ, ফুটবল, দাঁড়-টানা প্রভৃতিতে সে আমাদের সকলের অগ্রণী ছিল। কেবল তার মুখ দেখিলে তার বয়স বুঝা যাইত, তার মুখখানি ছিল—ষোড়শী কিশোরীর মুখের মত কোমল। তার চোখে একটা স্বপ্নাবিষ্টের মত ভাব ছিল—যাহার জন্ত তাহাকে আমরা সব 'কবি' আখ্যা দিয়াছিলাম। এক কথায়—তাহাকে দেখিলে মনে হইত, যেন হর্কু্যলিসের দেহে কিশোরীর মাথা বসাইয়া দেওয়া। তার চরিত্রও ঠিক এই রকম। সে যেমন বলিষ্ঠ চরিত্র ছিল—তার মনটি ছিল তেমনি নরম একান্ত বিশ্বাস-প্রবণ। তোমরা বুঝিতেই পার যে, এমন লোক, কত সুন্দরীর আকর্ষণের স্থল। কিন্তু কবি পিট এক দিকে যেমন নারী সৌন্দর্য্যের একান্ত উপাসক ছিল—পক্ষান্তরে প্রলোভনকে জয় করিবার শক্তিও ছিল তার অসাধারণ। আমরা বলাবলি করিতাম যে, যে দিন এই কবি হর্কু্যলিস কোন সুন্দরীর প্রেমে পড়িবে—সে দিন পার্ব্বত্য নদীর প্লাবনের মত সে প্রেম ইহাকে কোথায়

* ইংরাজী গল্প অবলম্বনে।

জাগাইয়া লইয়া যাইবে। তখন জানিতাম না, এ কথাটা কতটা সত্য।

"জানি না, শুভ কি অশুভ ক্ষণে আমাদেরই বাড়ীতে একটা নাচের মজলিশে পিটের সহিত আমি মিস্ মারগারেট সেন্ট-ষ্টিফেনের সহিত পরিচয় করিয়া দিলাম। পিট সেই প্রথম দর্শনেই সুন্দরী মারগারেটকে তার সমস্ত হৃদয়-মন সমর্পণ করিয়া বসিল—আমরা কিন্তু তাহার কিছুই জানিতাম না। মিঃ সেন্ট-ষ্টিফেন আমাদের প্রতিবেশী, আমার পিতার বাল্যবন্ধু এবং জমীদার। তাঁর মারগারেট ও রোজ এই দুই কন্যা ছাড়া আর কেহ ছিল না। মিস্ রোজ আমার বাল্যকালের খেলার সাথী। শৈশবে, কৈশোরে এবং যৌবনে আমরা প্রায় অভিন্ন ছিলাম। আমাদের বন্ধুত্ব দেখিয়া সকলেই খুসী হইত। দুই ভগ্নী দেখিতে প্রায় এক রকম, কিন্তু দু'জনের চরিত্রে অনেক পার্থক্য ছিল। মারগারেট ছিল গম্ভীর, একটু গর্ব্বিত এবং সৌখীন। আর রোজ ছিল, খোলা মানুষ, আমোদপ্রিয়, মিশুক।

"এই পরিচয়ের কিছুদিন পরেই, পিটের পিতৃবিয়োগ হইল—তার মা ছিলেন না, কাজেই পিট পিতার সম্পত্তি সমস্ত বিক্রয় করিয়া নিজের অবস্থার উন্নতির জন্য ক্যানেডায় চলিয়া গেল। তখন আমরা ইহার ঠিক অর্থ বুঝিতে পারি নাই। তার পর পিটের একখানা পত্রে সব কথা পরিষ্কার হইল। সে লিখিয়াছিল যে, প্রথম পরিচয়েই সে মারগারেটকে ভালবাসিয়াছে—কিন্তু মারগারেট ধনী জমীদারের কন্যা—আর পিট গরীব, এ অবস্থায় তাদের মিলন অসম্ভব জানিয়া, সে দূর হইতেই তার জীবনের এই দেবীকে উপাসনা করিয়াছে—দূর হইতে তাহাকে একবার মাত্র দেখিয়া, সে নিজের মনকে শান্ত করিয়াছে। এখন তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, নিজের অবস্থার উন্নতি করিয়া মারগারেটের উপযুক্ত হওয়া—যদি কখন তার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়।

"পিট ক্যানেডা চলিয়া যাওয়ার পর বহুদিন তার কোন সংবাদ পাই নাই—তবে লোকমুখে শুনিতাম, সে না কি একটা জঙ্গলের ইজারা লইয়া বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছে। একবার মিঃ সেন্ট-ষ্টিফেনের কাছে শুনিলাম যে, তাঁরা যখন ক্যানেডা গিয়াছিলেন, তখন পিটের সহিত দেখা হইয়াছিল—তিনি পিটের অনেক সুখ্যাতির কথা সেখানে শুনিয়া আসিয়াছিলেন।

"অনেক দিন পিটের কোন সংবাদ না পেয়ে, আমি একদিন কথায় কথায় রোজের কাছে পিটের কথা তুলিলাম—সে যাহা বলিল, তাহাতে আমি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। এবার তাদের ক্যানেডা হইতে ফিরিয়া আসার পর, পিট না কি মারগারেটকে প্রতি ডাকেই পত্র লিখিয়া থাকে। রোজ বলিল,—"দিদি আমাকে মিঃ পিটের সব চিঠিগুলিই দেখিয়েছে—এমন চিঠি। আচ্ছা, মিঃ পিটকে ত তুমি ছেলেবেলা থেকে জান—তিনি কি কবি? তাঁর চিঠি যদি তুমি পড় ত অবাক্ হবে। আমি ত হেসে বাঁচিনে। দিদিকে যদি আমি না জানতাম, আর মিঃ পিটের পত্র পড়তাম, তবে মনে করতাম যে, মিস্ মারগারেট শাপ-ভ্রষ্টা রতিদেবী। চিঠিগুলো দিদি আমাকে দিয়েছে। তুমিও পড়বার অনুমতি পেতে পার। পড়ে দেখো—দিদি আমার যে সে লোক নয়। আচ্ছা, ভালবাসলে কি মানুষের দৃষ্টি অন্য রকম হয়ে যায়। অথচ মিঃ পিট দিদিকে মাত্র তিন দিন দেখেছেন।" রোজ এমনি করে অনেক কথাই বকে গেল। আমি চুপ করিয়া শুনিয়া, শেষে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, পিট যে তোমার দিদিকে পত্র লেখে, তা তোমার বাবা জানেন?" 'বাঃ। বাবা আবার জানেন না—এবার ক্যানেডায় গিয়ে, যে দিন মিঃ পিট আমাদের বাড়ীতে ডিনার খেতে এলেন—সে দিন তিনি না কি বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, যদি তিনি দিদির ভালবাসা লাভ করিতে পারেন—তবে বাবার কোন আপত্তি আছে কি না? বাবা ত খুসী হয়ে মত দিয়েছেন—মিঃ পিটের মত অমন সুপুরুষ, কর্ম্মিষ্ঠ, সচ্চরিত্র পাত্র পাওয়া ত দিদির পক্ষে ভাগ্যের কথা।" যদিও পিট আমার বাল্যবন্ধু তবুও রোজের মুখে তার এই সুখ্যাতি শুনিয়া, জানি না, কেন আমার মনে একটা ঈর্ষার ভাব আসিল। আমি একটু জোর করিয়া হাসিয়া বলিলাম—"আচ্ছা! আমাকে তোমার এই আদর্শ প্রেমিকের পত্রগুলি দেখাতে পার?" রোজ আমার মুখের দিকে

খানিকক্ষণ চাহিয়া—একটু হাসিয়া জবাব দিল—"এখুনি দিচ্ছি, আমার দেরাজেই আছে।"—বলিয়া এক তাড়া নীল ফিতা বাঁধা পত্র আনিয়া আমাকে দিল। সে দিন সন্ধ্যার পর আমি বসিয়া বসিয়া সমস্ত পত্রগুলি পড়িলাম। পত্রগুলিতে পিটের মহৎ চরিত্র যেন পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পত্র শেষ হইলে, আমার মনে হইল—আমি কেন এমনি করিয়া আমার মনের কথা বলিতে পারি না! রমণী-হৃদয় লাভের জন্য কেবল ভালবাসাই পর্য্যাপ্ত নহে—তাহার প্রকাশ চাই! কিন্তু আমি সে বিষয়ে একেবারে অক্ষম।

"থাক্ সে সব কথা! ইহার কিছু দিন পরেই জর্ম্মাণীর মহাসমর বাধিল, শুনিলাম পিট সৈন্যদলে যোগ দিয়া বেলজিয়ম গিয়াছে এবং যাওয়ার পূর্ব্বে মিঃ সেণ্ট ষ্টিফেনের নিকট মারগারেটের সম্মতি লইয়া বিবাহ-বন্ধনের চিহ্ন স্বরূপ একটি আংটি পাঠাইয়া দিয়াছে—সেটি না কি তার মা'র ছিল। এই পবিত্র চিহ্ন পাঠাইয়া সে মারগারেটকে যে পত্র লিখিয়াছে—তাহা পদ্যে লিখিলে প্রেম-সাহিত্যে উচ্চ স্থান লাভ করিতে পারিত। ইহার এক বৎসর পরে আমিও সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়া ফ্রান্সে গেলাম। সেখানে গিয়া পিটের সহিত আমার প্রায়ই দেখা হইত—কেন না আমাদের দুই সৈন্যদল পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। পিট ইতিমধ্যে তিন চারিবার আহত হইয়াছিল। সে যখনই সময় পাইত, আমাদের ক্যাম্পে আসিয়া মারগারেটের গল্প ও তাদের ভবিষ্যতের সুখের চিত্র অঙ্কিত করিত। মারগারেটের পত্রও সে আমাকে দেখাইত—তার সঙ্গে রোজের এক আধ ছত্র থাকিত! এমনি করিয়া আরও দু'মাস কাটিয়া গেল!

"তার পর আমাদের দুই সৈন্যদল পৃথক পৃথক স্থানে চলিয়া যাওয়ায় অনেক দিন আর আমাদের দেখা হয় নাই। হঠাৎ এক দিন জানিলাম যে, কয়েকজন ষ্টাফ্ অফিসরের প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া পিট অত্যন্ত আহত হইয়া 'বেস্'-হাঁসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে এবং তার এই মহৎকার্য্যের জন্য তাহাকে "ভিক্টোরিয়া ক্রস" দেওয়া হইবে। ইহার দিন পাঁচ-সাত পরে 'বেস'-হাঁসপাতাল হইতে একটা টেলিগ্রাম পাইলাম যে, পিট আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। কোন রকমে দু' দিনের ছুটি লইয়া সেখানে গিয়া দেখিলাম—পিটকে চেনা যায় না—সর্ব্বাঙ্গ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ডাক্তারের নিকট জানিলাম—অন্যান্য আঘাত তেমন সাংঘাতিক নহে, কিন্তু সে জন্মের মত অন্ধ হইয়া গিয়াছে! পিটের সেই বড় বড় নীল গভীর ভাব-ব্যঞ্জক চক্ষু দু'টির কথা মনে পড়িয়া আমার চক্ষে জল আসিল। তার পর বন্ধুর সহিত দেখা করিলাম—সে দিন পিট ভালই ছিল। দু' চারিটি কথার পর সে আমাকে অনুরোধ করিল যে, তার এই অবস্থার কথা যেন আমি রোজকে লিখি—সে মারগারেটকে বলিবে। আর, তার ইচ্ছা হাঁসপাতাল হইতে ছুটি পাইলেই সে শরীর সারিবার জন্য ক্যানেডার চলিয়া যাইবে। পিটের অবস্থা দেখিয়া আমি তাহার কথায় সায় দিলাম এবং রোজকে সংবাদ দিবার ভার লইয়া তাহার নিকট বিদায় লইলাম।

"সাড়ে চার বৎসর অবিশ্রাম যুদ্ধের পর, এই সমগ্র পৃথিবীব্যাপী দাবানল নির্ব্বাপিত হইবার আশা হইল—যুদ্ধ বন্ধ রাখিবার হুকুম ও সন্ধিপত্র লেখাপড়া হইবার ব্যবস্থা হওয়ায় আমরা ছুটি পাইলাম। বহু দিন পরে দেশে আসিতেছিলাম, মনে কি ভাব হইতেছিল—তা আর তোমাদের কাউকে বলতে হ'বে না—কেন না তোমরা সব ভুক্তভোগী! বাড়ী আসিয়া দেখি, আমার আগমন-উপলক্ষে বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইয়াছে। বৃদ্ধ মিঃ সেণ্ট ষ্টিফেন, মিস্ মারগারেট, রোজ—সকলেই উপস্থিত। মারগারেটকে দেখিলাম—সে অনেক বদলাইয়া গিয়াছে—রোজ অপরের চক্ষে তেমনি দুষ্ট, তেমনি হাস্যমুখী। কিন্তু আমার যেন মনে হইল যে, সে আনন্দের মধ্যে কোথায় একটা বিষাদের সুর লুকাইয়া আছে—তা' কেবল সে যখন চুপ করিয়া অন্যমনস্ক থাকে, তখনই যেন ধরা পড়িবার মত হয়! পরক্ষণেই তার চোখ দু'টি দুষ্টামির হাসিতে ভরিয়া যায়! ডিনারের পর কথায় মিঃ সেণ্ট ষ্টিফেন বলিলেন, "পিট আজ এক সপ্তাহ হইল ক্যানেডা হইতে আসিয়াছে—তার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়াছে—কিন্তু বেচারার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাওয়ার কোন আশা নাই! প্রথমে লণ্ডনে আসিয়া সে ভাল ভাল ডাক্তারদের দেখাইয়াছিল—তাঁরা কোন আশা দেন নাই—আমার সঙ্গে দু' দিন দেখা হইয়াছিল—অনেক কথা হইল! সে তার

কাকার কাছে আছে।" পিটের কাকার বাড়ী আমাদেরই পাশের গ্রামে—স্থির করিলাম পর দিন প্রাতেই তাকে দেখিতে যাইব, কিন্তু এক মিঃ সেণ্ট ষ্টিফেন ছাড়া আর কেহ পিট সম্বন্ধে কোন কথা না কহায় আমার মনে একটা খট্‌কা বাধিয়া গেল। মিস্ মারগারেট দেখিলাম এই আলোচনার সময় ঠিক যেন পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিল—তার মুখ দেখিয়া আমি পিটের জন্য ভীত হইলাম। কেন না আমি জানিতাম তার এ ভালবাসা ক্ষণিকের মোহমাত্র নহে—ইহা তাহার জীবনের সহিত একেবারে জড়িত হইয়া আছে। অন্ধ পিটকে যদি সুন্দরী মারগারেট বিবাহ করিতে না চায়। কথাটা ভাবিতেও আমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইতেছিল।

"যাহা হউক, পর দিন পিটের সহিত আমার দেখা হইল। বহু দিন পরে অন্ধ পিটকে দেখিয়া আমার অন্ধ জ্যাকসনের কথা কেন যে মনে আসিল, তাহা বলিতে পারি না—ঈশ্বর করুন পিটের প্রণয়িনী যেন তেমন না হয়। যা'ক্—দু'জনে বসিয়া অনেক কথা হইল—শেষে আমি পিটের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা তুলিলাম। বিষাদের হাসি হাসিয়া পিট বলিল—"আমি জানিতাম যে, তুমি শীঘ্র আসিবে, তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে আমি এত বড় বিষয় স্থির করিতাম না। আজ তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। দেখ দৃষ্টিশক্তি হারানর পর হতেই আমার মনে একটা কথা বার বার উঠিয়েছে যে, আমার এ অবস্থায় মিস্ মারগারেটকে আমাদের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ রাখা কি আমার কর্ত্তব্য হইবে। মিঃ সেণ্ট ষ্টিফেনকে আমি এ বিষয়ে একটু আভাস দেওয়া মাত্র তিনি আমার উপর চটিয়া উঠিলেন—যেন আমি আমার কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি চাই। ভগবান জানেন—মারগারেটের প্রতি ভালবাসা আমার জীবনে কতটা জুড়িয়া আছে। আমি চাইব অব্যাহতি? কিন্তু এখন আমার কর্ত্তব্য কি তাহা স্থির করিবার সময় আসিয়াছে—আমি চাই না যে একটা সামাজিক বন্ধনের অছিলায় মারগারেটকে চিরদিনের মত এই অন্ধের ভাগ্যের সহিত বাঁধিয়া রাখি—আমি তাকে মুক্তি দিতে চাই—তবে সে যদি ইচ্ছা করে আমার কাছে আসে, সে কথা আলাদা। কি বল? আমি পরশু মারগারেটদের বাড়ী গিয়ে এটাই একটা, আবার জঙ্গলে ফিরে যেতে চাই। আমার ইচ্ছা তুমি সেদিন সেখানে উপস্থিত থাক।" বলিয়া পিট চুপ করিল। আমি তাহার ভালবাসার গভীরতা, তার চরিত্রের মাধুর্য্য দেখিয়া অবাক্ হইতেছিলাম। এ গভীর প্রেম যদি মারগারেট প্রত্যাখান করে, তবে তার মত অভাগিনী আর নাই। যাহা হউক, আমি পিটের কথায় সম্মতি দিলাম।

* * * *

"সেদিন শনিবার—মিঃ সেণ্ট ষ্টিফেনের বাড়ীতে টেনিস্ পার্টি। পিটও তার খুড়তুত ভাই-বোনের সঙ্গে এই পার্টিতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিল। পিটের আসার উদ্দেশ্য আমি ও বোস জানিতাম, তাই কৌশলে তার সহিত মারগারেটের কথাবার্ত্তা কহিবার সুযোগ ঘটাইয়া দিলাম, আমরা সকলে যখন টেনিস খেলিতেছিলাম, তখন তারা দু'জনে বাগানের একটা গাছের নীচে বেঞ্চে বসিয়া কথা কহিতেছিল।

"প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মিস্ মারগারেট আসিয়া আমায় বলিল, পিট আমায় ডাকিতেছে। মারগারেটের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—একটা বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলে লোকের মুখে যে একটা খুসী, একটা আরামের ভাব থাকে, মারগারেটের মুখে যেন সেই ভাব। আমি ধীরে ধীরে পিটের নিকট গেলাম, সে তখন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গাছের একটা ডাল ধরিয়া দুলাইতেছিল। আমি যাইবামাত্র সে বলিয়া উঠিল—"দেখ, আমি যা' ভাবিয়াছিলাম—তাই। একজন সুন্দরী যুবতী, ধনী কন্যা, যাহার জীবনের সামনে সুখের সারা পথ পড়িয়া আছে, সে কেন এ অন্ধের সঙ্গে আপনার জীবনকে বাঁধিতে চাহিবে? মিস্ মারগারেট খুসী হইবাই আমাদের বন্ধন ছেদন করিতে রাজী হইয়াছেন। তিনি শীঘ্রই আমার আংটী ফেরৎ দিবেন। কেন না তাঁর পিতাকে না বলিয়া তিনি হঠাৎ তাহা পারেন না। যাক্—এখন চল আমাকে বাড়ী পৌছিয়ে এস। আমার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে, আমি তিন চার দিনের মধ্যে ক্যানেডায় ফিরব।"

"আমি পিটের কথাবার্ত্তার রকম দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম, কোন কথা না বলিয়া আমার মোটরে বসাইয়া তাকে বাড়ী পৌছিয়া দিলাম।

* * * *

[illegible] জুড়াড়ে সঙ্গে ফ্লোরেন্সে পাঠান হয়েছে, পিটের নিজের অনুরোধেই না কি আমাদের কাহাকেও সংবাদ দেওয়া হয়নি।

ইহার পর আমি 'ওয়ার অফিসে'র পাড়ায় পড়িয়া তাহারও কোন সংবাদ রাখি নাই, লণ্ডন হইতে ফিরিয়া রোজের এই চিঠিখানি পেয়েছি—চিঠিখানা শুনলেই আমার গোড়ার কথাটা তোমরা বুঝতে পারবে, কেন আমি বলেছিলাম যে, ভুল বুঝে কখন কখন একটা জীবন সার্থক ও সুখী হতে পারে।

ম্যানোলা—জাহাজ।

"হে আমার বাল্যবন্ধু,

আমি সুখী হইয়াছি—আমার প্রিয়তমকে সুখী করিয়াছি—এ সংবাদ তোমাকে না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না, কেন না তুমি আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী।

আমার জীবন তোমরা সব জানতে, কিন্তু আমি গোপনে পিটকে ভালবাসতাম, তা' আমার অন্তরযামী ছাড়া আর কেউ জানত না। যে দিন দিদি পিটের সেই নিঃস্বার্থ গভীর ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করলে, সেদিন পিটের জন্ত আমার মনে যে মর্ম্মান্তিক কষ্ট হ'ল, তা' আর কি জানাইব। সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্ব্বুদ্ধি আমার মাথায় এলো। তাই দিদি যখন পিটের আংটি ফেরৎ দিতে আমাকে দিলে—তখন আমি সেটা ফেরৎ না দিয়ে নিজের কাছেই রাখলাম। তার পর বাবাকে একখানা পত্র লিখে রেখে আমি পিটের কাছে ফ্লোরেন্সে পালিয়ে গেলাম।

আমি যখন পৌঁছিলাম, পিট তখন ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে সমুদ্রের ধারে একটা হোটেলের বারান্দায় সন্ধ্যার অন্ধকারে একলাটি দাঁড়িয়েছিল, আমি গিয়ে ধীরে ধীরে তার হাতের উপর হাত রাখলাম, এমন ভাবে যেন তার দেওয়া আংটিটা সে অনুভব করতে পারে। এই স্পর্শে পিট প্রথমে চমকে উঠল, তার পর ধীরে ধীরে বললে—"তুমি এসেছ। তুমি যে আসবে তা' আমি জানতাম, আমার মন বলছিল যে, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করেছে, তাই আমি সেই মুহূর্ত্ত হইতে মারগারেট হইলাম এবং যত দিন বাঁচিব মারগারেটই থাকিব। আমি প্রাণ ধরিয়া পিটের এ সুখের ভ্রম ভেঙ্গে দিতে পারব না। আর পিটও আমার এ ছলনা বুঝতে পারবে না—কেন না তুমি ত জান যে, অন্ধ হওয়ার আগে পিট মারগারেটকে তিন চারি দিন মাত্র দেখেছিল, আর আমাদের দুই বোনের মধ্যে আকৃতি ও গলার স্বরের যে সাদৃশ্য তাহা আমাদের বিশেষ পরিচিতকেও ভুলাইতে পারে। হে আমার বাল্য সুহৃদ! ভগবানের নিকট প্রার্থনা করো তিনি যেন মূঢ়া নারীর জীবনের এই একমাত্র মিথ্যা ক্ষমা করেন, যেন আমার অন্ধ স্বামীর এই ভুল চিরজীবন না ভাঙ্গে! আজ আমার পূর্ব্ব জীবনের সকলের নিকট চির বিদায় লইলাম, যেন অতীত আমাদের বর্ত্তমানের এই প্রেমের স্বর্গে আমার প্রিয়তমের ভুল ভাঙ্গিতে উপস্থিত না হয়! বিদায়!

তোমার খেলার সাথী

রোজ।"

কপিল।

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

গভীর ব্যথায় যবে উঠেছিল কাঁদি,
চরাচর নিখিল সংসার।—
'দুঃখ—দুঃখ শুধু বিজড়িত, সুখে শোক,
শুদ্ধ সুখ নাহি কোথা আর!'
সে আর্ত্তি জাগায়েছিল ধ্যান-মগ্ন এক
শান্ত পূত পুরুষের প্রাণ।
বিশ্বজনে উদ্ধারিতে করুণ-হৃদয়,
শুনালেন বিবেক বিজ্ঞান;—
'নিত্য শুদ্ধ মুক্ত আত্মা বুদ্ধ নিরঞ্জন,
নহে সুখী নহে দুঃখী কভু।'
নাহি তার পাপ পুণ্য মোক্ষ বা বন্ধন
[illegible]

কভু বা ত্রিগুণী সেই প্রকৃতির সনে,—
হয় যবে মিলন বিশেষ।—
আমি সুখী আমি দুখী পাপী পুণ্যবান্‌,
জ্ঞান হয় এমতি অশেষ।
ত্যজ দেহ, ত্যজ মন, বুদ্ধি অহঙ্কার;
জ্ঞানার্ণবে নিত্য ভাসমান,—
পুরুষ, প্রকৃতি ভিন্ন; দিলা এই জ্ঞান,—
আমি গুরু কপিল বিদ্বান্‌।

বঙ্গভাষার গতিনির্ণয়।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র শর্ম্মা কাব্যতীর্থ।]

সমস্ত ভাষাই দুই ভাগে বিভক্ত,—গদ্য ও পদ্য। গদ্য সাহিত্যের দ্বারাই ভাষার বিচার হয়। আমরা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট যত রকম সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্মধ্যে সব চেয়ে বড় গদ্য সাহিত্যের উন্নতি। সাহিত্যের উন্নতির নিমিত্ত আমাদিগকে ইংরাজ-রাজের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে। কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতি ধর্ম্মযাজকগণ বঙ্গভাষা প্রচারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। এবং তৎকালে বড় বড় ইউরোপীয় রাজপুরুষগণও অতি যত্ন সহকারে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতেন। বাঙ্গালা গ্রন্থ ত পাঠ করিতেনই, আবার প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার জন্য এতদ্দেশের সর্ব্বশ্রেণীর ছোট বড় সমস্ত লোকের সহিতই মিশিতেন। ইংরাজ রাজপুরুষগণের অধ্যয়নের নিমিত্তই বোধ হয় প্রথম বাঙ্গালায় গদ্য-পাঠ্য-পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হয়। রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত" ও মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের "প্রবোধচন্দ্রিকা" বোধ হয় এই সময় ইংরাজদের অধ্যয়নের নিমিত্তই রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেও এই দুই বাঙ্গালা গ্রন্থই বোধ হয় সর্ব্ব প্রথমে অধীত হইয়াছিল। যদিও ইহার বহুপূর্ব্বের ২।১ খানা বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থের বিষয় জানা যায়, তথাপি বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন জন্য যে এই প্রথম বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বাঙ্গালা ভাষাতে ক্রমান্বয়ে চারিটী স্তর হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য চরিত, প্রবোধচন্দ্রিকা, রাজাবলী, কৃষ্ণচন্দ্র চরিত প্রভৃতি গ্রন্থগুলিকে প্রথম স্তরের অন্তর্গত বলিব। এই গ্রন্থ কয়খানির ভাষায় (ক্রমবিকাশ হেতু তারতম্য থাকিলেও ইহাই প্রথম স্তরের। তারপর মহাত্মা রামমোহন রায়, প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি লেখকগণের গ্রন্থ সমূহ দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বঙ্গভাষার বিশেষ সংস্কার সাধন করেন, তাঁহার গ্রন্থসমূহ তৃতীয় স্তরের পর্য্যায় ভুক্ত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর বঙ্কিমবাবু হইতে বর্ত্তমান কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ সকল (ক্রমবিকাশে তারতম্য সত্ত্বেও) চতুর্থ স্তরের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। এই চতুর্থ স্তরের লিপিভঙ্গীই বহুদিন চলিবে বলিয়া বোধ হয়। পরে যখন বঙ্গভাষা বার্দ্ধক্য লাভ করিয়া পঞ্চম স্তরে উপস্থিত হইবে, তখন বোধ হয় প্রাচীন ভাষার পঞ্চত্ব প্রাপ্তিই ঘটিবে। কারণ 'অত্যুচ্চ পতনায়' ইহা মহাজন-বাক্য। যাহা হউক, আমি এক্ষণে এই কয়েক স্তরের নিদর্শন ও ক্রমোৎকর্ষ দেখাইতেছি—

১ম স্তরের ভাষা—

'উত্তর দালানে সমস্ত দুগ্ধবতী গাভীগণ থাকে, হাতী ও উঠও থাকে, তার সাতে সাতে আর আর অনেক পশুগণ থাকে।'—(প্রতাপাদিত্য চরিত)

'অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল না পাওনেতে বিব্রত হইয়া জলান্বেষণ করিতে করিতে দেখিল, এক রম্য স্থল; কিন্তু জল নিকটের মধ্যে দেখিল না।'—(লিপিমালা)

২য় স্তরের ভাষা—

'এক ঈশ্বর, তাঁহার মূর্ত্তি দেখা যায় না, তাঁহার স্বরূপ কি? তিনি প্রকৃতি সিদ্ধ, বাহ্য দৃষ্ট নাই। অন্তরে দেখা যায়।'—(রামমোহন)

'রে মন! পরম পুরুষের পবিত্র প্রেম পুষ্পের আমোদের ঘ্রাণ একবার নে রে একবার নে রে। তাঁর প্রেমরস একবার চাক্‌ রে চাক্‌ রে।'—(ঈশ্বর গুপ্ত)

৩য় স্তরের ভাষা—

'দেবর্ষির বীণা ধ্বনিতে সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হইলে দৃষ্ট হইল ধবলাদ্রি সদৃশ শুভ্রোবসে ত্রিদিব সভায় প্রকৃষ্ট রূপে শোভিত; তদুপরি পুঞ্জ পুঞ্জ মধুব্রত গুঞ্জনে নিরত।'

...চতুর্থ স্তরের উদাহরণ সর্ব্বত্রই পরিদৃশ্যমান। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার এই দুই জনই তৃতীয় স্তরের প্রধান লেখক। তবে উপলেখকও অনেক ছিলেন। কিন্তু প্রধানতঃ দেখিতে গেলে, উক্ত দুই মহাত্মা দ্বারাই ক্রমে বঙ্গভাষার এইরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে। আধুনিক কবি ও পাঠকগণের মধ্যে কেহ ভাষাকে অতি সরল আড়ম্বরবিহীন গৃহস্থ বধূর ন্যায় দেখিতে ইচ্ছা করেন, কেহ বা বহু রত্নবিভূষিতা যৌবনগর্ব্বিতা বিলাসিনী ধনী রমণীর ন্যায়, শব্দচ্ছটা, ভাব-বৈচিত্র্য ও ঘটা দ্বারা পরিশোভিত দেখিতে ইচ্ছা করেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পের বই প্রথম উদাহরণ স্থল। এবং মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের 'নুরজাহান' দ্বিতীয় উদাহরণ স্থল। এইরূপ পূর্ব্বকালেও বিদ্বৎ সমাজে দুই মতাবলম্বী লোক ছিলেন। কিন্তু তৎকালে যাহা কঠিন কঠিন শব্দ ও গভীর ভাবদ্বারা একরূপ অবোধ্য ভাষায় লিখিত হইত, তাহাই পাণ্ডিত্য প্রশংসায় পূর্ণ ছিল। লিখিত প্রবন্ধ বা গ্রন্থ সরল, সহজ বা অনায়াসবোধ্য হইলে, ...হার আর রক্ষা ছিল না। বোধগম্য সরল বাঙ্গালাকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা বলিয়া ঘৃণা করিতেন।—(রামগতি ন্যায়রত্ন)

যিনি যত কঠিন দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতবহুল গ্রন্থ লিখিতে পারিতেন, তিনি তত প্রশংসা পাইতেন। ইহাতে ঐ সমস্ত গ্রন্থ বড় বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণেরই অধিগত ছিল। সাধারণ অল্পবিদ্যা লোকের কোনও উপকারে আসিত না। তজ্জন্য এক শ্রেণীর লোক কিঞ্চিৎ সাহিত্যাভিজ্ঞ হইলেও, পোনে ষোল আনা লোক একেবারেই ভাষা চর্চ্চায় বা সাহিত্য রসে বঞ্চিত ছিল, সুতরাং তৎকালে বঙ্গভাষার উন্নতি সম্বন্ধে কোন আশাই সম্ভাবিত ছিল না। সেই হেতু ক্রমে ভাষা সরল ও সুখবোধ্য করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। তাহার ফলে "সংবাদ চারু চন্দ্রোদয়" নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইল। ঐ সংবাদ পত্রখানি অকালে বিলয় প্রাপ্ত হইলেও, উহা দ্বারা ভাষার অনেকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তার পরেই প্যারীচাঁদের সর্ব্বজন বিদিত "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশিত হয়। যদিও এই পুস্তকে সুরুচির মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই, এবং নির্ব্বাচন পদ্ধতি ও ভাববিন্যাসের ধারা যথাযথ রক্ষিত হয় নাই, তথাপি ভাষার সরলতায়, চরিত্রের নিপুণ বিশ্লেষণে এবং সমাজের ও বঙ্গপল্লী নিখুঁত চিত্র প্রদর্শনে এই গ্রন্থ তৎকালে আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল। এইরূপ ভাবের গ্রন্থ এই প্রথম বলিয়া আমার ধারণা। আমার আরও অনুমান যে, "আলালের ঘরের দুলালে"র লিপিকৌশলানুযায়ী বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি লেখকগণ কলম চালাইয়াছেন।

প্যারীচাঁদের ভাষা—

"রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, কলুরা ঘানি জুড়িয়া দিয়াছে, চাষীরা লাঙ্গল লইয়া মাঠে চলিয়াছে, ধোপারা থপাস্ থপাস্ করিয়া কাপড় কাচিতেছে, ব্রাহ্মণেরা ভুস্ ভুস্ করিয়া গঙ্গায় ডুব দিতেছে, কেহ কেহ গুণ গুণ করিয়া গঙ্গাস্তব পড়িতেছে, কাক কা কা করিয়া ডাকিতেছে।..."—(আলালের ঘরের দুলাল)

বঙ্কিমবাবুর ভাষা—

"জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে; চন্দ্রকরে সিকতা শ্রেণী অধিকতর ধবল শ্রী ধারণ করিয়াছে, গঙ্গার জল চন্দ্রকরে প্রগাঢ় নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। নদী অনন্ত; যতদূর দেখিতেছি নদীর অন্ত দেখিতেছি না। পার্শ্বে বালুকা অনন্ত; তীরে বৃক্ষশ্রেণী অনন্ত।..."—(চন্দ্রশেখর)

পাঠক দেখিলেন বঙ্কিমবাবু আলালী ভাষাকে কিরূপ সুমার্জ্জিত করিয়া লইয়াছেন। যেমন বাঙ্গালা উপন্যাস-সাহিত্যের এইরূপ ক্রমোন্নতি বা সংস্কার হইয়াছিল, নাটকাদিরও তদ্রূপ হইয়াছিল। দীনবন্ধু, মাইকেল, রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশ ঘোষ প্রভৃতি নাটক রচয়িতৃগণ ক্রমপরম্পরাতেই ভাষার বিকাশ করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কথা স্বতন্ত্র; তিনি উক্ত কোন নাটককারের পথেই চলেন নাই; তাঁহার পথই আলাদা। রবীন্দ্রনাথের নাটকও অনেকটা প্রাচীন প্রণালীর অনুসৃত। তবে ভাষা সরল, অবলম্বিত পথও ভিন্ন বটে। অমৃতবাবুর নাটকীয় ভাষা বেশ সরল ও সুমার্জ্জিত। এই সমস্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের নাটক শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেরই প্রায় অভিজ্ঞাত। তজ্জন্য দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠের বিরক্তির ভয়ে, তাঁহাদের উদাহরণের উল্লেখ করিলাম না। মোটের উপর নাটকও চারি প্রকারের। ১ম। কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব শ্রেণীর;

নধবার একাদশী, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি। ৩য়। প্রফুল্ল, রবিশচন্দ্র প্রভৃতি। ৪র্থ। সাজাহান, রাণাপ্রতাপ, মোগল-পাঠান, পিয়রী প্রভৃতি।

সাধারণ বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পাঠ্যও এই চারি স্তরের অন্তর্গত। ১ম, পাদরীদের প্রণীত বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক। ২য় বিদ্যাসাগরাদির বোধোদয় প্রভৃতি পুস্তক। ৩য়, কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রভাত চিন্তা প্রভৃতি। ৪র্থ, বর্ত্তমানে জগদানন্দের 'জ্ঞানসোপান', প্রসন্ন বিদ্যারত্নের সাহিত্য পুস্তক প্রভৃতি। বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্বাপর ভাষার গতি ও পরিণতি দেখাইলাম। বর্ত্তমানে সকল লেখকই ভাষার সরলতা সম্পাদনে সচেষ্ট। শিক্ষিত সমাজ সকলেই সরল বাঙ্গালার আকাঙ্ক্ষা করেন। তজ্জন্য কালের স্রোতোনুসারে সকলেই ব্যাকরণ, অভিধানের সংস্রব ত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্রবোধ্য দেশজ ভাষাকেই একমাত্র উপজীব্য করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে সাহিত্যের বা ভাষার উন্নতি হইতেছে কি অবনতি হইতেছে, তাহা সুধীগণের বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যদি প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের স্থায়িত্ব বাঞ্ছনীয় হয় এবং ভবিষ্যতে যাহাতে উক্ত গ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য গ্রহণে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে বাসনা না থাকে, তবে এখন হইতেই সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত। উচ্ছৃঙ্খল গতিতে ভাষাকে চলিতে দিলে ভাষার পদ ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। ভাষারও একটা নির্দ্দিষ্ট পথ থাকা আবশ্যক, এবং সে পথের সীমার নির্দ্দেশও কর্ত্তব্য। যাহা লিখিত হইবে, তাহাই মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বিদ্যালয়ে মন্দিরে মঠে সর্ব্বত্র অবাধ গতিতে চলিতে থাকিবে, তাহা শ্রেয়স্কর নহে।

নিমুর মা।

[শ্রীচণ্ডীচরণ দাসগুপ্ত, বি-এ।]

(১)

মোক্ষদা বলিল, "দিদি, তোমার ছেলের দৌরাত্ম্যি রোজ রোজ বেড়েই যাচ্ছে দেখ্‌তে পাই।"

অতি ধীর নরম সুরে সরস্বতী কহিল, "তুমি বাছা শুধু নিমায়ের দোষটাই দেখ্‌তে জান।"

মোক্ষদা চাপা হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, দিদি, তুমিই বল, বড়ঠাকুর যে সেদিন নিমুকে চোখ রাঙিয়ে মারতে গেলেন, সেটা ত' হ'লে তাঁর মস্ত অপরাধ হ'য়েছে ?"

সরস্বতী জ্বলিয়া উঠিল। একেবারে মোক্ষদার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর দিল, "ওঁর কথা ছেড়ে দাও, রাঙাবৌ,—উনি অমন না বুঝে সুঝে পাঁচশ' কথা লোককে শুনিয়ে দেন।"

"তোমার ঐ কেমন কথা, দিদি,—নিজে যা' ক'রবে সেইটিই হবে ভাল,—আর অন্য লোকে ক'রলেই যত দোষ।"

"আমি কি ব'লছি তা'ই ;—একটু ছুতো পেয়েছ কি অমনি সেটাকে সাত কাহন ক'রে রটিয়ে বেড়া'বে।"

মোক্ষদা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া সরস্বতীর হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে মেঝের উপরে বসাইয়া দিল।

সরস্বতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পরে একটু সংযত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, রাঙাবৌ, ঠাকুরপো কল্‌কাতায় গিয়ে কি আমাদের ভুলে গেল—চিঠি পত্তর আস্‌ছে কি ?"

মোক্ষদা উঠিয়া যাইতেছিল। সরস্বতী তাহার আঁচল ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "উত্তর না দিলে কিছুতেই ছাড়্‌ না বৌ"

মোক্ষদা সেইখানে বসিয়াই বলিল, "কেন, চিঠি আজ সকালেই একটা এসেছে।"

"বেশ ভাল আছে ত ?"

মোক্ষদা কোন কথাই কহিল না। সরস্বতী একেবারে সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "শিগ্‌গির বল কি হ'য়েছে তা'র ?"

মোক্ষদা আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াই রহিল।

সরস্বতী তাহাকে খুব জোরে ঝাঁকানি দিয়া বলি "মুখপুড়ী, রাঙা বৌ, বল্‌ চিঠি কোথায় রেখেছিস্‌।"

আঁচলের ভিতর হইতে একখানি চিঠি বাহির করি মোক্ষদা বলিল, "এই নাও।" তা'র পর ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সরস্বতী ডাকিল, "নিমাই, নিমু রে।"

নিমাই ছুটিয়া আসিয়া একেবারে সরস্বতীর বুকের উপর লাফাইয়া পড়িল।

"হাঁা, নিমু, তোর বড় কা' এখন কোথায় রে ?"

নিমাই একেবারে দরজার কাছে গিয়া বলিল, "ঐ যে মাঠে ব'সে আছে। ডেকে আন্‌ব, মা ?"

সরস্বতী বলিল, "শোন্, বাঁদর, সব কাজে তাড়াতাড়ি।"

নিমাই ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া তাহার কোলের উপর বসিয়া রহিল।

সরস্বতী তা'র মুখটি উঁচু করিয়া ধরিয়া খুব জোরে জোরে চুমো খাইতে খাইতে বলিল, "ছাখ্, নিমু, ছুটে যাবি আর আস্‌বি। তোর বড়-কা'কে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে আয়।"

বনমালী অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত ভাবে হুঁকা হাতে করিয়াই ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কি হ'য়েছে গা,—কি হ'য়েছে—শিগ্‌গির বল।"

সরস্বতী [illegible] বলিল, "থাক্‌ খুব হ'য়েছে। তা'দেরও একটু [illegible] না ? আমরা না হয় তোমার কেউ [illegible] কি হ'ল না হ'ল—"

বনমালী [illegible] বলিল, "কি হ'য়েছে, দিদি, সুরেশের চিঠি [illegible] কি ?"

"আশ্চর্য্য না!" [illegible] মোক্ষদার নামের চিঠিখানা সরস্বতী তাহার হাতে [illegible] দিল।

পত্রের শিরোনামা দেখিয়াই বনমালী বলিল, "এ যে বোমার চিঠি। ছি, সরস্বতী, তোমার কি একটুও আক্কেল নেই। [illegible] স্বামী-স্ত্রীর চিঠি আমি প'ড়ব কি ক'রে ?"

সরস্বতী একটুও বিচলিত না হইয়া সোজা উত্তর দিল, "তা' হো'ক, তুমি এখনি প'ড়ে আমায় খবরটা আগে বল।"

বনমালী নাম মাত্র দিয়া চিঠিখানি পড়িয়া বলিল, "না, ভয় কিছু [illegible] গো—সামান্য জ্বর—বৌমাকে লিখেছে, যদি দাদাকে [illegible] বৌদি'কে বল ত' আর কখন তোমার মুখ দেখ্‌ব না।"

বনমালী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সুরেশ এখনও ছেলে মানুষটি র'য়েল,—না, সরস্বতী ? পাছে আমরা ভাবি ব'লে, জানা'তে বারণ ক'রেছে।"

সরস্বতী কোন কথায় কান না দিয়া বলিল, "সামান্য জ্বর ব'লছ। তা' সামান্য জ্বর ত একটু একটু ক'রে বেড়ে গিয়ে সাংঘাতিক হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। তার পর কেউ নেই সেখানে যে তাকে—" বলিতে বলিতে নিজের আঁচলে মুখ ঢাকিয়া সরস্বতী একেবারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

[illegible] দেখি নিমাইও কাঁদিয়া ফেলিল। বনমালী [illegible] বলিল, "চুপ কর্, তো'র মাকে।" তার পর [illegible] হন্ হন্ করিয়া ঘর হইতে [illegible] গিয়া ডাক ছাড়িয়া বাঁচিল।

(২)

তা'দের ছিল সে'টি সুখের সংসার। বনমালী ও সুরেশের বৈমাত্রেয় বড় ভা'য়ের একটি ছেলে—সেই ত নিমাই। তিনি যখন মারা যান, নিমু তখন মাতৃগর্ভে। তার পর ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হইয়া যখন সবে কান্না থামাইয়া চোখ তাকাইতে সুরু করিয়াছে, সেই সময় তা'র জননীর শেষ নিশ্বাসটুকু একদিন আকাশে মিলাইয়া গেল। আজ এই আট বছর সরস্বতীর সমস্ত বুকটাকে জোড়া করিয়া তা'র নিমাইটি ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিয়াছে। সুরেশের স্ত্রী মোক্ষদা কম বেশী পাঁচ ছ' বছর ধরিয়া এই মা-ছেলের সুখের মিলনটুকু দেখিয়া কখন বা হিংসায়, কখন বা আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে। কে এই দিদি! সরস্বতী দিদিই বা কোন রাজ্যের লোক। পেটে না ধ'রলেও যা'র মা এই, সে মা কি মানুষ। না, দেবী নিশ্চয়॥ নিজের মেয়েটি তরলাকে প্রায় পাঁচ বছরের প'ড়তে চায়, "কেও ত' কৈ অত সোহাগ দেখাতে পারলুম না। মোক্ষদা যতই ভাবিত, ততই তা'র [illegible] বহ্নি জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিত।

নিমাইর পিতা বেশ কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। বনমালীকে হুকুম দেওয়া ছিল, সুরেশের বিবাহ পর্য্যন্ত করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন এবং তাহার লেখাপড়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত খরচ [illegible] টাকা হইতে দেওয়া হইবে। বাকী যাহা থাকিবে, তাহাও অনেক। সেটুকু নিমাইর। আজ প্রায় ত' বছর পূর্ব্বে লেখাপড়া শেষ করিয়া সুরেশ কলিকাতায় ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছে। বনমালী জমিদারের সরকারী কাছারিতে চাকরি করে।

পথবার একাদশী, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি। ৩য়। প্রফুল্ল, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি। ৪র্থ। সাজাহান, বাপ্পারাও, মোগল-পাঠান, শিরীরী প্রভৃতি।

সাধারণ বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পাঠ্যও এই চারি স্তরের অন্তর্গত। ১ম, পাদরীদের প্রণীত বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক। ২য় বিদ্যাসাগরাদির বোধোদয় প্রভৃতি পুস্তক। ৩য়, কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রভাত চিন্তা প্রভৃতি। ৪র্থ, বর্ত্তমানে জগদানন্দের 'জ্ঞানসোপান', প্রসন্ন বিদ্যারত্নের সাহিত্য পুস্তক প্রভৃতি। বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্বাপর ভাষার গতি ও পরিণতি দেখাইলাম। বর্ত্তমানে সকল লেখকই ভাষার সরলতা সম্পাদনে সচেষ্ট। শিক্ষিত সমাজ সকলেই সরল বাঙ্গালার আকাঙ্ক্ষা করেন। তজ্জন্য কালের স্রোতোনুসারে সকলেই ব্যাকরণ, অভিধানের সংস্রব ত্যাগ করিয়া সর্ব্বজনবোধ্য দেশজ ভাষাকেই একমাত্র উপজীব্য করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে সাহিত্যের বা ভাষার উন্নতি হইতেছে কি অবনতি হইতেছে, তাহা সুধীগণের বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যদি প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের স্থায়িত্ব বাঞ্ছনীয় হয় এবং ভবিষ্যতে যাহাতে উক্ত গ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য গ্রহণে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে বাসনা না থাকে, তবে এখন হইতেই সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত। উচ্ছৃঙ্খল গতিতে ভাষাকে চলিতে দিলে ভাষার পদ ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। ভাষারও একটা নির্দ্দিষ্ট পথ থাকা আবশ্যক, এবং সে পথের সীমার নির্দ্দেশও কর্ত্তব্য। যাহা লিখিত হইবে, তাহাই মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বিদ্যালয়ে মন্দিরে মঠে সর্ব্বত্র অবাধ গতিতে চলিতে থাকিবে, তাহা শ্রেয়স্কর নহে।

নিমুর মা।

[শ্রীচণ্ডীচরণ দাসগুপ্ত, বি-এ।]

(১)

মোক্ষদা বলিল, "দিদি, তোমার ছেলের দৌরাত্ম্যি রোজ রোজ বেড়েই যা'চ্ছে দেখ্‌তে পাই।"

অতি ধীর নরম সুরে সরস্বতী কহিল, "তুমি বাছা শুধু নিমায়ের দোষটিই দেখ্‌তে জান।"

মোক্ষদা চাপা হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, দিদি, তুমিই বল, বড়ঠাকুর যে সেদিন নিমুকে চোখ রাঙিয়ে মারতে গেলেন, সেটা তা' হ'লে তাঁর মস্ত অপরাধ হ'য়েছে ?"

সরস্বতী জ্বলিয়া উঠিল। একেবারে মোক্ষদার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর দিল, "ওঁর কথা ছেড়ে দাও, রাঙাবৌ,—উনি অমন না বুঝে সুঝে পাঁচশ' কথা লোককে শুনিয়ে দেন।"

"তোমার ঐ কেমন কথা, দিদি,—নিজে যা' ক'রবে সেইটিই হবে ভাল,—আর অন্য লোকে ক'রলেই যত দোষ।"

"আমি কি ব'ল্‌ছি তা'ই;—একটু ছুতো পেয়েছ কি অমনি সেটাকে সাত কাহন ক'রে রটিয়ে বেড়া'বে।"

মোক্ষদা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া সরস্বতীর হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে মেঝের উপরে বসাইয়া দিল।

সরস্বতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পরে একটু সংযত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, রাঙাবৌ, ঠাকুরপো কল্‌কাতায় গিয়ে কি আমাদের ভুলে গেল— চিঠি পত্তর আসছে কি ?"

মোক্ষদা উঠিয়া যাইতেছিল। সরস্বতী তাহার আঁচল ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "উত্তর না দিলে কিছুতেই ছাড়্‌ব না বৌ।"

মোক্ষদা সেইখানে বসিয়াই বলিল, "কেন, চিঠি আজ সকালেই একটা এসেছে।"

"বেশ ভাল আছে ত ?"

মোক্ষদা কোন কথাই কহিল না। সরস্বতী একেবারে সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "শিগ্‌গির বল কি হ'য়েছে তা'র ?"

মোক্ষদা আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াই রহিল।

সরস্বতী তাহাকে খুব জোরে ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "মুখ্‌পুড়ী, রাঙা বৌ, বল্ চিঠি কোথায় রেখেছিস্।"

আঁচলের ভিতর হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া মোক্ষদা বলিল, "এই নাও।" তা'র পর ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সরস্বতী ডাকিল, "নিমাই, নিমু রে।"

নিমাই ছুটিয়া আসিয়া একেবারে সরস্বতীর বুকের উপর লাফাইয়া পড়িল।

"হ্যাঁ, নিমু, তোর বড় কা' এখন কোথায় রে ?"

নিমাই একেবারে দরজার কাছে গিয়া বলিল, "ঐ যে মাঠে ব'সে আছে। ডেকে আন্‌ব, মা ?"

সরস্বতী বলিল, "শোন্, বাঁদর, সব কাজে তাড়াতাড়ি।"

নিমাই ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া তাহার কোলের উপর বসিয়া রহিল।

সরস্বতী তা'র মুখটি উঁচু করিয়া ধরিয়া খুব জোরে জোরে চুমো খাইতে খাইতে বলিল, "স্থাখ্, নিমু, ছুটে যাবি আর আস্‌বি। তোর বড়-কা'কে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে আয়।"

বনমালী অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত ভাবে হুঁকা হাতে করিয়াই ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কি হ'য়েছে গা,—কি হ'য়েছে—শিগ্‌গির ব ।"

সরস্ব রাগিয়া বলিল, "থাক্ খুব হ'য়েছে। ভা'য়েরও একটু খ রাখ্‌তে পার না? আমরা না হয় তোমার কেউ কিন্তু . কি হ'ল না হ'ল—"

. . .ধা দিয়া . লল, "কি হ'য়েছে, গিন্নি, সুরেশের কিছু বিপদাপদ হ'ল . কি ?"

"আশ্চর্য্য নয়" বলিয়া মোক্ষদার নামের চিঠিখানা সরস্বতী তাহার হস্তে তুলিয়া দিল।

পত্রের শিরোনাম দেখিয়াই বনমালী বলিল, "এ যে বৌমার চিঠি। ছিঃ, সরস্বতী, তোমার কি একটুও আক্কেল নেই! তাদের স্বামী-স্ত্রীর চিঠি আমি প'ড়ব কি ক'রে ?"

সরস্বতী একটুও বিচলিত না হইয়া সোজা উত্তর দিল, "তা' হ'ক, তুমি এখুনি প'ড়ে আমায় খবরটা আগে বল।"

বনমালী বাদ সাধ দিয়া চিঠিখানি পড়িয়া বলিল, "না, ভয় কিছু নেই গো—সামান্য জ্বর—বৌমাকে লিখেছে, যদি দাদাকে বা বৌদি'কে বল ত' আর কখন তোমার মুখ দেখ্‌ব না।"

বনমালী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সুরেশ এখনও ছেলে মানুষটি র'ইল,—না, সরস্বতী ? পাছে আমরা ভাবি ব'লে, জানা'তে বারণ ক'রেছে।"

সরস্বতী কোন কথায় কান না দিয়া বলিল, "সামান্য জ্বর ব'লছ। তা' সামান্য জ্বর ত একটু একটু ক'রে বেড়ে গিয়ে সাংঘাতিক হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। তার পর কেউ নেই সেখানে যে তাকে—" বলিতে বলিতে নিজের আঁচলে মুখ ঢাকিয়া সরস্বতী একেবারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তা'র দেখাদেখি নিমাইও কাঁদিয়া ফেলিল। বনমালী বেগতিক দেখিয়া বলিল, "চুপ্ কর তো'র মাকে।"

ন্ করিয়া ঘর হইতে পলাইয়া গিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

(২)

তা'দের ছিল সে'টি সুখের সংসার। বনমালী ও সুরেশের বৈমাত্রেয় বড় ভা'য়ের একটি ছেলে—সেই-ই নিমাই। তিনি যখন মারা যান, নিমু তখন মাতৃগর্ভে। তার পর ছেলেটি ভূমিষ্ট হইয়া যখন সবে কান্না থামাইয়া চোখ তাকাইতে সুরু করিয়াছে, সেই সময় তা'র জননীর শেষ নিশ্বাসটুকু একদিন আকাশে মিশাইয়া গেল। আজ এই আট ব'ছর সরস্বতীর সমস্ত বুকটাকে জোড়া করিয়া তা'র নিমাইটি ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিয়াছে। সুরেশের স্ত্রী মোক্ষদা কম-বেশী পাঁচ ছ' ব'ছর ধরিয়া এই মা-ছেলের সুখের মিলনটুকু দেখিয়া কখন বা হিংসায়, কখন বা আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে। কে এই নিমু! সরস্বতী দিদিই বা কোন্ রাজ্যের লোক! পেটে না ধ'রলেও যা'র মা এই, সে মা কি মানুষ! না, দেবী নিশ্চয়!! নিজের মেয়েটি তরুবালা প্রায় পাঁচ ব'ছরে প'ড়তে চ'লল, তা'কেও ত' কৈ অত সোহাগ দেখাতে পারলুম না। মো যতই ভাবিত, ততই তা'র বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিত।

নিমায়ের পিতা বেশ কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন। বনমালীকে হুকুম দেওয়া ছিল, সুরেশের বিবাহে ঘটা করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন এবং তাহার লেখাপড়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত খরচ এই সঞ্চিত টাকা হইতে দেওয়া হইবে। বাকী যাহা থাকিবে, তাহাও অনেক। সেটুকু নিমায়ের। আজ প্রায় ছ' বছর পূর্ব্বে লেখাপড়া শেষ করিয়া সুরেশ কলিকাতায় ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছে। বনমালী জমিদারের সরকারী কাছারিতে চাকরি করে।

। নাই। সরস্বতী ছিল সে সংসারের
তাহাকে ভয় করিত না এমন কেহই ছিল
কন্তু সে ভয়ে এতটুকু আতঙ্কও স্থান পাইত না।

জ তাহাকে সত্যই কাঁদিতে দেখিয়া মোক্ষদা ঘরে
বলিল, "এ কি, দিদি, কান্না আবার কেন?"

স্বতী একটু স্থির হইয়া বলিল, "এ সব চিঠি কি
রাখ্‌তে আছে, পাগলি।"

ক্ষদা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কি ক'র্ব্ব,
মানা ক'রে দেওয়া সত্বেও কি ক'রে জানাই
দর।"

স্বতী তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া
"আমাকে জানালেও ত' পার্‌তে বোন্।"

াক্ষদা হাত ছাড়াইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "সব
তোমাকেই ব'লতে হবে তা'র কি মানে আছে,—
তামারই বা শোন্‌বার কি অধিকার?"

রস্বতী একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া কাঠের
র মত চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল।

(৩)

াদিন বেলা চারটার সময় বনমালী ভাত খাইতে
ছে। জমিদারীর মস্ত একটা তদরকে গিয়াছিল
সারা সকাল-দুপুরে একবারও তাহার বাড়ী ফিরি-
অবকাশ হয় নাই। সরস্বতী অনেক সাধ্য সাধনা
বাড়ীর সকলকে খাওয়াইয়া স্বামীর অপেক্ষায়
ছিল।

নমালীকে পাখার হাওয়া করিতে করিতে সরস্বতী
"আজ এত দেরী হ'ল যে? একটু খবর পাঠাতেও

নমালী মুখ তুলিয়া বলিল, "এখন মাঝে মাঝে এ
দেরী হবেই - জমিদাব আমায় একটা নতুন কাজে
য় দিয়েছেন — দু' পয়সা উপরিও আছে।"

রস্বতী জোর করিয়া বলিল, "তা' হ'ক, এ কাজ
কিছুতেই নিতে পা'বে না—পয়সার দরকার নেই
দের। ঠাকুরপো অত টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে—তোমার
ার খাটবার বয়েস আছে এখন।"

নমালী এক ঢোঁক্ জল খাইয়া কহিল, "তা' ব'টা
শক্তি থাকে খেটে নি' ত'।"

সরস্বতী তাহার কথাটা চাপা দিয়া বলিল, "তুমিই
ত' সেদিন ব'ললে, ঠাকুরপো তোমায় চাকরী ছেড়ে দিয়ে
ঘরে ব'সে থাকতে ব'লেছে।"

বনমালী একটু এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল, "সে
কি একটা কথা হ'ল, সরস্বতী। তুমি কচি খুকিটি নও।"

বনমালী প্রায় খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া যাইতেছিল।

সরস্বতী বলিল, "ওকি, উঠে যা'চ্ছ যে—একটু মিষ্টি
খাও।"

অগত্যা বনমালীকে আবার বসিতে হইল।

এই সময় কোথা হইতে ছোট দু'টি পায়ের শব্দ
হওয়াতেই সরস্বতী কান খাড়া করিয়া শুনিয়া বলিল, "এই
যে বাবু আস্‌ছে।"

নিমাই বই শ্লেট লইয়া একেবারে জুতাশুদ্ধ দালানের
উপর উঠিয়া এক মহা আব্দারের সুর জুড়িয়া দিল।

সরস্বতী তাহার দিকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিল, "খাবার
সময় জুতো শুদ্ধ্ দালানে উঠ্‌লি যে?"

নিমাই অন্যমনস্ক ভাবে জুতা উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া
দিয়া একেবারে সরস্বতীর আঁচল ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ
করিয়া দিল।

সরস্বতী তাহাকে কোলে বসাইয়া বাতাস করিতে
করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে রে, নিমু?"

নিমু কহিল, "আজ আমি এখুনি ইষ্টিষণে রেলগাড়ী
দেখ্‌তে যা'ব, মা। হালদার ঠাকুরের ছেলে রামদা'ও
যা'বে। আমাকে ব'ললে—শিগ্‌গির খেয়ে আয়।"

সরস্বতী গম্ভীর হইয়া বলিল, "তোকে যেতে দেবে
কে রে?"

"না যেতে দিলে আজ আমি খা'বও না, কিচ্ছুই ক'র্ব্ব
না" বলিয়া বই শ্লেট ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বনমালী আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "যা',
নিমু, খেয়ে নিগে যা'—আর একদিন তখন ইষ্টিষণে যা'স।"
তার পর বাড়ীর বাহিরের খোলা মাঠের দিকে চলিয়া
গেল।

নিমাই দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আমি যা'বই যা'ব—
ঐ রামদা' এসে ডাকাডাকি ক'রছে—ওকে দাঁড়া'তে
বল, মা,—নইলে এখুনি' চ'লে যা'বে।"

সরস্বতী হাঁকিল, "রাম, ভেতরে এস ত, বাবা।"

রাম ভিতরে আসিতেই নিমাই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "রামদা', রামদা',—মা যে যেতে দিচ্ছে না,—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি একটু বল না।"

সরস্বতী বলিল, "তুমি একেলা ইষ্টিষণে যেতে পারবে, রাম?"

জামাটি গায়ে পরিতে পরিতে রাম উত্তর দিল, "তা' পারি, বড়মা। গেছিও ত' অনেকবার।"

"তা', তুমি আজ যাও—নিমুকে আর একদিন মনে ক'রে নিয়ে যেয়ো এখন।"

রাম বিষন্ন বদনে চলিয়া যাইতেছিল। নিমাই কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "আর একটু দাঁড়াও না, রামদা'।"

"আর দাঁড়াবার সময় আছে কি—গাড়ী চলে গেলে আর দেখ্‌ব কি?" বলিয়া পিছনে আদৌ না তাকাইয়া রাম ছুটিয়া চলিয়া গেল।

নিমাই দরজায় হেলান দিয়া পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল—কিছুতেই নড়িল না। সরস্বতী একটিও কথা কহিল না। চুপ্‌ করিয়া বসিয়া রহিল।

মোক্ষদা আসিয়া বলিল, "যা' খেতে যা'—আর রাগে কাজ নেই।"

নিমাই একটুও নড়িল না দেখিয়া মোক্ষদা তাহার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া বলিল, "তুই যে বই-শেলেট ছুঁড়ে ফেলে দিলি, -তোর কাউকে ভয় নেই?"

সরস্বতী দাঁড়াইয়া উঠিয়া একেবারে নিমায়ের চ'খের উপরে তাকাইয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে রান্নাঘরে গিয়া দে'য়ালে ঠেসান দিয়া পরিশ্রান্তের মত বসিয়া পড়িল।

মোক্ষদা কহিল, "বড় হারামজাদ হ'য়েছিস তুই আজ কাল।"

নিমাই তাহার হাত ছাড়াইয়া দরজায় মুখ গুঁজিয়া লোহার মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"অনেক ছেলে দেখেছি—এমন একগুঁয়ে ছেলে বাপের জম্মে দেখিনি" বলিয়া মোক্ষদা তাহাকে আবার টানিতে লাগিল।

ছিমন্ত চাকর সেকেলে লোক। বাসন মাজিতে মাজিতে বলিল, "কি কর, রাঙা মা, আপনি ছেড়ে দাও না—খিদে পেলেই ও যা'বে এখন।"

মোক্ষদা রাগিয়া বলিল, "তুই চুপ্‌ কর্‌ ছিমন্ত,—আমার হুকুম, ওকে এখুনি' যেতে হবে।"

ছিমন্ত ঠোঁটের কোনে হাসি চাপিয়া বলিল, "ও এমন ছেলে নয়। এক বড়মা' ছাড়া আর কারুর কথাই কাণে নেয় না।"

নিমা'য়ের পিতাই ছিমন্তকে প্রথম বাহাল করেন। তাঁহার কথা মনে হইতেই ছিমন্ত কাপড়ের কোণে চোখ মুছিয়া বলিল, "ওর বাপ-মা বেঁচে থাক্‌লে হয় ত তাদের কথাই শুনত না। রাঙা মা, কেন মিছে বকাবকি ক'রছ ওর সঙ্গে।"

মোক্ষদা নিমুকে বলিল, "ত্যাখ্‌, আজ তোর কি করি—বড্ড অসভ্য হ'য়েছিস্‌ তুই।"

আজ সুবিধা পাইয়া মোক্ষদাসুন্দরী সরস্বতীকে আড়াল হইতে খুব খানিক শুনাইয়া দিল। বড়দি' শুধু গায়ে পড়িয়া নিজের কর্ত্তৃত্ব দেখাইতে যায়, ছেলেটাকে আদর দিয়া অসভ্য ভূত করিয়া তুলিয়াছে। সে মনে করে সে না হ'লে সংসার চ'লবে না—কেন, মোক্ষদা নিজে বড় লোকের মেয়ে, বিদ্বানের ঘরণী,—তার কি সংসারে কোন হাত নেই—কোন এক্তার নেই? গলার সুর আর একটু উচ্চ করিয়া অবশেষে বলিল, "আর এত টাকা যে সংসারে খরচ—টাকাটা যোগায় কে শুনি?"

ছিমন্ত স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছিল। বলিল, "রাঙা মা, আপনি অত রাগ ক'রছ কেনে, মা। বড়বাবু হয় ত' বা শুনতে পা'চ্ছে।"

আওয়াজ একটু নরম করিয়া মোক্ষদা বলিল, "তোরও বড় আস্পর্দ্ধা হ'য়েছে, ছিমন্ত। আমি আর এ বাড়ীতে এক দণ্ডও থাক্‌ব না—আমি আজই চিঠি লিখে দিচ্ছি—তা'রা আমাকে নিয়ে যা'ক—আমি বাপের বাড়ী চ'লে গেলে তোদেরও আপদ যায়।"

খুব স্পষ্ট গলায় সরস্বতী ডাকিল, "নিমু, এখানে আয়।"

সরস্বতীর কোলে বসিয়া তা'র বুকের ভিতর মাথা গুঁজিয়া মস্ত বড় একটা খুনী অপরাধীর মত ভয়ে জড়সড় হইয়া নিমাই চুপটি করিয়া বসিয়া রহিল।

সরস্বতী তাহাকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে একটু হাসিয়া

। নাই। সরস্বতী ছিল সে সংসারের তাহাকে ভয় করিত না এমন কেহই ছিল কিন্তু সে ভয়ে এতটুকু আতঙ্কও স্থান পাইত না।

আজ তাহাকে সত্যই কাঁদিতে দেখিয়া মোক্ষদা ঘরে আসিয়া বলিল, "এ কি, দিদি, কান্না আবার কেন?"

সরস্বতী একটু স্থির হইয়া বলিল, "এ সব চিঠি কি লুকিয়ে রাখ্‌তে আছে, পাগলি।"

মোক্ষদা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কি ক'র্ব্ব, দিদি, মানা ক'রে দেওয়া সত্ত্বেও কি ক'রে জানাই তোমাদের।"

সরস্বতী তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "আমাকে জানালেও ত' পার্‌তে বোন্।"

মোক্ষদা হাত ছাড়াইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "সব কথা তোমাকেই ব'লতে হবে তা'র কি মানে আছে,—আর তোমারই বা শোন্‌বার কি অধিকার?"

সরস্বতী একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া কাঠের পুতুলের মত চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল।

(৩)

সেদিন বেলা চার্‌টার সময় বনমালী ভাত খাইতে বসিয়াছে। জমিদারীর মস্ত একটা তদরকে গিয়াছিল বলিয়া সারা সকাল-দুপুরে একবারও তাহার বাড়ী ফিরিবার অবকাশ হয় নাই। সরস্বতী অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া বাড়ীর সকলকে খাওয়াইয়া স্বামীর অপেক্ষায় বসিয়াছিল।

বনমালীকে পাখার হাওয়া করিতে করিতে সরস্বতী বলিল, "আজ এত দেরী হ'ল যে? একটু খবর পাঠাতেও নেই।"

বনমালী মুখ তুলিয়া বলিল, "এখন মাঝে মাঝে এ রকম দেরী হবেই—জমিদার আমায় একটা নতুন কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন—দু' পয়সা উপরিও আছে।"

সরস্বতী জোর করিয়া বলিল, "তা' হ'ক, এ কাজ তুমি কিছুতেই নিতে পা'বে না—পয়সার দরকার নেই আমাদের। ঠাকুরপো অত টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে—তোমার কি আর খাট্‌বার বয়েস আছে এখন।"

বনমালী এক ঢোঁক্ জল খাইয়া কহিল, "তা' ব'টা দিন শক্তি থাকে খেটে নি' ত'।"

সরস্বতী তাহার কথাটা চাপা দিয়া বলিল, "তুমিই ত' সেদিন ব'ললে, ঠাকুরপো তোমায় চাকরী ছেড়ে দিয়ে ঘরে ব'সে থাক্‌তে ব'লেছে।"

বনমালী একটু এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল, "সে কি একটা কথা হ'ল, সরস্বতী। তুমি কচি খুকিটি নও।"

বনমালী প্রায় খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া যাইতেছিল।

সরস্বতী বলিল, "ওকি, উঠে যা'চ্ছ যে—একটু মিষ্টি খাও।"

অগত্যা বনমালীকে আবার বসিতে হইল।

এই সময় কোথা হইতে ছোট দু'টি পায়ের শব্দ হওয়াতেই সরস্বতী কান খাড়া করিয়া শুনিয়া বলিল, "এই যে বাবু আস্‌ছে।"

নিমাই বই শ্লেট লইয়া একেবারে জুতাশুদ্ধ দালানের উপর উঠিয়া এক মহা আব্দারের সুর জুড়িয়া দিল।

সরস্বতী তাহার দিকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিল, "খাবার সময় জুতো শুদ্ধ দালানে উঠ্‌লি যে?"

নিমাই অন্যমনস্ক ভাবে জুতা উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া একেবারে সরস্বতীর আঁচল ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল।

সরস্বতী তাহাকে কোলে বসাইয়া বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে রে, নিমু?"

নিমু কহিল, "আজ আমি এখুনি ইষ্টিষণে রেলগাড়ী দেখ্‌তে যা'ব, মা। হালদার ঠাকুরের ছেলে রামদা'ও যা'বে। আমাকে ব'ললে—শিগ্‌গির খেয়ে আয়।"

সরস্বতী গম্ভীর হইয়া বলিল, "তোকে যেতে দেবে কে রে?"

"না যেতে দিলে আজ আমি খা'বও না, কিছুই ক'র্ব্ব না" বলিয়া বই শ্লেট ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বনমালী আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "যা', নিমু, খেয়ে নিগে যা'—আর একদিন তখন ইষ্টিষণে যা'স।" তার পর বাড়ীর বাহিরের খোলা মাঠের দিকে চলিয়া গেল।

নিমাই দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আমি যা'বই যা'ব—ঐ রামদা' এসে ডাকাডাকি ক'রছে—ওকে দাঁড়া'তে বল, মা,—নইলে এখুনি' চ'লে যা'বে।"

সরস্বতী হাঁকিল, "রাম, ভেতরে এস ত, বাবা।"

রাম ভিতরে আসিতেই নিমাই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "রামদা', রামদা',—মা যে যেতে দিচ্ছে না,—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি একটু বল না।"

সরস্বতী বলিল, "তুমি একেলা ইষ্টিষণে যেতে পারবে, রাম?"

জামাটি গায়ে পরিতে পরিতে রাম উত্তর দিল, "তা' পারি, বড়মা। গেছিও ত' অনেকবার।"

"তা', তুমি আজ যাও—নিমুকে আর একদিন মনে ক'রে নিয়ে যেয়ো এখন।"

রাম বিষণ্ণ বদনে চলিয়া যাইতেছিল। নিমাই কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "আর একটু দাঁড়াও না, রামদা'।"

"আর দাঁড়াবার সময় আছে কি—গাড়ী চলে গেলে আর দেখ্‌ব কি?" বলিয়া পিছনে আদৌ না তাকাইয়া রাম ছুটিয়া চলিয়া গেল।

নিমাই দরজায় হেলান দিয়া পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল—কিছুতেই নড়িল না। সরস্বতী একটিও কথা কহিল না। চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল।

মোক্ষদা আসিয়া বলিল, "যা' খেতে যা'—আর রাগে কাজ নেই।"

নিমাই একটুও নড়িল না দেখিয়া মোক্ষদা তাহার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া বলিল, "তুই যে বই-শেলেট ছুঁড়ে ফেলে দিলি,—তোর কাউকে ভয় নেই?"

সরস্বতী দাঁড়াইয়া উঠিয়া একেবারে নিমায়ের চ'খের উপরে তাকাইয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে রান্নাঘরে গিয়া দে'য়ালে ঠেসান দিয়া পরিশ্রান্তের মত বসিয়া পড়িল।

মোক্ষদা কহিল, "বড় হারামজাদ হ'য়েছিস তুই আজ কাল।"

নিমাই তাহার হাত ছাড়াইয়া দরজায় মুখ গুঁজিয়া লোহার মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"অনেক ছেলে দেখেছি—এমন একগুঁয়ে ছেলে বাপের জন্মে দেখিনি" বলিয়া মোক্ষদা তাহাকে আবার টানিতে লাগিল।

ছিমন্ত চাকর সেকেলে লোক। বাসন মাজিতে মাজিতে বলিল, "কি কর, রাঙা মা, আপনি ছেড়ে দাও না—খিদে পেলেই ও যা'বে এখন।"

মোক্ষদা রাগিয়া বলিল, "তুই চুপ্ কর, ছিমন্ত,—আমার হুকুম, ওকে এখুনি' যেতে হবে।"

ছিমন্ত ঠোঁটের কোনে হাসি চাপিয়া বলিল, "ও এমন ছেলে নয়। এক বড়মা' ছাড়া আর কারুর কথাই কাণে লেয় না।"

নিমা'য়ের পিতাই ছিমন্তকে প্রথম বাহাল করেন। তাঁহার কথা মনে হইতেই ছিমন্ত কাপড়ের কোণে চোখ মুছিয়া বলিল, "ওর বাপ-মা বেঁচে থাক্‌লে হয় ত তাদের কথাই শুন্‌ত না। রাঙা মা, কেন মিছে বকাবকি ক'রছ ওর সঙ্গে।"

মোক্ষদা নিমুকে বলিল, "ত্যাখ্, আজ তোর কি করি—বড্ড অসভ্য হ'য়েছিস্ তুই।"

আজ সুবিধা পাইয়া মোক্ষদাসুন্দরী সরস্বতীকে আড়াল হইতে খুব খানিক শুনাইয়া দিল। বড়দি' শুধু গায়ে পড়িয়া নিজের কর্ত্তৃত্ব দেখাইতে যায়, ছেলেটাকে আদর দিয়া অসভ্য ভূত করিয়া তুলিয়াছে। সে মনে করে সে না হ'লে সংসার চ'লবে না—কেন, মোক্ষদা নিজে বড় লোকের মেয়ে, বিদ্বানের ঘরণী,—তার কি সংসারে কোন হাত নেই—কোন এক্তার নেই? গলার সুর আর একটু উচ্চ করিয়া অবশেষে বলিল, "আর এত টাকা যে সংসারে খরচ—টাকাটা যোগায় কে শুনি?"

ছিমন্ত স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছিল। বলিল, "রাঙা মা, আপনি অত রাগ ক'রছ কেনে, মা। বড়বাবু হয় ত' বা শুন্‌তে পা'চ্ছে।"

আওয়াজ একটু নরম করিয়া মোক্ষদা বলিল, "তোরও বড় আস্পর্দ্ধা হ'য়েছে, ছিমন্ত। আমি আর এ বাড়ীতে এক দণ্ডও থাক্‌ব না—আমি আজই চিঠি লিখে দিচ্ছি—তা'রা আমাকে নিয়ে যা'ক—আমি বাপের বাড়ী চ'লে গেলে তোদেরও আপদ যায়।"

খুব স্পষ্ট গলায় সরস্বতী ডাকিল, "নিমু, এখানে আয়।"

সরস্বতীর কোলে বসিয়া তা'র বুকের ভিতর মাথা গুঁজিয়া মস্ত বড় একটা খুনী অপরাধীর মত ভয়ে জড়সড় হইয়া নিমাই চুপটি করিয়া বসিয়া রহিল।

সরস্বতী তাহাকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে একটু হাসিয়া

বলিল, "আর কথখন আব্দার ধ'রবে—কেমন জব্দ আজ।"

নিমু কথাই কহিল না।

সরস্বতী তাহার মুখে হাতে জল দিয়া, নিজের আঁচলে মুছাইয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া বলিল, "হ্যাঁ নিমু, তোদের পণ্ডিত মশাই সে'দিন বলে গেল, তুই না কি ইস্কুলের মধ্যে সব চেয়ে ভাল ছেলে। শুধু বাড়ীতেই বুঝি দুষ্টুমি ক'রিস?"

নিমাই মা'য়ের গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া তা'র বুকের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, "তুমি কেন আমায় যেতে দিলে না?"

"যেতে আবার দেব না কেন? ব'ললুম ত', তো'র বড় কাকা একদিন নিয়ে গিয়ে খুব ভাল ক'রে দেখিয়ে আনবে।"

নিমাই বলিল, "হ্যাঁ, মা, রেলগাড়ী কি রকম দেখতে? —খুব উঁচু আকাশের মত?—রামদা' এতক্ষণ কেমন দেখছে" বলিয়া সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

একেবারে দরজার সামনে দাঁড়াইয়া হালদার ঠাকুর কহিল, "কি, মায়ে পোয়ে হ'চ্ছে কি?"

সরস্বতী নিমুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দেখ ত', ঠাকুর, ইস্কুল থেকে এসে খাওয়া দাওয়া নেই,—রেলগাড়ী দেখবে ব'লে এক আব্দার ধ'রে ব'সেছিল।"

নিমাই চট্‌পট্ বলিয়া বসিল, "রামদা'র সঙ্গেই ত যা'ব ব'লেছিলুম—আমি কি একলা। রামদা' এতক্ষণে কত দেখছে।"

হালদার একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কি, রাম আমায় না ব'লেই চ'লে গেল। আসুক সে, আজ তা'কে চাবকে ঠিক ক'রছি।"

নিমাই ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া হালদার ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

সরস্বতী নিমুর মাথার চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "আমার নিমুকে বেতিয়ে ঠিক করে এমন কেউ নেই কি, ঠাকুর? না হয় তুমিই আজ একে ধ'রে নিয়ে যাও।"

সরস্বতীর গলা জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অতি নিশ্চিন্ত হইয়া নিমু বসিয়াই রহিল।

কি এক চরম আনন্দে আত্মহারা হইয়া সরস্বতী আজ হালদার ঠাকুরের বসিবার ঠাঁই করিয়া দিতেও ভুলিয়া গেল।

হালদার একটা পিঁড়ি টানিয়া লইয়া ঘরের দোর-গোড়ায় ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

(৪)

হালদার কহিল, "আয় রে, নিমু, কাণে কাণে একটা কথা বলি শুনে যা'।"

নিমাই কি শুনিল সেই জানে, কিন্তু একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া হাততালি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "চল, আমি এখনি' যা'ব।"

তার পর সরস্বতীর কাণের কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিল, "হালদার ঠাকুর কি বলছে জান, মা,—বলছে আমায় সুরেশ কাকার কাছে নিয়ে যা'বে।"

সরস্বতী কহিল, "কেন মিছিমিছি নাচিয়ে দিচ্ছ, ঠাকুর —যে ছেলে আমার।"

হালদার একটু আশীর্ব্বাদের সুরে বলিল, "তা' হ'ক, কিছু আব্দারে বই ত' না—কিন্তু, নিমুর মা, আজ তোমায় প্রাণ খুলে সত্যি ব'লছি, যে ছেলে পেয়েছ তুমি অমনটি আর এ গাঁয়ে কখন দেখতে পাই নি। যদু পণ্ডিত সেদিন ব'লছিল, সরস্বতী মা'য়ের নিমু ছেলেটি একজন মস্ত লোক হবে।"

সরস্বতী একটু বাধা দিয়া বলিল, "যা'ক ওসব কথা। আশীর্ব্বাদ কর, ঠাকুর, যেন আমার নিমুকে রেখে যেতে পারি।"

হালদার ঠাকুর গম্ভীর স্বরে বলিল, "এ আবার কি কথা।" তা'র পর নিমুকে টানিয়া আনিয়া কহিল,—"দ্যাখ্, এই শ্রীপঞ্চমী এল—এ'বারে ঠাকুর কিনে এনে সরস্বতী পুজো করিস। তা' নইলে মা বিদ্যে দেবেন না।"

নিমু আহ্লাদে আটখানা হইয়া তা'র মা ও হালদার ঠাকুর দু'জনকেই বেশ স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিল যে, সে এ'বারে সরস্বতী পুজো করিবেই করিবে।

হালদার ঠাকুর দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আজ আসি তবে, মা।"

বাহির বাড়ীর কাছাকাছি গিয়া আবার ফিরিয়া

আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে হালদার কহিল, "হ্যাঁ, আর একটা কথা ব'লতে ভুলে গিছলেম, মা,—বনমালী দাদাকে মনে করিয়ে দিও, কাল সকালে যেন আমার বাড়ীতে যায়, একটু দরকারী কাজ আছে", বলিতে বলিতে আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে অন্ধকার পথে মিশাইয়া গেল।

সেই রাত্রে বনমালী তামাকু টানিতে টানিতে বলিল, "আজ একটা মস্ত ভুল ক'রে ব'সে আছ, বোধ হয়। বৌমার সঙ্গে তোমার কোন বচসা হ'য়েছিল কি?—পাঁচী বেটিই তা'কে বিগ্‌ড়ে দিলে দেখ্‌ছি। আজ বেড়ার পাশ দিয়ে আস্‌তে আস্‌তে স্পষ্ট শুন্‌তে পেলুম, তারা তোমায় খুব গাল দিচ্ছে।"

পাঁচী মোক্ষদার বাপের বাড়ীর ঝি। মোক্ষদার বিবাহের সময় হইতেই এখানে জমি গাড়িয়াছে। কিছু কিছু সংসারের কাজও করিত।

বনমালী কহিল, "কেন, বৌমা ত বেশ ছিল গো—মা লক্ষ্মী ঘরে এসে পর্য্যন্ত আমাদের ভাল বৈ কখনও মন্দ হয় নি।"

সেদিন বড় গরম। নিমু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে হাওয়া করিতে করিতে সরস্বতী কহিল, "ও কিছু না।—একটু খামখেয়ালি আছে। ঠিক হ'য়ে যা'বে আবার।"

বনমালী শুইয়া পড়িয়া কহিল, "না গো, খারাপটা যখন আসে, তখন এমনি ভাবেই মানুষকে অল্প অল্প ক'রে ঢেকে ফেলে।"

সরস্বতী একটু রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "তা' আমাকে কি ক'রতে হবে বল—আমার শক্তি যতটুকু তা'র বেশী আর কিছুই ক'রতে পার্ব্ব না।"

"তা' যা'ক, তুমি আর বৌমার কথায় বেশী থেকো টেকো না", বলিয়া বনমালী আজ অনেক দিন পরে সংসারের ভাবনায় মহা বিব্রত হইয়া উঠিল। সে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে যেন অতি দুর্গন্ধময় কালো, ঘোলাটে জলের বন্যায় তা'র সাজান সোণার সংসারটি ভাসিতে ভাসিতে কোন্ অতলের পচা গর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। সে আর চুপ্ করিয়া শুইয়া থাকিতেই পারিল না। উঠিয়া সিয়া তাকিয়ার হেলান দিয়া ভাবিতে লাগিল, একদিকে ত' মেঘ বেশ জমাট হইয়া আসিতেছে, হয় ত বা কোন্ দিন তাহা গলিয়া গিয়া শতধারে বর্ষিত হইয়া তা'দের ছোট্ট সংসারটুকু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কাদার পিণ্ড করিয়া দিবে।

সরস্বতী বলিল, "ঘুম হ'চ্ছে না বুঝি—ভাবছ কি?"

বনমালী উত্তর দিল, "ভাব্‌ব আর কি, তুমিই বা কৈ ঘুমোলে?"

"পাখা বন্ধ ক'রলে নিমু যে এখনি' উঠে প'ড়বে—আজ যে গরম, চোপো রাত বাতাস না ক'রলে ঘুমোতে পা'রবে না", বলিয়া নিমুর পাশে শুইয়া সরস্বতী চোখ বুজিয়া হাওয়া করিতে লাগিল।

বনমালী কহিল, "তুমি দেখ্‌ছি ছেলে ছেলে ক'রে উন্মাদ হ'য়ে যা'বে।"

সরস্বতী অল্প তন্দ্রার ঘোরে বলিল, "হুঁ।"

বনমালী এটা-ওটা অনেক কথা বলিয়া গেল। তার পর পাশ ফিরিয়া বলিল, "হালদার কি ক'র্ত্তে এসেছিল আজ?"

সরস্বতী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এতটি কথা বৃথায় গেল ভাবিয়া একটু ম্রিয়মাণ হইয়া বনমালীও চোখ বুজিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

(৫)

মোক্ষদা সেদিন মুখ হাঁড়ি করিয়া দালানের উপরে বসিয়াছিল।

পাঁচী বলিল, "আজ একটু নাওয়া খাওয়া কর—নইলে ভাল দেখায় না যে।"

একেবারে গর্জ্জন করিয়া মোক্ষদা বলিল, "বেরো আমার সামনে থেকে।"

সরস্বতী তখন সবে রান্না চড়াইয়াছে। মোক্ষদা চীৎকার করিয়া তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল, "ম'রে গেলেও আমার সোয়াস্তি নেই—আমি পাজি, আমি বদ্‌মায়েস্, আমি ছোট লোক, আমি কি না।" তার পর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আবার সুরু করিল, "তার চেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে ব'ললেই ত হয়—এ ত সোজা কথা পড়ে র'য়েছে।"

পাঁচী শেষটুকু যোগাইয়া দিয়া বলিল, "এত বড় স্পর্দ্ধা

কা'র আছে, মা—? আমরা ত জানি, এ বাড়ী ঘরের মালিক তুমিই—তুমি হাত তুলে যা'কে দাও সেই পায়, নইলে সবা'য়ের দাঁতকপাটি লেগে যেত।"

মোক্ষদা একেবারে সপ্তমে চড়াইয়া বলিল, "শুধু টাকার জন্যেই ত ভালবাসা, টাকা না থাকলে দেখতুম কোথায় নিমুর আদর থাকৃত বড়দি'র কাছে।"

ঠিক ঘা দিবার সময় পাইয়া পাঁচী কড়া কড়া করিয়া বলিল, "সব জায়গায় তাই, মা।"

সরস্বতী আজ নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। মোক্ষদা তা'র আড়ালে যাই ব'লুক, ঠিক তা'কে শুনিয়ে শুনিয়ে এত কথা ব'লবে, এ তা'র স্বপ্নের একটা আবল-তাবল কুৎসিত কাহিনীতেও সে কখন জানিতে পারিত কি না সন্দেহ। আজ পর্য্যন্ত যে ক্ষুদ্র গর্ব্বটুকু সরস্বতীকে সজাগ করিয়া রাখিয়াছিল, তা'র আগাগোড়া পুড়িতে পুড়িতে একেবারে ছাই হইয়া গেল। এই বৌটি,—যে কখন মুখ তুলিয়া সরস্বতীর কথার উপর জবাব দিতে এতটুকু হইয়া লজ্জায়, সরমে মরিয়া যাইত, হায় বিধাতা, কোন্ পচা অভিশাপে তা'র সেই ভালটুকু কাড়িয়া লইয়া, পরিবর্ত্তে শুধু পাঁকের দুর্গন্ধ ঢালিয়া দিতেছ! সরস্বতী ভাবিয়াই পাইল না, এর আরম্ভ কোথায়, আর সত্যই বা কতটুকু। তবে এটুকু সে জোর করিয়া বিশ্বাস করিয়া লইল যে, মোক্ষদা কি বলিতেছে তা' মোক্ষদার নিজেরই বুঝিবার শক্তি নাই। এটা যে সত্যের মাথায় দাঁড়াইয়া পদাঘাত না করিলে কিছুতেই বিশ্বাস হইবে না যে, মোক্ষদা নিজে এবং পাঁচীকে লাগাইয়া আজ তা'কে অপমান করিবার চেষ্টা করিতেছে।

সরস্বতী ঘরের বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে রাঙাবৌ, এত গোলমাল কিসের?"

মোক্ষদা দে'য়ালে হেলান দিয়া বলিল, "গায়ে প'ড়ে ঝগড়া ক'রতে ত তোমার কেউ ডাকে নি।"

সরস্বতী একটু রাগিয়া বলিল, "বড় কথা শিখেছ, রাঙ্গা বৌ,—না?"

মোক্ষদার নড়িবার ক্ষমতাও শেষ হইয়া আসিতেছিল। পাঁচী একেবারে চৌরস জবাব দিল, "এতে আর শেখাশিখির কথা কি আছে, বড় গিন্নী। মা ত আর কিছু চোরের মত লুকিয়ে কোন কাজ ক'রতে যায় নি।"

সরস্বতী এ কথায় কান না দিয়া একেবারে যেখানে মোক্ষদা বসিয়াছিল, সেই দালানে উঠিয়া বলিল, "এ সব ঝগড়া ক'রতে কবে শিখ্‌লে, রাঙ্গা বৌ?"

মোক্ষদা হঠাৎ চোখ রাঙ্গাইয়া বলিল, "আমি ত কারও কথায় জবাব দিতে আসি নি এখানে—আমার ত কেউই নেই—ম'রে গেলেই আমার ভাল।"

সরস্বতী সেখানে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "এ ক'দিন তোমার ঘাড়ে ভূত চেপেছে নিশ্চয়, নইলে—"

মোক্ষদা তাহাকে বাধা দিয়া একেবারে হুঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিল, "তা' হ্যাঁ, ঐটুকুই বাকি ছিল, ব'লে নাও।"

সরস্বতী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "কেন মিছে অশান্তি ক'চ্ছ, বৌ; ঠাকুরপো শুন্‌লেই বা কি ব'লবে—, আর তোমার ভাশুরের মাথাও ত হেঁট হ'চ্ছে,—তাঁ'কেও ত তোমার মেনে চলা উচিত।"

মোক্ষদা এক নিশ্বাসে বলিতে লাগিল, "আমিও তাঁ'কে কল্‌কাতায় চিঠি লিখেছি—তিনি কালই আস্‌বেন, এখানে আমি কিছুতেই থাক্‌তে পারব না—আমার কি চুলোয় কেউ নেই?"

সরস্বতী একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, "কেন তা'কে ব্যস্ত করবার জন্যে চিঠি লেখা আবার?"

মোক্ষদা রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে উত্তর দিল, "বেশ ক'রব চিঠি লিখ্‌ব আমি। ভাল মানুষটির মত যখন ছিলাম, তখন কিছু করিনি। এখন দেখ্‌ছি আমি ত তোমাদের কাঁটা হ'য়ে উঠেছি। তরু ত তোমাদের বাড়ীর ঝিএর মেয়ের চেয়েও হীন। তিনি আমায় বিয়েই ক'রেছেন, কিন্তু কখনও কোন ঝক্কি পোয়াতে পেরেছেন? তাঁ'কেই বা ভয় কি আমার!" বলিয়া মোক্ষদা কালি মুখ করিয়া দুম্ দুম্ করিয়া পা' ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

পাঁচীর চোখে অমনি জল আসিল। সে সজোরে মাথায় চাপড় মারিয়া বলিল, "হা, আমার পোড়া কপাল গো,—কেন মা'কে আমার ক্ষেপিয়ে দিলে, বাছা। যা' ভয় ক'রছিলুম তাই হ'ল।" তার পর সেও উঠিয়া চলিয়া গেল।

সরস্বতী পঙ্গুর মত সেখানে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল যে, মহীয়'সের হাজার হাজার

দুর্দান্ত চেলা-চামুণ্ডারা আসিয়া তা'র মুখে চোখে যেন তপ্ত লোহার ছর্ম্ম্ব পিটিয়া একে একে চলিয়া যাইতেছে। ঠাকুরপো আসিয়া কি বলিবে, সেই ভাবনায় সরস্বতী আজ পথের ধূলার সহিত মিশাইয়া গিয়া নিজের কাছে খেলো হইয়া যাইতেছিল।

(৬)

সেদিন নিমুর স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিতে খুব বেলা হইতেছিল। ছিমন্তকে দু' তিন বার পাঠাইয়াও সরস্বতী কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই।

হালদারকে ডাকিয়া বলিল, "ঠাকুর, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, নিমুকে খুঁজে বা'র করে নিয়ে এস—শুনৃছি, রাম ত বাড়ী ফিরে এসেছিল।"

হালদার একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল, "হ্যাঁ, সে ত অনেকক্ষণ এসে খাওয়া দাওয়া ক'রে বেড়াতে গেছে।"

সরস্বতীর বুকের ভিতরটা সব ফাঁকা হইয়া যাইতেছিল। সে একেবারে হালদার ঠাকুরের দু'টি পায়ের ভিতর মাথা গুঁজিয়া বলিল, "যেখান থেকে হয় খুঁজে বা'র কর, ঠাকুর, নইলে আমার দশা কি হবে বল ত।"

হালদার পিছাইয়া গিয়া কহিল, "কি ক'রছ, মা,—এই আমি চল্লুম—দেখ্‌ছি কোথায় গেল—কাছাকাছি আছে নিশ্চয়—সে ত ঘুরে বেড়াবার ছেলে নয়।"

হালদার চলিয়া গেলে সরস্বতী তুলসীতলায় প্রদীপটি জ্বালিয়া দিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

মোক্ষদা ব'লতেছিল, "সে আজ কাল পেকে উঠেছে—ত বদ ছেলে তা'র ইয়ার,—যেমন শাসনের ছিরি,—বেই ত, তা'র দোষটা কি বল,—" তার পর একটু র নামাইয়া অথচ ফিস্ ফিস্ করিয়া পাঁচীকে বলিল, দার তা' ছাড়া দ্যাখ্, ওটা যত শাসন ডিঙ্গিয়ে যায়, তত ড়িয়েই ভাল বই মন্দ নয়, টাকাগুলোর বেশী ভাগ হজম তা' হ'লে,—ঠিক না?"

পাঁচী খুব চড়া গলায় কহিল, "তা'র আর সন্দেহ আছে। তোমার চোখে ধুলো দিয়ে আর ক'দিন চালা'বে ল না। একটু সজাগ হ'য়ে কেবল দেখে যাও মা, দেখে ও,—কথা বলবার মুখ রেখেছে কি?"

মোক্ষদা কিছু সন্তুষ্ট হইয়া বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিতে লাগিল, 'হাজার দফা ব'লেছি, সামান্য লাভের জন্যে একটা ছোট ছেলের মাথা খেও না,—তা' শোনে কে,—ছিঃ, এত ছোট নজর!"

সরস্বতী তা'দের কোন্ কথাটাই বা শুনে নাই! সে বুকের পাঁজরগুলো চাপিয়া ধরিয়া একটা মড়ার মত নিশ্চল হইয়া তুলসীতলায় মাথা রাখিয়া উঠানে শুইয়া পড়িল। বেশ একটু অন্ধকার জমাট হইয়া আসিতেছিল। সে আর করিবে কি! আজ সে চুপ্ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া সকলের নিকট জুতা লাথি খাইতে প্রস্তুত ছিল। যদি এই সময় শুধু নিমুটা একবার আস্‌ত! মোক্ষদা কি আগুনে জ্বলিয়া আজ এমন মাথা উঁচু করিয়া তা'কে লাঞ্ছনা করিয়া, তা'র মুখটিকে কালো করিয়া দিতে আসিয়াছে, এর লেশ মাত্র সরস্বতী বুঝিতে চেষ্টাই করিল না।

মোক্ষদার শেষ বাণটি আসিল একেবারে এক রাশি তীব্র হলাহল বোঝাই করিয়া। "বড়ঠাকুরও টাকার লোভে নিমুর গোল্লায় যা'বার পথ পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছে।"

সরস্বতী কথাটাকে একবার নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল সেটা নরকের দুর্গন্ধ ছড়াইয়া দিতেছে। দেবোপম স্বামী তা'র, সুরেশ ভাই যা'র,—ওঃ, সেই ঘরে কি এই পাঁকের পোকা ঢুকিয়া বসিয়া আছে! সরস্বতী মোক্ষদাকে আজ চিনিয়াও চিনিতে চাহিল না। শুধু নিমু-ছেলের ভাবনাটুকু এ যাত্রায় তা'কে পাপ চিন্তার কবল হইতে মুক্ত করিয়া দিল।

দরজা পার না হইয়াই নিমু চীৎকার করিয়া উঠিল, "আজ অনেক খেলা হ'য়েছে, মা—খিদেও পেয়েছে বড্ড।"

সরস্বতী সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া নিমুর মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া ঠাওর করিতে লাগিল, এ তা'র সত্যকারের নিমাই আসিল কি না।—তা'রা যে সরস্বতীর চোখের দৃষ্টিও আজ ঝাপ্‌সা করিয়া দিয়াছিল!

নিমুকে কোলে করিয়া নিজের ঘরে আনিয়া সরস্বতী বলিল, "চুপ্ ক'রে বোস্।"

নিমাই খুব গোলমাল করিয়া বলিয়া উঠিল, "ও'সব কি—খাব না, খিদে পায় না বুঝি আমার?"

সরস্বতী তা'র কান মলিয়া দিয়া কহিল, "লক্ষীছাড়া, বাঁদর, কোথায় গিছ্‌লি?"

নিমাই কানে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কেন, পগারের মাঠে ঘুড়ি ওড়া'তে গিছলুম—রামদা নাটাই-ঘুড়ি অনেক এনেছিল।"

সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "কা'র হুকুম নিয়ে গিয়েছিলি?"

নিমাই ক্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

সরস্বতী বলিল, "দেখি, আজ তোকে কে খেতে দেয়।"

নিমু চুপ্ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বেশ্, দিও না।"

সরস্বতী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "কেন তুই আমায় না ব'লে গিয়েছিলি?"

ঘরে একটা ছোট বেত ছিল। সরস্বতী ছপাছপ্ তাহার পিঠে বসাইয়া দিল। নিমাই হামাগুড়ি দিয়া পালঙ্কের নীচে আশ্রয় লইল। সরস্বতী তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া নির্দ্দয় প্রহার করিতে লাগিল।

নিমাই তা'র কচি হাত দু'খানি জোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "আর কখ্‌খন যা'ব না, মা,—তোমার দু'টি পায়ে পড়ি।"

সরস্বতী কহিল, "বেরো, দূর হ'য়ে যা তুই।" তার পর বেতগাছটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। নিমাই বালিশে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে এক থালা খাবার সাজাইয়া আনিয়া সরস্বতী দেখিল নিমু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সরস্বতী তা'র আঁচলে নিমায়ের মুখ মুছিয়া দিতে গিয়া দেখিল, তা'র গা' গরমে পুড়িয়া যাইতেছে। থালাটি রাখিয়া নিমুর মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া সে খুব জোরে জোরে হাওয়া করিতে লাগিল।

মোক্ষদা বলিতেছিল, "কি আর দোষ ক'রেছে—না হয় ছেলেমানুষ একটু খেলাধূলো ক'রতে গিছলো,—অমন ত হ'য়েই থাকে,—ছিঃ, মেরে কুটে দিলে একেবারে।" পাঁচী তখন ছিল না। কথা আর বেশী বাড়িতে পাইল না। নির্দ্দোষ, নিরীহ একটা ছোট ছেলেকে মেরে ভারি পৌরুষের কাজ হ'ল ইত্যাদি শতখান করিয়া সরস্বতীর মাথায় দোষের বোঝা চাপাইয়া দিয়া মোক্ষদা নিশ্চিন্ত হইয়া চপ করিল।

সরস্বতী বেশ বুঝিতেছিল গা'য়ের গরম ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। খুব জ্বর নিশ্চয়!—কত জ্বর, তা' সরস্বতীর তখনকার লুপ্তচেতনায় সে আদৌ অনুভব করিতে পারিল না। নিমাই মাঝে মাঝে চোখ খুলিয়া কি বলিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সে কিছুই বলিতে পারিল না। ক্ষীণ বাহু দু'টি উঁচু করিয়া সরস্বতীকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "মা।" সরস্বতী মাথায় হাত দিয়া নীচু হইয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। সে আজ কা'রও কোন ডাক শুনিতে পাইল না। নিমাইকে কোলের কাছে আরও টানিয়া আনিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

(৭)

সরস্বতীর পায়ের ধূলা লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া সুরেশ কহিল, "একেবারে দু'টো বছরের ছুটি নিয়ে এলুম, বৌঠাকৃরুণ।"

সরস্বতী বলিল, "কাপড় জামা ছেড়ে আগে কিছু খেয়ে নাও, ভাই, তা'র পর শুনব এখন।"

খাওয়া শেষ করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে সুরেশ বলিতেছিল, "তোমার ছেলেটিকে আজ কি খেতে দিলে, বৌঠাকৃরুণ?"

"আজ চারটি ভাতই দিয়েছি।"

সুরেশ মেঝের উপর, যেখানে সরস্বতী বসিয়াছিল, তাহার কিছু দূরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "গল্পটা তোমার মুখে শুনে আমি যে আর হাসি চাপ্‌তে পারছি না, বৌদি' —বেশ রাগ তোমার।"

সরস্বতী ধীর গম্ভীর হইয়া বলিল, "না ভাই, বড় দুষ্টু হ'য়ে উঠেছিল দিনকতক—একটু আধটু না মা'রলে ঠিক হয় না যে।"

সুরেশ আর একটু অগ্রসর হইয়া বেশ হাসির সুরে বলিল, "যেমন বেছে বেছে বড়লোকের মেয়ে ঘরে এনেছিলে—কেমন তা'র ফলটা ভোগ ক'রছ এখন?"

সরস্বতী বলিল, "দূর পাগল, রাজা বৌ ছেলেমানুষ বই ত না, ভগবান ওর মতি গতি ফিরিয়ে দেবেন নিশ্চয়।"

সুরেশ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কিছুই ত বুঝি না আমি, বৌঠাকৃরুণ। তোমার পায়ের তলায় ফেলে দিয়েছি,—তোমার থেকে তুমিই মানুষ ক'রো।"

সরস্বতী প্রত্যেক কথাটির উপর জোর দিয়া বলিতে লাগিল, "ওর দোষ নেই, ঠাকুরপো—কেন যে এমন বিগ্‌ড়ে গেল, ব'লতে পারি না।"

সুরেশ কহিল, "শুধু কি তাই তোমার নামে যা' তা' লিখ্‌ত,—আর,—যাক্‌, সে কথা মুখে উচ্চারণ ক'রলেও পাপ। তুমি তা'কে না মাফ কর, বৌঠাকুরুণ, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় মাফ করবে ত?"

সরস্বতী একটু হাসিয়া কহিল, "কি ব'লছ, ভাই, নিজের স্ত্রীর কথাটা একটুও ত বিশ্বাস ক'র্‌তে হয়—সে সবই মিথ্যে লিখেছিল কেমন ক'রে জান্‌লে, ভাই?"

সুরেশ মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল। একটু এদিক-ওদিক করিয়া বলিল, "হেসে উড়িয়ে দিলে চ'লবে না বৌঠাকুরুণ। সে মেয়েমানুষটি যে কি জিনিষ তা' আমিই জানি।"

সরস্বতী কহিল, "তা' বেশ,—তা' হ'লেই ভাল।"

সুরেশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কর ঠাট্টা, টের পা'বে একদিন।"

বনমালী দরজার নিকটে আসিয়া বলিল, "কি সুরি, কখন এলি রে?"

"এই ঘণ্টা পাঁচেক হ'ল এসেছি।", বলিয়া বনমালীর পায়ে মাথা রাখিয়া সুরেশ প্রণাম করিল।

"যা'ক্‌, এসে ভালই হ'ল।"

সুরেশ চলিয়া গেলে বনমালী কহিল, "আর ত পারি না আমি। বৌমা তাঁর বাপের বাড়ীতেও খুব কড়া চিঠি লিখেছেন; কাছারিতে ব'সে আছি—তা'র ভাই এসে কত কথাই না শুনিয়ে দিয়ে গেল। দূর হ'ক, নিমুকে নিয়েই ত যত হাঙ্গামা। তা'কে দিনকতক তা'র মামার বাড়ীতেই রেখে আসি না হয়", বলিয়া বনমালী গামছা লইয়া মুখ ধুইতে চলিয়া গেল। সরস্বতীর মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল। সে ছুটিয়া গিয়া ঝাঁটা লইয়া ঘর ঝাঁট দিতে সুরু করিয়া দিল।

সুরেশ বলিতেছিল, "তোমরা যা' ভাল বোঝ তাই কর, দাদা।"

বনমালী একটু আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "আর দ্যাখ্‌, নিমুকে নিয়েই ত যত গোল্‌—ভাবছি, ওকে দিনকতক ওর মামার বাড়ী রেখে আসি।"

সুরেশ একেবারে জোর করিয়া বাধা দিয়া বলিল, "চুপ্‌, চুপ্‌, বৌ-ঠাকুরুণ এখনি শুন্‌তে পা'বে। অমন কথা মুখে আন্‌লে কি ক'রে, দাদা?"

বনমালী বলিল, "আমি তা'কেও এ বিষয়ে একটু আভাস দিয়ে এসেছি।"

সুরেশ হতাশের সহিত বলিল, "এইবারে সংসার পুড়ে যা'বেই যা'বে।" তার পর বড় বড় চোখ দু'টি তা'র জলে ভরিয়া আসিতেছে বুঝিয়া সে তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "আর যা' ইচ্ছে কর, দাদা,—কিন্তু এক কথা ব'লে দিচ্ছি আজ তোমায়, বৌ-ঠাকুরুণের কোল থেকে তা'র ছেলেটিকে কেড়ে নিও না।"

বনমালী একটু নীরব থাকিয়া কহিল, "দেখি না দিনকতক, যদি না থাক্‌তে পারে, তখন এনে দিলেই হবে।"

সুরেশ নিজের ঘরে গিয়া দেখিল, তাকিয়ায় হেলান দিয়া মুখ কালো করিয়া মোক্ষদা বসিয়া আছে। তা'র রূপ ছিল ফুটফুটে-পাকা সোণার মত। কিন্তু এমনিই হইয়া যায় মানুষ, তা'র অন্তরের কোথাও যদি এতটুকু ময়লার মলিন রেখা অঙ্কিত থাকে!

সুরেশ কহিল, "কেমন আছ, মোক্ষদা?"

সে উত্তর দিল, "এতক্ষণে দেখা করবার সময় হ'ল? আমি কি বাড়ীর ঝিরও অধম?"

সুরেশ হাসিয়া বলিল, "সে তোমার নিজের হাতেই ত তুমি নিজেকে এমনি ক'রে গ'ড়ে তুলেছ, মোক্ষদা।"

"তা যা'ক, কালই তুমি আমাকে আর তরুকে বাপের বাড়ী রেখে এস।"

সুরেশ একখানা কাগজ ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নাও তোমার বাবার চিঠি। তিনি লিখেছেন, এখানে পাঠালে আমি দুঃখিত হব।"

মোক্ষদা চিঠিখানি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "তবে না হয় আমাদের ওবাড়ীতে রেখে এস।"

আর একখানি পৃথক বাড়ী তা'দের বহু দিন হইতেই খালি পড়িয়াছিল।

সুরেশ একটু আদরের সুরে বলিল, "এমন সংসারটি ছেড়ে চ'লে যা'বে, মোক্ষদা?"

"সে আমার খুসী—আমি কারও কথা শুন্‌তে চাই না।"

সুরেশ বিছানায় বসিয়া বলিল, "তা'ই হবে।' দু' একদিন পরে যেও।" তার পর কি ভাবিয়া লইয়া বলিল, "তোমাকে আমি রেখে আস্‌ব—কিন্তু আমায় যেতে অনুরোধ ক'র না।"

মোক্ষদা কহিল, "তোমাকেও যেতে হবে—মেয়েমানুষ আমি, একলা থাক্‌ব কি ক'রে?"

সুরেশ উপহাস করিয়া বলিল, "তা' মন্দ নয়—যা'ব আমি, আর কি।"

(৮)

সেদিন বিকালে আসিয়া হালদার ঠাকুর ডাকিল, "নিমু ভাই, চল, আজ ঠাকুর না কিনে আন্‌লে যে হবে না।"

নিমাই কোথায় ছিল, চট্ করিয়া জুতাটি পরিয়া লইয়া একেবারে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হাজির হইল।

সুরেশ কহিল, "খুব সাজান-গোজান বড় দেখে ঠাকুর নিয়ে এস, নিমু", বলিয়া তাহার হাতে দশটি টাকা দিল।

টাকা ক'টি হালদারের হাতে দিয়া নিমাই বলিল, "আমি খুব গয়নাপরা সরস্বতী ঠাকুর নেব।"

"চল্, তুই নিজেই বেছে নিস্‌রে, আমি দাঁড়িয়ে থাকব এখন" বলিয়া তা'কে কোলে উঠাইয়া লইয়া হালদার চলিয়া যাইতেছিল।

সরস্বতী তাড়াতাড়ি বলিল, "কি কর, ঠাকুর, বুড়ো ছেলেকে আবার কোলে কেন?"

হালদার বলিল, "না, মা, একটু পরেই নামিয়ে দেব—চ'লুক ত এখন।"

কাল শ্রীপঞ্চমী—নিমায়ের আর কিছুতেই ঘুম হইতেছিল না। সে কেবলই ভাবিতেছিল, কখন্ ফুল হাতে দিয়ে পুরুত এসে মন্তর পড়া'বে। এবার আর সে ইস্কুলে অঞ্জলি দিতে যা'বে না—রামদা'কে বলা আছে সেও আস্‌বে, তরুও না হয় এবারে অঞ্জলি দেবে এখন। তা'র কেবলই মনে হইতেছিল যে, সেই মাটির গয়না-পরা ঠাকুরটি বুঝি তা'র মায়েরই মত একটা মেয়েমানুষ সাজিয়া আসিয়া তা'র কাণে কাণে অনেক লেখাপড়া শিখাইয়া দিয়া যাইতেছে। সে সরস্বতীর কোলের কাছে শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বলিল, "মা, ঠাকুরকে পিঁড়ির ওপর বসিয়ে রেখেছ?"

সরস্বতী বলিল, "তোর দেখ্‌ছি আজ আর ঘুম আস্‌বে না—তোর ঠাকুরের কিছু হবে না, বাপু, একটু ঘুমো দেখি।"

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া নিমাইকে বেশ করিয়া স্নান করাইয়া, সরস্বতী নিজের মনের মতনটি করিয়া তাহাকে সাজাইয়া দিল। সুন্দর ফুলকোঁচা করা লাল চেলির কাপড়। শিল্কের উপর জরি দেওয়া জামা একটি—কপালে, গালে, রক্তচন্দনের হরিপাদপদ্মের ছাপ! মাথার কোঁকড়া চুলগুলি আজ পরিষ্কার করিয়া আঁচড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। গলায় বেলফুলের মালা। আঙুলে সোণার আংটিটি চক্ চক্ করিতেছিল। ঠোঁটে আলতা মাখাইয়া টুকটুকে করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ডা'ন হাতে বই-শ্লেট আর কুশের আসনটি। বাম হাতে খাকের কাটা কলম আর মাটির দোয়াত।

সরস্বতী তা'কে একবার বুকের ভিতর আঁকড়াইয়া ধরিয়া চুমো খাইয়া বলিল, "যা, নিমু, আগে তোর সুরেশ কাকাকে দেখিয়ে আয়।"

সুরেশ দূর হইতে দেখিতে পাইয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "বাঃ বাঃ, বেশ সাজ দেখছি যে—পাগ্‌লা কোথাকার, মা'র পায়ে নমস্কার কর আগে।"

নিমাই নতজানু হইয়া সরস্বতীর পায়ের তলায় মাথা রাখিয়া, হাতে পায়ের ধূলা লইয়া বুকে মাখিয়া লইল।

সুরেশ হাসিয়া বলিল, "বেশ বুড়োটির মত পেন্নাম্ ক'রতে শিখেছিস্।"

নিমাই চট্ করিয়া সুরেশের পায়ে নমস্কার করিয়া বলিল, "খুড়ীমাকে নমস্কার ক'রে আসি।"

নিমাই যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তা'র মুখটি বড়ই ম্রিয়মাণ। সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কি, নিমু, মুখ ভার ক'রে এলি যে?"

"রাঙ্গা খুড়ী কথাই কইলে না।"

সুরেশ বলিল, 'কি ক'রছে রে?"

নিমাই উত্তর দিল, "বিছানায় ওপর শুয়ে র'য়েছে এখন।"

সুরেশ বলিল, "নাও, বৌঠাকৃরুণ, আর দেরী ক'রো না—শিগ্‌গির কাজটা সেরে নাও—ছেলেমানুষ আর ... এণ না খেয়ে থাক্‌বে।"

পূজার ঘর হইতে সরস্বতী ডাকিল, "আর রে, ও নিমু, পুরুত ঠাকুর ব'সে রয়েছে যে।"

সে সুরেশ কাকার কোল হইতে ছুটিয়া গিয়া দরজার দাঁড়াইয়া রহিল। সরস্বতী তা'র ছেলেটিকে আজ প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছিল। তা'র কেবলই মনে হইতে লাগিল, একরত্তি নিমু ছেলেটি আজ ধ্রুব সাজিয়া তা'র সামনে নয়, একেবারে তার বুকের এক কোণ হ'তে আর এক কোণ পর্য্যন্ত জোড়া করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। শুধু একটি জীব,—তা'কেই আজ সে দেখিতে পাইতেছিল—কেহই ছিল না তখন আর। ঠাকুর, পুরুত, নৈবেদ্যর থালা, ঘর বাড়ী, সবই আজ তা'র সাম্‌নে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় চলিয়া গেল।

নিমুর অঞ্জলি দেওয়া হইয়া গেলে পুরুত-ঠাকুর তা'র গাল ছ'টি টিপিয়া দিয়া বলিল, "বাবুটি বড় লক্ষী,—তোমার ছেলে জজ্‌ হবে, মা, একথা ব'লে দিয়ে গেলুম।"

সরস্বতী বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর, ঠাকুর, যেন বেঁচে থাকে।"

দিন পাঁচেক কাটিয়া গিয়াছে। বনমালী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "নাও, নাও, কান্নাকাটি রাখ এখন। ছেলেটাকে শিগ্‌গির সাজিয়ে দাও। ছিমন্ত ব'সে আছে।"

সরস্বতী ক'দিন ধরিয়া কাঁদিয়া চোখ্‌ ফুলাইয়াছিল। সে আর সাজা'বে কি! তা'র গায়ের প্রত্যেক অণু পরমাণু আজ জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্‌ হইয়া যাইতেছিল। নিমু বলিল, "কাঁদ্‌'ছ কেন মা, আমি ত' মামার বাড়ী যাচ্ছি—ছ'একদিন পরেই আস্‌ব আবার।"

বনমালী কহিল, 'দেখ ত', ছোট ছেলেটার যা' বুদ্ধি আছে তোমার তা'ও নেই।"

সুরেশ দূরে মাথা হেঁট্‌ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সরস্বতী বাহিরের দরজায় দুই হাত উঁচু করিয়া রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কি দেখিতেছিল। নিমু বার বার পিছনে তাকাইয়া চুপ্‌টি করিয়া ছিমন্তর কোলে বসিয়া রহিল। আর একটিবারও ফিরিয়া চাহিল না। সরস্বতী তার নীলমণির মথুরা যাত্রার অভিনয়টা আজ গিলিয়া গিলিয়া দেখিয়া লইতেছিল। শেষে যখন আর কিছু দেখা গেল না, তখন তা'র বেশ বোধ হইতেছিল বুঝি বা ঘর-দালান সব দমিয়া গিয়া তা'কে পাতালপুরীতে নামাইয়া লইয়া যাইতেছে।

সে ছুটিয়া গিয়া বিছানায় জড়সড় হইয়া শুইয়া রহিল।

(৯)

সরস্বতী আজ বহুদিন পরে হরিনামের মালা জপিতে জপিতে বলিতেছিল, "হ্যাঁ, ছিমন্ত, তা'কে কি চিরজন্মের মত রেখে এলি?"

"না, না, বাবু ত' ব'লেই দিলো, বড়মা'র হুকুম পেলেই লিয়ে আস্‌বি গে।"

"কোন্‌ বাবু ব'ল্‌লে রে এ কথা?"

"ছোট বাবুই মোরে আড়ালে ডেকে নে' গিয়ে কইল। আপনি বল ত' আমি আজই গিয়ে নে আসি—ঘর দোর আঁধার হ'য়ে গেল যে।"

সরস্বতী আজ পাথরের মানুষটি হইয়া গিয়াছিল। তা'র চোখে আর জলই কি ছিল।

সে কহিল, "না, আন্‌তে আর হবে না, ছিমন্ত। হ্যাঁরে, তুই তা'কে যখন নামিয়ে দিয়ে এলি, তখন একটুও কাঁদ্‌লে না রে?"

"কাঁদবেনি' মা, আহা, বাছা আমার কেঁদে ভাসিয়ে দিলে গো, ভাসিয়ে দিলে।"

সরস্বতী বলিল, "তা'র খেল্‌বার জিনিষগুলো সব ঝেড়ে গুছিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দে।" ছিমন্ত চলিয়া গেল। দূরে পাঁচীকে দেখিতে পাইয়া সরস্বতী বলিল, "শুনে যা' না, পাঁচী, একটা কথা বলি।"

পাঁচী ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল, "আমার আর সময় কোথা?"

"শুনে যা', একবারটি, শুনে যা"। সরস্বতী আজ অনেক দিন পরে পাঁচীকে এমনি ভাবে ডাকিতেছিল। পাঁচী আসিতেই সরস্বতী তাহাকে বসিতে বলিয়া কহিল, "বল্‌ দেখি, নিমু আমার এখন কি ক'রছে?"

পাঁচী একটু বিরক্তির সহিত উত্তর দিল, "ডাংগুলি খেল্‌ছে, বোধ হয়, কি ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি ক'রছে।"

সরস্বতী বলিল, "দূর, নিমুকে কেউ কখনও হুড়োহুড়ি ক'রতে দেখেছে ?"

পাঁচী বলিল, "না, দেখেনি আবার।" সরস্বতী একটু চুপ্ থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা, সে যায়গাটা কতদূর বল্ ত' —একটা মানুষ তিন চার দিন না খেয়ে কতক্ষণে হেঁটে যেতে পারে ?"

সরস্বতী এ'কদিনই জল স্পর্শ করে নাই।

পাঁচী বলিল, "তা' আমি আর কি ক'রে ব'লব বাছা, আমি সেখানে গেছি, না রাস্তা চিনি।"

সরস্বতী অন্যমনস্ক হইয়া উত্তর দিল, "কেন যাওনি', পাঁচী। সেখানে তোরা রোজ রোজ যাস্ না কেন ?"

পাঁচী থর্থর্ করিয়া বলিয়া উঠিল, "কি গরজ আমার সেখানে যা'বার ?"

সরস্বতী ধীরে ধীরে বলিল, "কেন রে, নিমাইটিকে কেমন দেখে আস্বি—তা'র সঙ্গে কথা কইবি,—না হয় আমিও তোর সঙ্গে যা'ব একদিন—আমার ত' আর বল-শক্তি নেই—তুই তা'কে আমার কাঁধের ওপর তুলে দিস্।"

পাঁচী উঠিয়া বলিল, "যাই, বাপু, তোমার ও আবল-তাবল শোনবার আমার সময় নেই।"

সরস্বতী তা'কে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "আর একটু বোস্ না, পাঁচী, আমার মাথা খাস্।"

পাঁচী হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। পথের সাম্নে রামকে যাইতে দেখিয়া সরস্বতী ভাঙ্গা গলায় ডাকিল, "রাম, ও রাম, একবার শোন ত', বাবা।"

রাম কাছে আসিতেই সরস্বতী তা'কে কোলের উপর বসাইয়া কহিল, "হ্যাঁ, রাম, নিমুর খবর জান কিছু ?"

রাম যদিও নিমায়ের অপেক্ষা কেবল তিন চার বছরের বড়, তবু তা'র কোলে বসিতে কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। সে মাটিতে নামিয়া বসিয়া কহিল, "কি ক'রে জান্ব, বড় মা।" রাম এই বয়সেই পাকিয়া বাবু হইয়া গিয়াছিল। সে লুকাইয়া চুরাইয়া বিড়িও টানিত। কত দিন সে বড়মা'র কোলে বসার দরুণ নিমুকে ধমকাইয়াছে। আর আজ কেমন করিয়া সে নিজেই সেই আসনে বসিয়া থাকিবে।

সরস্বতী কহিল, "কি রে, তুই ওখানে মাটিতে ব'সলি কেন ? নিমু যে আমার কোল ছাড়া আর কোথাও ব'স্ত না! আচ্ছা, ব'লতে পারিস, যদু পণ্ডিত মশাই আজ আস্বে কি না ?"

কথা শেষ হইতে না হইতেই পণ্ডিত মশাই আসিয়া হাজির। সে দূর হইতেই চোখ্ রাঙাইয়া আসিতেছিল। বলিল, "রাম, তোকে না ব'ললুম গোটাকতক বেগুন পেড়ে নিয়ে আয় তোদের গাছ থেকে ? যা' শিগ্গির যা', হতভাগা"। রাম এক লাফে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

পণ্ডিত বলিল, "তোমার বাড়ী ত খাঁ খাঁ ক'রবেই, মা,—আমারই কেমন কেলাশে পড়া'তে মন লাগে না।"

সরস্বতী বলিল, "কেন, নিমু ইস্কুলেও প'ড়তে আসে না আর ? তা'র মামারা রেখে যায় না রোজ ?"

"কি ব'লছ, মা, তা হ'লে আর সে তোমার কাছে ছুটে আসে না ?"

"তা' লেখাপড়া ক'রতে ক'রতে এখানে এলে হয় ত সময় নষ্ট হবে তা'র ; তাই আসে না।"

"না, না, সে রইল কোথায়, আর আস্বে কোথায়।"

"তা' তুমি কেন রোজ গিয়ে পড়িয়ে আস না, পণ্ডিত মশাই ? নিমুর আমার পড়বার কি চাড় জান ত ?"

"সে কি কম রাস্তা। অনেকখানি যে। কেন, তা'কে নিয়েই এস না, মা,—তোমার ছেলে তুমি নিয়ে আস্বে, এর আর কথা কি ?"

সরস্বতী দেয়ালে ঠেস্ দিয়া কহিল, "আর কি সে আস্বে,—না, তা' কিন্তু আমি যদি তা'র সাম্নে গিয়ে দাঁড়াই, তা' হ'লে—" সরস্বতী শেষের কথাগুলি ভুলিয়া গেল। শুধু ঘাড় নাড়িয়া বুঝাইয়া দিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল।

পণ্ডিত মশাই বিদায় হইয়া গেলে সুরেশ হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া বলিল, "বৌঠাকরুণ, ওবাড়ীর চাবিটা দাও। আজ তা'রা আলাদা হবেই হবে। আমিও তাদের সঙ্গে থাক্ব।"

সরস্বতী কহিল, "রাঙা বৌ আমার এই দশা দেখে কষ্ট' বেতে পা'রবে না।"

সুরেশ অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, "থা'ক্, এখন চাবিটা দাও ত।"

(১০)

অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। ওবাড়ী হইতে এক দিন পাঁচী আসিয়া বলিল, "বড়মা, কেমন আছ তুমি— বাজা মা জিজ্ঞেস ক'রে পাঠা'লে।"

"বল গে সেই রকমই আছি।" সপ্তাহে চার পাঁচদিন অনাহারে থাকিয়া সরস্বতী আধখানা হইয়া গিয়াছিল। সুরেশ একদিন মোক্ষদাকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি ত বেশ নিরিবিলি জায়গা খুঁজে নিয়ে ব'সেছ—ওদিকে বৌ ঠাকুরুণের কি দশা ক'রে দিয়ে এলে বল ত।" সুরেশ রাত্রে শুধু আসিত, আর সমস্ত দিন বড়ঠাকুরের বাড়ীতে থাকিত। মোক্ষদা রোজই এই কথাটাকে লইয়া তোলপাড় করিতে করিতে মস্ত গোল পাকাইয়া ফেলিত। কি বা হ'ল এমন আলাদা হ'য়ে। সে তা'র বিয়ের প্রথম ক'বছরের কথা ভাবিতে লাগিল। তা'র সব চেয়ে রাগ হইতেছিল পাঁচী মুখপুড়ীর উপর। সে না থাকলে, তা'র কি আর বুকের এমন সাহস যে, একেবারে বড়দি'র সামনে মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার ভাবিল, না, সে ত একটা রাস্তার কুলী মজুরের চেয়ে হীন,— ছোটলোক ঝি সে। যে দিন ইচ্ছে তা'কে ত গলাধাক্কা দিয়ে সে তাড়িয়ে দিতে পা'রত। মোক্ষদা আজ সমস্ত দোষটা নিজের মাথায় পাতিয়া লইয়া একটু নিশ্চিন্ত হইতে পারিল।

পাঁচী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ব'লব আর কি, মা। তেজে মটমট্ ক'রছে, কথাই কইলে না।"

মোক্ষদা একেবারে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "তোকে না কতবার ব'লেছি বিদেয় হ'য়ে যা'—তোর মুখ দেখতেও চাই না আমি।"

পাঁচী হেলিয়া দুলিয়া উত্তর দিল, "কেন, আমি আবার ক'রলুম কি?"

মোক্ষদা সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, "বেরো, দূর হ'য়ে যা', আমার বাড়ী থেকে, দূর হ'য়ে যা।"

পাঁচী কহিল, "বেশ ত যা'চ্ছি, তা' অত মুখনাড়া দেওয়া কেন? গরীব ভাল ব'ললেই মন্দ লাগে।"

তা'কে তাড়াইয়া দিয়া ঘরে গিয়া তরুকে বলিল, "যা' পালা, সামনে থেকে চ'লে যা—অন্য ঘরে যা'।" আজ আর তা'র কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। সে যে এই প্রকাণ্ড অন্যায়টুকু করিয়াও কেন সকলের নিকট অপমানিত, লাঞ্ছিত হইতেছে না, তাহার কোন একটা কারণ সে খুঁজিয়াও পাইল না।

সুরেশ বলিতেছিল, "তা'র কি কোন উপায়ের পথ দেখছ তুমি?"

মোক্ষদা বলিল, "আমি যদি পায়ে হাতে ধ'রে ক্ষমা চাই, তা' হলেও দিদির রাগ যা'বে না?"

সুরেশ বিছানার এক কোণে বসিয়া কহিল, "তোমার দিদিকে আবার কোন্ কালে রাগ ক'রতে দেখেছ, মোক্ষদা? ছিঃ ছিঃ, তুমি নিজের মুখটাকে কালি মাখিয়ে ব'সে র'ইলে—তা'তে কারও কিছু ক্ষতি হ'ল কি?"

মোক্ষদা কাঁদিতে কাঁদিতে সুরেশের হাত ধরিয়া বলিল "তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে ব'লছি—একবারটি দিদিকে ক্ষমা ক'রতে বল।"

সুরেশ তফাতে সরিয়া গিয়া খুব জোরে জোরে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "তা' আমার আর সাধ্যি কি আছে? আমার মাথাটিও ত' তুমি মাটির তলায় নামিয়ে দিতে ছাড় নি, মোক্ষদা।"

মোক্ষদা চোখে কাপড় ঢাকিয়া খুব কাঁদিতে লাগিল। সুরেশ দূরে বসিয়া গালে হাত দিয়া চুপটি করিয়া দেখিতেছিল। তা'র আজ বড় আনন্দ হইতেছিল। সে যে কথাটি একদিন বলিবেই বলিবে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, তা'র সুযোগ প্রায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

সে বলিল, "দেখ, মোক্ষদা, একটা উপায় থাকতেও পারে।"

মোক্ষদা চট্ করিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "কি, শুনি।"

"বুঝতেই পা'রছ তুমি, নিজেকে কি খেলোই করেছ— এক যদি কাজ ক'রতে পার, নিমুকে কোলে নিয়ে তা'রই শরণাপন্ন হ'য়ে যদি দিদির সাক্ষাৎ পাও।"

মোক্ষদা বলিল, "তা'কে ত তোমরাই রেখে এলে,— এখন তা'রা পাঠাবে কেন?"

"সাধ ক'রে কি রেখে এসেছিলুম, মোক্ষদা। তা' যা'ক, আমি যদি গিয়ে তা'দের সব বুঝিয়ে বলি, তা' হ'লে বোধ করি পাঠাতেও পারে।"

মোক্ষদা একেবারে ছুটিয়া গিয়া সুরেশের পায়ের তলায় মুখ গুঁজিয়া বলিল, "আর আমি এখান থেকে এক তিলও ন'ড়ছি না,—বল আগে আমার নিমুকে নিয়ে আস্‌বে ?"

সুরেশ তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, "দাঁড়াও, একটু সবুর কর, যে ভাঙ্গা ভেঙ্গেছ, তা' জোড়া দিতে কিছু দেরী লাগবে বই কি।"

মোক্ষদা মুখে কাপড় দিয়া কেবলই কাঁদিতে লাগিল।

সরস্বতী উপুড় হইয়া শুইয়াছিল। সুরেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দেখ, বৌ-ঠাকুরুণ, এ আবার কে এল দেখ।"

সরস্বতী পাশ ফিরিয়া দেখিল, তা'র সেই পুরানো নিমাইটি পালঙ্কের পাশে চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে, সরস্বতী বলিল, "তোমরা সবাই দরজা বন্ধ ক'রে চ'লে যাও। আয় রে নিমু, ওপরে আয় ত" বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া রহিল।

মোক্ষদা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "আর আমি কোথায় যা'ব বড়দিদি ?"

সরস্বতী মোক্ষদার গলার আওয়াজ শুনিয়াই বিছানায় উঠিয়া বসিল। কিছুই সে বুঝিতে পারিল না। ইসারা করিয়া মোক্ষদাকে পার্শ্বে বসিতে বলিয়া নিমুকে কোলের উপর উঠাইয়া লইল।

মোক্ষদা সরস্বতীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমি যে অনেক আশা ক'রে তোমার ছেলেটিকে বুকে ক'রে নিয়ে এসেছি, বড়দি'।"

সরস্বতীর আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। সে দুই হাতে দু'জনকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "সুরেশ, তোমায় ত ব'লেছিলুম, ভাই, মোক্ষদা আমার সে মোক্ষদাই ছিল না।" তা'র পর রাঙা বৌএর কোলের উপর নিমুকে বসাইয়া দিয়া বলিল, "পাগ্‌লি, ক্ষেপী কোথাকার, নিমুর মা কি তোকে নিজের বোনের চেয়ে কিছু আলাদা ক'রেছিল—?"

তিরোধান

[শ্রীকালিদাস রায়।]

সে গেছে মিলায়ে শিখরে শিখরে,
বনমর্ম্মরে সে আজি ফুটে—
মিলা'ল নিদাঘ নির্ঝ'র সম
পিয়াসায় যবে হৃদয় টুটে।
নির্ঝ'র পুন আসিয়া ভরিয়া
লভি ঝরঝর বারির কণা,
চিরতরে মোদে' বিষাদে ভাসায়ে
সে গেছে, আর সে ফিরিবে ত না।
পক্ক ধান্ত শীর্ষগুলিরে
কাটে সুসময়ে কৃষক লোকে,
কাল কেটে লয় তরুণ হৃদয়
প্রিয়জনগণে ভাসায়ে শোকে।
ঝরায় শরতে আয়ুহর বায়ু
পল্লব যাহা পক্কতম,
কীট কাটে হায় মাধবী উষায়
পূর্ণ বিকচ কুসুমে মম।
বিপদের দিনে পরম সহায়,
সমরে সব্যসাচীর মত,
গিরি-পথে চির দ্রুতচারী বীর
নিদ্রা তোমার গভীর কত ?
গিরির গাত্রে শিশিরের প্রায়
নদীর বক্ষে বিম্ব সম,
উৎসধারায় বুদ্বুদ যেন,
কোথা গেলে আজ হৃদয়-মম ?

পরিত্যক্তা

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।]

ওস্‌মানের কথা।

এক দিন নয়, দুই দিন নয়, দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল ধর করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, তাহাতে কি ভুল

Scott হইতে।

হইতে পারে? সে দিবারাত্র আমার সেবা করিত, হাতে হাতে জীবন ধারণের সকল আবশ্যক পদার্থগুলা যোগাইবা দিত, ছায়ার মত সাথে সাথে ফিবিত বটে, কিন্তু তাহাব হাব-ভাব, চাল-চলন, কথাবার্ত্তায় তাহাব সেই আভিজাত্য গৌরব ফুটিয়া উঠিত। উঃ! পৃথিবীতে সকল অত্যাচাব সহ্য হয়, সহ্য যায় না কেবল আভিজাত্য গৌরব। বিশেষ মুসলমানেব ঘরে। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতাব গর্ব্ব করুক ফরাসী বা মার্কিনবাসী—কিন্তু ঐ তিনটা যে ইস্‌লামেব প্রাণ! সেই মুসলমানেব ঘবে আভিজাত্য গৌরব বিশেষ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। তোবা! তোবা! এই চিন্তাটা দগ্ধ করিয়াছে আমার পাঁচ বৎসব। তাহাব সেবা, তাহাব সাহচর্য্য ষোল আনা উপভোগ কবিতে পাবি নাই, কাবণ তাহাব প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ কবিত যে, সে প্রসিদ্ধ জমিদাব-বংশ চৌধুরীদেব মেয়ে। এ বড ঘবেব গর্ব্ব ইস্‌লামেব নয়। কবে কোন্ যুগে তাহাব বংশেব কে হিন্দু ছিল, নিশ্চয়ই তাহাব রক্তের সহিত এ গর্ব্বটা এ বংশে চলিয়া আসিয়াছে।

প্রথম যখন হাসিনাব সহিত আমাব বিবাহেব প্রস্তাব হয়, তখন বন্ধু নীবদ বলিয়াছিল—ওবা বড়লোক—মেজাজে মিলবে তো?

আমি একটু বিবক্ত হইয়াই বলিয়াছিলাম—মুসলমানেব জাত নেই—সব ভাই ভাই—বড়লোক হ'ল তো কি হ'ল?

ব্রাহ্মণ নীবদ বলিল—সত্য কথা ভাই। কিন্তু পুঁথিব কথায় ও দৈনন্দিন কাজে তফাৎ থাকে। তুমি বিদেশী—আমি দেশেব লোক। বংশ-গৌবব কাশিম চৌধুরীদের একটু যেন বাড়াবাড়ি।

আমি বলিলাম—ভয় ক'ব না বংশগৌরব। তাব বিপক্ষে লড়বাব গৌবব আমাবও একটা আছে—

সে আমাব মুখের কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—বিদ্যা! তা বটে! চৌধুবী-বংশে আজ অবধি কেহ এণ্ট্রান্স পাশ হয় নাই। তোমাব মত প্রফেসাব—ভাল এম্-এ—পাচ্ছেন বলেই কাশিম সাহেব তোমার উপর ঝুঁকেছেন।

আমি বলিলাম—যাক্, আমি ঐখানেই বিবাহ করব স্থির করেছি। যার বিদ্যার আদর আছে, ইস্‌লামের সাম্য-ভাবটাও তার প্রাণে প্রতিষ্ঠিত।

কথায় কোনও দিন শ্বশুব মহাশয় তো গর্ব্বের পবিচয় দেন নাই, কিন্তু তাঁহাব প্রত্যেক কার্য্যে সেটা ফুটিয়া উঠিত। হাসিনারও তাই। তাহাব সেবাব যেন একটু বেশী বাড়াবাড়ি। কিন্তু আমাব সেবা গ্রহণ কবিবাব সময় তাহাব গর্ব্ব ফুটিয়া উঠিত বেশ বুঝিতাম। ইহাতে আমাব গাত্রদাহ উপস্থিত হইত, আব সেই বিতৃষ্ণা-বহ্নির স্ফুলিঙ্গগুলা জমিয়া যে অগ্নিব সৃষ্টি কবিয়াছিল, তাহাতেই তো এখন জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতেছিলাম।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। হাসিনার প্রীতিব জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য যদি আনিয়া দিতাম সে হাসিত। আমি মনোযোগ দিয়া হাসিটাকে বিশ্লেষণ করিবাব চেষ্টা কবিয়া বুঝিলাম তাহাব গর্ব্বিত প্রাণ বলিতেছে—"আমাকে খাবাব লোভ দেখাও হায়! হায়! তুমি ভোজনে পবিতৃপ্ত হইও, আমি এসব অনেক খাইয়াছি।"—স্পষ্ট এই অর্থ—ইহাতে কোনও ভুল নাই, কোনও যুক্তি বিভ্রম নাই। তাহাব ব্যবহাবেও ঠিক্ তাহা প্রকাশ পাইত। সে খাদ্য দ্রব্য পবিপাটিরূপে সজ্জিত কবিয়া রৌপ্য থালে আমাকে আহাব কবিতে দিত, কিন্তু আমি অনেক অনুসন্ধান কবিয়া দেখিয়াছি যে, সে স্বয়ং সে পদার্থ স্পর্শ কবিত না। যাহা সাধাবণ, যাহা ধনী গৃহে অখাদ্য, তাহাতেই তাহার তৃপ্তি হইত। ভাল খাবাব আমায় দিত, মন্দগুলা আপনি ভোজন কবিত। কেবল তাহাই নয়, উত্তম আহার্য্য দিত দাস দাসীকে। জিজ্ঞাসা কবিলে বলিত—"আহা! খোদা আমাদেব তো ভাল জিনিস খাওয়াচ্ছেন, ওবা তো এসবের স্বাদ পায় না" আমি জ্বলিয়া উঠিতাম, কোনও কথা বলিতাম না। ইহার কি প্রচ্ছন্ন অর্থ এই নয় যে, খোদা আমাব ভাগ্যেও পূর্ব্বে উত্তম আহার্য্য লিখেন নাই বলিয়া সে ভাল খাবাব আমায় খাওয়াইত? এক দিন নয়, দুই দিন নয়, পাঁচ পাঁচ বৎসব এই ঔদ্ধত্যে আমাব সুখ শান্তি সে হবণ কবিয়াছিল। তাহা না হইলে কি আমি—যাক্, সে কথা পবে বলিব।

পোষাক পবিচ্ছদ সম্বন্ধেও ঐ কথা। ঈদের সময় তাহাব পিত্রালয় হইতে অনেক বহুমূল্য শাড়ী দিত, আমিও যথাসাধ্য উত্তম বস্ত্রে তাহাব পরিতোষ করিবার চেষ্টা করিতাম। হাসিনা বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমাকে

এক কাপড় দুই দিন পরিতে দিত না—নিজে এক শাড়ী দুই দিন পরিধান করিত না। প্রত্যহ আমার গৃহে রজকিনী আসিত। কিন্তু সে পর্ব্বের দিনেও সাদা শাড়ী ছাড়িত না—বিশেষ ভাবে তোষামোদ না করিলে রেশম বা বেনারসী তাহার অঙ্গে উঠিত না। কখনও যদি অনুরোধে সাজিত, তখন মুখে সেই হাসি, যে হাসির অর্থ—"এসবে আর আমাদের রুচি নাই। আমার পিতার বৈঠকে শাল বিছান—জানালায় কাশ্মিরী জামেয়ারের পর্দ্দা।"

একবার পূজার ছুটিতে আমি কলিকাতায় আসিতে-ছিলাম। হাসিনা পিত্রালয়ে যাইতেছিল। আমি কলেজ হইতে ঘরে ফিরিলাম—দেখি আমাদের কাছু গোয়ালিনী একখানা মান্দ্রাজী শাড়ী হস্তে লইয়া হাসিতে হাসিতে বাটীর বাহিরে যাইতেছে। শাড়ীখানা বড়দিনের ছুটিতে আমি কলিকাতা হইতে হাসিনাকে আনিয়া দিয়াছিলাম। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—গোয়ালিনীর হাতে ভাল শাড়ী দেখলাম কেন?

সে এক মুখ হাসিয়া বলিল—আহা! তুমি যদি ওর আনন্দ দেখ্‌তে তো বড় খুসী হ'তে। ওর ছেলের বিবাহ হ'য়েছে। বৌকে পূজার তত্ত্ব করবে, তাই আমার কাছে একখানা দেশী শাড়ী চাইতে এসেছিল। মান্দ্রাজী শাড়ী পেয়ে কি আনন্দ! আহা! দিতে হয় তো ঐ সব লোককে। মাগি বড় ভাল। আমার মা ওকে—

আর শুনিলাম না। তাহাকে টানিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলাম। পুণ্য করিয়া সে একটা জ্যোতিতে যেন জ্বলিতেছিল—কত সুন্দর তাহাকে দেখায় যখন সে দান করে। কিন্তু পরক্ষণেই আসল কথাটা মনের মধ্যে উদিত হইল। এতো দানশীলতায় তৃপ্তি নয়, এ আভিজাত্য গৌরব। এ তো ইমানদারি নয়—এ শয়তানি!

আমাদের শিশু চামেলীর বেশ ভূষাতে মখমল ও রেশম ভিন্ন কিছু থাকিত না বটে, কিন্তু উহাও আমার পক্ষে একটা পীড়ার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। স্বাভাবিক ভাবে না বাড়িতে দিলে শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সরল পরিপোষণ হয় না। তাহার উপর শিশুর গলায় মতির মালা প্রভৃতি ভয়ের কারণ—যেহেতু সহরে চোরের অভাব ছিল না। কিন্তু হাসিনার সঙ্গে তো তর্ক করিবার উপায় নাই। সে যাহা কিছু করিবে আপনার প্রবৃত্তির বশে—আমার উপদেশ কোনও দিন তাহাকে নিজের গন্তব্য-পথ ছাড়াইতে পারিল না। একদিন আমার আপত্তির উত্তরে চামেলীর মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল—আমি ছেলেবেলা ঠিক এই রকম সেজে থাকতাম। আমার মেয়েও তেমনি সাজবে।

আমি জলিয়া গেলাম। আমি বলিলাম—আমি ছেলে-বেলা নগ্ন থাক্‌তাম। আমার পিতা গরীব ছিলেন। তিনি আদালতের পেয়াদা ছিলেন। তিনি কিন্তু আমার দেহকে না সাজাইয়া মনকে সাজাবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আমি স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া কথাগুলা বলিলাম। আমার দারিদ্র্যের আমি লজ্জা করিতাম না। আমার পিতৃ-পরিচয় সে জানিত। আমি তাহাকে ভর্ৎসনা করিবার জন্যই কথাগুলা বলিলাম, সে কোনও উত্তর দিল না। কথাটা যেন তাহার কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল না। সে সোণার সুরমা-দান হইতে চামেলীর টানা টানা চোখে সুরমা পরাইতেছিল।

তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া আমি বলিলাম—সত্যি হাসিনা, মেয়েকে অত সাজিয়ে রেখো না।

এবার সে উঠিয়া কন্যাকে আমার বুকের উপর দিয়া বলিল—"এমন নিষ্ঠুর বাপ্ তো দেখিনি। দেখ দেখি মা আমার কেমন দেখ্‌তে হয়েছে! নিজের মনে মনে স্ফূর্ত্তি হচ্চে, আবার চালাকী! কেবল একটা ঝগড়া চাই।"

আমার হিন্দু বন্ধুরা বলিত, আমার কন্যা রূপে যেন সরস্বতী। নীরদ বলিত—"উহার নাম রাখ বীণাপাণি। বীণাপাণি যদি পৌত্তলিক হয় তো কেবল বীণা ব'ল।"

সত্যই কোনও তাস্কর অমন মূর্ত্তি গড়িতে পারিত না। আমি তাহার মুখ চুম্বন করিলাম। স্ত্রী বলিল—বাপ্ চাও, আর অমন কথা বলবে না। আয় চামেলী।

কন্যাকে কাড়িয়া লইল। আমি হাত বাড়াইলাম। সে বলিল—"বাপ্ চাও। বল আর মেয়ের সাজ খুলতে বলবে না?"

সে চামেলীকে চুম্বন করিতে লাগিল। র‍্যাফেল ম্যাডোনার মূর্ত্তির জন্য সেই স্নেহশীলা সুন্দরীর চুম্বন-দীপ্ত

মুখের নমুনা লইয়া শ্রেষ্ঠ বীণমাতা আঁকিতে পারিত। হাস্তময়ী আমায় ক্ষমা ভিক্ষা করাইল।

কিন্তু বাহিরে আসিয়া আবার জ্ঞান ফিরিল, বুঝিলাম এ সবের ভিতর যুবতীর প্রচ্ছন্ন গর্ব্ব বিরাজিত। কন্যার সাজ সজ্জায় আমাকে দেখাইতে চায়, তাহার শৈশব কত সুখে, কত বিলাসে কাটিয়াছে। আর আমার শৈশব। আহা! পিতা এখন স্বর্গে! কত কষ্টে তিনি আমাকে শিক্ষিত করিয়াছেন।

হাসিনার কথা।

আমার যাহা কিছু ছিল তাহা তো তাঁহাকে পাঁচ বৎসর অকাতরে দিয়াছি। পাখী যেমন গান গেয়ে সুখ পায়, চাঁদ যেমন সুধা ঢেলে সুখী, আমিও তেমনি দিয়েই সুখ পেয়েছি। না না, সুখ পেয়েছি বলি কেন? সুখ তো পাই নাই সব দেওয়ার শেষে যেন একটা অভাব, তাই তিনি প্রথমে হাসিতেন পরে হইতেন বিরক্ত। খুব ধপ্‌ধপে জ্যোৎস্নার রাত্রে যেমন কোথা থেকে ধোঁয়ার মত এক টুকরা কালো মেঘ এসে রজনীর প্রসন্নতা নষ্ট করে, তেমনি হঠাৎ ভ্রূকুঞ্চন আসিয়া তাঁহার সস্মিত মুখ খানিতে গাম্ভীর্য্য লেপিত—তাহার হাসির অন্তঃসারটুকু যেন কাড়িয়া লইত। কিন্তু তাহাতে আনিত আমার বিষাদ- সকল সুখের শেষে শোক। ত্রুটিটুকু কি হইত বুঝিতে পারিতাম না কিন্তু কেমন একটা অভিমান আসিত, জিজ্ঞাসা করিতাম না। যত দুঃখের মূলে ছিল ঐটুকু।

আর একটা বিষাদের কারণ ছিল। সে বিষাদটুকু আসিত তাঁহার অনুপস্থিতিতে, যখন বুঝিতে চেষ্টা করিতাম, তিনি কেন আমায় ভালবাসেন। নিজের উদ্যমে ও চরিত্রবলে তিনি উন্নত হইয়াছিলেন—শিক্ষা লাভ করিয়া ছিলেন—সাধু চরিত্র গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, শ্বশুর মহাশয় সামান্য অবস্থায় থাকিয়া তাঁহার আত্ম প্রকাশের সহায়তা করিয়াছিলেন। তাই ভাবিতাম মুগ্ধ করিবার মন্ত্র ও কবচ তাঁহার কাছে গুণপনা দেখান। যথাশক্তি সেবা করিতাম কিন্তু দেখিতাম তিনি ভালবাসেন আমার দেহটাকে। চাঁদের দিকে মুখ তুলিয়া স্নেহভরে যখন বলিতেন—"হাসিনা, চাঁদ আমার, তুমি কত সুন্দরী!" তখন তৃপ্ত হইতাম না, এ কথা বলিলে আমার নারী-বৃত্তির অবমাননা হয়। কিন্তু যেদিন সরবত পান করিয়া সুস্থ দেহে বলিতেন—"আঃ। হাসিনা তোমার মত গুণ যদি সব স্ত্রীলোকের থাকত তো পৃথিবীটা স্বর্গ হত।" —সেদিন বড় বিমল আনন্দ পাইতাম, কিন্তু এ রকম আনন্দ পাইতাম কম বেশী পাইতাম তাঁহার মুখে আমার টানা টানা চোখের জন্য, জোড়া ভুরু আর কোমল দেহের জন্য। পোড়া কপাল! "হাত পা গোলগাল", "সোণার মত রঙ" "বুলবুলের মত স্বর" —এ সব কি আদর করিবার কথা? এ কথাগুলো তার জন্য বলি শুনিতেছি। খোদাতালা যাঁহার বাঁদী করিয়া গড়িয়াছেন, তাঁহার মুখেও শুনিতে হইবে। হাঃ আল্লা। আর এসব তো দিয়েছেন খোদা। যাহা আমার, যাহা আমি গড়িয়া তুলিয়াছি -আমার সেবার প্রবৃত্তি—সেটুকু যেন তিনি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অভিমান আসিত আমার তখন, যখন তিনি আমাকে দিনে রাতে হুকুম করিতেন অলঙ্কার পরিতে, পোষাক পরিচ্ছদে অঙ্গের সেই মাধুরী ঢাকিতে, যে মাধুরীর তিনি অত ভক্ত। আমি ইচ্ছায় অবাধ্য হইতাম কেন? স্বর্ণকার ও তন্তুবায়ের সাহচর্য্যে তাঁহার স্নেহের অধিকারী হইব? কাপড়ের দোকানে তো মণিক কাপড় আছে। তিনি তা হলে দোকান ভালবাসুন, স্বর্ণকারের স্বর্ণবীর কারখানার প্রেমে পড়ুন। হঃ [illegible] আমার! আর একটা ছেলেমানুষ [illegible] তাঁর [illegible] ভাবতেন তাঁর শিশু—আমি শুধু শিশু নই, আমি পেটুক শিশু! ও মা! ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জা! এই কি স্বামীর কথা! "ওগো খাও খাও খাও। আঙুর খাও, বেদানা খাও, সন্দেশ খাও, রসগোল্লা খাও, কাবাব খাও, কোর্ম্মা খাও, খোর্ম্মা খাও, সের খাও, খাও, খাও, খাও।" তোবা! তোবা! এ কি কথা? আমি কি ভোজনের জন্য তাঁহার সংসারে খাদিমা হইয়াছিলাম—বাঁদীর মত খাটিতাম কি আহার্য্য বখ্‌শিস পাইবার জন্য? আমাদের দাসী গুল্‌কি গর্ব্ব ভরে এক একদিন বলিত—"মা আজ মরদ আমার ঢাকাই পরাটা এনে দিয়েছে" আমি কি গুল্‌কি না কাহু গোয়ালিনী?

চামেলীকে লইয়া ঐ গণ্ডগোল। হ্যাগা! সে স্বর্গের

হুরী, তার রূপটা ঢেকে রাখব না? নিজেব কত জহবৎ বাক্স সিন্দুকে না বাখিয়া তো সদবে সাজাইলে হয়। আমাব বন্ধকে তেমনি ঢাকিয়া বাখিতাম। তাঁহাব সে দেহ কি সূতাব কাপড়ে ঢাকিতে পাবি? বাদুকবী আমাব। চাঁদ আমাব। মাণিক আমাব। সাহজাদী আমাব। তাহাব অঙ্গে রেশম ভেলভেট কিংখাপ ববদাস্ত হইবে না?

এই ছিল আমাব জ্বালা। একটু আধটু ছোটখাট জ্বালা। তিনি বলিতেন—সুখ বড় কাজে নাই, সুখ প্রত্যেক মুহূর্ত্তেব কাজেব ফলাফলেব উপব নির্ভব কবে। তা হ্যাঁগা। প্রত্যেক কাজেব উপব যদি দুঃখ হয় তো জীবনেব তবীখানা কি ঠিক আনন্দেব স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে বলা যায়?

এখন মনে হয়, এ কথাগুলা তাঁহাব নিকট খোলসা কবিয়া বলিলে হইত। তাঁহাকে কেন বলি নাই—"ওগো! আমি তোমাব বাঁদা, তোমাব খাদিমা, তুমি আমাব সেবায় তুষ্ট হও, সেবাব সুখ্যাতি কব, গুণেব আদর কব, আবও সেবা পাবে, আবও গুণ প্রাণেব ভিতব হ'তে টেনে বাব কববে, ফুটয়ে তুলবে?" তা হলে বোধ হয় ভালবাসাব এ পবিণাম হইত না। ওঃ! কি অপমান! কি ঘৃণা! খোদা কববগুলা কাহাব জন্য কাটাও দয়াময়?

ওসমানেব কথা।

এমন কি দোষ কবিয়াছি—এমন কি গুণাহ্ কবিয়াছি। হদীশেব বিরুদ্ধে তো কাজ কবি নাই। কিন্তু মন বলে কেন এমন? পাশ্চাত্য শিক্ষাব বাবিশ। নীবদ বলে অধর্ম্ম কবিয়াছি, আমি শয়তান। মূর্খ! তাহাব সামাজিক বিষয়েব কি জ্ঞান আছে? এইতেই তো হিঁদুয়ানীব গোঁড়ামীব চেয়ে ইস্‌লাম শ্রেষ্ঠ!

আচ্ছা বিচাব কবি। ঈদেব দিন। সাবা দুনিয়া সুন্দর সাজে সাজিয়াছে, গায়ে গন্ধদ্রব্য লেপিয়াছে। আমি বলিলাম—"আজ তোমাব এ কি সাজ?" হাসিল। বলিলাম—মা কি বলিবেন? তোমার আব্বাজান কি বলিবেন? তাঁরা মনে করিবেন আমার ঘরে তোমার এমন দুরবস্থা!

ওঃ! কি গর্ব্বভরে বলিলেন—"তাঁবা এমন কমিনার কথা মুখে আনেন না।" চৌধুরী সাহেব—সেই বংশগৌরব! সেই স্পর্দ্ধা! সেই দারিদ্র্যের ঘৃণা! আমি ক্রোধে কাঁপিতেছিলাম বলিলাম—"হ্যাঁ, বড় সবাই। কিন্তু আমার হুকুম মানিতে হবে।"

"তোমার এ হুকুম মানব না। ছিঃ ছিঃ, তোমার শিক্ষার ধিক্! তুমি আমায় ভালবাস, না কাপড় ভালবাস, জহবত ভালবাস? তুমি তাই নিয়ে থাক। আমি এক কাপড়ে মা বাপেব দোয়া আনতে চললাম।"

ইহাব পব আব কথা চলে? পাঁচ বৎসর যে সিদ্ধান্তটা কবিয়াছিলাম, আজ তাহা সত্য বুঝিলাম। তবে তো প্রাণে ঘৃণা পুবিয়া এত দিন সে কপট ভাবে আমার সহিত সখ্য কবিয়াছে, সংসাবেব কাজ কবিয়াছে। কি? আমি ওসমান গনী—এত শিক্ষা পাইয়া ইংবাজী, বাজালা, উর্দ্দু, ফার্সি এত কেতাব পাঠ কবিয়া জহবতের লোভে অন্ধ! আব এই কালসাপ পাঁচ বৎসর বুকেব মাঝে ধবিয়াছি! উঃ কি ভীষণ তীক্ষ্ণ দংশন! সারা অঙ্গে বিষের বহ্নি ছুটাছুটি কবিতে লাগিল। আজ ইহাব অবসান করিব। এ ভুজঙ্গিনীব আজ বিষদাঁত ভাঙ্গিব। বর্জ্জন কবিব। বিষবৃক্ষ উপাড়িব।

আমি বলিলাম—"আমি পেয়াদার ছেলে—তুমি জমিদাব কন্যা। ভাল না লাগে তালাক নাও। তালাক উল্‌বাঁয় তুমি ইচ্ছা কব তালাক নাও।"

তাহাব দেহ কাঁপিতেছিল—স্পর্দ্ধায়, তেজে, অহঙ্কারে, বংশমর্য্যাদায়। তাহাব চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল।

সে বলিল—বেশ ভাল, আমি তালাক গ্রহণ করিলাম আজ হইতে তুমি আমার স্বামী নও, আমি তোমার স্ত্রী নই।

কন্যা লইয়া সে পালকীতে উঠিল। আমি বলিলাম—"চামেলি!"

সে বলিল—আমি মা! মেয়ের হিফাজত আমার মেয়ে আমার নিকট থাকিবে।

হাসিনার কথা।

পিতা বলিলেন,—"শয়তান! বদ্‌বখ্‌ত! এত বড় স্পর্দ্ধা!" ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাঁদিতে। [illegible]। আমি

বলিলাম—"স্থির হ'ন আব্বাজান।" পিতা বলিলেন—"মা, তোর অপমানের যদি প্রতিশোধ না নিতে পারি তো আমি চৌধুরী খান্দানের কলঙ্ক। কান ধরিয়া কাল ওকে এ সহর-ছাড়া করব—মাথায় গাধার টুপি দিয়ে।" ছিঃ ছিঃ! সে কি কথা! ও মা কি হবে! বাবার পায়ে ধরিলাম। চামেলীকে বাবার পায়ের কাছে ফেলিলাম। আমার চোখের তপ্ত অশ্রু পিতার চরণে পড়িল। বাবা বলিলেন,—"ওঠ মা।" তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। আহা, হইবারই কথা। তাঁহার কত কালের, কত যুগের বংশমর্য্যাদা। মা উঠিয়া বাবার হাত ধরিলেন। বলিলেন,—"ছিঃ! যাকে মেয়ে দিয়েছিলে সে তো ছেলে। বাছার আমার অতীতটা ভাব, আর চামেলীর ভবিষ্যৎ।"

পিতা দুর্দ্ধর্ষ। কিন্তু মাতার উপর স্নেহ ছিল তাঁহার অপরিমেয়। তিনি জননীর কথায় নির্ব্বাক হইলেন। জননী তাঁহাকে জানিতেন, বলিলেন,—"বল তার অনিষ্ট করিবে না?"

পিতা ইতস্ততঃ করিয়া অগত্যা বলিলেন—না। কিন্তু হাসির এমন নিকা দ'ব যে সে জামাই শয়তানকে শিক্ষা দেবে।

পিত্রালয়ে থাকি—জীবনের যেন উৎসাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিন বছরের এক টুকরার উপর সব স্নেহটা ঢালিয়া দিই তবু যেন কিসের একটা অভাব থাকে। বলি—চামেলি কেন এমন হ'ল মা। খোদাতালা কেন আমাদের এমন করলেন!

সে বোঝেনা, বলে—আব্বা তোতা? নেই নেই।

ওস্‌মানের কথা।

প্রায় তিন মাস হইল। এ তিন মাস অনুতাপ আসিয়াছে বটে, কিন্তু সে গলাধাক্কা খাইয়া পলাইয়াছে। কি? একটা আত্মসম্ভ্রম নাই? ঘর দ্বারগুলা দেখিতাম—কি অযত্ন অপরিষ্কার! স্বহস্তে পরিচ্ছন্নতার ভার নিলাম। বন্ধু নীরদ ময়লা কলার টানিয়া একদিন বলিল,—"মৌলবী, কেন হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌লি"! হায় দুর্ব্বুদ্ধি! কাফের হিন্দু! বুঝিবে কি? ঐ সকল ঔদ্ধত্যকে পরাজিত করিবার জন্যই হজরত মুসলমানের হস্তে ভালাকরূপ অস্ত্র দিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে এ কলেজ হইতে বদলী হইতে পারি—কিন্তু পারি না সেই মাণিকের টুকরার লোভে। ওঃ। আর কি কোন দিন প্রকাশ্যে তাহাকে বক্ষে ধরিতে পারিব না—তাহার সেই অধরের বিমল—

না। যত গোল ঐখানে। খাওয়া হয় না—শয্যায় রাজ্যের ছারপোকা আসিয়া জুটিয়াছে, রাত্রে শৃগালগুলা কি ভীষণ চীৎকারই করে। এক একবার যেন মনে হয় যে, সে আমার জন্ম আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিল, আমার সুখের জন্ম আপনার বিলাস-বিভ্রম হালাল করিয়াছিল। আহা। কি সেবা!—ওঃ। কি বলিতেছি। শয়তানী! নারী হইয়া এত দর্প, এত স্পর্দ্ধা, এত অপমান।

গোপনে মেয়েটাকে দেখিতাম। তাহাদের খিড়কীর বাগানে ঠিক সন্ধ্যার সময় যাইলে দাসী লুৎফি দ্বার খুলিয়া দিত। আমি শিউলি গাছের ঝোঁপে বসিয়া তাহাকে কোলে লইতাম—তাহার মুখ চুম্বন করিতাম। সে বলিত—"আব্বা—আয়—মা।" কি মধুর স্বর। কিন্তু নিজের মেয়েকে চোরের মত দেখিতাম। চৌধুরী ধরিতে পারিলে জেল না খাটাইয়া ছাড়িবে না। হা। অদৃষ্ট। কিসে কি হইল যেন বুঝি না। বাগানের বাহির হইলে যেন প্রাণটা দেহের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতাম না। একদিন ঘুরিয়া পড়িয়া গেলাম—তেঁতুলগাছের গুঁড়িতে। একটু অসুখ হইলে এ পাঁচ বৎসর সে কত সেবা—

আঃ আবার ঐ কথা। কি দুর্ব্বলতা! তাহার সেই সুঠাম দেহটার উপর লোভ ছিল বুঝি আমার? না সেই যত্ন? দূর হ'ক ছাই। বদলী হইয়া যাইব দূরে—বহু দূরে—বর্ম্মায়—মান্দ্রাজে। পাপীয়সি। আমার মধুর প্রাণে কি বিষ ছড়াইয়া দিলি।

একদিন চুপি চুপি লুৎফি বলিল—মিঞা সাহেব—আর আপনি বুঝি মেয়েকে দেখ্‌তে পান না?

আমি বলিলাম—কেন রে লুৎফি?

সে বলিল—বিবির আবার নেকা—

মাথাটা ঘুরিয়া গেল। বুকে কে যেন শেল বিঁধিল। রক্ত চলাচলও বোধ হয় বন্ধ হইল। গৃহে গেলাম।

যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা তো ঘটিবে। সে আমার কে?

আইনের কেতাব দেখিলাম। তাহার নিকা হইলে কন্যার ভার পাইব আমি। ইঃ আল্লা! হ'ক নিকা! আমার চামেলী আমার হইবে! ইঃ আল্লা!

না, কিন্তু তাতে তো সুখ পাইলাম না। কি, চামেলীকে বুকের মধ্যে রাখিব এ আশায়ও সুখ নাই? কি, সেই মাণিক আমার বুকের মধ্যে বিরাজ করিবে তাহাতেও বুকের জ্বালা জুড়াইবে না? নিশ্চয় জুড়াইবে! নিশ্চয় নিভিবে, আলবৎ! আলবৎ! আলবৎ!

না, না! আমি পাগল হইয়াছি। সে যে উদ্ধতা, সে যে গর্ব্বিতা, সে যে বড়লোকের মেয়ে, আমায় ঘৃণা করে, তাহাকে যে আমি বর্জ্জন করিয়াছি। কই না, আমি তো বর্জ্জন করি নাই। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তালাক লইবে? স্ব-ইচ্ছায় লইয়াছে—নিকা হইবে, অপরের ঘরে—উঃ! কি বিষম বেদনা!

না না হইবে না, হইবে না, হইবে না। আঃ! চুপ্ চুপ্, কাজ কি মনকে আঁখি ঠেরে। বলি না সত্য কথাটা। হাঁা, সত্য কথা! সত্য কথা! দোহাই আল্লা! সত্যি কথা—ওগো তাকে যে ভালবাসি! ভালবাসি! ভালবাসি! না না পারিব না! খোদা! কি করলাম খোদা! "নিকা হ'বে!" হাঃ আল্লা!

হাসিনার কথা।

আহা কি ফুটফুটে চাঁদের আলো, চামেলী কেমন নাচিতেছে! খেলিতেছে! হুরী! ও মানুষ না! এমনি চাঁদের আলো ফুটিয়াছিল পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, যে দিন প্রথম ঘর করিতে যাই। আরাম-কেদারায় আমাকে ক্রোড়ে লইয়া একটি ফার্সি কবিতা—

আঃ! দূর কর ছাই! আর কি চিন্তা নাই! বাবার কি পাগলামী! মাকে তো লাগিয়েছি! কেন বামুনদের শেফালী তো আমারই সমবয়স্কা—আহা! বিধবা হইয়া কেন শেফালীর রূপ ফাটিয়া পড়িয়াছে। সে কি নিকা না করিয়া সুখে নাই? বাঃ বেশ গন্ধ বাপু! নেবু ফুলের গন্ধ! হজরত বড় গন্ধ ভালবাসিতেন। তাই ঈদের দিন—ওঃ! খোদা! রসুল! ঈদ্! মাগো! কি কঠোর! কি নিঠুর! ঈদের দিন! একমাস রোজা করিয়া মেজাজটা খোঁ হয়—কে লুৎফি?

কি বলিলি? মা ডাক্ছেন? একটু পরে যাচ্ছি লুৎফি। কেমন নেবু ফুলের গন্ধ লুৎফি! কেমন চাঁদ!

লুৎফি বলিল—"বিবিজি, মিঞা সাহেব বদলী হ'য়ে চলে যাচ্চেন। কাল সকালে যাবেন।"

"তাতে আমার কি লুৎফি?"

"না বিবিজি কিছু না। তোমার যেমন নেকা হবে, তাঁরও তেমন হবে কলিকাতায়"—

অ্যাঁ? হঠাৎ কেন মাথাটা ঘুরে এল? না না, মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা! লুৎফি কিসের শব্দ হল রে জলের ধারে! পুকুরে! অ্যাঁ! চামেলী! চামেলী! দৌড়! দৌড়! চামেলী! ওমা! ও বাবা! চামেলী! হুরী!

ওসমানের কথা।

শেষ করিব। নামাজ পড়িয়া গেলাম চোরের মত কন্যাকে দেখিতে। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় পুকুরটা টলমল করিতেছিল। নেবুর ফুলের গন্ধ আমের মুকুলের গন্ধে মিলিয়া এক অপূর্ব্ব সুবাসের সৃষ্টি করিয়াছিল। শেষ দিন মনের মধ্যে প্রবৃত্তিগুলা খেয়োখেয়ি, মারামারি, কাটাকাটি করিয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিলাম পুকুরের চাতালে আমার কুহকিনী খেলিতেছে, আর সে চাঁদের আলোয় তেমনি লাবণ্য গায়ে মাখিয়া ঘাসের উপর চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া পায়চারী করিতেছে, আর মাঝে মাঝে চাঁদের দিকে চাহিতেছে, তখন আবার মনের মধ্যে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। বেশ ত! তাহাকে তো ভালবাসি, দেখিতে দোষ কি? একটা ঝোঁপে ঢুকিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। লুক্কায়িত থাকিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। আহা! কি অনিন্দ্যসুন্দর রূপ - বুঝি নুরজাহান, মমতাজমহল, খুড্‌সেয়া বেগমদের—

এ কি, মেয়েটা জলের দিকে যায় কেন? কি সর্ব্বনাশ! সে লুৎফির সঙ্গে কি কথা কহিতেছে। ও! বাবা! মেয়েটা এগোয় যে! আঃ! কি বিপদ! কি করিব, চীৎকার করিব? এ কি জলের দিকে। হা! আল্লা! ঐ যা জলে পড়িল! খোদা! খোদা!

হাসিনার কথা।

ঐ যে চামেলি! কে একজন জলে পড়িয়া তুলিল? ওগো তোলো, তোলো। যাহা চাহ তাহাই দিব। কই

হার দিব, মতি-মুক্তা দিব। ঐখানে! ঐখানে! আল্লা! ধরিয়াছে! ওগো আগন্তুক! কে তুমি জানি না, আন! আন! তীরে আন শীঘ্র আন! পিতা আমার ভারী ধনী! চামেলী আমার কাঙ্গালিনীর ধন! যাহা চাহ দিব। উঠিয়াছ—দাও কোলে দাও, কোলে দাও। আঃ!

চামেলীকে ক্রোড়ে লইলাম। চামেলি! চামেলি! ও মা কথা কহে না যে—চামেলি মা আমার, জান্ আমার, কলিজা আমার, চামেলী। কি বলিলি—"মা! মা!" আবার বল্, চামেলি! চামেলি!

চামেলী চক্ষু চাহিল, হাসিল। আহা! কি হাসি! ছিঃ চাঁদ। তোমার এত কিরণ, তুমি অত শুভ্র, অত অমল তবু তো তুমি আমার চাঁদের মত হাসিতে পার না। চামেলি! আহা বাছা আমার ভিজে গেছে চল চল ঘরে চল।

আর তুমি কে গা আগন্তুক, আমার চামেলীর প্রাণ দিলে? দেখি তোমায়। কন্যা লইয়া বিভোর হইয়াছিলাম। যাঁহার কৃপায় কন্যা পাইলাম দেখি তাঁহাকে।

এ কি কাঁদেন কেন? পায়ে হাত কেন? ও মা! কি সর্ব্বনাশ! আঁা, এখানে কোথা থেকে। তিনি! চামেলীর রক্ষাকর্ত্তা তিনি! "আল্লা! আল্লা!"

"হাসিনা! ক্ষমা চাচ্ছি হাসিনা। আর তো অবহেলা করব না। ক্ষমা কি নাই হাসিনা?"

"ছিঃ ছিঃ, পা ছাড়ুন। আমি যে পর। আমায় যে ত্যাগ করেছেন।"

"হাসিনা! ক্ষমা কর। যাহা চাহি তাহা দিবে বলিয়াছ হাসিনা।" (খোদাতালা জানেন কি গভীর বেদনা)

আমার মাথা ঘুরিতেছিল। হাত পা কাঁপিতেছিল। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি, জনক জননী! তিনিও দেখিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি বাবার পায়ে লুটিয়া পড়িলাম। তিনি মাতার পা ধরিলেন। আহা! কত স্নেহ জননীর প্রাণে, মাতা বলিলেন—ছিঃ বাবা! ওঠ! তোমার হাসিনা তুমিই পাবে।

পিতা কোন কথা না বলিয়া স্থির পাদ-বিক্ষেপে বাটীর দিকে চলিয়া গেলেন।

ভুল।

[শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্।]

(১)

বাল্যের স্বপন মোর ছুটিয়া টুটিয়া গেছে
সে ভুল ভেঙ্গেছে চিরতরে;—
বুঝেছি প্রেমের দাবী পুরুষের কিছু নাই
কভু নাই রমণীর পরে।
পাষাণ প্রতিমা তুমি নারি!
জীবনের নাহি সাড়া, বৃথাই করুণা যাচা,
মোরা শুধু পূজা অধিকারী।
ধরেছিনু ভিক্ষাপাত্র করে—
এবে সে স্বপন মোর ছুটিয়া টুটিয়া গেছে
সে ভুল ভেঙ্গেছে চিরতরে!

(২)

শুধু মরীচিকা মোরে ভুলাইয়ে লয়েছিল
আপনার সীমার বাহিরে;
কঠোর ইঙ্গিতে তুমি উচ্ছৃঙ্খল গতি মোর
রুদ্ধ করি দিলে ধীরে ধীরে।
তুমি মোর ফুটাইলে আঁখি—
আজি হ'তে সন্তর্পণে চলিতে শিখিব আমি
সীমাপথে স্থির লক্ষ্য রাখি'।
এস ওগো এস তুমি ফিরে—
সে ভুল হবে না আর যে ভুলে ছুটিয়া গেনু
আপনার সীমার বাহিরে।

ব্রজরেণু।*

[শ্রীকালীপদ মিত্র, এম-এ, বি-এল।]

কাব্যের সমালোচনা করিতে ভয় হয়। কোনও সুন্দর বস্তুর বিশ্লেষণ করিয়া কোথায় তাহার সার আছে, কোথায় তাহার সেই অন্তর্নিহিত principleটি আছে, যাহা সমস্ত সৌন্দর্য্যের মূলে এবং যাহাকে অবলম্বন করিয়া সেই সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি হইয়াছে, ইহা বাহির করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা, বোধ হয় একটু নির্দ্দয়ও। ফুলের সমগ্র এক

* শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত।

সঙ্গে না দেখিয়া, বৈজ্ঞানিক প্রণালী-সম্মত বিশ্লেষণ উদ্ভিদ্‌-বিদের পক্ষে রুচিকর হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে আমার বড় ভয় হয়। বিশ্লেষণ অথবা ব্যবচ্ছেদ, যাহাই বলা হউক না কেন, করিতে গেলেই জীবন্ত কাব্য সাড়া দিয়া উঠে। মনে হয়, যেন vivisection করিতে যাইতেছি। আজ কালকার যুগে vivisection উঠিয়া গিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে অভ্রবিধ শিবমন্ত্রের প্রচার হইতেছে সেই শাশ্বত, চিরন্তন মন্ত্র 'সর্ব্বম্ প্রাণময়ম্ খল্বিদং জগৎ আনন্দময়ঞ্চ।'— তাই কবি কালিদাসের "ব্রজবেণু" সমালোচনা—(বিশ্লেষণ) করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। তাঁহার "ব্রজবেণু" আমার ভিতরে যে সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি জাগরিত করিয়াছে, তাহাতে কোথাও কোথাও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি, পঙ্‌ক্তি-গুলি পড়িতে পড়িতে একটা বাষ্প জমিয়া উঠিয়াছে—গলা ভারি হইয়াছে—নেত্রপল্লব বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এক অপূর্ব্ব রসের সৃষ্টি—বড় সুন্দর, বড় কোমল, বড় উপভোগ্য। যাত্রা, কথকতা, ভাগবত শুনিয়া—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ ভক্তগণের সুললিত পদাবলী শুনিয়া, পড়িয়া—কল্পনায় শ্রীকৃষ্ণকে মনের মতন গড়িয়া তুলিয়াছি। সেই শ্রীকৃষ্ণ যে আমাদের মত একান্ত মানবই ছিলেন—ছেলেবেলায় আমাদের মতই দুষ্টামি করিতেন—হয় তো একটু বেশী মাত্রায়, এই কথা যখন ভাবি, তখন তিনি যে ঈশ্বর "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—তিনি যে সেই গীতায় সর্ব্বরস-সম্পর্কশূন্য, কঠোর—নিষ্কাম কর্ম্মের উদ্গাতা, তিনি যে কুরুক্ষেত্রে রথরশ্মি সংযত করিয়া ফাল্গুনিকে বজ্রমন্ত্রে কর্ম্মে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া যাই, তখন তাঁহাকে—কাঙাল আমরা—আমাদেরই একজন অতি নিকট, অতি আত্মীয় ভাবিয়া ডাকি—

"কাঙালের বঁধু আয় রে কাঙাল।"

তখন ভাবি—

সুখের কৃষ্ণ, দুখের কৃষ্ণ, বুকের কৃষ্ণ সে
দীনের কৃষ্ণ, হীনের কৃষ্ণ, দুঃখের কৃষ্ণ রে।

তখন ভাবি সে যে

"আমার কৃষ্ণ, প্রাণের কৃষ্ণ, জীবনধন রে।"

তখন তাঁহার অসি কিরীট ধারণ, যুদ্ধকার্য্য, [illegible] সাধন, গীতাপ্রচার, কিছুই বিশ্বাস করি না, বা করিতে চাহি না, বলি,—

"গীতা নয় সে ত, গীত।
পতাকার কথা বলিতেছে যাহা রক্ত নহে ত, পীত।"

তাহাকে জানি—

লুটে পুটে খায় দুয়ারে দুয়ারে
এটা ওটা চায় ইহারে, উহারে
থড়ায় চূড়ায় লতায় পাতায় সদাই রহে সে সাজি।

জিজ্ঞাসা করি—"যাবা হ'তে যাবে অন্য কোন সে দেশে?" তাহাকে এত ভালবাসি, তাহার কোন অপরাধ দেখিব না, তাহার উপর যথেষ্ট জোর খাটে, আবদার খাটে, তাহার সঙ্গে ভাব করি, আড়ি করি, অভিমান করি, কথা বন্ধ করি, আবার কথা বলিবার ইচ্ছা পুরামাত্রায় থাকিলেও অভিমান আসিয়া মুখ চাপা দেয়, কথা কহিতে পারি না, তাহার কাছে কাছে বেড়াই; নিজে পাছে লঘু হইয়া পড়ি—পাছে জেদ না বজায় থাকে, তাই বুক ফাটিয়া গেলেও কথা বলি না, কিন্তু দোলের দিন আর থাকিতে পারি না—

"ফেটে যায় বুক মুখে কিছু নাহি বলি
গুমরি গুমরি মনের আগুনে জ্বলি
থাকি থাকি কোণে আঁখি উঠে ছলছলি
দোল এল আর কেমন করিয়া থাকি?"

এক একা আড়ি কত করি, প্রাণ যায়! শেষে "আপনার গড়া নিগড়" ভাঙ্গিয়া স্থির করি—

বক্ষে ছুটিয়া ধরিব, রাখাল রাজ,
চক্ষের জলে ভাসাইব আজ আড়ি।—

এ কৃষ্ণ যে আমার কৃষ্ণ তাঁহাকে জানি

"ফাঁদিব না যদি গোঠে নাহি যাবে
ধণ রেখে সে গো কোথায় পালাবে?
খেলায় হারিয়া রে?"

কিন্তু আমার অনুসন্ধান প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সে পলাইয়া যায়, আবার শেষে যখন অতি ব্যাকুল হইয়া খুঁজি, তখন আর সে থাকিতে পারে না, তাহাকে ধরিয়া ফেলি, সে যে বড় অসাবধান!

অসাবধানেতে কাদের মাঝে ধরিয়া ফেলাও দোষ নাই।

দখনে যখন, লুকাস্ তখন,
দেখিতে পাই যে মেঘে মেঘে
হয় ঘনশ্যাম, তোর তনুটির
রঙ লেগে।

শুধুই কি ভালবাসি? কখনও কি ভাবি না যে, সে আমার চেয়ে বড়? ভাবি বই কি। তখন হৃদয় তাহার চরণে নত হইয়া পড়ে, ভক্তিতে তাহার মহত্ত্ব, ভাবনায় কিন্তু তবু সাহস, বড় হইলেও সে নামিয়া আসিয়া ছোট যে আমি—আমার হাত ধরিতে, আমার সঙ্গে কোলাকুলি করিতে, কুণ্ঠা বোধ করে না—সে আমার ভালবাসার বন্দী, তাহার সঙ্গে আমার যা খুসী তাই করি, সে যে আমার বড় আপনার—আমি জানি—

চোখে চোখে বুকে বুকে বাঁধা আছ যে নন্দনন্দন
লভি বন্ধু শতেক বন্ধন।

তাহাকে ডাকিবার, তাহার সঙ্গে কথা কহিবার আমার নির্দিষ্ট সময় নাই, আমি

"যখন খুসী দুয়ার খুলে প্রণাম করি পায়।"

* * *

"ছুটি পেলেই তোমার সাথে একলা ঘরে রই।
পরাণ খুলে চরণতলে মনের কথা কই।"

সেও আমাকে খুব ভালবাসে, তাই তো

"এক থালাতেই তোমার আমার আগে পিছে খাওয়া।"

আমি দীনহীন দরিদ্র বলিয়া তাহার হেলা ত দেখি না, বরং পতিতপাবন, সে যে আমার—বড়ই করুণা করিয়াছে—'এ মহামণি দিয়াছে'

আমাদেরও লাগি ভরসা আনিলে?

"যে ধন দিয়াছ, তার কথা প্রভু প্রকাশের আর ভাষা নাই।" জানি না ভক্তের প্রাণ কিরূপ? কিন্তু যদি ভক্ত হইতাম, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে আমি কাঁদিয়া এই নালিশ করিতাম—

তোমার বাঁশি শুনিয়া যেন সকলি যায় চুরি,
ঘরের বার করিয়া তুমি । ভুলায়ে আঁখি নয়ন চুরি
লুকাও পুনঃ ছলনা করি বেতস কাঁটা বনে।

আমার বিরহক্লিষ্ট প্রাণ তাহাকে পাইবার জন্য পাগল হইয়া পড়ে—আমি নানা ছল করিয়া—নানা ফন্দি আঁটিয়া—তাহাকে জোর। চাহনিতে দেখিয়া লইতে চাহি—তাই কখনও কখনও কোনও কথা না লুকাইয়া "পুরা কথা" বলিয়া ফেলি—

তোমার পাশ দিয়ে যাইতে কেন মোর
বেতস ডালে শুধু বাধিত বাস ডোর
বিধিত পথে যেতে চাহিলে তুমি চোর,
দুঃখের কাঁটা কেন পায়?

তবু আমার—"বুক যে ফেটে যায় মুখ ত ফুটেনাক"—

চাপিয়া রাখিবারে হৃদয় কাঁপিয়াছে—
ফুঁপিয়া গুমরেছে প্রাণ—
জীবন এইরূপে গোঁয়ান' কি কঠিন
তুমিই কর অনুমান।

সে কি এ সব বুঝিয়াও বোঝে না? সেই জন্যই তো প্রেমিকা কিশোরী রাধিকা বিরহের জ্বালা কতখানি বুঝাইয়া দিবার জন্য তাহার সহিত "জীবন বিনিময়" করিতে চাহিতেছে—

"আজিকে বুঝাব হে শ্যাম তোমায়
কেমনে রাধিকা জীবন গোঁয়ায়
তোমার বাঁশরী কেমন কাঁদায় কত তার লাজ বাধা,
আমি হই তব শ্যাম, রসরাজ তুমি হও মোর রাধা।

* * *

রাধা হওয়া কত সুখ তাহা আজি, বুঝাইব দাও বাঁশী।"

এমন করিয়া না জ্বালাইলে কিতব, কপট, শঠ, চোরের শাস্তি হইবে কেমন করিয়া? প্রেমের অনুরোধে এ বিরহের জ্বালা শ্রীকৃষ্ণকেও সহিতে হইয়াছিল, বৃন্দাবনে নহে, এই আমাদেরই হীনভাগ্যদের দেশে—নদীয়ায়। বৈষ্ণবদিগের বিশ্বাস গোরার প্রেম—কিশোরীর প্রেম। তিনি সংসার ছাড়িয়া মহাযাত্রা করিয়াছিলেন। কোথায়? দয়িতের দর্শনাভিলাষে!! যখন শ্রীকৃষ্ণ বড় সাধের বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন ব্রজবধূগণের যে দিব্যোন্মাদ উপস্থিত হইয়াছিল, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করিয়া যেরূপ তাঁহারা পাগল হইয়াছিলেন—অরণ্যের যাবতীয় পশু পক্ষী তরুলতাকে কৃষ্ণ মনে করিয়াও তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছেন মনে করিয়া বনে বনে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন, সেইরূপ গোরাচাঁদ প্রিয়ের অনুসরণে সারা ভারত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, শেষে শ্রীরাধিকার যমুনায় ঝাঁপ দেওয়ার মত নীলাচলে নীলসমুদ্রে কৃষ্ণের দেখা পাইয়াছেন ভাবিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন।

গোরার এই প্রেম তাঁহাকে সকলের আত্মীয় করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ত সর্ব্বভূতেই বিরাজমান; এই বিশ্বকে

ভালবাসিলেই ত দরিদ্রকেই পাওয়া হইল। তাই আচণ্ডাল সকলকেই তিনি কোল দিয়াছিলেন। মহা প্রেমে তিনি সকলকেই জয় করিয়াছিলেন। আজ যে মহাসংগ্রাম চলিতেছে,—যে অস্ত্র ঝন্‌ঝনি কর্ণমূল বধির করিতেছে, যে ভীষণ রক্তপাত প্রা ণ আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে, আবার সংসারে যে বিরোধ, বৈষম্য, অপ্রীতি, অসামঞ্জস্য, 'সমষ্টি'কে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অসংখ্য 'ব্যষ্টি'তে পরিণত করিতেছে, যে একটা সমাজবিধ্বংসী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে প্রত্যেক মানুষই যে একটা বৃহৎ মানব পরিবারের সঙ্গে, এ কথা ভুলিয়া গিয়াছে। আজি তাই বিশ্বপ্রেমিককে ডাকিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

হেথা—কার কিসে আছে অধিকার,—
কেবা নীচে কেবা উচ্চে হে,
তাই নিয়ে নিতি অবিচার,—
সার ফেলি ধরে তুচ্ছে রে।
প্রভু,—চণ্ডালে তুমি দিয়া কোল
নেচে—দীনসনে বলো হরিবোল
আর কোল দিয়ে দিয়ে বুকে টেনে নিয়ে
সবারে শিখাও কোলদান।

অথবা

নিখিল ধরা আত্মহারা আসিয়া ছুটে মাগি রে
একটী কণা সে মহাধন ভিক্ষা,
দু'হাত তুলে নাচিয়া নায়া বালুর ঘর তা ভবে
অমৃত ধ্রুব মন্ত্রে লাভ দীক্ষা।

আলস্যে।

[শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।]

১

ঊষার চির-তরুণ আলো পড়্‌ল যবে চোখে,
স্বপ্ন-মাঝে বিভোর ছিলে বৃথা ঘুমের ঝোঁকে।
ইচ্ছা করি' উঠ্‌লে নাক সুখের শয্যা ফেলি
বাহিরে যেতে অলস হৃদি চায়নি আঁখি মেলি।
যাত্রী যত এগিয়ে গেল কত সুদূর পথে,
তুমিই একা রইলে ব'সে বিফল মনোরথে!

২

আজ্‌কে যবে কালের ভেরী বাজে গভীর সাঁঝে,
প্রবীণ রবি ডুবে যখন রাঙা চিতার মাঝে।
সময় পেয়ে মোহের নিশা এল আঁধার নিয়ে,
সব সাধনা সফল হ'বে এখন আঁখি-নীরে?
নাই যে গৃহ। তোমার কাছে শুধুই হত বিধি,
এগিয়ে যারা তারাই বাঁচে পেয়ে প্রাণের নিধি।

বিচিত্র প্রসঙ্গ।

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বসু, এম্‌-এস্‌ সি।]

স্তন্যপায়ী পশুদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইতেছে তিমি। ইউরোপের এক জাতীয় তিমি (Baleonoptera Sibbaldi) প্রায় দৈর্ঘ্যে ১০০ ফিট হয়। আমাদের ভারতমহাসাগরীয় তিমিও প্রায় ৯০ হইতে ১০০ ফিট বড় হয়।

রোমন্থনকারী পশুদিগের মধ্যে আফ্রিকাবাসী জিরাফই বৃহৎ। উচ্চে প্রায় ১৭ ফিট।

অন্য বৃহদাকার পশুর মধ্যে ভারতীয় ও আফ্রিকার হস্তী উচ্চে প্রায় ১০,১১ ফিট, আফ্রিকার উট্‌ ৭,৮ ফিট উচ্চ ও ১০ ফিট দীর্ঘ, ভারতীয় গণ্ডার ৬॥০ ফিট উচ্চ।

হিংস্র পশুর মধ্যে ভারতীয় ব্যাঘ্র (Royal Bengal Tiger) দৈর্ঘ্যে লাঙ্গুল সমেত ১২ ফিট এবং আফ্রিকার সিংহও প্রায় ঐরূপ।

বাঁদর জাতির মধ্যে আফ্রিকার গরিলা উচ্চে প্রায় ৫॥০ ফিট।

পক্ষী জাতির মধ্যে আফ্রিকার উটপাখী ও নিউ হলাণ্ডবাসী এমু প্রায় ৭,৮ ফিট উচ্চ হয়।

সর্প জাতির মধ্যে ভারতীয় বোড়া (Python) প্রায় ৩০ ফিট দীর্ঘ। আমেরিকার জলবোড়া (Anaconda) প্রায় ৩০ ফিটেরও অধিক দীর্ঘ হয়।

বিষাক্ত সর্পের মধ্যে আমাদের শঙ্খচূড় জাতীয় সর্প (Naia Bungarus) ১২ ফিট অবধি লম্বা হয়। আমেরিকার রেটেল সাপ ৮ ফিট, আমাদের গোক্ষুর (Naia Tripudians) ৬,৭ ফিট লম্বা হয়।

অন্য সরীসৃপের মধ্যে আমাদের কুম্ভীর ২০,২৫ ফিট দীর্ঘ হয়। আফ্রিকার নীল নদীর ও আমেরিকার মিসিসিপি নদীর কুম্ভীরও প্রায় ২০ ফিট হয়।

ভূমধ্য সাগরের কচ্ছপ প্রায় ৮ ফিট অবধি দীর্ঘ হয়।

মৎস্য জাতির মধ্যে করাত মৎস্য (Pristis antiquorum) দীর্ঘে ১৫।ফিট অবধি হয় শুনা যায়। শঙ্কর মৎস্যও ১০,১৫ ফিট দীর্ঘ হয়। কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণসাগরের ষ্টারজিয়ন (Sturgeon) মৎস্যও প্রায় ১৫ ফিট লম্বা এবং ওজনে প্রায় ২০,২৫ মণ হয়। এক জাতীয় হাঙ্গর (Carcharodon rendeletu) দৈর্ঘ্যে ৪০ ফিট পর্য্যন্ত হয় শুনা যায়। ইহাদিগকে ভূমধ্যসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীলণ্ড অঞ্চলে দেখা যায়।

[illegible]-পত্রিকা ও সমালোচনা

১৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩২৬

৪র্থ সংখ্যা

প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের দেবদেবী।

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্যবিশারদ।]

হিন্দুদিগের স্তায় প্রাচীন গ্রীক্‌দিগেরও 'তেত্রিশ কোটি' দেবতা ছিল। তবে তাহাদের মধ্যে দ্বাদশ জনই সমধিক শক্তিসম্পন্ন; অপরগুলি ঐ দ্বাদশ দেবতা অপেক্ষা ক্ষমতা ও পদমর্য্যাদায় কিছু হীন।

অলিম্পাস্ শৈলের শিখরদেশে দ্বাদশ দেবতার মন্ত্রণা-সভা বসিত। 'জয়', 'বিজয়ে'র স্তায় 'হোরা'ই (Horae) তখন অলিম্পাসের দ্বাররক্ষী ছিল। 'আইরিস্'—দেবতা-দিগের দৌত্যকর্ম্ম করিত; 'হেবি' (Hebe) তাঁহাদের মুখে অমৃতের পিয়' ' ধরিত।

আমাদের' দেবতাদিগের মধ্যে যেমন স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে, প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের দ্বাদশ দেবতার মধ্যেও সেইরূপ স্ত্রী-পুরুষ ভেদ ছিল। নিম্নে একে একে তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

প্রাচীন গ্রীক্‌গণ টাইটান বংশ সম্ভূত 'ক্রোণাশ' দেবের পুত্র 'জুপিটার'কে দেবরাজ বলিয়া বিশ্বাস করিত। সুরপতি জুপিটার দক্ষিণ করে এক অশনি ধারণ করিয়া, সিংহাসনে উপবেশন করিতেন; একটি ঈগল পাখী সদাই তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া থাকিত।

বৃদ্ধ ক্রোণাশ কালের দেবতা ছিলেন। তিনি এক হস্তে 'কাস্তে' ও অপর হস্তে লেজমুখে করা একটি বিষধর সর্প ধরিয়া থাকিতেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, নিজের সন্তান হইতেই তাঁহার অমঙ্গল ঘটিবে। এ জন্য সন্তান ভূমিষ্ট হইলেই তিনি তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ উদরসাৎ করিতেন।

এই ঘটনায় নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া 'ক্রোণাশ'-পত্নী 'রেয়া' (Rhea) জুপিটারের জন্মসময়ে নব-কুমারকে লুকাইয়া রাখেন। ক্রমে বালক জুপিটার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কৌশলে পিতাকে গর্ভস্থ সন্তানগুলি উদ্গীর্ণ করিতে প্রবৃত্তি দেন। তখন ক্রোণাশ একে একে 'ভেষ্টা' (Vesta), 'সিরিস্' (Ceres), 'জুনো' (Juno', 'নেপ্‌চুণ' (Neptune) ও 'প্লুটো' (Pluto)—এই পাঁচটী সন্তানকে উদর হইতে বাহির করিয়া ফেলিলেন।

অতঃপর জুপিটার তদীয় পিতৃদেব ও ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে শক্তিহরণ করিতে সঙ্কল্প করিলে দেবগণের মধ্যে এক মহাসমর উপস্থিত হয়। সেই দেব-রণে বসুমতী প্রকম্পিতা হইয়া উঠেন। কিন্তু কালে জুপিটারের পক্ষই জয়লাভ করিল। 'ক্রোণাশ' ও তাঁহার অপরাপর পুত্রগণ চিরতরে কারারুদ্ধ হইলেন।

প্রাচীন গ্রীক্‌গণ 'নেপচুণ'কে ভূমিকম্পের দেবতা ও সমুদ্রের শাসনকর্ত্তা বলিয়া পূজা করিত। ইনি শক্তিতে জুপিটার অপেক্ষা কিঞ্চিদূন। ইঁহার আকার অর্দ্ধ-উলঙ্গ মানবের স্তায়। মাথায় রাজমুকুট পরিয়া, করে ত্রিশূল ধরিয়া, ইনি একখানি জল-ঘোটকচালিত শকটে আরোহণ করিয়া থাকিতেন।

জুপিটারের পুত্র 'এপেলো'- গ্রীক্‌দিগের ভবিষ্যৎ গণনা ও গীতবাদ্যের দেবতা ছিলেন। ইনি বেশ

সুন্দর যুবা পুরুষ; ইহার হস্তে একটি বীণা ও কার্ম্মুক থাকিত।

জুপিটারের পত্নীর নাম 'জুনো' দেবী। ইনিও দেখিতে বেশ সুন্দরী বটে, কিন্তু ইহার স্বভাব তাদৃশ কমনীয় ছিল না। ইনি সন্তানগণকে সাতিশয় নির্য্যাতন করিতেন। স্বামীর সহিত ইহার প্রায়ই ঝগড়া বাধিত। এই দেব-রমণী মুকুট-মণ্ডিত মস্তকে ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া হস্তে রাজদণ্ড লইয়া ময়ূর-শকটেই ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেন।

আমাদের যেমন আগুনের দেবতা আছে, প্রাচীন গ্রীক্‌দিগেরও সেইরূপ একজন আগুনের দেবতা ছিলেন। তাঁহার নাম 'ভাল্‌ক্যান্‌' (Vulcan)। জগতের আগ্নেয়-গিরিগুলি এই অগ্নি-দেবতার কারখানা বলিয়াই সেকালের লোক বিশ্বাস করিত।

'মার্স' দেবকে (Mars) তাহারা রণ-দেবতা বলিয়া জানিত। যুদ্ধ, নরহত্যা ও নগর ধ্বংসের ধ্বনিতে মার্স দেবতা বড়ই আনন্দানুভব করিতেন।

প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের বাগ্দেবতা পুরুষ মানুষ; তাঁহার নাম 'মার্কারি' (Mercury)। তবে দুষ্ট সরস্বতীর মত ইনিও জাল, জুয়াচুরি ও নানা অসৎ কার্য্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। ইনি সর্ব্বপ্রথমে বীণাযন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং পরে ঐ যন্ত্রটি 'এপেলো' দেবকে দেন। ইহার পদে পক্ষবিশিষ্ট এক জোড়া উপানৎ থাকিত। তাহারই সাহায্যে অত্যল্প কালের মধ্যে ইনি জলে স্থলে বিচরণ করিতে পারিতেন। ইনিও হস্তে রাজদণ্ডের স্থায় একটি দণ্ড রাখিতেন। ইহার মস্তকও ভ্রমণকারীর টুপিদ্বারা আবৃত থাকিত।

আমরা যেমন মনে করি, ভগবান বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, প্রাচীন গ্রীক্‌রাও সেইরূপ মনে করিত জুপিটারের মস্তক হইতে তাহাদের 'মিনার্ভা' দেবীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই দেবী মূর্ত্তি একেবারেই বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া বাহির হ'ন। ইনি গ্রীসদেশের জ্ঞানদাত্রী ও রণ-দেবী। সকল লোকই ইহাকে বিশেষ ভক্তির সহিত পূজা করিত। তবে স্ত্রীমূর্ত্তি হইলেও ইহার শরীরে রমণীসুলভ মায়া-মমতা একেবারেই ছিল না।

'এপেলো' দেবের এক যমজ ভগ্নীর নামও গ্রীক্‌দিগের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। তাঁহার নাম 'ডায়েনা' (Diana)। তিনি কখনই ভালবাসায় মুগ্ধ হইতেন না। লোকে তাঁহাকে মৃগয়া-দেবী বলিত। তাঁহার কোমল করে সর্ব্বদাই ধনুর্ব্বাণ শোভা পাইত।

মদন-জননী 'ভেনাস' (Venus) ও প্রণয় দেবী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ইনি সৌন্দর্য্যেরও ঈশ্বরী। সাইপ্রাস্‌ ও সিথেরাদ্বীপে মহাড়ম্বরে ইহার পূজা হইত।

সতী শিরোমণি 'ভেষ্টা' (Vesta) দেবীর কথাও গ্রীক্‌-দিগের ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হইত। লোকে ইহার নাম উচ্চারণ করিয়া দিব্য করিত। ইনি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী ও অগ্নিকুণ্ডের রক্ষয়িত্রী ছিলেন। ইহার পবিত্র নামে নগরে নগরে যজ্ঞ-কুণ্ড রক্ষিত হইত। গ্রীক্‌গণ বিদেশে গমন করিলে ঐ যজ্ঞ-কুণ্ড হইতে অগ্নি লইয়া গিয়া প্রবাস স্থানে অগ্নি জ্বালিত।

কৃষি-কার্য্যে 'সিরিস' (Ceres) দেবীর একাধিপত্যের কথাও লোকে বিশ্বাস করিত। আমাদের লক্ষ্মী পূজার ন্যায় এথেন্সবাসীরা বিলক্ষণ ধূমধামের সহিত এই দেবীর পূজা দিত।

প্রাচীন গ্রীক্‌গণ তাহাদের দেবদেবীর তুষ্টির জন্য পশু-বলি প্রদান করিত। তাহারা দেবতাকে পশুর হাড় ও চর্ব্বিমাত্র উৎসর্গ করিত। বিবিধ ফল, তৈল ও গন্ধ দ্রব্য দ্বারা দেবতার তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা হইত। কেহ কেহ দেবোদ্দেশে ভূমি ও ধন-রত্ন দান করিত।

দেব মন্দিরে নানা উৎসব আয়োজনেরও ত্রুটি ছিল না। উৎসবকালে দেবতার সম্মুখে স্তোত্র পাঠ হইত। দেবতা যে ভাবে জন্মিয়াছেন—যে সকল অমানুষিক কার্য্য করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন—স্তোত্রে সেই সকল কথারই উল্লেখ থাকিত।

দেশে দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইলে সাধারণ পূজায় দেবতা সন্তুষ্ট হইতেছেন না বলিয়া প্রাচীন গ্রীক্‌গণ বিশ্বাস করিত। তখন সকল লোকই বিশেষভাবে পূজার অনুষ্ঠানে ব্যস্ত হইত।

প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে গ্রীক্‌-রমণীরা একটি নির্জ্জন স্থানে সমবেত হইয়া গীত গাহিয়া দেবতাকে আবাহন করিত ও নৃত্য করিয়া রাত্রি কাটাইত।

পুরুষেরা দেব-মূর্ত্তি স্কন্ধে লইয়া মহোল্লাসে রাজপথে শোভাযাত্রা করিত। এই শোভাযাত্রায় যোগদান না করিলে দেবতার রোষে পড়িতে হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল।

আমাদের ন্যায় প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের মধ্যেও নানা ধর্ম্মোপাখ্যান প্রচলিত ছিল। পাঠক, তাহাদের একটি গল্প শুনিলে বেশ বুঝিতে পারিবেন।

একদা 'সিরিসে'র কন্যা 'প্রসারপাইন' (Proserpine) কোন প্রান্তরে পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন। এমন সময়ে দেবতা 'প্লটো' আসিয়া তাহাকে প্রণয়িণী করিবার অভিপ্রায়ে হরণ করিয়া এক 'ছায়া-রাজ্যে' (World of shades) লইয়া যায়। এই ঘটনায় প্রসারপাইনের জননী একান্ত অধীরা হইয়া নয় দিন নয় রাত্রি মশাল হস্তে কন্যার অনুসন্ধানে ব্যাপৃতা হ'ন: অবশেষে দেবতাদিগের গোয়েন্দা 'হিলিয়াস্' (Helios) দয়া করিয়া তাঁহাকে সত্য ঘটনা বিবৃত করেন। 'সিরিস' ক্রোধে-অভিমানে অলিম্পাস্ শৈল পরিত্যাগ করিয়া এবং অমৃত পানে বিরত হইয়া মর্ত্তলোকে আসিয়া অনাহারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এক দিবস তিনি 'ইলিউসিসে'র (Eleusis) কাছে আসিলে রাজকন্যারা তাঁহাকে দেখিতে পান এবং জিজ্ঞাসা করেন—'তুমি কি নিমিত্ত এ স্থানে আসিয়াছ?' 'সিরিস' উত্তর করিলেন,—'কোন শুশ্রূষাকারিণীর কার্য্য পাইবার আশায় আমি এ স্থানে আগমন করিয়াছি।' সেই দিন হইতেই তিনি রাজ-অন্তঃপুরে নবপ্রসূত রাজপুত্রের প্রতিপালিকা নিযুক্ত হইলেন।

'সিরিস' শিশুকে কোন খাদ্য দিতেন না; কেবল তাহার কোমল অঙ্গে স্বর্গের পীযূষ মাখাইয়া দিতেন। ইহাতে রাজপুত্র দিনে দিনে কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্ হইতে লাগিল। বালককে অমর করিবার অভিপ্রায়ে তিনি প্রতি রজনীতে অল্পকালের জন্য তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেন। এক দিবস রাজমহিষী গোপনে এই ঘটনা দর্শন করিলে দেবী আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। তখন মহা সমারোহে নিকটস্থ এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতে তাঁহার মন্দির নির্ম্মিত হইল।

'সিরিস' মন্দিরে দিনযাপন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মনঃকষ্টে মানবের পূজা গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার রোষে দেশ ক্রমশঃ শস্যহীন হইয়া পড়িল—লোক অনাহারে মরিতে বসিল। তখন দেবরাজ জুপিটার তাঁহার ক্রোধোপশমের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই সে রাগ কমিল না। অবশেষে বৎসরে তিন মাস মাত্র 'সিরিস'-তনয়া 'প্লটো'র সঙ্গিনী হইবেন এই সর্ত্তে 'প্রসারপাইন'কে ফিরাইয়া দিবার হুকুম দেওয়া হইল। বসুন্ধরা আবার শস্যপূর্ণা হইয়া উঠিলেন;—লোকের হাহাকার ঘুচিয়া গেল।

অন্ধের হাতে আলো।*

[শ্রীদীননাথ মজুমদার, এম্-এ।]

ঘোর অমানিশা; অন্ধ পথ বহি' যায়
কাঁধেতে কুম্ভের ভার, হাতে দীপ জ্বালা;
যষ্টিখানি ফেলি ফেলি চলে ধীর পায়
আকাশ নিবিড় মেঘে হইয়াছে কালা—
ভেদিয়া আঁধার-বুক পান্থ অন্য জন
দ্রুতপদে চলিয়াছে, দৃষ্টি নভোপানে;
হেরিয়া অন্ধেরে, করি বিদ্রূপ বর্ষণ
বলিল কর্কশে পান্থ অন্ধজন কানে,
"অক্ষিহীন, তবু কেন করে বাতি জ্বালা?
অন্ধ পাশে দিবা যাম সকলি সমান,
মূর্খ আর তোমা' চেয়ে নাহি ভূমণ্ডলে!"
উত্তর বিনয়ে অন্ধ করিল প্রদান,
"আলোক আমার করে নহে মোর তরে—
তব সম অজ্ঞ জনে দেখাইতে পথ,
অসতর্কে চলি পাছে পড় গাত্র'পরে—
পাছে মোরা উভয়েই হই হতাহত।"
বিজ্ঞজন পর তরে—করে বহু কাজ,
না বুঝি সমাজ তারে দেয় গালি লাজ।

---

* শেখ সাদি হইতে।

কুন্দনন্দিনী।

[শ্রীরামসহায় [illegible]।]

কুন্দ ছোট ফুল। তাহার শুভ্র সরল মুখখানি দেখিতে যেমন সুন্দর, গন্ধ তেমন মধুর নয়। হৃদয়ের পুটে নিরুদ্ধ সে গন্ধ অতি মৃদু। গোলাপ, মল্লিকা, যূথী, জাতি, রজনী-গন্ধার মত কুন্দ তেমন কার্য্যে আসে না। বিলাসীর প্রমোদোদ্যানে ফুটিলেও তাহার স্বাভাবিক আরণ্য-ভাব ঘোচে নাই।

আমাদের কুন্দনন্দিনীও ঠিক কুন্দ ফুলের মত। তাহার স্বভাব সুন্দর সরল মুখখানি দেখিলে কুন্দ ফুলের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। গন্ধ গুণ, সে গুণ কুন্দের সামান্যই ছিল। আর তাহা সংসারে কোন ভাল কার্য্যে লাগিল না। কুন্দের প্রেম তার হৃদয়-বালুকার মধ্য দিয়া নীরবে বহিত, কুল কুল শব্দ করিত না; মধ্য দিয়া নীরবে বহিত, কেহ তাহা জানিতে পারিত না—আপনিও বড় বুঝিতে পারিত না। সে প্রেম মধুর মত মধুর, মধুর মতই মর্ম্মপুটের তলে লুকান ছিল। গভীর—অতি গভীর, উপরে কিন্তু বহির্বিকাশ ছিল না। আর পরিমাণে অল্পই মিলিত। ক্ষুদ্র পল্লীর ঘনান্ধকার ছায়ার তলে সে ফুটিয়াছিল, কিন্তু পরে অদৃষ্টের চক্রে ধনীর প্রমোদ কাননে আসিয়া পড়ে। শৈশবে তাহার জননী তাহাকে ফেলিয়া স্বর্গে চলিয়া যায়। দরিদ্র বৃদ্ধ পিতার ক্রোড়েই সে বাড়িয়া উঠে। মাতৃহারা কুন্দ আত্মীয় স্বজনের কোনরূপ আদরই পায় নাই। প্রতিবেশীর স্নেহ ও সহানুভূতিও বড় লাভ করে নাই। কাজেই স্বভাবের অকৃত্রিম বন্যভাব সে যথেষ্টই পাইয়াছিল; আদর গর্ভ শাসন অভাবে সংযম শিক্ষাও একেবারেই পাইল না।

মুমূর্ষু পিতার পায়ের তলে প্রথম কুন্দকে আমরা দেখিতে পাই। অন্ধকারময় রাত্রে ভগ্ন প্রাসাদে একাকিনী "বাবা বাবা" করিয়া কাঁদিতেছিল। যা'দের আত্মীয় স্বজন নাই, ভালবাসিবার কেহ নাই, তাহারাও এমন বিপদে পাড়া-প্রতিবেশীর কিছু না কিছু সাহায্য পায়, কুন্দ কিছুই পায় নাই।

কুন্দের এমন বিপদের দিনে "আহা" করিবার কেহই নাই। পাড়ায় বাল্যসঙ্গিনী চাঁপা নামে একজন ছিল মাত্র। সেও কার্য্যতঃ কোন উপকারে আসিল না। মাতৃহারা সংসারের একমাত্র অবলম্বন পিতাকে হারাইল। দয়াপ্রাণ নগেন্দ্রনাথ তাহার সহায় স্বরূপ হইয়া আসিলেন। নিরাশ্রয়া কুন্দকে তিনিই আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইলেন। সহকার স্থানে মাধবী কমিতগে আশ্রয় লইল। কলিকাতায় কুন্দের আত্মীয়ের কোন সন্ধান মিলিল না; কাজেই কিছুদিন কমলমণির আশ্রয়ে থাকিয়া শেষে নগেন্দ্রনাথের বিস্তৃত অট্টালিকায় স্থান লাভ করিল।

অসহায়া বালিকা মহাপ্রাণ দেবকান্তি নগেন্দ্রনাথকেই আপনার বলিয়া জানিল। অনাথাকে যে বুকে তুলিয়া লয়, সে দেবতা। কুন্দ নগেন্দ্রনাথকে দেবতারূপেই দেখিল। দেবতার অপরিসীম দয়া ও স্নেহের পরিচয় পাইয়া কুন্দের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। নগেন্দ্রনাথের দেবতার মত কান্তি, রাজার মত ঐশ্বর্য্য, নিষ্কলঙ্ক পূতচরিত্র কুন্দকে আকৃষ্ট করিল। কিশোরী আপনার হৃদয়-সিংহা-সনে নগেন্দ্রনাথকে দেবতারূপে বসাইয়া মনে মনে পূজা করিতে লাগিল। কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিল। যে বয়সে বালিকার হৃদয়ে গাঢ় ভালবাসার সঞ্চার হয়, কুন্দের সে বয়স হইয়াছিল।

ভালবাসা অনেক কারণে জন্মে। কাহাকে দর্শন মাত্র কাহারও হৃদয়ে অহেতুক অনুরাগ জন্মে। তাহা [illegible]রাগ, তারামৈত্রক নামে কবিরা অভিহিত করেন। আর গুণের পরিচয় পাইয়া গুণবানের প্রতি ক্রমে ক্রমে অন্তর আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন গভীর কৃতজ্ঞতা হইতেও ভালবাসার সঞ্চার দেখা যায়। কুন্দের ভালবাসায় উপরোক্ত তিনটি কারণই বিদ্যমান ছিল।

কুন্দ নগেন্দ্রকে প্রথমে এমন চক্ষুতে দেখিতেছিল যে, স্বর্গগতা জননীর আদেশ-বাণীও ভাসিয়া গেল। তাঁহার দয়া ও স্নেহ পাইয়া সে স্বপ্ন-বিস্মৃতা হইল। কুন্দ স্বভাব-সরলা; বয়সোচিত কৃত্রিমভাব তাহাতে আধিপত্য করে নাই, বয়সের ধর্ম্মে অন্তরের ভাবকন্দীকা কিন্তু প্রস্ফুট হইয়াছিল।

কিশোর বয়সে স্নেহময়ী রমণী পতির উপর যেমন অনুরাগিণী হয়, কুন্দ তেমনই নগেন্দ্রে অনুরক্তা হইল। এই

নির্ম্মল আকাঙ্ক্ষাশূন্য পূত ভালবাসাই বয়সের সঙ্গে ক্রমে যেন উদার হইয়া দেখা দিয়াছিল। অবস্থাগুণে এই ভালবাসাই একদিন কেন প্রবল মোহের আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহার কারণ পরে পরিস্ফুট হইবে।

কুন্দ সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি। ভিতরে তুষাগ্নি ধিকিধিকি জ্বলিতেছে, কিন্তু উপরে কি শীতল স্পর্শ! তারাচরণের সহিত বিবাহে সে কোন কথাটি বলিল না, আপনার মনকে কোন কথাই ভাবিতে দিল না। মুখে চক্ষুতে হাসির বিজলী ছুটিল না, বিষাদের রেখাও দেখা দিল না। কুন্দের অন্তরের ভিতরটা যদি কেহ দেখিত, সে বুঝিত, প্রাণহীনা প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির মত কুন্দ তারাচরণের বধূ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ কুন্দের নিকট আকাশের চাঁদ। এ চাঁদ জীবনে কোন দিনই ধরা দিবে না, সে আকাশকুসুমবৎ কল্পনা কোন দিনই পূর্ণ হইবে না। যাহা পাইবার কোন আশা নাই, তাহার উপর আকর্ষণ কখনই তত তীব্রভাবে প্রকাশ পায় না। কাজেই আশাশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য কুন্দের প্রেম তাহাকে মর্ম্মপীড়া দিল না।

কুন্দ হৃদয়পুটে রুদ্ধ ভালবাসা কাহাকেও জানিতে দেয় নাই। আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল না, আর আকাশের চাঁদের মত নগেন্দ্র চির-দুর্লভ এ জন্য ভালবাসার প্রভাব সে নিজেও বড় ভাল বুঝিতে পারে নাই। নগেন্দ্রের উপর তাহার মনোভাব যে ভালবাসা, নগেন্দ্রকে যে সে পতিরূপেই চাহে—ইহা সে বুঝে নাই। স্বভাবসরলা কুন্দনন্দিনীর সে বুঝিবার মত অবস্থাও পড়িয়া উঠে নাই। তারাচরণের সহিত স্ত্রীভাবে কুন্দ তিন বৎসর কাটাইল, এই তিন বৎসরে কুন্দ পতি কি, বিবাহ কি, সবই বুঝিল। ভোগের আস্বাদ পাইয়া জানিল, তাহার অতৃপ্তি কত বড়! নগেন্দ্রের স্থান কোথায়, তাহাও সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। নগেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ যদি সম্ভবপর বলিয়া কুন্দ মনে করিত, আর তাহার ক্ষীণ ভরসাও যদি সে একদিনও পাইত, অথবা কেহ যদি তাহার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হৃদয়-দেবতারূপী নগেন্দ্রের সন্ধান পাইত, তবে তারাচরণের সহিত তাহার বিবাহটা এমন নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে ঘটিতে পারিত না। কুন্দের মতামত কেহ লয় নাই, লইবার আবশ্যকতা কেহ ভাবে নাই, কুন্দ আপনিই সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা করে নাই। কুন্দ বাহিরে তারাচরণের স্ত্রী ছিল, কিন্তু অন্তরের মধ্যে তারাচরণকে সে পতির যোগ্য পূজা একদিনও দিতে পারে নাই। সে ভিতরে রাত্রিদিন নগেন্দ্রনাথকেই ভাবিত, তাহার ভাবেই বিভোর থাকিত। কুন্দের সঙ্কটময় দেবী-ভাবযুক্ত অবস্থা কাটিয়া গেল। সে বিধবা হইয়া নগেন্দ্রের গৃহে আসিল। বিবাহে তাহার কোন সুখ হয় নাই, বিধবা হইয়াও দুঃখ হইল না। লোকে কুন্দকে পাষাণী, সংসারজ্ঞান বর্জ্জিতা বলিয়া মনে করিল। কুন্দের এত বড় ঔদাসীন্য যে নগেন্দ্রের উপর গভীর ভালবাসার ফল—তাহা কেহই বুঝিল না।

কুন্দের এখন ভরা যৌবন। সে আর এখন সরলা কচি খুকিটি নহে। এখন সে আপনাকে বুঝিয়াছে। নগেন্দ্র তাহার কে, কি হইলে তার সাধ আহ্লাদ মেটে, এ সব সে ভালরূপেই জানিয়াছে। নগেন্দ্রকেও সে বুঝিয়া লইয়াছে। নগেন্দ্রের প্রাণ যে তাহার বৈধব্য দশা দেখিয়া গলিয়াছে, তাহা সে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। নগেন্দ্রের চক্ষু কি খোঁজে, শ্রবণ কি শুনিতে চাহে, তাহা কুন্দের আর অবিদিত নাই। নগেন্দ্র যে তাহাকে ভালবাসিয়াছে, ইহা অস্পষ্ট রকম যেন তার বোধ হইয়াছে। কুন্দের এইবার বড় রকম পরিবর্ত্তন দেখা দিল। কুন্দ বুঝিল, নগেন্দ্র আর আকাশের চাঁদ নহে, তাহারই মত রক্তমাংসময় হৃদয় সমন্বিত মানুষ। সে জানিল, তাহার আশা আর আকাশ কুসুম নহে। আশা-আকাঙ্ক্ষাশূন্য হৃদয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হইল। মদনও অবসর বুঝিয়া সুতীক্ষ্ণ শরক্ষেপ করিল। কামমোহের গৈরিক স্রোত আসিয়া কুন্দের ভালবাসার নির্ম্মল নদীস্রোতকে লোহিত ও পঙ্কিল করিয়া দিল—সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিল। কুন্দ বুভুক্ষু হৃদয় লইয়া, অঙ্গে অঙ্গে উচ্ছলিত যৌবন-লাবণ্যের রসপ্রবাহ লইয়া নগেন্দ্রের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কুন্দের পিপাসু রক্তিম অধরোষ্ঠে, উপোসিত বৃহৎ নীল করুণ চক্ষু অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা-ভরা ভালবাসাময় মন প্রাণ নগেন্দ্রকে ক্রমেই উন্মত্ত করিতে আরম্ভ করিল।

কুন্দের যেটুকু বুঝিবার বাকি ছিল, কমলমণির কথায় তাহা সে বুঝিল। একদিন গভীর ভালবাসায় অনেক যত্নে বাঁধ দিয়া রাখিয়াছিল, আজ কমলমণির কথায় সে বাঁধ

ভাঙ্গিয়া গেল। সে যখন শুনিল, "তাহার জন্য অনেকে মরে যে, সোনার সংসার ছারখারে গেল যে।" তখন স্বভাবতঃ কোমল, দয়ার্দ্র অন্তঃকরণ গলিয়া গেল। সে পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার প্রাণ বলি দিতে, নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর মঙ্গলার্থ আপনার সুখ বিসর্জ্জন দিতে স্বীকৃতা হইল। হৃদপিণ্ডচ্ছেদের মত নগেন্দ্রের অদর্শন তাহার বড় কষ্টের। তথাপি সে কমলমণির অনুরোধে কলিকাতায় যাইতে মত দিল। সুখে দুঃখে, তৃপ্তিতে অতৃপ্তিতে, সে কমলমণির কোলে মাথা রাখিয়া অঝোরে কাঁদিল। কমল ভালবাসা কি জানে; সে কুন্দকে সহানুভূতি করিল।

তার পর কুন্দ অনেক ভাবিল। আপনার মনে বিচার করিয়া দেখিল যে, নগেন্দ্রকে না দেখিয়া সে কি করিয়া কলিকাতায় থাকিবে, নগেন্দ্রকে সে ভুলিবেই বা কিরূপে? কোমল-হৃদয়া সংযমে আদৌ অনভ্যস্তা কুন্দ আপনার মরণই মঙ্গল বলিয়া ঠিক করিল। স্বর্গীয়া মাতার উপদেশ মনে পড়িল।

তখন কুন্দ উদ্যান মধ্য বাপীতটে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার জন্য উপস্থিত হইল। প্রাণ ভরিয়া তখন সে "নগেন্দ্র, নগেন্দ্র আমার নগেন্দ্র, আ ম'লো আমার নগেন্দ্র কেন, সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র" করিতে লাগিল। এমন সময়ে নগেন্দ্র চোরের মত আসিয়া কুন্দের পৃষ্ঠে হাত দিল। আর কুন্দ সেই চোরের স্পর্শে কম্পিতাঙ্গী হইয়া স্রোতোচালিতা বেতস লতার মত কাঁপিতে লাগিল। নগেন্দ্রনাথ তখন আপনার প্রেম শতমুখে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, "তোমাকে বিবাহ করিব, বিধবা বিবাহ এক্ষণে চলিত হইতেছে", বলিয়া লোভ দেখাইলেন। নগেন্দ্রনাথ বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের বড়ই সুখের চিত্র কুন্দের সম্মুখে ধরিলেন। কুন্দ সকল কথার উত্তরে "না" বলিল। হৃদয়-কুসুম-শোষিণী তৃষ্ণায় কুন্দের অধরোষ্ঠ একবিন্দু বারি-আশায় উন্মুখ ছিল। নগেন্দ্র সেই শুষ্ক অধরোষ্ঠের উপর নব মেঘার্জ্জিত ধারা ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। আর কুন্দ সেই বিশুষ্ক অধরোষ্ঠে প্রাণপণ বলে চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। আপনার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে, তথাপি বালিকার এই পূত আত্মোৎসর্গ, এই কঠোর আত্মসংযম কি সুন্দর! প্রেমিকের প্রেমলালসা বাড়াইবার জন্য রসভাবজ্ঞা যুবতীর মত সে যে প্রেমখেলা খেলিতেছিল, তাহা নহে। ভিতরে প্রবল ইচ্ছা, আর মুখে লজ্জা—যাহা কুমারীদের স্বভাব—কুন্দ সে প্রকৃতির বশে "না না" করে নাই। "আরাধ্যন্তে মনসিজমপি ক্ষিপ্তকালাঃ কুমার্য্যঃ" কুমারীরা সময়ক্ষেপ করিয়া কেবল যে আপনারাই কষ্ট পায়, তাহা নহে, মদনকে পর্য্যন্ত কষ্ট দেয়—কুন্দকে এ জাতীয় ভাবিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। পরের মঙ্গল-মন্দিরে আত্মবলি দিবার জন্য সে যে এইমাত্র কমলমণির নিকট স্বীকার করিয়া আসিয়াছে, দত্ত-গৃহে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর সুখের মাঝখানে আগুন জ্বালিবে না মনে মনে ঠিক করিয়াছে—তাই প্রাণপণ চেষ্টায় আপনাকে সংযত রাখিল, নগেন্দ্রনাথের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল।

কুন্দের এই আত্মবলি, এই সর্ব্বত্যাগ যদি শেষ রক্ষা পাইত, তাহা হইলে আজ সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া তাহাকে আমরা পূজা করিতাম।

কুন্দ আজ অনায়াসে কচি খুকীটির মত ঘোমটা টানিয়া নববধূর সাজে সাজিল। সতীলক্ষ্মীর মেয়ে, হিন্দুগৃহের বিধবা এত দিন পরপুরুষকে পতিজ্ঞানে পূজা করিয়া আসিয়াছিল, ইহাই ত অমার্জ্জনীয় অপরাধ। আর এ অপরাধ আমরা ক্ষমা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু যখন বিধবা বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল, তখন যে হিন্দুগৃহে পল্লীসমাজের মধ্যে অবস্থিতা বাঙ্গালীর মেয়ে বিধবা কুন্দের মনে যে কোন স্পন্দন উঠিল না, ধর্ম্ম, সমাজ, বিবেক ও আবাল্য সংস্কারের বিরুদ্ধে তাহার অন্তরে যে একবার কোন দ্বিধা সঙ্কোচের ভাব পর্য্যন্ত দেখা গেল না—ইহা আমরা কোন মতেই মার্জ্জনা করিতে পারি না। হইতে পারে, নগেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তার দেহ, ইন্দ্রিয়, মনপ্রাণের শক্তি সম্পূর্ণ অচল হইতে পারে, প্রবল কাম মোহে পূর্ণ লালসাময় প্রেমের টানে সে স্রোতোচালিত তৃণের মত অবশ! কিন্তু যে বিধবা বিবাহ লইয়া অনেক দিন ধরিয়া সারা গ্রাম আন্দোলিত হইতেছিল, যতই সরলা হউক, কুন্দের কাণে পৌঁছে নাই—হইতে পারে না।

আশ্চর্য্য মেয়ে এই কুন্দ প্রাণের টানেই বরাবর ভাসিয়া চলিয়াছে, উপরে কিন্তু যেন সে নির্লিপ্তা জড় প্রতিমা, এত সরলা, সংসারভাবানভিজ্ঞা। মায়ের স্বপ্ন ভুলিল।

আপনা-ভোলা মেয়ে নগেন্দ্র হইতে অনিষ্ট শঙ্কাও করিল না, কিন্তু হীরাকে আবার আপনার ভাবিয়া লইল।

কুন্দকে যাহারা আশ্রয় দিয়াছে, তাহারা কুন্দ সম্বন্ধে যাহা করিবে, কুন্দকে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। কুন্দ নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর উপর মধ্যে আপনার সত্তা দিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের আদেশ পালন করা, তাহাদের নির্দ্দেশ মত চলাই তাহার প্রকৃতি। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী তারাচরণের সহিত বিবাহ দেওয়াইল, সে বিবাহ করিল। তারাচরণের গৃহে ৩ বৎসর তাহারা রাখিয়া দিলেন, সে রহিল। বিধবা হইবার পর দত্তগৃহে আনিলেন, আসিল। আবার সেই নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী তাহার বিধবা বিবাহ দেওয়াইতেছেন, সে অস্বীকার করিল না। প্রাণহীনা পুত্তলিকার মত সে সকল কার্য্যই করিল, কিন্তু বিধবা বিবাহের সময়ে সে আর ঠিক প্রাণহীনা পুত্তলিকার মত ছিল না, ইহা নিশ্চয়।

নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী তাহার জীবনের গুরু। সে যেন ঐ দুই জনের সামগ্রী। বৈষ্ণবীর অনুরোধে সূর্য্যমুখীর বিনা অনুমতিতে শাশুড়ীর সহিত দেখা করিতে চাহিল না। সেই দুজনেই যখন তাহার বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা করিল, সে আপত্তি করিবে কেন? অভিপ্রেত, অনভিপ্রেত কোন কার্য্যেই সে প্রতিকূলা হয় নাই, আর তাহার পক্ষে সুখের কার্য্যেই বা কেন সে প্রতিকূলা হইবে? বিশেষতঃ এত দিনের আরাধনার ধন আজ মিলিতে চলিল, তাহার কত বড় ভাগ্যের কথা। ভগবানের দান বলিয়া নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর ব্যবস্থাকে সে মাথায় পাতিয়া লইল। ধর্ম্ম, সমাজ, বিবেক ও সংস্কারের সে বড় ধার ধারিত না। সে ভালবাসিত নগেন্দ্রকে, নগেন্দ্রই তাহার ইহকাল পরকাল, নগেন্দ্রই তাহার ধর্ম্ম, সমাজ, বিবেক, সংস্কার সবই। আর কুন্দ সূর্য্যমুখীকে নগেন্দ্র হইতে পৃথক্ ভাবিত না। তাই সে সূর্য্যমুখীর কথায় গৃহত্যাগ করিল, আবার সূর্য্যমুখীর সঙ্গে গৃহে ফিরিল। যাহারা কলঙ্কিনী বলিয়া কুন্দকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিল, কুন্দ আবার সেইখানেই দীন ভিক্ষুকের মত আসিয়া উপস্থিতা হইল। তার সবই যে নগেন্দ্র। নগেন্দ্রকে দেখিতে না পাইলে সে বাণবিদ্ধা হরিণীর মত ছটফট করে। দেখিতে পাইবে না বলিয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে গিয়াছিল।

সূর্য্যমুখীর যখন মত ছিল না, সূর্য্যমুখী যখন তাঁহার নগেন্দ্রকে কুন্দকে দেয় নাই—তবে কুন্দ কেন নগেন্দ্রনাথকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃতা হইবে? তাই অম্লান বদনে নগেন্দ্রের সেই অপরিমিত প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। আর আজ সূর্য্যমুখী নিজের দাবী দাওয়া ত্যাগ করিয়া তাঁহার নগেন্দ্রনাথকে কুন্দনন্দিনীকে দান করিতেছে, সে গ্রহণ করিবে না কেন?

তার পর কুন্দ নগেন্দ্রকে পাইয়া কৃতার্থা হইল, কিন্তু সুখিনী হওয়া তার অদৃষ্টে ঘটিল না। এত দিনের সাধ মিটিয়াও মিটিল না।

বিবাহের দিন তার মনে হইল "বুঝি এ সুখের সীমা নাই, পরিমাণ নাই।" তার পর তিন দিন যাইতে না যাইতে সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া যাইলেন। কুন্দ সূর্য্যমুখীর জন্য অসময়ে রক্ষা পাইয়াছিল, সেই নিজ হাতে তাহার আরাধনার ধন নগেন্দ্র দান করিয়াছে; সেই সূর্য্যমুখী চলিয়া যাওয়ায় কুন্দের মনে পরিতাপ জন্মিল। কুন্দ স্বভাবতঃ কোমলা ও পরদুঃখকাতরা ছিল, তাহার প্রকৃতিও সরল ও মধুর ছিল, নচেৎ সূর্য্যমুখীর জন্য আন্তরিক ব্যথিতা হইবে কেন?

কুন্দ চিরদিনই অর্দ্ধস্ফুট। ভাল করিয়া সে ফুটিতে পাইল না। ফুটিবার অবস্থায় আসিয়াছিল মাত্র। নগেন্দ্রকে পাইয়া, তাহার আদর যত্ন লাভ করিয়া, ক্রমে সে ফুটিত। কিন্তু তাহার ফোটাটাই বিধাতার অভিপ্রেত নহে। আমি তুলনামূলক সমালোচনা তত পছন্দ করি না। কারণ এক একটি চরিত্রগত বিশিষ্টতাই সেই সেই চরিত্রের প্রাণ। বাহিরের সাদৃশ্য লইয়া তুলনা করায় অনেক সময়ে চরিত্র বুঝিবার পক্ষে ক্ষতিই হয়।

কুন্দের হৃদয়ে নগেন্দ্রের প্রতি অপরিমিত প্রেম ছিল, তবে তাহা প্রকাশের ভাষা পায় নাই বলিয়া নগেন্দ্র তাহা জানিতে পারিলেন না। কুন্দের "বাসি বৈ কি", "বরাবরই বাসি" এই সব বাণীও নগেন্দ্র বিশ্বাস করিলেন না। কুন্দ সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী, কিন্তু স্বভাবতঃই সে ভীরুস্বভাবা। তাহার অন্তর এত সরল, এত সংসারভাবানভিজ্ঞ ছিল, যে জন্য তাহাকে বালিকা বলিয়া বোধ জন্মানই স্বাভাবিক ছিল। সময়োপযোগী কথা কহিতে সে জানিত না।

জানিলে, আর যুবতী-জনোচিত ব্যবহার করিতে পারিলে, নগেন্দ্র অমন অনাদর করিতে কখনই পারিতেন না। নগেন্দ্র কর্ত্তৃক কুন্দ মর্ম্মপীড়িতা হইল।

কুন্দ দেখিল, সকল সুখের সীমা আছে। তাহার সাধের স্বপ্নরাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল। ভালবাসার সপ্তচূড়-মন্দির ধূলিসাৎ হইল। কুন্দ আপন মনে কাঁদিতে লাগিল। সান্ত্বনার আশায় কমলমণির কাছে গেল। কমলমণি আমার "কাজ আছে" বলিয়া উঠিয়া গেল। বেদনার উপর বেদনা বাড়িল।

তার পর দুঃখে, অনুতাপে, নিরাশায় ও উপেক্ষায় কুন্দের দিনগুলি কাটিতে লাগিল। সেই নিরানন্দ পুরী মধ্যে সে একা। আপনার অদৃষ্টের চিন্তায় বিভোরা। কুন্দ বিধবা—তাহার এ বিবাহ গর্হিত। এ জাতীয় কোন মনোভাব কুন্দের জন্মে নাই। ইহা যে পাপ, এ ধারণাই তার কখন হয় নাই। সেজন্য সে অনুতপ্তাও নহে। কুন্দ ও সব বড় কথা ভাবিত না। ছেলেমানুষের মত আপনার সুখ দুঃখ লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। তবে ছেলে-মানুষের মত এক হিসাবে সে বড়ই স্বার্থপর। আবার স্বভাবতঃ অতি কোমলা ও পরদুঃখকাতরা কুন্দের পরার্থ-পরতাও বলবতী ছিল।

নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে হারাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কুন্দ এত দিনের মধ্যে নগেন্দ্রের কোন পত্রাদি পায় নাই। এমন কি নগেন্দ্র আসিয়া তাহার সহিত দেখা করা দূরে থাক, একবার খোঁজ পর্য্যন্ত করিলেন না। কুন্দ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কাঁদিল। ভাবিল, এখন আর কোন্ সুখের আশায় প্রাণ রাখি?

চারি বৎসর পরে কুন্দ আবার মাকে স্বপ্ন দেখিল, "মা ডাকিতেছেন"। এখন জীবনের সব সুখই ত ফুরাইয়াছে, আর কেন, ভাবিয়া কুন্দ মায়ের নিকট তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য কাঁদিল। স্বপ্ন ভাঙ্গিল, কুন্দ "আপনার স্বপ্ন সফল হউক" বলিয়া দেবতার নিকট ভিক্ষা মাগিল। তার পর দত্ত-গৃহে মঙ্গল শঙ্খরব ও উলু উলু ধ্বনি শুনিয়া হীরা বিষের কৌটা ফেলিয়া ছুটিয়া দেখিতে গেল।

কুন্দ আগেই জানিয়াছিল নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর, নগেন্দ্র তাহার নহে, সেজন্য সে মরিত না। সে নগেন্দ্রকে পাইয়াই কৃতার্থা। নগেন্দ্রের সামান্য আদরেই সে গলিয়া যাইত, মৌখিক যত্নেও বুঝি তার সাধ মিটিত। সে অতি অল্পেই সন্তুষ্ট হইত। সে এক্ষণে বুঝিল, নগেন্দ্র তাহাকে চাহেন না, তাহার সঙ্গ বিষবৎ মনে করেন—তবে সে কেন তাঁহাদের সুখের পথে কাঁটা হইয়া রহিবে? বিবাহের পর আর সে আগেকার মত থাকাও চলিবে না—কুন্দ আর বাধা স্বরূপ থাকিতে চাহে না। কুন্দ আত্মহত্যা করিল।

কুন্দ মরণের অর্দ্ধপথে গিয়া ফুটিল। তাহার গভীর প্রেম আজ আপনই ভাষা করিয়া লইল। হৃদয়ের মধ্যে সেই গভীর অপরিমিত ভালবাসা মৃত্যুকালে নিরুদ্ধ ও অব্যক্ত থাকিতে পারে না। শেষ দিনে শত মুখে সেই প্রেম আজ ভাষা পাইয়া বাহির হইল। অন্তিম কালে মুক্তকণ্ঠে কুন্দ কহিয়া গেল;—

"কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার "কুন্দ" বলিয়া ডাকিতে—কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে—তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্প দিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি—তোমাকে দেখিয়া আমার তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না।"

নগেন্দ্রকে জানুর উপর ললাট রক্ষা করিয়া নীরবে অধোবদনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কুন্দ আবার কহিল—কুন্দ আজ বড় মুখরা, আর ত স্বামীর সঙ্গে কথা কহিবার দিন পাইবে না।

"ছিঃ, তুমি অমন করিয়া নীরব হইয়া থাকিও; আমি তোমার হাসিমুখ দেখিতে দেখিতে যদি না মরিল তবে আমার মরণে সুখ নাই।" * * * কুন্দ অপরিতৃপ্তের ন্যায় পুনরপি ক্লিষ্ট নিশ্বাস সহকারে কহিতে লাগিল—"আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া জানিতাম—সাহস করিয়া কখনও মুখ ফুটিয়া কথা কহি নাই।" কুন্দ স্বামীর পদযুগল মধ্যে মুখ লুকাইল। তার মুখে আর কোন কথা ফুটিল না। পদতলে মুখ রাখিয়া অপরিস্ফুট কুন্দ জন্মের মত পরিস্ফুট হইয়া জীবন ত্যাগ করিল। সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন হইয়া গেল।

আমাদের শাস্ত্রমতে কুন্দের অনুষ্ঠিত বিধবা-বিবাহ ও

আত্মহত্যা, দুইটিই পাপ মধ্যে পরিগণিত। তবে ঐ দুইটি কার্য্য কুন্দের পক্ষে কেবলই যে পাপানুষ্ঠানই হইয়াছিল, তাহা আমরা বলি না। বিধবা বিবাহ ব্যাপারে কুন্দের আত্মসুখান্বেষণী বৃত্তি বলবতী ছিল, স্বার্থপরতা ও অসংযম তাহার অন্তরে প্রকট ছিল—তাহাই পাপ। আর পাপ নহে কেন—সে সম্বন্ধে বক্তব্য অগ্রেই বুঝাইয়াছি।

কুন্দের আত্মহত্যা, যখন আত্মহত্যা তখন তাহা পাপই। কিন্তু নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর মঙ্গলেচ্ছা ও পরের মঙ্গল-মন্দিরে আত্মবলিও এই আত্মহত্যার অন্যতম কারণ। আত্ম-বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা পাপ নহে।

কুন্দের আত্মহত্যা স্বকৃত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু শাস্ত্রমতে এ আত্মহত্যা আবার নূতন পাপানুষ্ঠান। এই আত্মহত্যা নগেন্দ্রের চিত্তে সারা জীবনব্যাপী অনুতাপের সৃষ্টি করিয়া গেল। কবিই বলিয়াছেন, "কুন্দের আধিক্লিষ্ট সুখের মন্দ বিদ্যুন্নিন্দিত হাসি নগেন্দ্রের প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত অঙ্কিত রহিল।" উৎকট পাপের ফল পরলোকে বা জন্মান্তরে ভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন ইহজন্মে সম্পূর্ণ না হউক, অন্ততঃ কিয়দংশের ভোগ হইয়া থাকে। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর জীবনের মধ্য দিয়া কুন্দের বিষাদপরীত অশরীরিণী ছায়ামূর্ত্তি মধ্যে মধ্যে গমনাগমন করিত—ইহা নগেন্দ্র স্পষ্টচক্ষে দেখিতে পাইত। এই মিলনান্ত উপন্যাসের মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্ম "ট্রাজিডি"র ভাব আছে, যে জন্য বিষবৃক্ষকে ঠিক মিলনান্ত বলা চলে না।

কবির নিকট আমাদের একটি দাবী আছে। সেইটি প্রকাশ করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। কুন্দ দেবেন্দ্রাচরণকে মনের মধ্যে স্বামী বলিয়া না ভাবুক, তিন বৎসর যুবতীর অবস্থায় একত্র বসবাস করিয়া মনের মধ্যে কোন দাগ না পড়ুক, মৃত্যুতে একটু দুঃখ মনের মধ্যে নাই জাগুক, কিন্তু মৃত্যু সময়ে অন্ততঃ মন্ত্রের শক্তিও কি তাহার সেই দুর্ব্বল মনে এতটুকু স্পন্দন উঠাইতে পারিল না? হিন্দু গৃহের সতী-লক্ষ্মীর মেয়ে মরণের পথে একবার কি চকিতের মত সে শক্তির বিকাশ উপলব্ধি করিল না? আর কবি প্রাচ্যদেশবাসী হইয়া পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন—তাই কি স্ব-সৃষ্ট চরিত্রে জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে ঐ স্পন্দন-টুকু উঠাইলেন না? মৃত্যুর পরেও কি মন্ত্রশক্তির বিন্দু মাত্র স্পন্দন বুদ্বুদের মত ফুটিবে না? দর্শনশাস্ত্রের চক্ষে আমাদের মনে এই বিতর্ক উঠিয়াছে, কিন্তু এ সরস প্রবন্ধে সে নীরস দার্শনিক বিচার উঠাইতে ভরসা করিলাম না।

এত দিন অর্দ্ধস্ফুট থাকিয়া মরণের পথে কুন্দ-কুসুম আপনাকে ফুটাইয়া ভূমিশয্যায় ঝরিয়া পড়িল। আত্মহত্যা করিয়া কুন্দ যে কেবল আপনাকে ফুটাইয়া গেল তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি কার্য্য করিল। সূর্য্যমুখীকে শিক্ষা দিল, হীরাকে উন্মাদিনী করিল, দেবেন্দ্রের মৃত্যুশয্যা কণ্টকময় করিয়া দিয়া গেল। আর যাহা করিল—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কুন্দের আত্মহত্যার উজ্জ্বল দৃশ্য অনেক জ্ঞানহীনা রমণীর আত্মহত্যার প্রযোজক বলিয়া অনেকে কবিকে অনুযোগ করেন। কবি আপনার কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, ফলও যথোচিত দেখাইয়াছেন—তথাপি যদি কোন কুফল ফলে, তজ্জন্য কবি অনুযোগার্হ নন।

অভয়া।

[শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।]

(১)

ধনহীন হইলেও গ্রামের সকলেই ভূষণ চাটুজ্যেকে ভালবাসিত, ভক্তি করিত। তাই যে দিন তিনি তাঁহার পত্নী ও দ্বাদশ বর্ষের পুত্রটিকে অনাথ করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন, সে দিন সকলেই এই অসহায়, রোরুদ্যমান প্রাণী দুইটির শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিল। কেহ কেহ সদ্যবিধবা তুলসীকে বলিল,—"তোর ভাবনা কি, তোর শ্রীকণ্ঠ বেঁচে থাক,—তুই রাজার মা।" স্বামীহারা অভাগিনীর সমস্ত শোক-দুঃখের মধ্যে, ঐ একটি আশার প্রদীপ, জীবনের অবলম্বন, শোকে সান্ত্বনা! সে যদি দশের এক হইতে পারে, তবে সত্যই তুলসী রাজার মা!

স্বামীর শেষকার্য্য সমাধা করিয়া, শ্মশান হইতে ফিরিবার পথে, তুলসী ভাবিতেছিল, কেমন করিয়া শ্রীকণ্ঠকে সে মানুষ করিয়া তুলিবে। পথের ধারেই জমীদার রামহরি ঘোষালের প্রকাণ্ড বাড়ী। দ্বিধাহীন তুলসী পুত্রের হাত ধরিয়া, ফটক পার হইয়া, একেবারে কাছারী বাড়ীর

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নায়েব দীননাথ তখন কি একটা হিসাব ঘোষাল মহাশয়কে বুঝাইতেছিল। মুখ তুলিয়া ঘোষাল মহাশয় কহিলেন,—"কে এল ?"

দীননাথ উত্তর করিল—"আজ্ঞে চাটুজ্যে মশায়ের পরিবার, আর তাঁর ছেলে।"

ঘোষাল মহাশয় কহিলেন,—"কি রে, শ্রীকণ্ঠ, তোর বাবা—" সহসা তাঁহার দৃষ্টি তুলসীর উপর পড়িল, চমকিত হইয়া তিনি কহিলেন,—"কখন মারা গেল ?"

অশ্রুরুদ্ধ গাঢ় কণ্ঠে তুলসী কহিল,—"গেল রাত্রে।"

বৃদ্ধ সহানুভূতিসূচক স্বরে কহিলেন,—"কি ক'রবি, মা! অদৃষ্ট ছাড়া ত পথ নেই,—সকলই ভগবানের হাত।"

তুলসী আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া তাঁহার প্রসারিত পায়ের উপর জোর করিয়া, শ্রীকণ্ঠের মাথাটা মিলাইয়া দিয়া, মিনতিপূর্ণকণ্ঠে কহিল,—"আমার আপনার ব'লতে কেউ নেই,—আপনিই আমার বাপ! শ্রীকণ্ঠের ভার আপনাকে নিতে হবে।"

"ওর জন্য ভাবিস না তুই, আমাদের বেলা যেমন, শ্রীকণ্ঠও আমার কাছে তেমনি।" বেলা ঘোষাল মহাশয়ের একমাত্র পুত্র সতীশের ছয় বৎসরের কন্যা। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন,—"ভূষণ আমার যে উপকার ক'রেছে তা নিজের ছেলেতে করে না, সে যদি না থাকৃত ত পাঁচড়াহাট পরগণা ত গিছলো, তার ছেলের যদি কোন কষ্ট হয় ত সেটা আমায় আগে দেখতে হবে, এ যে আমার কর্ত্তব্য!"

নতমুখে তুলসী কহিল,—"ওকে আমি পড়াব।"

"তা বেশ ত, ভূষণের কাজকর্ম্ম হয়ে যা'ক, ওকে ইস্কুলে দেওয়া যা'বে।"

"ও ইস্কুলেই প'ড়ছে, তবে এখন মাইনে, বই, কাগজ, কলমের দামের জন্যই ভাবনা। এত দিন তিনি ছিলেন—" বাধা দিয়া ঘোষাল মহাশয় কহিলেন,—"তার জন্য ভাবিস না তুই, সে সব আমি দেব।"

তুলসী অকূলে কূল পাইল। বৃদ্ধের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া, অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে সে কহিল,—"আপনি আমার বাবা, আপনার ঋণ আমি শোধ ক'রতে পারব না।"

পুত্রের হাত ধরিয়া তুলসী বাড়ী ফিরিল।

(২)

আজ একটি বৎসর হইল, ঠিক এমনি দিনে ভূষণ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া তুলসী তাহার জীবনের একটি বৎসর কাটাইয়া দিল। তুলসী কেবলই ভাবিত, কত দিনে শ্রীকণ্ঠ উপার্জ্জনক্ষম হইয়া তাহাকে দুঃখ দারিদ্র্যতার হাত হইতে উদ্ধার করিবে। সে দিন দাওয়ায় বসিয়া তুলসী তাহার অতীত জীবনের কথা ভাবিতেছিল, এমন সময়ে শ্রীকণ্ঠ স্কুল হইতে আসিয়া, একেবারে মা'র সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া, একখানি ঝকঝকে নূতন পুস্তক বাহির করিয়া কহিল, "দেখ মা, আমি ভাল হয়ে ক্লাসে উঠেছি ব'লে, মাষ্টার মশায় এই বইখানা আমায় দিয়েছেন!" পুত্রকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া, সস্নেহে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া, আর্দ্রকণ্ঠে তুলসী কহিল, —"লক্ষ্মী বাপ আমার, মন দিয়ে লেখাপড়া শেখ, আরও কত কি পা'বে।" তুলসী ভাবিতেছিল—হায়, আজ যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন!

শ্রীকণ্ঠের সঙ্গী ছিল একটি গাভী, সে আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল, "অভয়া"। অভয়া অপেক্ষা প্রিয় বস্তু বুঝি তাহার কিছুই ছিল না; সে তাহার খেলার সাথী। গ্রামের কোন বালকের সহিত সে মিশিত না। নিজের লেখাপড়া করিয়া, যেটুকু অবসর সে পাইত, অভয়াকে আদর করিয়া, তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়া, সে সময়টুকু কাটাইয়া দিত। ভোরে উঠিয়াই সে এই জন্তুটির পরিচর্য্যায় লাগিয়া যাইত, তাহাকে স্নানাহার করাইয়া, তবে সে নিশ্চিন্ত মনে নিজের পাঠ অভ্যাস করিতে বসিত। তার পর স্কুলে যাইত। যথা সময়ে স্কুল হইতে আসিয়া, অভয়াকে লইয়া মাঠে বেড়াইতে যাইত। সেখানে দু'জনে কত রকমের খেলা হইত, কখন অভয়া সিং নাড়িয়া শ্রীকণ্ঠকে ভয় দেখাইত, কখন শ্রীকণ্ঠ তাহার গলা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িত, কখন কচি কচি ঘাস তুলিয়া তাহাকে খাওয়াইত। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দুই জনে এইরূপ খেলা চলিত, তার পর অভয়াকে লইয়া ক্লান্তদেহে শ্রীকণ্ঠ বাড়ী ফিরিত।

কখন কখন অভয়াকে নদীর ধারে ছাড়িয়া দিয়া, বট গাছের শিকড়ে বসিয়া শ্রীকণ্ঠ বাঁশী বাজাইত। এই

অজ্ঞ বাদকের তানলয়হীন অনর্গল বংশীধ্বনি অভয়া নিবিষ্ট চিত্তে শুনিত। অভয়াকে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, শ্রীকণ্ঠ দ্বিগুণ উৎসাহে বাঁশীতে ফুঁ দিত। অষ্ট-প্রহর এক সঙ্গে থাকিয়া, শ্রীকণ্ঠ এমনি অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, একদণ্ড অভয়াকে না দেখিলে, সে থাকিতে পারিত না। অভয়াকে শ্রীকণ্ঠ প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। দত্তপুর গ্রামে, এমন লোক খুব কম ছিল, যাহারা শ্রীকণ্ঠের অভয়াকে চিনিত না।

(৩)

"মা, আমার অভয়া!" বিদ্যালয় হইতে আসিয়া, পাঠ্যপুস্তকগুলি যথাস্থানে রাখিয়া, শ্রীকণ্ঠ দেখিল, প্রাঙ্গণে যে স্থানে অভয়া বাঁধা থাকিত, সেখানে অভয়া নাই। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, আমার অভয়া?" চরকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে তুলসী কহিল,—"কি জানি, কোথাও বেড়াতে গেছে বোধ হয়।" আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া, শঙ্কিত শ্রীকণ্ঠ অভয়ার অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। সারা গ্রাম তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও শ্রীকণ্ঠ অভয়াকে পাইল না। অর্দ্ধ রাত্রে নিরাশ হৃদয়ে সে বাড়ী ফিরিল। তুলসী জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ রে, অভয়া কোথা?"

"কি জানি, চারিদিক খুঁজেছি, কোথাও দেখতে পেলাম না।"

সে দিন শ্রীকণ্ঠ নামমাত্র আহারে বসিল, তাহার কিছুই ভাল লাগিল না। শয্যায় পড়িয়া সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তাহার অভয়া কোথায় গেল? অনেক ভাবিয়াও সে কিছু স্থির করিতে পারিল না। শয্যা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে শ্রীকণ্ঠ বাটীর বাহির হইয়া পড়িল। জ্যোৎস্না-ময়ী নিশীর শুভ্র আলোকে সে অভয়ার অনুসন্ধান করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি অনুসন্ধান করিয়া, ভোরের সময় ঘোষাল মহাশয়ের বাটী-সংলগ্ন উদ্যানে, শ্রীকণ্ঠ তাহার অভয়াকে পাইল। অভয়ার গলা ধরিয়া, তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, আদর করিয়া শ্রীকণ্ঠ কহিল,—"কাল থেকে কোথায় গিছলি, অভয়া! না ব'লে এমন করে পালিয়ে আসতে আছে! ছিঃ মা! দেখ দেখি, কাল হ'তে আমি খুঁজে খুঁজে সারা হচ্ছি!" অভয়া বোধ করি তাহার কথাগুলি বুঝিতে পারিল। সে নিজের মাথাটি শ্রীকণ্ঠের কাঁধের পাশ দিয়া, তাহার পিঠের উপর রাখিল। শ্রীকণ্ঠ নানা রকমে অভয়াকে আদর করিয়া কহিল,—"চ অভয়া, বাড়ী যাই, তোর দিদিমা কত ভাবছে!" অভয়াকে শ্রীকণ্ঠ মায়ের মত ভালবাসিত, তাই তুলসী তাহার সহিত নাত্‌নি সম্পর্ক পাতাইয়াছিল।

অভয়াকে লইয়া শ্রীকণ্ঠ বাড়ী ফিরিল। সকালে উঠিয়া শ্রীকণ্ঠকে না দেখিতে পাইয়া, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে তুলসী তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে বাড়ী আসিলে তিরস্কারের স্বরে তুলসী কহিল,—"হাঁ রে শ্রীকণ্ঠ,না ব'লে রাত্তিরে উঠে কোথায় গিছলি?"

"অভয়াকে খুঁজতে।"

"তা সকালে গেলেই হ'ত; আমি ভেবে মরি।"

শ্রীকণ্ঠ কোন উত্তর না দিয়া পাঠ্যপুস্তক লইয়া পড়িতে বসিল।

তুলসী কহিল,—"শ্রীকণ্ঠ,যা না, একবার তোর ঘোষাল দাদুর সঙ্গে দেখা করে আয় না, তিনি আজ তির্থী করতে যাচ্ছেন।"

ঘোষাল মহাশয় আজ তীর্থদর্শনেচ্ছায় দত্তপুর হইতে রওনা হইবেন। শ্রীকণ্ঠ কখনও জমিদার-বাড়ী যাইত না, কি জানি গরীব বলিয়া যদি কেহ অশ্রদ্ধা করে! তাই মাতার অনুরোধে সে আজও ঘোষাল মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেল না। পথে ঘাটে প্রায়ই ঘোষাল মহাশয়ের সহিত শ্রীকণ্ঠের সাক্ষাৎ হইত, তিনি অনেকবার এই বালকটিকে বাড়ী লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু একদিনও কৃতকার্য্য হন নাই। এই বালক যেমন অসহায়, তেমনই অভিমানী ছিল।

এখন হইতে অভয়া শ্রীকণ্ঠকে লইয়া প্রত্যহই ঘোষাল-দের বাগানে যাইত, এতদিন শ্রীকণ্ঠ অভয়াকে বেড়াইতে লইয়া যাইত, এখন অভয়া শ্রীকণ্ঠকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইত। সে কোন দিনই অভয়াকে অন্য দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিত না, ইহা তাহার একটা খেয়াল বলিয়াই সে ধরিয়া লইয়াছিল। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা ঘোষালদের বাগানে অভয়াকে ছাড়িয়া দিয়া শ্রীকণ্ঠ একটা

বড় অর্জ্জুনগাছের তলায় বসিয়া বাঁশীতে ফুঁ দিত। কিছুক্ষণ পরে বাগানের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া, অভয়া ফিরিয়া আসিলে, সে তাহাকে লইয়া বাড়ী ফিরিত। এমনই ভাবে অভয়ার সঙ্গে খেলা করিয়া, আর পুস্তক পাঠ করিয়া শ্রীকণ্ঠের দিনগুলি বেশ কাটিতেছিল।

প্রতি দিনের ন্যায় সেদিনও শ্রীকণ্ঠ অভয়াকে ঘোষালদের বাগানে ছাড়িয়া, অর্জ্জুনের তলায় বসিয়া বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু অভয়া ফিরিল না। অভয়া যাহাতে শুনিতে পায়, এই ইচ্ছায় সে পূর্ব্বাপেক্ষা জোরে বাঁশীতে ফুঁ দিল। আরও কিছুক্ষণ অতীত হইয়া গেল, কিন্তু অভয়ার দেখা নাই। উদ্বিগ্ন শ্রীকণ্ঠ বাঁশী বন্ধ করিয়া উঠিল, বাগানের সরু পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া শ্রীকণ্ঠ দাঁড়াইল, বিস্মিতনেত্রে দেখিল, অদূরে তাহার অভয়া দাঁড়াইয়া, আর তাহার নিকট উহারা কে? দ্রুতপদে শ্রীকণ্ঠ অগ্রসর হইল, নিকটে গিয়া দেখিল —অভয়ার কাছে দাঁড়াইয়া—একটি নয় বৎসরের সুন্দর মেয়ে আর এক বৃদ্ধা।

বালিকা যাহা দিয়াছে, অভয়া তাহাই আহার করিতেছে, আর বিস্মিতনেত্রে বালিকা দেখিতেছে, এবং মাঝে মাঝে সাদরে তাহার গলায় হাত বুলাইতেছে। এই অপরিচিতা অভয়াকে আদর করিতেছে দেখিয়া, শ্রীকণ্ঠ মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল, তাহার ভালবাসার জিনিসকে এ আদর করিবার কে! বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে শ্রীকণ্ঠ ডাকিল,—"অভয়া!"

আহার্য্য ফেলিয়া চকিত অভয়া একবার বালিকার প্রতি, একবার শ্রীকণ্ঠের প্রতি চাহিল, তার পর অপরাধিটির মত ধীরে ধীরে শ্রীকণ্ঠের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। অভুক্ত অভয়া শ্রীকণ্ঠের পাশে গিয়া দাঁড়াইল দেখিয়া, বালিকা দুঃখিত ভাবে কহিল,—"এ গরুটা বুঝি তোমার?"

বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া বিরক্ত শ্রীকণ্ঠ কহিল, —"হ্যাঁ।"

উৎসুক ভাবে বালিকা কহিল,—"কোথা থেকে এনেছ?"

শ্রীকণ্ঠ কহিল,—"ও আমাদের গাইয়ের বাচ্ছা।"

"আমায় ওটা দেবে, আবার বাচ্ছা হলে, তুমি সেটাকে পুষ তখন।"

অবজ্ঞার সহিত শ্রীকণ্ঠ কহিল,—"হাঁ, তোমাকে আমি গরুটা দিয়ে, আবার কবে বাচ্ছা হ'বে, সেই ভরসায় বসে থাকি আর কি!" একবার বালিকার দিকে চাহিয়া, অভয়াকে লইয়া শ্রীকণ্ঠ অগ্রসর হইল।

মুখ বিকৃত করিয়া বৃদ্ধা কহিল,—"আ মর, দেমাকে চোখে দেখতে পান না, তবু যদি এক মুঠো খাবার ঠিক থাকৃত! চ বেলা।"

বর্ষীয়সী ঘোষাল মহাশয়ের বাটী অভিমুখে অগ্রসর হইল। বেলা কিন্তু বৃদ্ধার কথা কানেও তুলিল না, সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে অভয়ার প্রতি চাহিয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। অগত্যা বৃদ্ধাকেও বেলার সহিত চলিতে হইল, কিন্তু এই ধৃষ্ট ছেলেটার ব্যবহারে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল।

শ্রীকণ্ঠ উদ্যানের ফটক অতিক্রম করিয়া, বাটীর পথ ধরিল। বেলা একদৃষ্টে অভয়ার দিকে চাহিয়া ফটক ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যখন শ্রীকণ্ঠ ও অভয়া চক্ষের অন্তরাল হইল, তখন সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, —"বেশ গরুটি, না কালির মা?"

বিরক্ত হইয়া কালীর মা কহিল,—"হাঁ বেশ গরু, এখন বাড়ী চল, বাপু।"

"আমি ঐ রকম একটা গরু পুষব,—ওইটেই।"

"হ্যাঁ, ওই গরুটা ও তোকে দিলে, আর তুইও পুষলি, চ বাড়ী চ, সেখানে গিয়ে পরামর্শ করিস এখন।" বেলাকে লইয়া কালীর মা বাড়ী ফিরিল।

পথে চলিতে চলিতে শ্রীকণ্ঠ ভাবিতে লাগিল, এ মেয়েটি কে, কেনই বা সে তাহার অভয়াকে চায়! অভয়া কেন যে এই বাগানে আসে, এখন শ্রীকণ্ঠ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল,—"আর অভয়াকে লইয়া ঘোষালদের বাগানে বেড়াইতে যাইবে না, কাল হইতে সে অভয়াকে লইয়া গ্রামের বাহিরে বেড়াইতে যাইবে; যেখানে জনসমাগম নাই, এমন স্থানে সে অভয়াকে লইয়া যাইবে, যেখানে আর কেহ অভয়াকে আদর করিতে

হাসিবে না। তাহাকে আদর যত্ন করিবার অধিকার সে আর কাহাকেও দিবে না।" ভাবিতে ভাবিতে শ্রীকণ্ঠ বাড়ী পৌছিল। সেদিন আর তাহার পড়া হইল না, অভয়াকে মৃদু তিরস্কার ও আদর যত্ন করিতেই, তাহার সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। রাত্রে অভয়াকে যথাস্থানে বাঁধিয়া, তাহারই কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্রীকণ্ঠ নিদ্রা গেল।

(৪)

বাড়ী ফিরিয়া বেলা বায়না ধরিল,—"আমি সেই গরুটা পুষব।"

হাসিতে হাসিতে সতীশ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন্ গরুটা রে?"

"সেই যে আমাদের বাগানে রোজ আসে। সে একটা ছেলের গরু, কালির মা জানে।" বেলা কালির মার দিকে চাহিল।

সতীশ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই ক্রুদ্ধা কালির মা কহিল,—"ওই তুলসীর ছেলের গরু। আহা, গরুটা খাচ্ছিল, খেতে দিলে না। দিদিমণি জিগ্‌গেস করলে, তা দাঁত মুখ খিচিয়ে বলা হল, এ গরু আমি কাউকে দেব না।"

সতীশ কহিল,—"শ্রীকণ্ঠর অভয়া বুঝি?"

"হাঁ, অভয়া,—আমি অভয়া নেব বাবা।"

সতীশ কহিল,—"ওর চেয়ে ভাল গরু আমি তোকে দেব, তুই পুষিস বেলা।"

"না, আমি অভয়া নেব।" বালিকা কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ বাধাইয়া তুলিল। সতীশ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল,—"আচ্ছা, আমি তোকে অভয়া দেব তখন।"

"কখন দেবে?"

"কাল সকালে দরওয়ান গিয়ে নিয়ে আসবে।" আনন্দিত বেলা ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর, অভয়ার আগমন-সংবাদ ঘোষণা করিতে গেল।

ইজি চেয়ারে বসিয়া সতীশ ভাবিতে লাগিল, শ্রীকণ্ঠ কি অভয়াকে ছাড়িয়া দিবে? তার পর ভাবিল, সে দিবে কি না তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? আমার প্রয়োজন, সে স্বেচ্ছায় না দিলে, জোর করিয়া লইয়া আসিব। তাহাদেরই অন্নে প্রতিপালিত একটা দরিদ্র বালক, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে! সতীশ ডাকিল, "ভজন।"

কানপুর নিবাসী বলিষ্ঠকায় ভজন সতীশের সম্মুখে আসিয়া কহিল,—"কি আজ্ঞে হুজুর?"

সতীশ কহিল,—"দেখ্ কাল সকালে ভূষণবাবুর বাড়ী যাবি, তাঁ'র ছেলের একটা গরু আছে, সেটা নিয়ে আসবি, বলবি,—জমিদারবাবুর হুকুম।"

"যো হুকুম হুজুর।"

ভজনের দিকে চাহিয়া সতীশ কহিল,—"কাল গরু আনা চাই।" সতীশ অন্দরে প্রবেশ করিল।

প্রাতে ভজন তাহার বাঁশের লাঠি কাঁধে ফেলিয়া ভূষণ চাটুজ্যের বাটী অভিমুখে রওনা হইল।

(৫)

ঘুম হইতে উঠিয়া শ্রীকণ্ঠ দেখিল, অভয়ার গলার দড়ি ধরিয়া প্রাঙ্গণের উপর একটা লোক বসিয়া আছে। ভজন বহু পূর্ব্বে অভয়াকে লইয়া যাইত, কিন্তু শ্রীকণ্ঠ উঠিলে তাহাকে বলিয়াই লইয়া যাইবে, এই ভাবিয়া, সে এতক্ষণ বসিয়া আছে। শ্রীকণ্ঠকে দেখিয়া ভজন কহিল,—"বেলা দিদি এ গরুটা পছন্দ করিয়েছে, খোকা,—হামি উসকো লে যাইবে।" অভয়াকে লইয়া ভজন দ্বার অতিক্রম করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

শ্রীকণ্ঠ ডাকিল,—মা।

তুলসী তখন পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া সবেমাত্র বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছিল। জলপূর্ণ কলসী দাওয়ায় রাখিয়া কহিল,—"কেন?"

তুলসীকে জড়াইয়া ধরিয়া সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—"ও মা, অভয়াকে ছেড়ে আমি বাঁচব না, ওকে নিয়ে যেতে বারণ কর মা।" অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে শ্রীকণ্ঠ জননীর মুখের দিকে চাহিল। তুলসী স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, স্নান করিতে যাইবার পূর্ব্বে সে ভজনকে কাতরভাবে নিবেদন করিয়াছিল যে, সে যেন অভয়াকে না লইয়া যায়। কিন্তু তাহার আসিবার পূর্ব্বেই ভজন অভয়াকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। তুলসীকে সজোরে নাড়া দিয়া ক্রন্দনজড়িত উচ্চ কণ্ঠে শ্রীকণ্ঠ আবার কহিল,—"ও মা, অভয়াকে ফিরিয়ে আনতে বল না, তোমার পায়ে পড়ি, মা।" সে মাটীতে

লুটাইয়া পড়িয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তুলসী তাহাকে অনেক বুঝাইল, সান্ত্বনা দিল, কিন্তু শ্রীকণ্ঠের ক্রন্দন কিছুতেই থামিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত শ্রীকণ্ঠ ঘুমাইয়া পড়িল। তুলসী তাহাকে বুকে করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় শ্রীকণ্ঠের প্রবল জ্বর দেখা দিল, রক্তবর্ণ চক্ষে সে তুলসীর দিকে চাহিয়া, করুণ কণ্ঠে কহিল,—"অভয়াকে ছেড়ে আমি বাঁচব না মা, তোমার পায়ে পড়ি, তা'কে এনে দাও।"

তুলসী কি উত্তর দিবে! প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারের বিরুদ্ধে ত তাহার দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই! সে দুর্ব্বল, অর্থহীন, নিঃসহায়। বৃদ্ধ জমিদার রামহরি ঘোষালের কথা তুলসীর মনে পড়িল। আজ যদি তিনি এখানে থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাহার উপর এ অত্যাচার হইত না। এখনও যদি তিনি ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে সে অভয়াকে লইয়া আসিতে পারে। সেই পর-দুঃখ-কাতর বৃদ্ধ কি এরই মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন! তুলসীর অদৃষ্ট কি এতই সুপ্রসন্ন হইবে! অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে সে পুত্রের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কম্পিত হস্তখানি তাহার মস্তকে বুলাইতে লাগিল। জ্বরঘোরে শ্রীকণ্ঠ এক এক বার চীৎকার করিতে লাগিল,—"মা, আমার অভয়া ?"

আশঙ্কায়, উৎকণ্ঠায় তুলসী বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিল। ঊষা গ্রামখানিকে সোনালী রঙে রাঙাইয়া, সূর্য্যদেব দেখা দিলেন। কাল হইতে মাতা পুত্র উপবাসি। তার পর সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় তুলসীর শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, তবু সে নিজের সমস্ত কষ্ট তুচ্ছ করিয়া, পুত্রের শয্যা পার্শ্বে বসিয়া রহিল। অনাথার পুত্রের জন্য কেই বা ঔষধ আনিবে, কেই বা পথ্য আনিবে! যথারীতি চিকিৎসাভাবে. শ্রীকণ্ঠের জ্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিনা ঔষধে তিনটি দিন কাটিল; চতুর্থ দিনে পুত্রের অবস্থা দেখিয়া তুলসী আর থাকিতে পারিল না। শ্রীকণ্ঠের অন্নপ্রাশনের সময় বড় সাধ করিয়া পিতা পুত্রকে এক ছড়া রূপার বোর দিয়াছিলেন। এতদিন তুলসী তাহা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল। আজ পুত্রের অবস্থা দেখিয়া, সে তাহা বন্ধক রাখিয়া গ্রামের মধু ডাক্তারকে লইয়া আসিল। রোগী দেখিয়া তিনি ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—"কোন ভয় নাই, রোগী শীঘ্রই সুস্থ হইবে।"

সমস্ত কাজ ফেলিয়া তুলসী পুত্রের শিয়রে বসিয়া তাহাকে যথারীতি ঔষধ দিতে লাগিল। ঔষধ সেবন করিয়া শ্রীকণ্ঠের জ্বর কিছু উপশম হইল। সে গাঢ় নিদ্রামগ্ন হইল। নিদ্রিত পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া তুলসী তেত্রিশ কোটী দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল,—"ঠাকুর, শ্রীকণ্ঠকে আমার ভাল করে দাও। যদি দিয়েছই, তবে, ওগো দয়াময়, ওগো দীনের ঠাকুর, সেটুকু আর কেড়ে নিও না! তা'কে রেখে যেন আমি যেতে পারি, ঠাকুর!" তাহার দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারে অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

ঠিক এমনই সময় কে ডাকিল,—"তুলসী, বাড়ী আছিস্ মা!"

(৬)

আজ বৃদ্ধ জমিদার রামহরি ঘোষাল—মথুরা, বৃন্দাবন, প্রভৃতি তীর্থ পরিদর্শন করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। দাস-দাসী-গণ দ্রব্যাদি নামাইতে ব্যস্ত। ঘোষাল মহাশয় গাড়ী হইতে নামিতেই বেলা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল,—"দাদু, দেখবে এস, আমি কেমন একটা গরু পুষেছি!"

"কই দেখি।"

"এস না দেখাই তোমায়।" বেলা ঠাকুরদাদার হাত ধরিয়া যেখানে অভয়া বাঁধা ছিল, সেই স্থানে লইয়া চলিল।

"এই দেখ আমার গরু, কেমন সুন্দর, নয় দাদু ?"

বিস্মিত ঘোষাল মহাশয় দেখিলেন, গরুটি শ্রীকণ্ঠের অভয়া। তিনি কহিলেন,—"অভয়াকে তুই কোথায় পেলি, শ্রীকণ্ঠ বুঝি এখানে বেঁধে গেছে ?"

"হাঁ, সে দিতেই চায় না, তা আবার বেঁধে যা'বে। বাবা জোর করে কেড়ে এনেছেন। তার গরুটা বড্ড পাজী, চার দিন এসেছে,তা একটু জল পর্য্যন্ত খায় নি, দাদু, এমনি একগুঁয়ে গরুটা! কিন্তু দেখতে বেশ।"

ঘোষাল মহাশয় বুঝিলেন, কেন এই জন্তুটি আজ চার দিন জলস্পর্শ করে নাই। শ্রীকণ্ঠ অভয়াকে যেমন ভাল-বাসিত, তেমন বুঝি আর কাহাকেও বাসিত না। ঘোষাল

মহাশয় গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—"গরুটা তার ফিরিয়ে দাও,দিদিমণি! আহা, দেখ দেখি চার দিন থেকে খায় নি, হয় ত শ্রীকণ্ঠও এ ক'দিন খায় নি, কাঁদছে। দু'জনের কত কষ্ট হচ্ছে! চল ভাই, তার গরু তাকে দিয়ে আসি।"

দাদামহের কথায় বেলার মুখ শুকাইয়া গেল। সে শুষ্ক কণ্ঠে কহিল,—"তাকে না দিয়ে এলে, গরুটা না খেয়ে মরে যাবে, না দাদু?"

"হাঁ দিদি, আর দু'দিন না খেতে পেলেই মরে যাবে। তুই কোথাও গেলে তোর বাবার জন্যে, মা'র জন্যে, আমার জন্যে যেমন মন কেমন করে, কাঁদিস—খাস্ না, তেমনি গরুটারও ত হয়, ভাই!"

বেলার মনে পড়িল, সে একবার মামার বাড়ী গিয়াছিল, কি কষ্টেই যে দুইটি দিন সে মামার বাড়ী কাটাইয়াছিল, তাহা সেই জানে। আহা, গরুটারও ত তেমনি কষ্ট হইতেছে! সে ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল,—"চল, দাদু, গরুটা এখনি তাকে দিয়ে আসি।" চল ভাই, লক্ষ্মী দিদি আমার।

ঘোষাল মহাশয় ধূলা পায়েই অভয়াকে লইয়া, ভূষণ চাটুজ্যের বাটী অভিমুখে চলিলেন। বেলা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

পিতা অভয়াকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া, সতীশ কহিল,—"আপনি এই এলেন, একটু জিরুন, গরুটা চাটুজ্যে মহাশয়ের বাড়ী আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ঘোষাল মহাশয় কহিলেন,—"না, আমাকেই যেতে হবে।" তিনি অগ্রসর হইলেন।

শ্রীকণ্ঠদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া ঘোষাল মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। কাহারও সাড়া শব্দ নাই,—তবে কি তাহার পালিত প্রিয় জন্তুটির জন্য বালক—তাঁহার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল, তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না। আহা. সেই যে বিধবার জীবনের একমাত্র অবলম্বন! ঘোষাল মহাশয় জানিতেন,—পুত্রের এতটুকু বিপদ পিতা মাতার প্রাণে কত বড় আশঙ্কার সৃষ্টি করে। অনেকগুলি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া, দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া তাঁহারও ওই একমাত্র পুত্র সতীশ বাঁচিয়াছিল। প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া শঙ্কিত হৃদয়ে ঘোষাল মহাশয় ডাকিলেন,—"তুলসী, বাড়ী আছিস মা!"

সহসা তুলসীর চিন্তা স্রোতে বাধা পড়িল। যে ডাকিল, তাহার কণ্ঠস্বর তুলসীর পরিচিত, দেবতার আশীর্ব্বাদের মতই আশাপ্রদ! সে দেখিল, ঘোষাল মশাই একেবারে উঠানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আর পশ্চাতে তাঁহার নাতনী বেলা। তুলসীকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোর শ্রীকণ্ঠ?"

আজ কয়দিন তুলসী কাহারও নিকট হইতে একটা শুষ্ক সহানুভূতি পর্য্যন্ত পায় নাই। আজ সহসা ঘোষাল মহাশয় উপযাচক হইয়া, তাহার বড় আদরের শ্রীকণ্ঠের কথা জিজ্ঞাসা করাতে, তাহার সযত্ন রুদ্ধ অশ্রুরাশি, শ্রাবণের বারিধারার মত ঝরিয়া পড়িল। ক্রন্দনরুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল,—"বাছা আমার যায় যায় হয়েছে, বাবা,—একবার দেখবে এস!" ঘোষাল মহাশয় রুদ্ধনিঃশ্বাসে দাওয়ায় উঠিলেন। রোরুদ্যমানা তুলসী তাঁহাকে লইয়া শ্রীকণ্ঠের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ একেবারে রুগ্ন শ্রীকণ্ঠের শয্যায় গিয়া বসিয়া পড়িলেন। শ্রীকণ্ঠ তখন অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। ঘোষাল মহাশয় তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কহিলেন,—"কোন ভয় নাই,—শীগ্ গীর আরাম হয়ে যাবে।" তার পর বেলার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"দেখ দেখি, ভাই,—এইটুকু মেয়েটা মিছে বায়না ক'রে কি কাণ্ডটা ক'রে ফেলেছ!" তার পর বলিলেন,—"তুলসী, তোর শ্রীকণ্ঠের অভয়া বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—আমি নিজেই তা'র গলার দড়িটা ধ'রে নিয়ে এসেছি।"

আশায়, আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় তুলসীর হৃদয়টা ভরিয়া গেল। সে ঘোষাল মহাশয়ের পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া কহিল,—"আপনি দেবতা!"

গোলমালে শ্রীকণ্ঠের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শিয়রে ঘোষাল মহাশয়কে দেখিয়া সে উঠিতে চেষ্টা করিল। তিনি তাহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিয়া কহিলেন,—"এখন উঠ না, দাদা, আর দু'টো দিন পরে খুব দৌড়োদৌড়ী ক'র, কেউ বারণ ক'রবে না।"

শয্যায় শুইয়া শ্রীকণ্ঠ কহিল,—"মা, আমার অভয়া!"

অভয়া এতক্ষণ চক্ষু বুজিয়া বাহিরে নির্জ্জীবের মত একধারে দাঁড়াইয়াছিল। শ্রীকণ্ঠের স্বর তাহার কানে প্রবেশ করিতেই, সে একেবারে তাহার শয্যার নিকট আসিয়া, শ্রীকণ্ঠের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

শ্রীকণ্ঠ তাহার রোগকম্পিত হস্তে একবার অভয়ার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া, তাহাকে ছাড়িয়া দিল। তার পর একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া রহিল।

শোপেনহাউরের রমণী-বিদ্বেষ।

[শ্রীমতী বিভাবতী দেবী।]

কে জানে কবে কোন্ "দার্শনিক" শোপেনহাউর জার্ম্মাণী দেশে বসিয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রমণী জাতি সম্বন্ধে বিষ-উদ্গীরণ করিয়াছেন। শিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচি সম্পাদকের 'অর্চ্চনা'র মত পত্রিকায় তাহা না উদ্ধৃত করিলে পূজার আমোদ কতটুকু হ্রাস হইত, তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত। সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন, তাহা তাঁহার গল্প ও প্রবন্ধ হইতে বুঝা যায়। তবে এ বিষাক্ত কুসুমে তিনি অর্চ্চনার ডালি নষ্ট করিলেন কেন? যাহাদের মত বিভিন্ন, তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় মহত্ব থাকে, কিন্তু শত্রুপক্ষের প্রতি সে শ্রদ্ধা, যদি মিত্র পক্ষের প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে, তাহা হইলে মহত্বটুকু অনাবিল হয় না। দুর্ব্বল-চিত্ত কোনও যুবক বা যুবতী মস্ত বড় জার্ম্মাণের নামে আস্থা রাখিয়া যদি শোপেনহাউরের মতগুলা লইয়া রমণী-সমাজের উপর—তাহাদের মাতা, ভগ্নী ও কন্যার সমাজের উপর—শ্রদ্ধা বা স্নেহ হারায়, তাহা হইলে সমাজ, অন্ততঃ আমাদের বাঙ্গালী সমাজ, উচ্ছৃঙ্খলতায় পূর্ণ হইবে। সামাজিক জীবনের মধুটুকুও থাকিবে না। নাস্তিকদেরও শুনিয়াছি অনেক উত্তম যুক্তি আছে। কিন্তু দুর্ব্বল-চিত্ত লোকের আস্তিক্য বুদ্ধির হানি হইবার ভয়ে সেগুলার আলোচনা অনর্থকর বিবেচিত হয়।

প্রথম কথা বলি, "দার্শনিক" মহাশয়ের রমণী-সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান—পাশ্চাত্য রমণী দর্শনে। পাশ্চাত্য সমাজ আদর্শ না হইলেও সেখানকার সকল রমণীর সহজাত বৃত্তি —যেগুলা শোপেনহাউর বর্ণনা করিয়াছেন, সেইগুলা— এ কথা সত্য হইতে পারে না। এই যুদ্ধের সময়ই দেখুন। পুরুষে মারিয়াছে—ধ্বংস করিয়াছে—যমদূতের কার্য্য করিয়াছে, পাশ্চাত্য রমণী নার্সরূপে আরোগ্য করিয়াছে, শান্তি বিলাইয়াছে, মহাসমরের তীব্রতাটুকু মোলায়েম করিবার আয়োজন করিয়াছে। "কোনও গুরুতর মানসিক বা দৈহিক পরিশ্রমের জন্য নারীর সৃষ্টি হয় নাই।"—এ কথা পাশ্চাত্য রমণীদিগের সম্বন্ধে বলা বাতুলতা। এ মহাসমরে রমণী যাহা করিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। যেখানে নারী পুরুষের সহিত সমান শিক্ষা পাইয়াছে, সেখানে সে পশ্চাৎপদ হয় নাই। সকল জাতিই প্রায় স্ত্রীলোককে যত্নে রাখে বলিয়া তাহারা গুরুতর কার্য্যের অবসর পায় না। তাই পুরুষের মত রমণীর গুরুতর কার্য্যের শিক্ষা হয় নাই। ইহা হইতে কি সিদ্ধ হয় যে, তাহারা স্বভাবতঃ গুরুতর কার্য্য করিতে অপারগ?

এবার বলি ভারত-মহিলার কথা। গত বৎসর অর্চ্চনায় পড়িয়াছিলাম, মহাকবি কালিদাসের স্ত্রীচরিত্র অঙ্কনে রমণী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকটিত। আমরা এদেশে 'মা' বলিয়া যত শান্তি পাই, এত তৃপ্তি কোনও কথায় পাই না। আর আমরা রমণী, "মা" বলিয়া ডাকিলেও আমাদের প্রাণটা গলিয়া যায়। ঈশ্বরকে মাতৃ-সম্বোধন অপর জাতি বোধ হয় করে না, আমরাই করি। যে সব পুণ্যশ্লোক মুনি ঋষি সৃষ্টির আদি কারণকে রমণী বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সন্ধান পাইয়াছেন—শিবের সঙ্গে শক্তি, নারায়ণের সঙ্গে লক্ষ্মী—নারীকে এ সম্মান, এ উচ্চ স্থান দিয়া তাঁহারা স্ত্রী-চরিত্র কখনই হীন মনে করেন নাই। আমি তাঁহাদের ধারণার গুরুত্ব জার্ম্মাণ দার্শনিকের মতের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইলাম। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের মতের মূল্য অধিক, কি জার্ম্মাণ লেখকের মতের মূল্য অধিক, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ হইবে না।

"সে জীবনের পাপ ভার বহন করিতেছে…সন্তান পালনের দুঃখে এবং পুরুষের অধীনতায়" এবং পুরুষের অপেক্ষা অধিক মাত্রায় সুখ রমণীর নাই। ইহা তাঁহার মত। সুখভোগই যদি শ্রেষ্ঠতার কষ্টিপাথর হয়, তাহা হইলে সন্তান পালনের অপেক্ষা সুখ কোন্ কার্য্যে আছে তাহা জানি না, কারণ ছেলে যেদিন আধ আধ ভাষায় "মা" বলিয়া ডাকে, অঙ্গে অঙ্গে ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয়, তখন জননী যে সুখ পায়, সে সুখ পৃথিবীতে আর কেহ কোন উপায়ে

পাইতে পারে না। যে ব্যক্তি আতুরাশ্রমে পালিত না হইয়া গৃহে পালিত হইয়াছে, সে "মায়ের সুখ" নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং সে সুখ যে উচ্চদরের তাহা বুঝিয়াছে। সন্তান-পালন অর্থে সৃষ্টি-পালন। সৃষ্টি-পালনের ভার তো জগদীশ্বরের, সেই ভার তিনি আমাদের উপর দিয়াছেন কি আমাদের "পাপ-ভার বহন" করাইবার জন্য? নিজের সুখের চেষ্টায় সংসার ছাড়িয়া পুস্তক পাঠ করা এবং দর্শনের পুস্তক রচনা করা, পুণ্য-ভার বহন করা না কি? সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা, আপদ-বিপদ, বাধা-বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করা এবং সেই সংগ্রামে জয় লাভ করাই সাংসারিক সুখের প্রকৃষ্ট পন্থা। সন্তানপালনের দুঃখ না পাইলে কি পুত্র-মুখ দর্শনের সুখ পাওয়া যায়? শেষ রাত্রের গাঢ় অন্ধকারের পর অরুণোদয় হয় বলিয়াই অরুণ কিরণের অত শোভা। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার ভয়ে কৌমার্য্য অবলম্বন করা বা রুদ্ধ কক্ষে "দর্শন" চিন্তা করা, দুর্ব্বল-প্রকৃতির লক্ষণ। সে দৌর্ব্বল্য রমণী দেখায় না, সেটা দার্শনিকদের নিজস্ব। তাই জলে না নামিয়া তাঁহারা সাঁতার শিখেন, লোক-শিক্ষা দেন, মন্তব্য-প্রচার করেন।

তাহার পর পুরুষের অধীনতা। তাঁহার দেশে তো শুনিয়াছি এ অধীনতা নাই। আমাদের দেশে আছে। তিনি দার্শনিক, তিনি কি বিচার করিয়া দেখেন নাই, এই পুরুষের অধীনতার আসল অর্থ কি? যেখানে প্রকৃত অধীনতা আছে, স্বেচ্ছার আত্মসমর্পণ আছে—তাহা কি পুরুষের কাছে না প্রেমের কাছে? প্রেম যে ভগবানের গুণ—শোপেনহাউরের খৃষ্টানেরা বলেন। আমরা স্বামীর অধীনতা স্বীকার করি, প্রেম ও ভক্তিতে; পুত্রের অধীনতা স্বীকার করি, স্নেহ ও মমতার বশে। আমরা তো মনে করি, ইহাতে ভগবানের দয়া আমাদের উপর অধিক; কারণ কতকগুলা সদ্‌গুণ অত বিমল ভাবে আমাদের প্রাণে জাগিতে পারে, কর্ম্মফলে আমাদের প্রাণটা এমন উচ্চতা লাভ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভাবাবেশে আপনাকে নারী-কল্পনা করিয়াছিলেন। আর যাহার প্রাণ কোমল, সে সুখ ভোগ করিতে পারে না? শোপেনহাউর যশ লাভ করিয়া আপনার মাতা বা ভগ্নীকে যে সুখ দান করিয়াছিলেন, সে সুখ তিনি নিজে পান নাই, তাহা আমার রমণী-বুদ্ধিতে আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

"বেশ-বিন্যাস, নৃত্য প্রভৃতি তাহারই জীবনের চরম উদ্দেশ্য"—রমণী সম্বন্ধে এ কথা যিনি বলিতে পারেন, তিনি স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বাঙ্গালী পাঠককে এ কথা বুঝাইতে হইবে না। বিধবা জননী অনশনে, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া যে শান্ত-প্রাণে প্রাণাধিক পুত্রকে ভোজন করান ও সাজাইয়া রাখেন—তাহার কি তুলনা আছে? সাধ্বী স্ত্রী প্রত্যেক ভারতবাসীর ঘরে ঘরে নিজেকে যেরূপ স্বেচ্ছায় ও সুখে পোষাক পরিচ্ছদ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে, তাহা কে না দেখিয়াছে? কিন্তু তাহাতে তাহারা মোটে অসন্তুষ্ট হয় না, যতক্ষণ তাহারা পতি-পুত্রের মুখে প্রসন্নতা দেখিতে পায়।

স্ত্রীলোকের বুদ্ধি প্রখর হয় না, অন্ততঃ এ দেশে—কারণ তাহাদের বুদ্ধিকে প্রখর করিবার চেষ্টা করা হয় না। তবে ন্যায়পরতা, সাধুতা ও বিবেকানুবর্ত্তিতায় তাহারা পুরুষের পশ্চাৎবর্ত্তী—এ কথা কি সত্য? অন্যায় করে পুরুষ, অসাধুতা পুরুষে অধিক; বিবেকবুদ্ধি স্ত্রীলোকের ও পুরুষের সহজাত—অর্জ্জিত বুদ্ধির প্রখরতায় পুরুষ সেটাকে নষ্ট করে। নারী না কি মিথ্যা-সাক্ষ্য দেয়। এ কথা কই উকীল আত্মীয়দিগের নিকট তো শুনি নাই। জার্ম্মাণীর কথা জানি না। অন্যায়ের উল্টাটাই আমাদের সংস্কার; কারণ "আহা হা"-টা আমাদেরই ভাষা। মহাভারতের অন্যায়গুলা পুরুষের দ্বারাই হইয়াছিল। পুরুষ রাবণ সীতাদেবীকে বন্দিনী করিয়াছিল—রমণী মন্দোদরী "রাক্ষসী" হইয়াও ন্যায়পরতার বলে তাঁহার মুক্তির যুক্তি স্বামীকে দিয়াছিলেন। আগ্রার কেল্লায় পুত্র ঔরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, রমণী জাহানারা ভোগ-বিলাস, সুখ-ঐশ্বর্য্য উপেক্ষা করিয়া পিতৃ-কারাগারে দিনপাত করিয়াছিলেন। পুত্রেরা কিন্তু সাম্রাজ্য-লাভের চেষ্টায় লোকক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

স্ত্রীলোক পথের মাঝে স্ত্রীলোককে দেখিলে "অহি-নকুলবৎ পরস্পর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে"—ভারতবর্ষে এ সংবাদ বিস্ময় উৎপাদন করিবে মাত্র। পরদার অন্তরালে থাকিয়া অন্য মহিলাদের সঙ্গে মিশিবার জন্য আমরা কত ব্যগ্র হই, তাহার দৃষ্টান্তস্থল পল্লীগ্রামের নদীর ঘাট, থিয়েটারের মহিলাদের বসিবার স্থান, বারোয়ারীতলা প্রভৃতিও

চিকের ভিতরটা। আমাদের দিল্লী সহরে একটী 'পর্দ্দা-পার্ক' হইয়াছে। তাহাতে নানা জাতীয় রমণী সম্মিলিত হইয়া যত গল্প করে, পরস্পরের সঙ্গে বিনা পরিচয়ে যত মিশে, তত মেলা-মেশা পুরুষদের মধ্যে বিনা পরিচয়ে সম্ভবে না। আর অহি-নকুল সম্বন্ধ হইলে শাশুড়ী, ননদ, প্রভৃতি লইয়া একত্র বাস ও যৌথ সংসার হিন্দুর পক্ষে এত দিন ধরিয়া কি সম্ভবপর হইত? বাঙ্গালী রমণীদের পরস্পরের সখিত্বের জ্বালায়, তাহাদের "বেল-ফুল", "জুঁই-ফুল", "বকুল-ফুল", "দেখন-হাসি" পাতানর হুড়াহুড়িতে পূজা-পার্ব্বণের সময় বাঙ্গালী পুরুষদের ব্যস্ত-ত্রস্তও হইতে হয়।

নিম্নশ্রেণীর স্বজাতির প্রতি আমাদের ব্যবহার না কি নৃশংস এবং গর্ব্বিত! এ দেশের এক শ্রেণীর সাহেব পুরুষেরা দেশীয় পুরুষকে যত ঘৃণা করে, তাহাদের সঙ্গে যত নৃশংস ও গর্ব্বিত ব্যবহার করে, তাহাদের মেম সাহেবেরা দেশীয় রমণীর প্রতি তেমন নৃশংস বা গর্ব্বিত ব্যবহার করেন না। পুরুষ কুলির পুরুষ ইংরাজ পিলা ফাটায়, কিন্তু ইংরাজ মহিলা কুলি-রমণীর পিলা ফাটাইয়াছে, এ সংবাদ কোথাও পড়ি নাই। এখন দিল্লী রাজধানী। কত বড় বড় মেম দেখিয়াছি আমাদের বাটীর সম্মুখের রাস্তায় দেশীয় আয়াকে পার্শ্বে বসাইয়া মোটর ও বগীতে চড়িয়া যান। কোনও সাহেবকে তো খানসামা এমন কি 'বাবু' লইয়া অমন ভাবে যাইতে দেখি নাই। আমাদের তো কথা নাই। আমাদের দাসীকে বলি 'ঝি'—যাহার অর্থ কন্যা। আমাদের হিন্দু সমাজের জাতি-ভাগ রমণীদের মধ্যে কম। কেবল আহার্য্য বিষয়ে স্পর্শ দোষ আছে—কিন্তু অপর বিষয়ে সাম্য-ভাব। আমার পিত্রালয় যে গ্রামে—সে গ্রামে শতকরা ৭০ জন লোক মুসলমান। আমাদের অন্দরের মেয়ে-মজলিসে মুসলমান রমণীরা সমান ভাবে সুখ দুঃখের গল্প করিয়া যায়—আমি তো শৈশবাবধি কোনও পক্ষের মুখে নৃশংসতা বা গর্ব্বের লক্ষণ দেখি না। অবশ্য এক একজন গর্ব্বিতা থাকে—সে সকলেরই নিকট গর্ব্বিতা। নৃশংস রমণী নাই বলিলে পক্ষপাত-দুষ্ট হইব। কিন্তু ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হয় যে, নৃশংসতার দৃষ্টান্ত রমণী-সমাজে খুব বিরল।

স্বভাবতঃ পুরুষ সুন্দর কি রমণী সুন্দর, এ কূট তর্ক অনাবশ্যক। কিন্তু যে কারণে দার্শনিক বলিয়াছেন যে, পুরুষ স্ত্রীলোককে সুন্দর দেখে, সে কারণটা অলীক। মাতৃমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ দেবীদের কত সুন্দরী দেখিয়াছেন—কত স্তব-রচনা করিয়া গিয়াছেন। ছোট ছোট কুমারী কন্যাদের—পুরুষেরা কত সুন্দরী দেখে, কত আদর করে। এ সৌন্দর্য্য-দর্শনের মূলে কত পবিত্রতা আছে, তাহা দার্শনিক সত্যই যদি না বুঝিয়া থাকেন তো তিনি করুণার পাত্র।

আমি বলি না সকল রমণী আদর্শ চরিত্রা। তাহাদের উন্নতির সহিত পুরুষের উন্নতি একই সূত্রে গ্রথিত। তাহাদের ভিতর সদ্‌গুণ ফুটাইয়া তুলিলে ফুটিতে পারে। তাহাদের অনেক সহজাত বৃত্তি আছে, যাহা পুরুষ অপেক্ষা সাধু। শিক্ষার অভাবে আমাদের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারের অভাব নাই। তবে তাহারা মন্দ সংস্কার লইয়াই জন্মায়, তাহারা সদ্‌গুণের আধার হইবার অনুপযুক্ত, এ মত যে দার্শনিকের, 'অর্চ্চনা'র তাহার শ্রদ্ধা না দেখাইলেই ভাল হইত। *

---

* বলা বাহুল্য, স্ত্রীজাতির প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিবার জন্য 'অর্চ্চনা'য় ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। শোপেনহাউর তাঁহার দেশের শিক্ষিতা রমণী দেখিয়াই ঐ সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ঐরূপ ধর্ম্মবর্জ্জিত পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষিত ও গঠিত হইলে, আমাদের মহিলা-সমাজ সম্বন্ধেও ঐ সকল সার্থক হইতে পারে। ঐ বিপদ নিরাকরণের জন্যই এবং ঐরূপ শিক্ষার কুফল দর্শাইবার জন্যই আমরা ঐ প্রবন্ধটী পত্রস্থ করিয়াছিলাম। আমাদের মহিলাদের ঐরূপ কুশিক্ষা দিবার জন্য এক শ্রেণীর সভ্য বাঙ্গালী বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন না কি?

এই স্থলে ঋষিদিগের দেবী-কল্পনা সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রধান তন্ত্রগ্রন্থে—মহানির্ব্বাণতন্ত্রে শ্রীসদাশিব দেবীকে ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—"ব্রহ্মোপদেশে লোকে যেমন সর্ব্বপাতক হইতে বিমুক্ত হয়—হে দেবি, তোমার সাধনায় লোকে তেমনি ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।" তাহাতে দেবী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন—"কেন তা হয়, মহেশ্বর?" তখন শ্রীসদাশিব পার্ব্বতীকে বলিলেন—

"ত্বং পরাপ্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তোজাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে।

শঙ্করী

[শ্রীচণ্ডীদাস গুপ্ত, বি-এ।]

(১)

হরিশ মুখুজ্যের শেষ জীবনের সমস্ত দুঃখ-দৈন্য তা'র একমাত্র সন্তান যোগেশচন্দ্রের সেবাধর্ম্মের মহিমায় ধন্য হইয়া গেল। যোগেশ তা'র মায়ের চরণ দু'টি দেখিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু স্মৃতির বহু অতীতের সে কোন্ এক অভিশাপের দিনে তা'র মায়ের কোলের আশ্রয়টুকুও আর রহিল না। সতী-সিমন্তিনীকে চিতা-শয্যায় রাখিয়া আসিবার পর ছেলের মুখ চাহিয়া আজ পনের বছর হরিশ মুখুজ্যে কোন রকমে কাটাইয়া দিয়াছে। এক বৎসরের মাতৃহীন শিশুকে বুকে ধরিয়া মানুষ করিতে তা'র নিজের চোখের জলেই সে অন্ধ হইয়া যাইত।

হরিশের পিতা যখন বাঁচিয়া ছিলেন, তখন কর্ত্তাদের ভিতর কি এক সামান্য বিবাদের সূচনা হওয়ায় তা'দের পৈত্রিক রাশি রাশি সম্পত্তির দুইটি বিভাগ হইয়া গেল। হরিশ তা'র চোখের সামনে একে একে সকলকেই মরিতে দেখিল। তার ছোট ভাই সিদ্ধেশ্বরকে ডাকিয়া সে বলিল, "ও তরফের আর ত কেউ বেঁচে রইল না—শুধু র'ইল নিতাই। ছেলে মানুষ সে, বিষয়ের এক ভাগের খোদ মালিক—তা'র দিকে একটু নজর রাখিস।"

হরিশের ভ্রাতুষ্পুত্রের ছেলে নিতাই। কবে তার অগ্রণীদের ভিতর মনোমালিন্য বশতঃ দুইটি পৃথক সংসারের সৃষ্টি হইয়াছিল, তা'র কোন খবরই সে রাখে না। যোগেশ তার চেয়ে আট বছরের বড়। দু'জনের সদ্ভাব এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, তা'দের অলক্ষ্যে দু'টি প্রাণ এক হইয়া গিয়াছিল। হরিশ যে দিন সিদ্ধেশ্বরের হাতে যোগেশ ও নিতাইকে সঁপিয়া দিয়া ভবের খেলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল, সে দিন স্বর্গের দেব-দেবীর মঙ্গল আশীষে এই কাকা-ভাইপোর বন্ধনটি সোনার বন্ধনে ফুটিয়া উঠিল।

তার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। সিদ্ধেশ্বর তা'র স্ত্রী হরিমতিকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল, "বৌমাকে না আন্‌লে ত আর চলে না। যোগেশকে অনেক বুঝিয়েও কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারলেম না—তোমার মত কি?"

হরিমতি চুপ্ থাকিয়া উত্তর দিল, "যোগেশ তা'র নিজের বৌকে ত্যাগ ক'রেছে—আমাদের আর কি জোর জবরদস্তি আছে বল?"

সিদ্ধেশ্বরের ইচ্ছা, সে নিজে গিয়াই শঙ্করীকে তা'র পিত্রালয় হইতে লইয়া আসে। হরিমতিকে আরও দু' একবার বুঝাইয়া বলিতে, সে শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "অমন কাজ কখনও ক'র না। তুমি ত তা'দের বংশের কলঙ্কের কথা শুনেছ। যোগেশ তা'কে না বুঝেই কি ত্যাগ ক'রেছে?"

সিদ্ধেশ্বর দালানের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে বলিল, "তা' ব'ললে কি হয়—তাদের কে কবে কুলত্যাগিনী হ'য়েছিল ব'লে, শঙ্করীর জীবনের টুকুও তোমরা কেড়ে নিতে চাও। এ যে বড় অন্যায় কথা, হরিমতি?"

"তোমাদের বৌকে আন্‌তে আমি মানা ক'রছি কি?"

মহদাদ্যণু পর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ॥
ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানাম্ অস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন॥

*　　*　　*

ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি।

ইত্যাদি। আমাদের দার্শনিকেরাও প্রকৃতিকে স্ত্রীস্বরূপিণী কল্পনা করিয়াছেন। আমাদের সাহিত্যে, দর্শনে, তন্ত্রে, পুরাণে, সর্ব্বত্রই নারীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ। সুতরাং লেখিকা বা অন্য পাঠিকার উদ্বেগ অযথা। তির্য্যক-যোনির স্ত্রীজাতির প্রতিও শ্রদ্ধা দেখাইয়া শাস্ত্র বলিতেছে যে, বলিদানে পুরুষ পশুই কাটিবে, "স্ত্রীপশু র্ন চ হন্তব্য-স্তত্র শাম্ভব-শাসনাৎ।" এইরূপ উদাহরণ ভূরি ভূরি দেওয়া যায়। ইংরাজি সাহিত্যেও স্ত্রীজাতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইয়াছে। স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অপর দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—

ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ
সততং তোষয়েৎ দারান্ নাপ্রিয়ং কচিদাচরেৎ॥
যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কৃতস্তেন ভবতীপ্রিয় এব সঃ॥

—সম্পাদক।

সিদ্ধেশ্বরের আফিঙের নেশা জমিয়া আসিতেছিল। রমাই আচার্য্যির বৈঠকখানায় তা'র দাবাখেলার আসরটি অনেকক্ষণ সুরু হইয়াছে, এ কথা হঠাৎ মনে পড়ায় সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "দেখি কি ক'রতে পারি। পাঁচ জনের মতও নে' আস্‌ছি।" সিদ্ধেশ্বর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সোজা চলিয়া গেল।

নিতাই বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া কহিল, "আজ একটা কথা তোমায় ব'লে যাব ব'লেই এই রাত্রে ছুটে এলুম, দিদিমণি।" হরিমতি তাহাকে হাত ধরিয়া দালানে উঠাইয়া বলিল, "কি রে, নিতাই, কিসের কথা একবার শুনি! এতদিন পরে বুঝি ঠাকু'মাকে মনে পড়ল?"

নিতাই খোলা গায়ে আসিয়াছিল। কাপড়ের খোঁটটি গায়ে দিয়া বলিল, "আমার শঙ্করী মাকে নিয়ে আসতে কালই যাচ্ছি। যোগেশ কাকা রাজি হ'য়েছেন। তুমি সব বন্দোবস্ত ক'রে রেখো, দিদিমণি। তুমিই ত' আমাদের নির্ভর।"

যোগেশের বিবাহের পর সে ক'টা বছর শঙ্করী এখানে ছিল, তা'র প্রত্যেক দিনটি নিতায়ের বড় সুখেই কাটিত। কেহই ত' আর ছিল না তা'র! নিজের অংশের অত বড় মহল্লায় একেলাই সে থাকিত। শঙ্করীর যেমন গুণ, তেমনই তা'র অন্তরের স্নেহটুকু সকলকে আপনার করিয়া লইত। সব চেয়ে ভালবাসিত সে নিতাইকে। তা'র পর যেদিন শঙ্করীকে বাপের বাড়ী রাখিয়া আসিয়া যোগেশ কহিল, "নিতা, তোর মা'কে আজ জন্মের মত বিদায় ক'রে দিলুম। কি কুক্ষণে না জেনে বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন।"—সে দিন নিতা'য়ের বেশ মনে হইল যে, শচীকান্তের লৌহবজ্রের মুখ হ'তে রাশি রাশি আগুনের হল্‌কা আসিয়া তা'র অন্তরের প্রাণটুকু পুড়াইয়া দিয়া যাইতেছে।

আজ বহুদিন পরে তা'কেই আনিতে হইবে! নিতাই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না, তা'র জন্য কি সাজ-সজ্জা করিয়া রাখিবে।

হরিমতি কহিল, "যোগেশ তা' হ'লে একটা পেরাচিত্তের বন্দোবস্ত ক'রেছে নিশ্চয়? কৈ আজ সকালেও ত' আমাকে এ কথা কিছু ব'ললে না?"

নিতাই একটা টুলের উপর বসিয়া কহিল, "প্রায়শ্চিত্ত আবার কি, দিদিমণি? তুমিও কি এই পচা গাঁয়ের ভুতুড়ে পণ্ডিতগুলোর সঙ্গে একজোট হয়েছ? শঙ্করী মা'কে তাড়ালে কে?—তা'রাই ত' টিকি নেড়ে বড় বড় বিধান দিতে লাগ্‌ল।—"

হরিমতি কহিল, "ছিঃ, ও কথা ব'লতে আছে কি! তা'রা বামুন-পণ্ডিত, তা'রা জানে না ত' কি আমরা জানি?"

নিতাই দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "যা'ক, ও কথায় আর এখন কাজ নেই। আমি চল্লুম।"

হরিমতি তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "আর একটু বোস্ না ভাই।—কত দিন পরে এলি—"

নিতাই গালভরা হাসি লইয়া কহিল, "আমার মা এখানে এলে আর তোমায় ও কথা সেধে ব'লতে হবে না, দিদিমণি।" সে চলিয়া গেল।

হরিমতি ঘরকন্নার কাজ করিতে করিতে নিতায়ের ও তা'র স্বামীর কথাগুলি তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।—সে একটা তর্কের উপর আর একটা তর্ক চাপাইয়া দিয়া মহা গোলযোগ করিয়া ফেলিল। তার পর হাল ছাড়িয়া দিয়া ভাবিল, "তা'রা যা' ভাল বোঝে তাই করুক; আমার আর কি!"

(২)

সে রাত্রে এক নিমেষের জন্যও শঙ্করী চোখের পাতা বুজিতে পারিল না। সে এখানে আসিবার পর শুধু একটি দিন যোগেশ বাড়ী ছিল। তার পর সে যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সিদ্ধেশ্বর আজ পাঁচ ছয় দিন নানা চেষ্টা করিয়াও কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। নিতাইও যে কেন একবারটি তা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিল না, সে কথা ভাবিয়া শঙ্করীর বুক যে ফাটিয়া যাইতেছিল! শঙ্করী কাঁপিতে কাঁপিতে অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া বিছানায় বসিয়া রহিল। আজ ত কতদিন পরে সে স্বামীর ঘরে আসিল, কিন্তু তাঁর পায়ের ধুলা বুকে মাখিয়া লইতে যে অবসরটুকু সে খুঁজিয়া মরিতেছিল, তাহাও ত' কেমন চক্ষের পলকে বহিয়া গেল। সে দরজা খুলিয়া দেখিল ভুবনেশ্বরের মত অন্ধকার ছিল, সব যেন আজ তা'দের

অন্দরমহলে সেঁধিয়া বসিয়া আছে। তা'র কুলের কলঙ্ক রেখাটি এর চেয়ে যে আরও কত কালো, তা' শঙ্করী প্রাণে প্রাণেই অনুভব করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া সে যখন প্রত্যূষে ঘরকন্নার কাজ করিতে সুরু করিল, তখনও তার বড় বড় টানা চোখ দু'টি লাল হইয়াছিল। সে স্নান করিয়া চুল বিনাইবার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। একটি সাদা ধপ্‌ধপে গরদের কাপড় পরিয়া যখন সে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, তখন হরিমতি তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি বাছা সমস্ত জিনিষ-পত্তর ছুঁয়ে একশা' ক'র না আর।"

শঙ্করী ছল ছল চোখে হরিমতির দিকে তাকাইয়া কহিল, "কেন, মা, আমি ত' অনেকক্ষণ চান ক'রে এসেছি।"

হরিমতি তা'র দিকে না তাকাইয়াই উত্তর দিল, "তা' হ'লেই কি আর শুদ্ধু হয় গা?"

"তবে ত' আর কোন কাজই নেই দেখ্‌ছি" বলিয়া শঙ্করী দালানের এক পাশে চুপ্‌ করিয়া বসিয়া রহিল।

কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়াইয়া খুব উচ্চৈঃস্বরে নিতাই কহিল, "শঙ্করী মা কোথায় গেলে গা" তার পর নিকটে আসিয়া বলিল, "দেখ, যোগেশ কাকা তোমায় একবার দেখ্‌তে চেয়েছে।"

একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া শঙ্করী বলিল, "ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না, নিতাই। কি হ'য়েছে খুলেই বল ত'।"

নিতাই শঙ্করীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "কাল রাত একটার সময় কোথা থেকে এসে যোগেশ কাকা আমার দরজা ঠেল্‌ছিল। আমি যখন আলো নিয়ে গেলুম, তখন দেখি তা'র সর্ব্বাঙ্গে রক্তের-নদী ব'য়ে যা'চ্ছে—খবর আমি কিছুই জানি না—তোমাকে এক্ষুণি যেতে হবে।"

শঙ্করী কাঁদ কাঁদ হইয়া জবাব দিল, "তা' আমার কি যা'বার হুকুম আছে, নিতাই। মা চান্ ক'রতে গেছেন,—তিনি এলে একবার জিজ্ঞেস কর, কি বলেন।"

নিতাই চীৎকার করিয়া বলিল, "তাঁর হুকুম নেবার কোন দরকার নেই—সিধুদাদাও সেখানে ব'সে আছেন—তুমি এখুনি চল।"

শঙ্করীর আর বলিবার কি ছিল! সে মড়া মানুষটির মত চোখ বুজিয়া নিতায়ের সহিত চলিয়া গেল।

যোগেশ কহিল, "দাঁড়িয়ে র'ইলে যে—একটিবার ব'সবে না?"

শঙ্করী বিছানার এক কোণে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গিয়েছিলে শুনি?"

যোগেশ মাথার বালিসটি উল্টাইয়া লইয়া কহিল, "সে অনেক কথা—"

খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া যোগেশ বলিল, "আর আমি তোমাদের ও বাড়ী মাড়াব না, এটা একেবারে ঠিক ক'রে ফেলেছি—কিন্তু তোমার যেমন কখন কোন জিনিষের অভাব রাখিনি', তেমনি ভবিষ্যতেও তোমার কোন-কিছুর অকুলান থাকবে না, শঙ্করী।"

শঙ্করী জোর করিয়া বলিল, "কা'র ওপর রাগ ক'রে তুমি বাড়ী ছাড়া হ'তে চাইছ?"

যোগেশ বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কহিল, "রাগ আমি কারও ওপর করি নি', শঙ্করী—একদিন ছিল, যেদিন তোমার শ্বশুরের একটা কোড়ে আঙ্গুলের ইঙ্গিতে এত বড় গ্রামটা মাথা নীচু ক'রে ভয়ে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ত'—আর আজই তা'র ছেলের বৌকে তা'রা পায়ের তলায় মাড়িয়ে, তা'কে রাস্তার পোকার চেয়ে অধম ক'রে দিয়ে চ'লে যাচ্ছে!"

শঙ্করী কহিল, "তা' তা'রা যেটা ভাল বোঝে করুক। সবায়ের মালিক ত একজন আছেন।"

যোগেশ শিথিল হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, "এতদিন তা'রা তোমার কুলের কলঙ্ক নিয়ে হৈ হৈ ক'রেছিল, কাল হয় ত তা'রা তোমার কলঙ্ক রটা'বে।"

শঙ্করী একটু হাসিয়া কহিল, "তা'দের যা' ইচ্ছে করুক—কিন্তু তুমি যদি আমায় ভাসিয়ে দিয়ে চ'লে যাও, তা' হ'লে আমি যাই কোথায়?"

যোগেশ খুব কড়া কথায় জবাব দিল, "যেখানে তোমার খুসী চ'লে যেও—যেমন পোড়া কপাল নিয়ে জ'ন্মেছ। কি আর শক্তি আমার।—তা'দের ক'জন লোকের মুখ আমি চাপা দেব—তা'রা মিথ্যেকে এমন ক'রে খাড়া ক'রবে যে, দেখ্‌বে শঙ্করী, একদিন না একদিন তোমারই মনে হবে যে আত্মহত্যা ক'রে মরি।"

যোগেশ বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

শঙ্করী তা'কে হাওয়া করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তা' হ'লে আমাকে এখানে আন্‌তে লোক পাঠিয়েছিলে কেন?"

যোগেশ মুখ তুলিয়া কহিল, "সেটা তোমার ভালর জন্তে করি নি', শঙ্করী?"

শঙ্করী ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল। যোগেশের ত' দাঁড়াবার শক্তিও ছিল না! সে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আর একটুখানিও ব'সবে না, শঙ্করী?"

যোগেশের শিয়রের কাছে বসিয়া থাকিয়া শঙ্করী কহিল, "শুধু একবার কেন, যত বার ব'লবে আসব আমি।"

যোগেশ কোন উত্তর দিল না। আজ সকালের এই উত্তেজনায় তা'র জ্বর ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছিল। সে তা'র অলস ক্লান্ত চোখ দু'টি মুদিত করিয়া শঙ্করীর কোলের কাছে ঘেঁসিয়া আধ-মরা মানুষের মত শুইয়া রহিল।

(৩)

সিদ্ধেশ্বরকে ভাতের থালাটি আগাইয়া দিয়া হরিমতি কহিল, "আমার কি সাধ, যে তা'কে রাস্তায় তাড়িয়ে দি'—কিন্তু এটাও ত তোমার বোঝা উচিত যে, আমি এই বুড়ো বয়সে একঘ'রে হ'য়ে বাঁচি কেমন ক'রে।"

সিদ্ধেশ্বর বিচলিত হইয়া বলিল, "এ যে মস্ত বড় অবিচার তোমাদের।—তুমি ত' বেড়া লাগিয়ে শঙ্করীকে আলাদা ক'রে একলা ফেলে রাখ্‌লে—ধর্ম্মের নাম ক'রে কত বড় অধর্ম্ম ক'রছ তা' একদিন না একদিন জান্‌তেই পারবে।"

হরিমতি এ কথাটা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টাও করিল না। বলিল, "এ আর কি এমন অত্যোচার ক'রেছি আমি। যোগেশের যদি একটু বুকের সাহস থাকৃত, তা' হ'লে ত সে নিজেই সকলকে তুচ্ছ ক'রে নিজের বৌএর মান বজায় রাখ্‌তে পারত।"

সিদ্ধেশ্বর খুব খানিক হাসিয়া কহিল, "যোগেশকে ত চেনই তুমি—কখনও কি কোন ভার ব'ইতে পারে সে?—আমাদের ঘরের বৌকে তুমি নিজেই যদি আঁচল দে' ঢেকে রাখ্‌তে পারতে, তা' হলে কি আর কোন গোলই থাকৃত।"

একেবারে দালানের উপর উঠিয়া নিতাই কহিল, "কৈ, আমার শঙ্করী মা'কে দেখ্‌তে পাচ্ছি না যে?"

সিদ্ধেশ্বরের বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। সে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "কি আর শুন্‌বে নিতাই, আমরাও তা'কে একঘরে ক'রে দিয়েছি—দেখ্‌ছ এই বাড়ীটা বেড়া লাগিয়ে দু' ভাগ করা হ'য়েছে—"

নিতাই মাথায় হাত দিয়া সেখানে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কবে থেকে এ রকম হ'ল—কে দায়ী এর জন্তে?"

সিদ্ধেশ্বর নিজের পাকা চুলগুলি সরাইয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, "এ সব আমারই হুকুমে হ'য়েছে, দাদা,—বুঝ্‌ছিস্ নে', সমাজ যা'কে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেছে, তা'কে কে আর আশ্রয় দেবে?"

কথাগুলি হরিমতির বুকে খুবই বাজিল—সে মুখ হেঁট্ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

নিতাই একটু ক্ষেপিয়া উঠিয়া কহিল, "তবে আজ থেকে তোমাদের সঙ্গে আমারও কোন সংস্রব নেই, এ কথা ব'লে দিয়ে যা'চ্ছি।—তোমরা যা'কে পায়ে ঠেলেছ—" কথা শেষ হইতে না হইতেই সে উঠানে নামিয়া পড়িল।

খুব জোরে হাসিয়া উঠিয়া সিদ্ধেশ্বর ডাকিল, "আরে, পাগলা, শুনে যা' রে, শুনে যা'।"

নিতাই কাছে আসিতেই সে আসন হইতে উঠিয়া মুখ ধুইয়া কহিল, "ত্যাখ্, মা লক্ষ্মীকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে যে অবস্থা হয়, তা' আমাদের হবেই হবে।"

সিদ্ধেশ্বরের সমস্ত বিদ্রূপের কথাগুলি নিতাই বুঝিতে না পারিলেও, হরিমতির বুকে সেগুলি বাণের মত বিঁধিয়া যাইতেছিল।

তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া মুচ্‌কী হাসিয়া সিদ্ধেশ্বর বলিল, "আর এ কথাটাও শেষ পর্য্যন্ত মনে রাখিস্, যে যতই নির্দ্দোষী হ'ক,—সে যদি মাথা হেঁট ক'রে সমস্ত উপদ্রব সহ্য ক'রে যায়, তা' হ'লে তার যন্ত্রণার কখন শেষ হয় না।"

নিতাই প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। সে আর একটুও অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শঙ্করী তা'র বাহিরের দরজায় খিল আঁটিয়া দিয়া স্পন্দহীন কঙ্কালের মত নীরব হইয়া বসিয়াছিল। তা'র

পৃথক ঘরকন্নার জিনিষগুলি এদিক-ওদিক গড়াগড়ি যাইতেছিল। যত ভাবনা তা'র ছিল, সবারের গলা টিপিয়া আজ সে তা'র এই জনহীন ঘরের চৌকাটের ধারে দরজার হেলান দিয়া বসিয়া রহিল। তখন অনেক বেলা।—সে তা'র বুকের মাঝখানে বুকের দেবতার ছায়া-প্রতিমাটি ধরিতে গিয়াও ধরিতে পারিতেছিল না। সে যে অনেক দিনের বিচ্ছেদের রত্নকে পাইয়া হেলায় হারাইয়া ফেলিল! কেন সে সেদিন জোর করিয়া বলিল না,—তোমার পায়ে ত কোন অপরাধই করি নি'—তবে কেন আমার শুদ্ধ মাত্র একটি দাবী থেকেও তুমি আমায় এমন নির্দ্দয় ভাবে বঞ্চিত ক'রে দ'লে পিষে চ'লে যাবে? কেন তুমি আমার মুখও দেখ্‌বে না!—লঙ্কেশ্বর রাবণের অগ্নি-ময় চিতাটি যেন আজ তা'র সমস্ত বুক জোড়া করিয়া নিজের বাসা বাঁধিয়া তা'কে নির্ম্মম ভাবে দাহ করিতে-ছিল! এইটাই ত সে চায় এখন! তা'র নারী-জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ পরম কামনা যখন শেষ হইয়া গেল, তখন ত তা'র পুড়ে মরা, বেঁচে থাকা একই!

কিন্তু অভাবও ত তা'র ছিল না কিছু—একটি মেয়ে-মানুষ রাণীর মত থাকিতে পারে, তেমন রাশি রাশি সাজ-সরঞ্জাম, আস্‌বাব-পত্র যোগেশ বরাবর শঙ্করীকে দিয়া আসিয়াছে। হরিমতি যে দিন তা'কে হাতে ধরিয়া তা'র এই পৃথক মড়া সংসারটিতে বসাইয়া দিয়া গেল, সেদিন সে হিসাব করিয়া শঙ্করীর যা' কিছু ছিল, সমস্ত তাহার নিকট পাঠাইয়া দিল। শঙ্করী চোখ মেলিয়া যতই না সেই সব প্রাণহীন বিলাস সামগ্রী দেখিতে লাগিল, ততই তার মনে হইল যে, সেগুলির প্রত্যেকটিরই ত ধূলা-মাটির চেয়ে বেশী কিছু কদর ছিল না।

খুব জোরে জোরে দরজায় আঘাত করিয়া নিতাই কহিল, "আমার ত ভেতরে যাবার অধিকার আছেই,—আমি ত আর তোমার পর নই, শঙ্করী মা।"

খিল টানিয়া দিয়া মাথা নীচু করিয়া শঙ্করী নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মাধু নিতাইয়ের বাড়ীর পাচক। নিতাই বলিল, "খাবারগুলি তুমি ঐ দালানে রেখে চ'লে যাও, ঠাকুর।"

সে চলিয়া গেলে নিতাই বলিতে লাগিল, "চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে ত চলবে না আর—আজ ক'দিন খাওনি বল ত?"

শঙ্করী নিতায়ের চোখের উপর চোখ রাখিয়া উত্তর দিল, "তুমি কি পাগল হ'য়েছ, নিতাই।"

অনেক সাধ্য-সাধনায় পর শঙ্করী অল্প কিছু খাইয়া লইল।

নিতাই বলিতেছিল, "স্থাখ, মা, যোগেশ কাকার নিজেরই যে ছোট বাড়ীটা ছিল, সেই [illegible] র'য়েছে এখন—বেশী দূর নয়—তুমি যদি বল ত আজই তোমায় নিয়ে যাই।"

শঙ্করী একটু ভাবিয়া লইয়া উত্তর দিল, "কাজ নেই আর।—তাঁর নিরিবিলি সুখের বাসাটি কেন আমার উৎপাতে ভেঙ্গে দিতে চাইছ, নিতাই?"

"বেশ ত আর দু' দিন যাক্‌—তাড়াতাড়ি কি।"

"দু' দিন কেন, হাজার দিন কেটে গেলেও আমার এই কালো মুখ নিয়ে তাঁর সাম্‌নে দাঁড়া'ব না আর।"

নিতাই অনেক বুঝাইল।—শঙ্করী তা'র সমস্ত কথা চাপা দিয়া শেষ বলিয়া ফেলিল, "আমি ত জন্মের মত কাদা-মাটির তলায় ডুবে গেলুম, নিতাই"। তার পর হঠাৎ তা'র হাত দু'খানি ধরিয়া বলিল, "আর কেউ আমায় না চা'ক,—আমার গা ছুঁয়ে শপথ ক'রে বল, তুমি আমায় কাঁদিয়ে চ'লে যাবে না?"

নিতায়ের কি আর মুখের কথাই ছিল! সে শঙ্করীর কাপড়ের আঁচলটি মুখে ঢাকিয়া ছোট্ট শিশুর মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

(৪)

সে দিন ছিল চড়ক-উৎসবের গাজন। মুখুজ্যে পাড়ার এক সীমানা হ'তে আর এক সীমানা পর্য্যন্ত অনেক লোকের জনতা হইয়াছিল। তা'রা কেউ কাঁটা, কেউ ছুরী-ছোরা, কেউ বঁটি লইয়া মহা হুলস্থুল আরম্ভ করিয়া-ছিল। তিন চার জন দলের সর্দ্দার বলিয়া নিজেদের প্রচার করিয়াছিল—সে যে কি গণ্ডগোল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না!

নিতাই রঘু সিং দারোয়ানকে আজ ক'দিন [illegible] শঙ্করীর বাড়ীতে পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া [illegible]

নিতাই তা'র নিজের মহলের বড় বারান্দা হইতে ডাকিল, "রঘু, এই লোকগুলোকে এখান থেকে দূর ক'রে দে ত। আজ যেন একটুও গোলমাল না করে—যদি না শোনে ত মেরে তাড়িয়ে দে।"

রঘু সুমুখেই দলের একটা সর্দ্দারকে পাইয়া কহিল, "আরে, তামাসা আজ বন্ধ্ করিয়ে দাও—ছোটবাবুর মেজাজ খারাপ আছে।"

সর্দ্দার চটিয়া বলিল, "ধা' ধা', কে তোর ছোটবাবু?"

রঘু অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উত্তর দিল, "আরে দেখ্ দেখ্, উপর পানে তাকিয়ে দেখ্।"

নিতাই হাঁকিল, "বেরো, শিগ্গির বেরো, পাজি ভূতগুলো, নইলে এখুনি চাকরকে দিয়ে কান মলিয়ে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেব।"

সর্দ্দার চোখ ঘুরাইয়া উত্তর দিল, "যাও, যাও, ভারি বড়লোক উনি—বুকের পাটা থাকে ত নেমে এস না দেখি।"

নিতায়ের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। সে একগাছা মোটা লাঠি লইয়া তর্ তর্ করিয়া উপর হইতে নামিয়া আসিল।

শঙ্করী তা'দের বচসা সমস্তই শুনিতেছিল। জানালার ফাঁক হইতে দেখিল নিতাই তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দিয়াছে। সে চার পাঁচ জনকে এমন মারিয়াছে যে, তা'রা ছুটিয়া পলাইয়া গিয়া মাথা বাঁচাইল। দু'এক জন লোক মধ্যস্থ হইয়া তাহাকে সরাইয়া দিতে গিয়া মার খাইয়া চলিয়া গেল।

একেবারে দরজার কাছে যাইয়া শঙ্করী হাঁকিল, "নিতাই, মারামারি ভাল কি?"

শঙ্করীর একটি কথার ইঙ্গিতে লাঠিগাছটা ফেলিয়া দিয়া নিতাই যখন চলিয়া আসিল, তখন সত্যই শঙ্করী তা'র বুকের মাঝখানে একটা ছোটখাট গর্ব্ব অনুভব করিতেছিল। সে তা'র নিঃসম্বল জীবনের সমস্ত অপূর্ণতার মধ্যেও আজ মানের দায়ে আকুল হইয়া যে কথাটি উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহা রক্ষা করিয়া নিতাই তা'র শঙ্করী মায়ের মান বাড়াইয়া দিল।

নিতা'য়ের তখনও রাগ যায় নাই।—সে উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল, "কেন আমায় ডাকলে বল ত'—আজ ঐ ভূতুড়েগুলোর মাথার খুলি উড়িয়ে দিতুম। আমরা আগুনে জ্ব'লে পুড়ে ম'রছি আর এই অসভ্যগুলো নিশ্চিন্ত মনে হট্টগোল ক'রে বেড়া'বে।"

নিতা'য়ের আপাদমস্তক ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। দাওয়ার উপর একটা মাদুর ও বালিস রাখিয়া শঙ্করী নিতাইকে শুইতে বলিল। তা'র ঘরে একটিও পাখা ছিল না। সে নিজের আঁচলের খোঁটটি লইয়া বেশ জোরে জোরে হাওয়া করিতে লাগিল।

নিতাই বলিতেছিল, "ওরা কি মনে ক'রেছে মুখুজ্যে-বংশ মরা-গাঙ্গের চেয়ে নির্জ্জীব হ'য়ে গেছে—আজ আমাদের নিরাশ্রয় পেয়ে মোড়লগুলো এক সর্ব্বনাশ ক'রে ব'সল—তার পর এরাও আমাদের তাচ্ছিল্য ক'রতে শিখেছে।"

শঙ্করী কহিল, "এত লোকের বিরুদ্ধে একলা মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ালে পার পাবে কি তুমি?"

নিতাই ভারি উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তা'দের আর ভয় কি আমার, আমি তা'দের এক একটাকে খুন ক'রে ফাঁসি যা'ব—তবু ক্ষমা আমি কিছুতেই ক'র্ব্ব না—কি অপমান এটা! যে বংশের কর্ত্তাদের মুখের একটা দয়ার কথা শোনবার জন্যে তা'রা জোড়হাতে কাণ খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে থাকৃত, তা'দেরই বাড়ীর সুমুখে দাঁড়িয়ে এত বড় একটা তাচ্ছল্য!"

কথাগুলি চাপা দিয়া শঙ্করী জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ, নিতাই, তুমি যে বললে সে দিন, তোমার কাকা তাঁর নতুন বাড়ীতে গিয়ে আছেন—কতখানি পথ বল ত'—"

নিতাই উত্তর দিল, "খুবই কাছে—এই বাড়ীর সামনের রাস্তা ধ'রে বরাবর গেলেই ডানহাতি বাগান একটা—বাগান আর কি, জঙ্গল হ'য়ে গেছে—সেইটেই যোগেশ কাকার ছোট্ট বাড়ী।"

সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, "আর ত বসবার সময় নেই আমার—যাই এখন।"

শঙ্করী বলিয়া দিল, "সোজা বাড়ী যেও।"

পথে বাহির হইয়াই নিতাই দেখিল, হারাণ ভট্‌চায্যি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে কহিল, "তোমায় দেখ্‌ছি বড্ড দেমাক হ'য়েছে। লোকগুলোকে অমন ভাবে মেরেছ কেন?"

নিতাই মুখের উপর জবাব দিল, "বেশ ক'রব, যাও তুমি এখান থেকে,—ছোটলোক কোথাকার।"

হারাণ চোখ রাঙাইয়া কহিল, "কি, আমি ছোট-লোক! আমায় তুমি ছোটলোক বল,—দীনু ভট্টচায্যির বংশধর আমি—ন্যায়রত্নের পুত্র, তা'কে তুমি ছোটলোক বল?"

নিতাই চট্-পট্ জবাব দিল, "একটা কথা আজ তোমা-দের ব'লে দিচ্ছি,—এই মুখুয্যে পাড়ায় কখন এসে যদি তোমরা জটলা ক'রবে, তা' হ'লে মজা টের পাবে।"

হারাণ অগ্রসর হইয়া বলিল, "ক'রবে কি,—তুমি আর ক'রবে কি—তোমাদের ত একঘ'রেই ক'রেছি আমরা, তোমাদের জলস্পর্শ করে কে?"

নিতাই তা'র কোন কথায় কাণ না দিয়া চলিয়া গেল।

(৫)

যোগেশ বলিতেছিল, "আর দু'টি দিনের সময় দিলুম—এর মধ্যে যা ক'রতে পার।"

নিতাই অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘাড়-নাড়িয়া কহিল, "সে ত' তোমায় স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিলুম, যোগেশ কাকা।—শঙ্করী মা আর তোমার সঙ্গে দেখাও ক'রবে না, এটা একেবারে তা'র প্রতিজ্ঞার কথা।"

যোগেশ তা'র শিথিল চোখ দুটি জোর করিয়া মেলিয়া রাখিয়া কহিল, "কেন দেখা ক'রবে না রে?"

নিতাই এক টুকরা কাগজ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, "তা' আর আমিই কি জানি।"

"তা, না আস্‌বারই কথা, কেমন?"

"আচ্ছা যোগেশ কাকা, তুমি কি আমাদের পাড়ায় যাওয়াটা বন্ধ ক'রে দিলে একেবারে?"

যোগেশ নিতায়ের হাত ধরিয়া বলিল, "তোরা ত' কেউই আমায় চাস্ না—আর তা' ছাড়া আমার এই হেঁট-মাথা নিয়ে কেমন ক'রে তা'দের মুখ দেখাই।"

নিতাই দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, "সে সব তোমায় কিছু ভাবতে হবে না, যোগেশ-কাকা। সে দিন আমি তা'দের খুব শিক্ষে দিয়ে দিয়েছি।"

যোগেশ একটা বালিস টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, "আর আমায় অনুরোধ করিস নি—আমার সব সাধই মিটেছে।"

নিতাই চলিয়া গেলে যোগেশ পালঙ্কের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিল। কি সে অসহ্য বেদনা! যে বুক-ভরা সোহাগটুকু লইয়া সে ভাবিয়াছিল যে একদিন না একদিন তা'র ফিরিয়ে দেওয়া রত্নকে আবার সে নিজের বুকের উপর রাখিবার সুযোগ ও সামর্থ্য পাইবেই, সেই ক্ষীণ আশাটুকুও আজ আছাড়ি-বিছাড়ি খাইয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একশা' হইয়া গেল। সে নিজে কম নিষ্ঠুর নয়! কিন্তু শঙ্করীকে লোকচক্ষুর সুমুখে একেবারে ত্যাগ করিয়া সে ত' শুধু তা'র অত বড় বংশের মান-মর্য্যাদা বজায় রাখিতেছিল! শঙ্করীর দু'টি হাত ধরিয়া এই কথাই সে কত আদর করিয়া তা'কে বুঝাইয়া দিয়াছে। শঙ্করী প্রতিবারেই শুধু কাঁদ কাঁদ দু'টি টানা চোখের কোণে তা'র অন্তরের মৌনব্যথায় রাশি রাশি অশ্রু চাপিয়া রাখিয়া, তা'র স্বামীর মানের বোঝাটুকু যা'তে সোণার বোঝায় পরিণত হয়, তেমনি এক স্বইচ্ছায় কখন তাঁর চরণ-স্পর্শ করিয়াও তাঁকে অপবিত্র করিতে এতটুকু লোভ করে নাই। যোগেশ আজ একটুও কাঁদিল না, কিন্তু সে নিমেষের তরেও তাকাইয়া থাকিতে পারিল না। তার দু'টি আঁখিতারা যেন আজ অলস ক্লান্ত হইয়া খসিয়া গিয়া ধূলার সহিত লুঠাইয়া মরিতে চাহিতে ছিল। একটু তন্দ্রার ঘোরে সে দেখিল, কার লাল আঁচলখানি যেন পালঙ্কের চারি ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। যোগেশ ধড় মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। তার পর সে ছুটিয়া বাগান পার হইয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেল।

সে দিন রঘুসিংকে অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া শঙ্করী একখানি গরদের চাদরে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। যে পথ সে ধরিয়াছিল, সেটি যোগেশের বাগান-বাড়ীর পথ। সে ভয়ে ভয়ে লুকাইয়া-চুরাইয়া প্রবেশ করিয়া দেখিল, বাড়ীতে কেহই নাই। যোগেশ একটিও দাস-দাসী রাখে নাই, এ কথা সে নিতায়ের মুখেই শুনিয়াছিল। সে নির্ব্বিঘ্নে দ্বিতলে উঠিয়া গেল। উপরের ঘরে দেয়ালের মাঝখানে দেখিল একটি রূপার ফ্রেমে বাঁধান তারই ছবিখানি সজ্জিত

রহিয়াছে।—তখন তা'র ভরা যৌবন,—বুঝি সুরধুনীর কলকল্লোলের মতই কানায় কানায় ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে! রান্নাঘরে গিয়া দেখিল সরঞ্জাম সবই রহিয়াছে, কিন্তু সকালে যে আদৌ রাঁধা-বাড়া হয় নাই, এ কথা শঙ্করীর বুঝিতে বাকি রহিল না। সে অত্যন্ত ক্ষিপ্র-হস্তে সমস্ত যোগাড় করিয়া রান্না চড়াইয়া দিল। তার পর বাগানটি ঝাঁট্‌-পাট্‌ দিয়া বেশ পরিষ্কার করিতে সুরু করিল। তখন সবে রাত্রি হইয়াছে। রান্না শেষ করিয়া সে আহার-সামগ্রী যোগেশের উপরতলার ঘরে সাজাইয়া রাখিয়া বাগান পার হইয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় খুব জোরে জোরে জুতার শব্দ হইতে লাগিল। সে গাছের আড়ালে লুকাইয়া দেখিল, এক জন সত্যকারের মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে যোগেশ বাগানে ঢুকিয়া পড়িল। তা'র পায়ে পায়ে ক্রমশঃ জড়াইয়া আসিতেছিল,—সে আর নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া সেইখানেই আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

শঙ্করী তা'র হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল, "শিগ্‌গির ওপরে চল।"

সে নেশার ঘোরে শঙ্করীকে অল্প চিনিতে পারিল।

তা'র মাথাটি বালিশের উপর রাখিয়া দিয়া শঙ্করী কহিল, "ছিঃ, অধঃপাতে যেতে ব'সেছ একেবারে!"

যোগেশ সব কথাগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট শুনিতে পাইল। সে খুব শক্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "এত রাত্রে তুমি এখানে কেন?"

শঙ্করী উত্তর দিল, "সে কথা পরে জেনো—এখন কিছু খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও ত'।"

যোগেশ কলের পুতুলের মত বেশ কিছু খাইয়া লইল। তার পর সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, "তোমায় আমি চিনেছি, শঙ্করী। তুমি আমার এই সরমের মুখখানা ছোট ক'রে দেবার জন্তে এখানে এসেছ। তা' বেশ, এ আমার উচিত দণ্ড। কিন্তু ক্ষমা আমি তোমায় কিছুতেই ক'র্ব্ব না—তুমি যে শুধু আমাদের সাজান সংসারটা পুড়িয়ে ছারে-খার দিয়েছ, তা নয়, তুমি আমারও বুকের পাঁজর সব পিষে ধুলো ক'রে দিলে!"

তাহার এই উত্তেজনায় শঙ্করী একটু ভয় পাইল। সে ত' কহিবার বলিবার একটিও ছাঁদা কথা লইয়া আসে নাই! সে শুধু তা'র পাণ্ডুর মুখখানি তুলিয়া বলিল, "এখন একটু বিশ্রাম ক'রে নাও।"

যোগেশ বালিশে মুখ গুঁজিয়া নীরব হইয়া শুইয়া রহিল। শঙ্করী দেখিল সে তন্দ্রায় বিজড়িত হইয়া আসিতেছে। সে অতি সন্তর্পণে সেখান হইতে পলায়ন করিল।

নিজের বাড়ীতে গিয়া দেখিল, দালানে বসিয়া সিদ্ধেশ্বর ঝিমাইতেছে। তা'র পায়ের উপর মাথা রাখিয়া শঙ্করী জিজ্ঞাসা করিল, "কতক্ষণ হ'ল এসেছেন?"

সিদ্ধেশ্বর আফিঙের নেশায় মশগুল হইয়াছিল। হঠাৎ বলিল, "হ্যাঁ এসেছি, বটেই ত', এসেছি,—তা' কিছুক্ষণ হ'ল আর কি। যা' হ'ক নিতা'র বাড়ী গিয়ে এত শিগ্‌গির ফিরে আস্‌বে এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নে।"

শঙ্করী আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "মা'ও ভাল আছেন ত?"

একটু অন্যমনস্ক হইয়া সিদ্ধেশ্বর বলিল, "আর তোমায় একলা থাকৃতে হবে না, মা—আমি এখুনি নে' যাব ব'লে এসেছি।"

শঙ্করী নীরব হইয়া বসিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া নিজেই মাতোয়ারা হইয়া বলিল, "কেমন, এইটেই ঠিক কথা না? আমাদের সাধের বৌটি রাস্তায় গড়াগড়ি যাবে, সেটা কেমন কেমন দেখায় যে।"

শঙ্করীর একটিও কথা নাই।

সিদ্ধেশ্বর নিজের পাকা চুলগুলি সরাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "কি রে, কথাও ফুরিয়ে গেল?—কতদিন পরে দেখ্‌তে এলেম, তা গোঁজ হ'য়ে ব'সে থাকলে চলবে কেন?" বলিতে বলিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শঙ্করীর হাত ধরিয়া কহিল, "লক্ষ্মী মা আমার, আর রাগ করিস নে। বুড়ো আমি, আজ তোর হাতে ধ'রে ব'ল্‌ছি, একটি কথা রাখ্‌।"

তা'দের ছোট্ট আলোর শিখা শঙ্করীর মুখের উপর পড়িয়া চক্‌চক্‌ করিতেছিল। তখন যেন তার চাঁদের মত রূপটি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তবু সে জানিত নিজের মুখখানি তা'র কয়লার চেয়ে কত কালো! সে নীচের পানে চোখ করিয়া বলিল, "বেশ ত আমি আছি, কাকা।"

সিদ্ধেশ্বর বসিয়া পড়িয়া কহিল, "দূর পাগ্‌লি, তাও কখন হয়? চল্, চল্, আর আপত্তি তুলিস্ নে'। জানিস্ তোকে আলাদা ক'রে দিয়ে পর্য্যন্ত কেমন দ'গ্ধে দ'গ্ধে সময় কাটিয়েছি আমি।"

শঙ্করী বলিল, "মা'র ত কোন মত নেই, এ আমি কালও শুনেছি।"

সিদ্ধেশ্বর খুব জোরে হাসিয়া কহিল, "তা', সে কি আর এখানেই আছে। আজ সকালে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে তীর্থি ক'রতে চ'লে গেছে।"

শঙ্করী তা'দের সিধু-কাকার সব কথা-হাসি যেন ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিয়া বলিল, "তা যাই হ'ক, বেশ আছি আমি,—আর কোথাও যা'ব না, এ অনেক দিন ঠিক ক'রেছি।"

শঙ্করীর এলো চুলগুলি মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া সিদ্ধেশ্বর কহিল, "আর কষ্ট দিস্ নে', ক্ষেপী মা,—তুই যোগেশের পর হ'য়ে ব'সে আছিস্, কিন্তু আমি বেঁচে থাক্‌তে আর পুড়িয়ে মারিস নে'।"

শঙ্করী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "অনেক রাত হ'য়েছে, বাড়ী যান্; আমার যা' বলবার ছিল, তা' ব'লেই দিয়েছি।"

সিদ্ধেশ্বর শঙ্করীর নত মস্তকের উপর হাত রাখিয়া আশীর্ব্বচন দিয়া বলিল, "আচ্ছা, আজ চ'ল্লেম—আমি আর এক দিন এসে প'ড়ব এখন।—একটু ভেবে উত্তর দিস্ তখন।"

(৬)

খুব বেলায় উঠিয়াও যোগেশের তন্দ্রার ঘোর একেবারে কাটে নাই। তা'র সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইয়াছিল।—আর পূর্ব্ব রাত্রের অনেকখানি এলো-মেলো স্মৃতি তা'র মনের মধ্যে আছাড় খাইতেছিল। সে নিজেকে এত খাটো করিয়া ফেলিল যে, কল্য রাত্রের তা'র সমস্ত অভিনয়ের আগাগোড়া ভাবিয়া লইয়া নিজেকে একটু ক্ষমা করিতেও আদৌ তার মন চাহিল না। শঙ্করীর সমস্ত পাওনা-গণ্ডার মধ্যে ত সে তা'কে হেলার তুচ্ছ করিয়াছে, তা'র উপর সে নিজের বীভৎস উচ্ছৃঙ্খলতার দৃশ্যটা এত বড় করিয়া কাল তা'র সামনে ধরিয়া রাখিয়াছিল, যে তাহা ভাবিয়া আজ যোগেশের সমস্ত শিরা-উপশিরার মধ্যে একটা তুমুল ঝড় বহিয়া যাইতে লাগিল। সে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া আজ যেন নিজের গলায় টুঁটি চাপিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিল!

যোগেশ নিতা'য়ের মুখের উপর চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "আর আমায় একটিবারও অনুরোধ করিস নি'। আমার মনের কথা ব'লছি, আমি আজই এ গ্রাম ছেড়ে চ'লে যা'ব।"

এ ক'দিন সিধুদাদার সহিত একজোট হইয়া নিতাই যে ছোট-খাটো উপায় একটি স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, সেটা একেবারে নিষ্ফল স্বপ্নের মত পচিয়া গলিয়া যাইবে, তা' মনে করিয়া তা'র চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল। সে একটু মিনতির সুরে কহিল, "আর একবার ভেবে দেখ, যোগেশ কাকা। তোমার এখনকার এই মনের অবস্থায় একলা দূরে কোন জায়গায় থাকা উচিত নয়।"

যোগেশ বলিল, "বেশী দূর আর কি?—নবদ্বীপ এখান থেকে চার পাঁচ ক্রোশ। একটা আশ্রয় খুঁজে নিয়ে বেশ নিরিবিলি থাকা যা'বে।"

নিতাই সজল চক্ষে বলিল, "সেটা আমাদের কপাল,—কিন্তু তুমি আমার সব আশাটুকু দমিয়ে দিলে।"

যোগেশ নিরুপায় হইয়া জবাব দিল, "ভাগ্য কারও নয়—আমি নিজের হাতে সব ভেঙ্গে চুরে গুঁড়ো ক'রে ফেলেছি।"

যোগেশ কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ চুপ্ করিয়া যাওয়াতে নিতাই তাহাকে পাইয়া বসিল। যোগেশ একটু ধমক দিয়া কহিল, "তোর কি আর কোন কাজ কর্ম্ম নেই—আমাদের জন্যে কেন এত সময় নষ্ট কচ্ছি'স্। আমাদের যা' হবার তাই হবে।"

নিতাই মাথা হেঁট্ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যোগেশ একবার গলা ঝাড়িয়া বলিতে লাগিল, "সে যে কারও হুকুম না নিয়ে বাড়ীর বাইরে ঘুরে বেড়ায়, এর বেশ প্রমাণও আমি পেয়েছি,—এখন দেখ্‌ছি তুইও আমার শত্রু হ'য়ে উঠ্‌লি।"

নিতায়ের মুখ চোখ লাল হইয়া গেল। সে বড় উত্তেজিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, "এতদিনে বুঝলুম তোমাকে মানুষ ব'লে গণ্য করা যায় না, যোগেশ-কাকা।

তোমার যেখানে খুসী চ'লে যাও—কিন্তু আমার শঙ্করী মা'য়ের সম্বন্ধে নতুন ক'রে যদি আর একটিও ভুল ধারণা ক'রে থাক, তা' হ'লে সে অপরাধের সাজা তোমায় এক জন না এক জন দেবেই।"

নিতাই আর একটুও অপেক্ষা না করিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। সে যে এতগুলি গঞ্জনার কথা বলিয়া নিমেষ না অপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবে, যোগেশ তাহা কখনও ভাবে নাই। অনেক দিন পরে সে আজ সত্যই যেন একটা খোলা, বিজন প্রান্তরে বসিয়া রহিয়াছে। সে আজ অভিমান করিয়া সকলকে পর করিয়া তুলিল! বাড়ীর বাহির হইয়া একটিবারও সে ফিরিয়া তাকাইতে সাহস করিল না। সে অন্যমনস্ক হইয়া বরাবর চলিতে লাগিল।

সিদ্ধেশ্বর পিছন হইতে বলিল,—'যোগেশ রে, এত বেলায় আবার যাচ্ছিস্ কোথা?'

সে উত্তর দিল, 'যেখানে খুসী।'

সিদ্ধেশ্বর লাঠিগাছটায় ভর দিয়া বেশ শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'সে কি রে, পাগ্‌লা,—বুড়ো মানুষ আমি, আমার ওপরও দয়া-মায়া ক'রবি নে?'

যোগেশ বলিল, 'তোমার পায়ে পড়ি, কাকা, যে ক'টা দিন আছি আমায় সুখে বাঁচ্‌তে দাও।'

সিদ্ধেশ্বর গলা চড়াইয়া জোরে জোরে হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, 'তা'ও কি হয় রে, আমি যে অনেক সাধ্যি-সাধনা ক'রে আমাদের সাবিত্রী-সতীকে ঘরে তুলে নে যা'ব ব'লে তোকে ডাক্‌তে এসেছি।'

যোগেশ উন্মত্তের মত ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল, 'তা' তোমাদের যা ইচ্ছে কর, কিন্তু আমি আর এক পাও ফিরব না।'

সিদ্ধেশ্বর লাঠিশুদ্ধ যোগেশের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তা'র মুখখানা বুকের উপর চাপিয়া রাখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'দুষ্টু কোথাকার, ফাঁকিটি দিলে আর হ'চ্ছে না,—আমার কি পা চ'লছে,—নইলে তোকে কাঁধে ক'রে নিয়ে ছুটে পালাতেম।'

যোগেশ সেই তেকেলে বুড়োর সরু-সরু কম্পান্বিত পায়ের উপর নিজের মাথাটি মিলাইয়া দিয়া কহিল, 'কখনও তোমার পায়ের সেবা ক'রতে এতটুকু ত্রুটি করি নি'—কিন্তু আজ আমায় ক্ষমা কর—আমার চ'লে যাবার পথে বাধা দিও না।'

সিদ্ধেশ্বর খুব খানিকটা সেই পুরাণো হাসি হাসিয়া লইয়া জড়িত স্বরে কহিতে লাগিল, "তা' ব'ল্‌লে আমি আর শুন্‌ছি নে'। বুড়ো যা ধ'রেছে, তা ক'রবেই।"

যোগেশ হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, 'আমার মাথার ঠিক নেই, সিধুকা'। আর আমায় তুমি লজ্জা দিও না।'

সিদ্ধেশ্বর হতাশ হইয়া জবাব দিল, 'আচ্ছা, আজ নবদ্বীপ যা'চ্ছিস্ যা',—কিন্তু বুড়োর ডাক পেলেই ফিরে আসিস্।'

সে আর কথাটি না কহিয়া অন্য পথ ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চলিল। বাড়ীর কাছে আসিয়া নিতাইকে দেখিয়া বলিল, 'দাদা রে, পার্‌লেম্ না।—বুড়োর গোঁ'টা আজ আর বজায় রইল না।'

(৭)

কিন্তু শঙ্করী একটা নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছিল। আজ অনেক দিন হইল সে রোগে ভুগিতেছে। বিপিন ডাক্তার দেখিতে আসিয়া এক দিন উঠানে দাঁড়াইয়া স্পষ্ট বলিয়া গেল, বাঁচবার ত কোন আশা দেখ্‌ছি না।'

সারা দিন রাত নিতাই শিয়রের কাছে বসিয়া থাকিত। যক্ষ্মা রোগে মানুষ বাঁচে না, এ কথা নিতাই অনেকবার শুনিয়াছিল। সিদ্ধেশ্বর ঘরে আসিয়া কহিল, "যা', তুই যা' ত'—একটু ঘুম ক'রে নিগে যা'। আমি আছি ততক্ষণ।' নিতাই চলিয়া গেলে প্রদীপটি কমাইয়া দিয়া সিদ্ধেশ্বর বলিল, 'এখন একটু ভাল বোধ হ'চ্ছে?'

শঙ্করী উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, বেশ আছি।'

সিদ্ধেশ্বর নিজের কাপড়ে তা'র মুখখানি মুছাইয়া দিয়া বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, 'সেরে যা'বি নে' ত' কি? ভগবান আমাদের আর কষ্ট দেবেন না, এ আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি।'

শঙ্করীর হাড় কয়খানি সার হইয়াছিল। তা'র ডাগর চোখ দু'টি বসিয়া গিয়াছে। সেই চক্‌চকে সোণার অঙ্গে কে যেন কালির প্রলেপ লেপিয়া দিয়াছিল।

তা'র সুগোল হাত দু'খানি জীর্ণ ফ্যাকাসে কঙ্কালের মত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল।

সিদ্ধেশ্বর তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, 'এ আমাদের ভাগ্যি, যে তোর মত মেয়ে পেয়েছেম—কিন্তু, কি আর বলব—' সে কথা শেষ না করিয়াই বসিয়া রহিল।

শঙ্করী বলিল, 'একটু জল দিন না।' সিদ্ধেশ্বর তাহাকে জল খাওয়াইয়া কহিল, 'একবার উঠে ব'সতে চেষ্টা কর ত' মা।'

শঙ্করী উঠিয়া বসিয়া সিদ্ধেশ্বরের অঙ্গে তা'র সমস্ত গায়ের ভর রাখিয়া শুধাইতে লাগিল, 'নিতাইকে আস্‌তে বারণ ক'রে দিয়েছেন?—রাত জেগে তারও শরীর মাটি হ'য়ে গেল। এখন ত বেশ আছি।—আপনাকেও আর মিছিমিছি থাকতে হবে না।'

সিদ্ধেশ্বর হাসির রোল তুলিয়া কহিল, 'বেশ ব'ললি যা' হ'ক।' তার পর সে শঙ্করীর আধ-মরা দেহটি বুকের উপর ধরিয়া রাখিয়া বলিল, 'অনেক পাপ ক'রেছি আমরা।—তার প্রতিফল হাতে হাতে পাচ্ছি আর কি, মা।'

শঙ্করী কহিল, 'রাত অনেক হ'য়েছে—আমি ত বেশ আছি—আর রঘু দালানেই শুয়ে থাকে।'

সিদ্ধেশ্বর দাঁড়াইয়া উঠিয়া শঙ্করীর বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিল, 'বুড়োর অনুরোধটা তুচ্ছ করিস নে' মা—আজ রাত্তিরটা প্রাণ ভ'রে দেখ্‌তে দে'।'

শঙ্করী তা'র নির্জীব চোখ দু'টি খুলিয়া রাখিয়া জবাব দিল, 'আপনার শরীরটাও ত দেখা উচিত।'

সিদ্ধেশ্বর দরজার বাহিরে আসিয়া কহিল, 'বেশ, চ'ল্লেম এখন,—ভোর রাত্রে আস্‌ব আবার।'

শঙ্করী তেমনিই শুইয়া রহিল। তা'র মুখখানিতে আজ প্রাণের গোপন কথাটি যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে তা'র এককোঁটা জীবনের মেলাটি আজ চোখের উপর ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ধূলার সমান হইয়া যাইতে দেখিল। কিসের ছল করিয়া যে নয়নজলে তা'কে ডুবাইয়া দিয়া তা'র অন্তরের স্বামী এমনি তীব্র বিষ ঢালিয়া চলিয়া গিয়াছে, তা' শঙ্করী ভাবিতেও পারিল না। তা'র অনেক কালের সঞ্চিত দ্বিধার মাঝখানে সে শুধু এইটিই অনুভব করিবার শক্তি পাইল যে, তাঁর বুঝি আর ফিরিয়া আসিবার কোন উপায় ছিল না! সে বুকের উপর দুই হাত জোড়া করিয়া রাখিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিল। আজ সে নীরবে নির্জ্জনে একেলা থাকিয়াও প্রাণের ব্যথার লেশ মাত্রও অনুভব করিল না। তা'র মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কেমন এক মধুর স্নিগ্ধ তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছিল। সে আঁখির পলকে বিছানা হইতে উঠিয়া মেঝের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। নিতায়ে'র মুখে সে শুনিয়াছিল, সুমুখের ঐ "মণি-জঙ্গলের" ভিতর দিয়া অতি সহজেই নবদ্বীপে পৌঁছান যায়। আজ অনেক পুরাণো দিনের ভাঙ্গা কথাগুলি এক সাথে আসিয়া পড়িয়া তা'র বুকের কাছে, কাণের কাছে জটলা করিতেছিল। যা'র চলা-ফেরার শক্তি ছিল না, সে ত বল ফিরিয়া পাইল! শঙ্করী কাঠ হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তা'র পর সে একখানি কাঁচি লইয়া মাথার সমস্ত চুলগুলি কাটিয়া ফেলিল।

তখনও ভোর হইতে অনেক দেরী। সিদ্ধেশ্বর উঠানে দাঁড়াইয়া হাঁকিতেছিল, 'কি, মা, জেগে র'য়েছ না কি?—এই যে একটু চলা-ফেরা ক'রছ,—তা' বেশ, খুব ভাল।'

সে ঘরের ভিতর আসিয়াই চীৎকার করিয়া বলিল, 'এ কি, চুল কেটে ফেল্‌লে যে?'

শঙ্করী কোন কথা কহিল না।

সিদ্ধেশ্বর মুখ ভার করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'তোর মাথাটাও খারাপ হ'য়ে গেছে, মা?'

শঙ্করী বেশ শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল, 'কি আর ব'ল্‌ব আপনাকে, আমি আর এক দণ্ডও থাক্‌ছি না এখানে।'

সিদ্ধেশ্বর প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া লইয়া কহিল, 'সে আর আমি বুঝি নে'।—কিন্তু নবদ্বীপ যে অনেকটা রাস্তা, মা।'

শঙ্করী আশায় বুক বাঁধিয়া সিদ্ধেশ্বরের পায়ের তলায় মাথা রাখিয়া বলিল, 'আমার শেষের দিনের এ কথাটা আর ঠেলে ফেলে দিও না, কাকা—আমি মেয়েমানুষ হ'য়ে লজ্জা-সরম বিদেয় ক'রেছি।'

সিদ্ধেশ্বরের হাসিটি ছিলই। বলিল, "তা', তুই খুব শক্ত মেয়ে তাই এখনও বেঁচে আছিস্। এতে আর লজ্জার কথা কি আছে রে? তোর পায়ে হাঁটবার ক্ষমতা থাকে ত' আমি তোর হাত ধ'রে নে' যাচ্ছি, চল্।"

শঙ্করী একটু অগ্রসর হইয়া স্পষ্ট স্পষ্ট কহিতে লাগিল, 'শক্তি আর নেই আমার? আমি খুব যেতে পা'র্ব্ব— কাউকে সঙ্গ নিতে হবে না।'

সিদ্ধেশ্বর শঙ্করীর গায়ের চাদরখানা বেশ করিয়া জড়াইয়া দিয়া তা'র হাত ধরিয়া বলিল, "চ', আজ দু'জনেই আমরা এই গাঁ ছেড়ে চ'লে যাই।" তার পর হঠাৎ ঘরের ভিতর হইতে একটা সিন্দুরকৌটা আনিয়া শঙ্করীর সিঁথির উপর সবটা ঢালিয়া দিয়া বলিল, "যা', এই তোর রক্ষে কবচ,—আমি দিচ্ছি।—বুড়ো আজ তা'র কাঁপা-হাতে ক'রে চেপে দেছে। মিথ্যে হবে না।—যা', সাবিত্রী যা', কেউ তোকে ধ'রে রাখ্‌তে পা'রবে না" বলিতে বলিতে সে তা'কে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মাঝে রাখিয়া আবার কহিল, 'এ আমার সাধ ছিল যে, এক দিন তোকে সাজিয়ে এমনি ক'রে বিদেয় দেব :—যা', আর দাঁড়িয়ে থাকিস নে'।' তা'র পর সে নিজের মুখের হাসিকে চ'খের জলে ভাসাইয়া দিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেখান হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

শঙ্করী ত' সেই বনের ভিতর দিয়াই চলিয়াছে! তা'র মুখখানি যেন কোন্ দেবতার সাড়া পাইয়া ফুলের হাসির মত মাতিয়া উঠিল। বনটি পার হইলেই নবদ্বীপ। তা'র মনে হইতেছিল, সে আর এক মুহূর্ত্তও বুঝি বাঁচিবে না। তা'র হাত দু'টি জোর করিয়া মুঠা পাকাইয়া সে প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল।

নিতাইকে বিছানা হইতে টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিয়া সিদ্ধেশ্বর কহিল, 'আর ঘুমোবি কত?—তোর শঙ্করী মা'কে আজ আমি নিজে হাতে ধ'রে বিদেয় ক'রে দিয়ে এলেম।'

নিতাই ঘুমের ঘোরে চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ব'লছ, সিধু কাকা, কিছুই আমি বুঝ্‌তে পারছি না।'

সিদ্ধেশ্বর বেশ হাসিতে হাসিতে আগাগোড়া বলিয়া গেল। তা'র পর খুব জোরে নিতা'য়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, 'আমার চিঠির জবাব দিয়ে যোগেশ লিখেছে যে, সে নিজেই আজ সকালে দেখা ক'রতে আসবে। আমি কি না জেনেই তোর শঙ্করী মা'কে বিদেয় দিয়েছি —পথেই তা'দের দেখা হবে যে।'

নিতাই বলিল, 'আচ্ছা, আমিও যাই।'

শঙ্করী চলিয়াছিল!—একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে পায়ে-পায়ে ছুটিয়া চলিয়াছিল! একবার থমকিয়া দাঁড়াইলে হয় ত তা'র শেষের ক্ষণে সে আছাড় খাইয়া সেখানেই পড়িয়া মরিয়া থাকিবে, সেই ভয়ে শঙ্করী একটিবার পিছনেও তাকাইল না বা দাঁড়াইয়া রহিল না। তা'র দেখা যে হবেই! এ যে কত বড় বিশ্বাস, কত বুক-জোড়া আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া চলিয়াছে সে! তা' কি মিথ্যা হয়! তা'র একটি নিমেষের যাচা প্রার্থনা আজ কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া তা'র সমস্ত ভেঙ্গে যাওয়া, প'চে যাওয়া, নিভে যাওয়া সাধনাকে জাগাইয়া তুলিয়া যে সফল করিবেই! এ তা'র দাবী,—এ তা'র লুকিয়ে-রাখা গরবের সাফল্য! যাইবার প্রয়োজন ছিল না! মরিতে মরিতে, টলিতে টলিতে মুখের রক্তে বুক ভাসাইয়া তা'র ছুটিয়া যাইবার প্রয়োজন ছিল না!—সে ত' চাহিয়াইছিল!—অন্তরের ভিতর হইতে সে তা'র সমস্ত জীবনের পর আজ একটি নিমেষের তরে তার স্বামীকে চাহিয়াছিল!—অপূর্ণ থাকিত না,—কিছুতেই নিষ্ফল হইত না!—তা' হ'লে দয়াল ঈশ্বরের এই সুন্দর ভুবনখানি সতীর গোপন শেষ মর্ম্মশ্বাসে দাহ হইয়া আগুনের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত। শঙ্করী যদি আর একটি পা'ও না চলিয়া সেইখানে রহিয়া যাইত, তা' হ'লেও এই সাজান বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তা'র স্বামীর হাত ধরিয়া আনিয়া তা'র মাথার শিয়রে রাখিয়া যাইত! শঙ্করী সুমুখ পানে তাকাইয়া চলিয়াছিল। তা'র অভিশাপের দিনগুলি বিশ্বরাজের চরণ-স্পর্শে সুখ-হাসিকে সত্য করিয়া নূতন করিয়া আজ জাগাইয়া তুলিবেই! শঙ্করী বন পার হইয়া অনেক দূর গিয়া বুঝিল, সে নবদ্বীপে আসিয়াছে।—আর তা'র শক্তি ছিল? তার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে সেইখানেই জড়সড় হইয়া শুইয়া পড়িল,—শ্রীগৌরাঙ্গের সোণার নবদ্বীপের তীর্থ-ধূলার মাঝখানে সে তার অবশ শিথিল অঙ্গ লইয়া শুইয়া পড়িল!

সিদ্ধেশ্বরের মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে নিতাই চলিয়া গিয়াছিল। সে বন পার হইতে না হইতেই দেখিল, শঙ্করী পড়িয়া গেল। সে প্রাণ ভরিয়া তাহাকে দেখিয়া লইতেছিল।

পাশে দাঁড়াইয়া যোগেশ কহিল, 'কি রে, তুই এখানে? কাকার চিঠি পেয়ে আমি ছুটে যাচ্ছিলুম।—কেমন আছে বল্ ত'?'

নিতাই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উত্তর দিল, 'আর যা'বার দরকার নেই।—তোমার সামনেই শুয়ে র'য়েছে। হয় ত' তুমি মাড়িয়ে চ'লে এসেছ।'

যোগেশের পায়ে মাথায় ভর দিয়া শঙ্করী বলিতেছিল, 'আমায় একটিবার গরব ক'রে ম'রতে দাও।—আর তোমায় কষ্ট দিতে আস্‌ব না!'

যোগেশ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'কি ক'রলে বল ত?'

তা'র পর সে শঙ্করীর মাথাটি কোলের উপর রাখিয়া তার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "ছিঃ, তুমি অভিমান ক'রে নিজের শরীর পাত ক'রলে, শঙ্করী? আমি যে আজ তোমায় নিয়ে সুখী হব ব'লে স্থির সিদ্ধান্ত ক'রে ছুটে চলেছিলাম।"

শঙ্করী যোগেশের পায়ের ধূলা বুকে রাখিয়া জড়ান-স্বরে কহিল, 'এবার যদি হাসিমুখে বিদায় দাও ত' যাই।'

যোগেশ তা'র শঙ্করীর অসাড় হিম দেহখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'যাও তুমি, কিন্তু আমায় ক্ষমা ক'রে যেও না।'

নিতাই তা'র মরা-মা'য়ের পা জড়াইয়া বসিয়াছিল।

দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া সিদ্ধেশ্বর তা'র হাত ধরিয়া কহিল, 'আয়, উঠে আয়, দাদা, আজ আমরা দু'জনেই মাকে হারালেম।'

জীবনভরা।

[শ্রীকালিদাস রায়।]

ঘরটি-জোড়া বিছানাতে, কুলায় নাক আজকে মোর,
একটুখানি ছোট্ট মেয়ে, ঘরটি গোটা চাই যে তোর।
এ কোণ ও কোণ জুড়ে রাখিস্
যেথায় সরি সেথায় থাকিস্
একটী কোণে জড়সড়ো, হয়ে রহি রাত্রি ভো'র,
ঘর-জোড়া এ বিছানাতে, কুলায় নাক আজকে মোর।
বাড়ী-ভরা তোমার পোষাক, বাক্সে যে নাই তিলটি ঠাঁই,
তোমার জামার ইন্দ্রধনুর লীলা ঘরে দেখ্‌তে পাই।
ধূলামাখা একটুকু গায়
এত পোষাক লাগে কোথায়?
পরার জন্য পাঁচটা লাগে, ছেঁড়ার জন্য বিশটা চাই,
মোদের বসন বাইরে ফেলে, তোর পোষাকের দেই রে ঠাঁই।
দিবস-ভরা সকল কাজে, তুই হলি রে একটী মূল,
সারাটি দিন তোর কাজে যে, চলেনাক তিলটি ভুল।
সারা দিনের সব আয়োজন
সাধি শুধু তোর প্রয়োজন,
একটুখানি কাঁদলে পরে, পড়ে গৃহে হুলুস্থুল,
দিবস-ভরা সকল কাজের, হলি রে তুই একটা মূল।
দিবস-ভরা আয়োজনের কথা শুধুই ব'লছি কেন?
মোদের সবার চিন্তাচিত, আগুলিয়া আছিস্ যেন।
জীবন-ভরা সকল কাজে
অশ্রু-হাস্য-ভাষার মাঝে
ভাব্‌ছি আমি কেমন ক'রে খেলাপাতী পাতলি হেন?
বাড়ী-ভরা আয়োজনের, কথা শুধুই ব'লছি কেন?

গ্রন্থ-সমালোচনা।

উপনিষদাবলী।—শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত উপনিষদাবলীর দুই খণ্ড আমরা পাইয়াছি। প্রকাশক মণ্ডলীর উদ্দেশ্য, ১১৫ খানি উপনিষদ অন্বয় টীকা শ্রীশঙ্কর ভাষ্যানুরূপ বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত করিয়া হিন্দু সমাজে বহুল প্রচার করেন। যেমন পকেট গীতা, পকেট চণ্ডী প্রভৃতির আয়তন, এ গ্রন্থ দুইখানির আয়তনও তদনুরূপ অতি সুন্দর মোটা কাপড়ে বাঁধা। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য এক টাকা। দুই খণ্ডে সর্ব্বসমেত ১৮ খানি গ্রন্থ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বড়বাজারের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ধর্ম্মপ্রাণ প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় এই সৎ কার্য্যের প্রধান সহায়। অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গ্রন্থ-প্রচারে সাহায্য করিয়াছেন।

উপনিষদ কি অমূল্য গ্রন্থ তাহা হিন্দুকে বুঝাইতে হইবে না। এরূপ আকারে এমন প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সহ উপনিষদ প্রচারে যে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের একটি বিশেষ অভাব দূর হইতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা হিন্দু মাত্রকেই এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম কি, তাহার প্রকৃত জ্ঞান অর্জ্জন করিতে

ভ্রম-সংশোধন—গত মাসের 'অর্চ্চনা'য় প্রকাশিত "নিঠুর মা" শীর্ষক গল্পের লেখকের নাম শ্রীচণ্ডীচরণ দাস গুপ্ত নহে; তাঁহার নাম শ্রীচণ্ডীদাস গুপ্ত।

গেলে, উপনিষদ পাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য। সুখের বিষয়, এখন শিক্ষিত সমাজ স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান হইয়া উঠিতেছে। মজ্জাগত হিন্দুয়ানীটুকু ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে—তাই হিন্দু-সমাজের আবার গঠন আরম্ভ হইয়াছে। এই উপনিষদগুলি গৃহপঞ্জীর মত ঘরে ঘরে বিরাজ করিয়া অমৃত প্রস্রবণে অন্তর বাহির পবিত্র করিয়া তুলুক, তৎসহ অনুষ্ঠাতৃগণের প্রয়াস সকলতামণ্ডিত হউক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

সৃষ্টিতত্ত্বে পুরাণ ও বিজ্ঞান।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। লেখক জ্ঞানেন্দ্রবাবু বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। সমালোচ্য গ্রন্থে তিনি পুরাণে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। একণে নব্য বিজ্ঞান হিন্দুর পুরাণোক্তি কতটা সমর্থন করিতেছে। বলা বাহুল্য, বিষয়টি অত্যন্ত বিশদ, সুতরাং লেখকের উদ্দেশ্য সফল করিতে অনেক মাল-মসলা, অনেক বিচক্ষণতার আবশ্যক হয়। গ্রন্থকার অশেষ দক্ষতা ও কৃতিত্বের সহিত তাঁহার অভিমতগুলি সিদ্ধ করিয়াছেন। এ গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। আমরা এ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

ইহুদীয়-ধর্ম্ম।—এলাহাবাদের পাণিনি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত জগৎ-তারণ ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলীর এখানি অন্যতম গ্রন্থ। 'পাণিনি কার্য্যালয়ে'র সদনুষ্ঠানের অভাব নাই। সরল আকারে সংক্ষেপে জগতের প্রধান ধর্ম্মমতগুলি সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলে মানুষের মনের সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামী যে কতটা কাটিয়া যায়, তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি অশ্রদ্ধার প্রধান কারণ, অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতা-প্রসূত কুসংস্কার মানব-সমাজকে অনেক পাপে লিপ্ত করিয়াছে। সেই অজ্ঞতা দূর করিবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় জগৎ-তারণ ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলীর প্রকাশ।

"ইহুদীয়-ধর্ম্ম" লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়। পুস্তকখানি সুলিখিত এবং তথ্যপূর্ণ। ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। ইহুদীদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত সকল কথা ইহাতে মোটামুটি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পরিণাম।—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্-এ মহাশয়ের উপন্যাস—পরিণাম, সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ-প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের 'আট আনা সংস্করণে'র অষ্টত্রিংশ গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মহাশয় 'অর্চ্চনা'র পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার সরস লিখনভঙ্গী, এমন কি অনূদিত গল্পগুলিও চিত্তাকর্ষক। "পরিণাম" পাঠে আমরা সুখী হইয়াছি, কারণ 'পরিণামে' পরিণত বুদ্ধি ও পরিমার্জ্জিত রুচির বিকাশ আছে। গল্পাংশ চিত্তাকর্ষক—আরম্ভ করিলে গল্প শেষ না করিয়া, পুস্তক ফেলিবার উপায় নাই। কেবল আদর্শ চরিত্র অঙ্কন না করিয়া নিজ পর্য্যবেক্ষণ ফলে বাস্তব চরিত্র আঁকিয়াছেন বলিয়া গল্পটি মনোরম হইয়াছে। পাঠকগণ 'পরিণাম' পাঠে প্রসন্ন হইবেন। আমরা সরকার মহাশয়ের অন্য উপন্যাস পাঠ করিবার জন্য উদ্গ্রীব রহিলাম।

নিয়তির গতি।—গার্হস্থ্য উপন্যাস, মূল্য ২৲ টাকা। শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত ও ২২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট "অরুণা বুকষ্টল" হইতে প্রকাশিত।

লেখক ইতিপূর্ব্বে তিনখানি গ্রন্থ-রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন যে, বিদেশীয় উপন্যাস অবলম্বন করিয়া তিনি এই উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন। লেখক বলিয়া না দিলে অনেক পাঠকের হয় ত এ কথা বুঝিবার উপায় থাকিত না। বিলাতী গ্রন্থকে মন্থন করিয়া তিনি দেশীয় ভাবে ও ছাঁচে যে চরিত্রগুলি সৃজন করিয়াছেন, তাহাতে বিদেশী গন্ধ নাই। অনেকস্থলে করুণ রসের উদ্দীপনায় অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। ইহা লেখকের শক্তির পরিচায়ক। গ্রন্থান্তর্গত 'হরিহর' 'রাজলক্ষ্মী' 'সুরেশ' 'সতীশ' 'যতীন' প্রভৃতি চরিত্রগুলি বেশ ফুটিয়াছে। 'শৈলবালা' চরিত্রটী গোলমাল হইয়া গিয়াছে মনে হয়। 'যতীন'কে না মারিলে সতীশ জমিদার হইতে পারিত না বটে, কিন্তু গ্রন্থের উপসংহারটুকু আরও মধুর হইত। অথচ 'সতীশ'কে 'মায়া'য় বাঁধিয়া তাহার অন্য রকমে সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান করা ঔপন্যাসিকের পক্ষে দুরূহ হইত না।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ২।১টী ত্রুটী থাকিলেও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, উপন্যাসখানি আগ্রহোত্তেজক; পাঠ করিতে বসিলে শেষ করিতেই হয়। ভাষা প্রাঞ্জল। স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই ইহা পাঠ করিয়া জ্ঞান ও আনন্দলাভ করিতে পারিবেন।

সাধের বৌ—উপন্যাস, মূল্য ১৲ টাকা—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও 'শিশির পাবলিশিং হাউস' (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট) হইতে প্রকাশিত।

আমরা পুস্তকখানি উপহার পাইয়াছি, কিন্তু ইহার পরিচয় দিব না, কারণ 'মুখবন্ধে'ই গ্রন্থের গ্রন্থকার আমাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমার তিনখানা বহি লেখা শেষ হইলে পাঠকগণ আমার লেখার ভাল মন্দের বিচার করিবেন। ক্ষেত্র নূতন, বিষয় নূতন, বিষয়ীভূত নরনারীর চরিত্র নূতন।" তথাস্তু, আমরাও সুতরাং নির্ব্বাক। তবে এটুকু বলিয়া রাখি যে, বহুদিন পরে উপন্যাসে পাকা হাতের সরস প্রাঞ্জল রচনা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে।

একটী মজার কথা।—পুস্তকের আবরণীতে গ্রন্থকারের 'বন্দ্যো'র '্য'টা খসিয়া পড়িয়াছে।

শুনিয়াছি, গ্রন্থখানি '১৲ টাকা সংস্করণের গ্রন্থে'র অন্তর্ভুক্ত। তাহা হইলে বলিতে হইবে, 'শিশির পাবলিশিং হাউস' বাজীমাৎ করিয়াছে। কারণ—১৲ টাকা মূল্যের গ্রন্থে এমন শিল্পের বর্ণাকর-রঞ্জিত আবরণী এবং এত উৎকৃষ্ট ছাপা ও কাগজ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। গঠন, কলেবর ও পারিপাট্যের হিসাবে মূল্য যে অত্যন্ত সুলভ, তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি। এই নবীন গ্রন্থপ্রকাশালয়ের প্রয়াস সফলতামণ্ডিত হউক, ইহা আমাদের আন্তরিক কামনা।

'রত্ন'-প্রসঙ্গ।

তৃতীয় প্রস্তাব। *

[অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

কার্ত্তিকী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর সায়ং সময়ে মূর্ত্তিমান্ ন্যায়শাস্ত্র মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় কাশীধামে দেহত্যাগ করেন। মণিকর্ণিকার ব্রহ্মনালে বিষ্ণুপাদপদ্মে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হয়,—সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রও বুঝি চিরদিনের জন্য ভস্মীভূত হইয়া গেল। আজ তাঁহার মৃত্যু-তিথিতে সেই মহাপুরুষ সংক্রান্ত নানা স্মৃতি, হৃদয়ে জাগরূক হইতেছে!

ন্যায়রত্ন মহাশয়, তাঁহার জীবনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ন্যায়শাস্ত্রকে যে কি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাহা আমরা বর্ণনা করিতে পারি না। একনিষ্ঠ সাধক যেমন ইষ্টদেবতার ধ্যান করে, ন্যায়রত্ন মহাশয়, তেমনই অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে ন্যায়শাস্ত্রের চিন্তা করিতেন। এই শাস্ত্রচিন্তা, তাঁহার হৃদয়ে এমনই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল যে, অন্য কোনও বৈষয়িক চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইত না। এই শাস্ত্র-চিন্তা-ব্যসনের মাহাত্ম্যেই তিনি একমাত্র পুত্রের বিয়োগ-ব্যথা ভুলিতে পারিয়াছিলেন। পুত্র বিয়োগের পর ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিতেন,—"ন্যায়শাস্ত্রে এইরূপ অতিমাত্র আসক্তি ছিল বলিয়াই আমি হরকুমারের শোক ভুলিতে পারিয়াছি। নতুবা এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকে আমাকে বড়ই কাতর করিয়া ফেলিত। ভগবান্‌কে তেমন একাগ্রভাবে সর্ব্বদা ভাবিতে পারি না যে, তাহার প্রভাবে সমস্ত শোকদুঃখের আক্রমণ অতিক্রম করিতে পারিব।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় এইরূপ একাগ্রচিত্তে শাস্ত্রের অনুধ্যান করিতেন বলিয়া এই শাস্ত্র-সংক্রান্ত অনেক নিগূঢ় রহস্য তিনি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের বহু গ্রন্থের তিনি এমন সকল অভিনব পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবন করিয়াছেন, ন্যায়রত্নমহাশয় ভিন্ন আর কেহই তাহার উত্তর করিতে সমর্থ হন না।

কেবল বিদ্যাবত্তাই যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গুণ ছিল তাহা নহে,—গুণবানের যথোচিত আদর তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির জন্য ন্যায়রত্ন মহাশয় আজীবন তাঁহাকে পরম স্নেহ করিতেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে ন্যায়রত্ন মহাশয়, নিজের বাটীতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তাতীয়া শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিত-মণ্ডলী লইয়া সভা করিয়া তর্করত্ন মহাশয়কে 'কবিসম্রাট' উপাধি দিয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় এই উপলক্ষে যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।—

"নবকাব্যচয়ঃ কৃতস্ত্বয়া
দ্বিজবিদ্বদ্বর যাদবেশ্বর।
ইতি সৎসমিতৌ ময়াদ্য তে
'কবিসম্রাট্' উপনাম দীয়তে।"

"হে যাদবেশ্বর, তুমি অভিনব কাব্যসমূহ রচনা করিয়াছ এবং বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই আজ এই পণ্ডিত-সভায় আমি তোমাকে 'কবিসম্রাট্' উপাধি দিতেছি।"

সংস্কৃত বিদ্যায় অনুরক্তি ও কবিত্বশক্তির জন্য নাটোরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরকেও ন্যায়রত্ন মহাশয়, যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। মহারাজ বাহাদুরকেও তিনি "ভূদেববান্ধব" ও ভুবাচস্পতি" এই উপাধিদ্বয়ে ভূষিত করিয়াছিলেন।

যে কোনও গুণবান্, ন্যায়রত্নমহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ন্যায়রত্ন মহাশয়, তাঁহাদের সকলকেই যথোচিত সমাদর করিয়াছেন। নাটোরের মহারাজের মুখে শুনিয়াছি, একবার এক জ্যোতির্ব্বিদ্ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার পুত্রকে বলেন, 'ইহাঁকে দুইটী টাকা দাও।' জ্যোতিষী সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরিয়া যাইবার পর পুত্র হরকুমার, ন্যায়রত্ন মহাশয়কে বলেন: 'বাবা আপনি [illegible]

* প্রথম প্রস্তাব, ১৩২৩ সালের ভাদ্র-সংখ্যা 'অর্চ্চনায়' ও দ্বিতীয় প্রস্তাব ১৩২৫ সালের কার্ত্তিক-সংখ্যা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে।

জ্যোতিষশাস্ত্রব্যবসায়ীদিগকে বিশ্বাস করেন না, তবে যে এই লোকটীকে টাকা দিলেন ?' ন্যায়রত্ন মহাশয় উত্তর করেন,—আমি বিশ্বাস করি, আর না করি, লোকটী যখন সাগ্রহে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে, তখন তাহার যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা না করা কি আমার উচিত ?"

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই গুণগ্রাহিতার জন্য যে কোনও সজ্জন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, সকলেই তাঁহার সদ্ব্যবহারে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

ন্যায়রত্নমহাশয়, তাঁহার ছাত্রদিগকে অত্যন্ত ভাল ভালবাসিতেন। যে বেশী ভালবাসে, তাহার ভালবাসার সামান্য ত্রুটি অনুভব করিলেও হৃদয়ে বড় আঘাত লাগে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সর্ব্বপ্রধান ছাত্র, বর্ত্তমান ভারতবর্ষের গৌতমাবতার, মূলাযোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়, কোনও একটী ঘটনায় গুরু-কৃপার ন্যূনতা অনুমান করিয়া আক্ষেপপূর্ব্বক অধ্যাপক ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন,—

'শ্রীশ্রীদুর্গা'
শরণম্

ভট্টপল্লীতঃ

ভৃত্য শ্রীশিবচন্দ্রসার্ব্বভৌমঃ সকরুণং নিবেদয়তি—
আবাল্যাদ্ গুরুসেবনেন মনসা কায়েন বাচা তথা
কালং নীতবতোঽস্ত ভাগ্যরহিতস্যাল্পাবশেষং বয়ঃ।
অদ্যাপীহ কৃপা কৃপানিধিগুরোর্নাসাদ্বি সম্যঙ্ ময়া
মন্যে জন্ম জগত্যজাগলকুচস্যেবার্থহীনং মম॥"

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অন্যতম প্রতিভাশালী ছাত্র, কোটালীপাড়ানিবাসী ৺দ্বারিকানাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় বলিয়াছেন,—"যখন ভাটপাড়ায় থাকিয়া পড়িতাম, তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একদিন ছাত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ তোমরা এক কাজ করিও—মধ্যাহ্নে আহারের ত বিলম্ব হয়, সকালে তোমাদের জল না খাইলে কষ্ট হইবে। আমি এই টাকা দিতেছি, ইহা দিয়া ছোলা কিনিয়া আনিয়া ভিজাইয়া রাখিও। গুড় ত বাড়ীতেই কেনা আছে। ঐ নীচের কোণের ঘরে গুড় থাকে, তোমরা নিজেরাই গিয়া লইয়া আসিও। তবে প্রত্যহ একটা নাগ্‌রী হইতে গুড় লইও না—টের পাইয়া কে আবার কি বলিবে—আজ এটা হইতে কাল ওটা হইতে এইভাবে গুড় নিও, তাহা হইলে কোনও নাগ্‌রীই আর শীঘ্র খালি হইবে না।"

"ন্যায়রত্ন মহাশয় ছাত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া খাইতে বসিতেন। পাতে যে সব তরকারী দেওয়া হইত, প্রথমেই তাহার প্রত্যেকটা হইতে কিছু কিছু চাকিয়া দেখিতেন। যে তরকারীটা সুস্বাদ হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে বেশী করিয়া আনিয়া দিতে বলিতেন। খাইতে বসিয়াই আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'ঘি দিয়াছে ?' যদি কোনও দিন বলিতাম, 'না,' তাহা হইলে বলিতেন, ডালের ভিতরে মিশাইয়া ঘি আনিয়া দাও।' উচ্ছিষ্ট পাত্রে কেবল ঘৃত দেওয়া নিষিদ্ধ, তাই ঐ ভাবে ঘি দিতে বলিতেন।"

আমাদের সময়েও ন্যায়রত্নমহাশয়ের অকৃত্রিম ছাত্রস্নেহ দেখিয়া বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়াছি। একবার তিনি একটী কার্য্যের জন্য আমাকে কোনও স্থানে যাইতে বলেন। তখন বেলা ৩টা। ফিরিয়া আসিয়া আমার পড়িবার কথা ছিল। সেই সময়ে পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত বটুকনাথ কাব্য তীর্থ এম-এ, বি-এল, ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র কাব্যস্মৃতিমীমাংসা তীর্থ কাশীতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাটীতে পূজার অবকাশ উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। আমি যাইবার সময়ে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাই। পথে "বসুমতী"র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শাস্ত্রীর সহিত দেখা হয়। তখন তাঁহারা পরামর্শ করিলেন, ভাল একায় চড়িয়া কাশীর সহরের বাহিরের দিকে বেড়াইতে যাইতে হইবে। আমাকেও যাইবার জন্য তাঁহারা বিশেষ অনুরোধ করিলেন। আমারও কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল, নূতন আমোদের প্রলোভনে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আদিষ্ট কার্য্য উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের সহিত বেড়াইতে গেলাম। মনে করিয়াছিলাম, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিতে পারিব। কিন্তু আমরা যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন

রাত্রি ৮টা। বড় ভয় হইল। তাড়াতাড়ি তাঁহার বাড়ীর দিকে যাইতেছি। একটা গলির মোড় ফিরিয়াই দেখি, সেই নবতিবর্ষদেশীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। সঙ্গে লণ্ঠনহস্তে তাঁহারই বাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী ছাত্র শ্রীযুক্ত গয়াদত্ত ত্রিপাঠী। ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাকে দেখিতে পাইয়া দাঁড়াইলেন। মনে করিয়াছিলাম, খুব বকিবেন। কিন্তু তিনি বেশী কিছু বলিলেন না—শুধু বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিলেন,—"ছি! ছি! তুমি এমন অবোধ!" যদিও তিনি বেশী কিছু বলিলেন না, তথাপি সে দিন ভয়ে ও লজ্জায় তাঁহার সহিত যাইতে পারিলাম না—বাড়ীতেই ফিরিয়া আসিলাম।

ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রতিবৎসর ৺পূজার সময়ে বাড়ীর পরিজনবর্গের ন্যায় ছাত্রদিগকেও কাপড় কিনিয়া দিতেন। বিদেশী ছাত্রেরা ত তাঁহার বাড়ীতেই খাইত, আমাদিগকেও মাসের মধ্যে ১০।১২ দিন তাঁহার বাড়ীতে খাইতে হইত। কোনও একটা ভাল জিনিষ রান্না হইলেই তিনি আমাদিগকে খাইতে বলিতেন। সন্ধ্যার পর পড়িতে আরম্ভ করিয়া হয় ত বেশী রাত্রি হইয়া গেল, অমনই ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন, "এইখানেই লুচী ও আলু ভাজা হউক, খাইয়া যাও।"

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অন্যতম ছাত্র, কাশীর খ্যাতনামা নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত শ্রীশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, "আমি যখন কাশীতে অধ্যয়ন করি, তখন আমার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। ন্যায়রত্ন মহাশয় খাইতে দিলেও অন্যান্য খরচের জন্য সময়ে সময়ে খুবই অভাবে পড়িত হইত। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রসাদে অল্পকাল মধ্যেই আমার সকল অভাবই দূর হইল। কাশীতে যেখানেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রণ হইত, সেই সমস্ত স্থলেই যাহাতে আমি একটি 'বিদায়' পাই, তাহার ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিতেন। কোনও কোনও স্থানে তিনি এমনও বলিয়াছেন, "দেখ, আমি প্রতিগ্রহ করিলে আমাকে ত একটা 'বিদায়' দিতে, সেই 'বিদায়'টা শঙ্করকে দাও।"

ছাত্রেরা পাঠসমাপ্তির পর যাহাতে ভাল অধ্যাপক-পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এজন্য ন্যায়রত্ন মহাশয় সবিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার অনেক ছাত্র তাঁহারই চেষ্টায় বিবিধ সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্র ৺কালীকুমার তর্কতীর্থ মহাশয় ন্যায়রত্ন মহাশয়েরই চেষ্টায় জয়পুর সংস্কৃত কলেজের প্রধান নৈয়ায়িকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

অনেক স্থলে দেখা যায়, পাঠাবস্থাতেই গুরুর সহিত ছাত্রদের সম্বন্ধ, পাঠ সমাপ্তির পর কর্ম্মজীবনে অনেক ছাত্রই গুরুর সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখেন না। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্রেরা এরূপ নহে। তাঁহার সকল ছাত্রই পত্রাদি দ্বারা বা মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সংবাদ লইতেন। নাটোর-মহারাজের সভা-পণ্ডিত, উত্তর বঙ্গের প্রধান দার্শনিক, ৺পীতাম্বর তর্কালঙ্কার মহাশয় ন্যায়রত্ন মহাশয়কে মাসে ২।৩ বার পত্র লিখিতেন। বর্দ্ধমান-বিজয় চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ৺বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ন্যায়শাস্ত্রের পরীক্ষায় প্রধানভাবে উত্তীর্ণ ছাত্রকে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নামে রৌপ্যপদক পুরস্কার দিতেন। একবার বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্বয়ং এই পদক বিতরণ করিয়াছিলেন। পূষণ মিশ্র নামে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের একটী ছাত্র ছিল, গঙ্গার এদিকের জল অপরিষ্কার বলিয়া সে প্রত্যহ অসি হইতে ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গঙ্গাজল আনিয়া দিত। এই সকল গুরুভক্তির মূলে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অনন্যসামান্য ছাত্র প্রীতি নিহিত ছিল।

নাটোরের মহারাজ বাহাদুর, ন্যায়রত্নমহাশয়ের সাক্ষাৎ ছাত্র না হইলেও ছাত্রের ছাত্র। মহারাজ বাহাদুর ন্যায়রত্নমহাশয়কে কিরূপ ভক্তি করিতেন, নিম্ন লিখিত পত্রাংশ পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারা যায়। মহারাজকুমারের বিবাহের সময়ে ৺পীতাম্বর তর্কলঙ্কার মহাশয় ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন,—

"আপনার স্নিগ্ধাশীর্ব্বাদ-পত্রে মহারাজ বাহাদুর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আপনাকে শত শত নমস্কার জানাইতে বলিয়াছেন। তাঁহার মাতৃক্রিয়ার সময় হইতেই আপনাকে স্পেশাল ট্রেণে লইয়া আসিয়া সভাস্থ করিবার জন্য বলিতেছেন। আমার নিকট তাহা ভাল বিবেচনা না হওয়ায় তদ্বিষয়ে উদ্যোগ করি নাই। বিস্তারিত শ্রীমান্ প্রমথনাথ তর্কভূষণ ভায়ার পত্রে অবগত হইবেন।"

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের একটা জাতীয় অভিমান ছিল। তাঁহাদের পাঠ্যাবস্থায় ছাপা সংস্কৃত পুস্তকের উদ্ভব হয় নাই; তাঁহারা হাতের লেখা পুঁথি দেখিয়াই পড়িয়াছেন। কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন—সবই তখন হাতে লিখিয়া বা ঘরে প্রাচীন লিখিত পুঁথি থাকিলে তাহা দেখিয়া পড়িতে হইত। কাজেই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দেব নাগর অক্ষর পরিচয়ের সুযোগ হয় নাই। পরে তিনি চেষ্টা করিলে যে দেবনাগর অক্ষর শিখিতে না পারিতেন, তাহা নহে; কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিয়াই দেবনাগর শেখেন নাই। তাঁহার অভিমান ছিল, আমরা বাঙ্গালী, আমরা কেন বঙ্গীয় লিপি ভিন্ন বিজাতীয় লিপি ব্যবহার করিব? তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থের মধ্যে "তত্ত্বসার"ও"বিবিধ-বিচার" তিনি বঙ্গাক্ষরেই ছাপাইয়াছিলেন। আমাদের অনুরোধক্রমে "অদ্বৈতবাদ খণ্ডন" প্রভৃতি গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জাতীয় অভিমান, এতই উচ্চ ছিল যে তিনি হিন্দুস্থানী বড় বড় পণ্ডিত বা রাজা-মহারাজের সহিত কথোপকথনের সময়ে বাঙ্গালা ভাষারই ব্যবহার করিতেন, কদাচ হিন্দী বলিতেন না। আমরা কখনও হিন্দী কথা শিখিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন,—"হিন্দুস্থানীদের সহিত কথা কহিবার জন্য যদি হিন্দী শিখিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের সহিত কথা কহিবার জন্য উহারাই কেন বাঙ্গালা শিখুক না।"

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইয়াও ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যেরূপ দানশীলতা ছিল, তাহা আজ কাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি অনেক দুঃস্থ ব্যক্তিকে নিয়মিত মাসিক বৃত্তি দিতেন। কাশীধামে বৎসরে দুইবার তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিতেন। কাশীতে অনেক ধনবানের বাটীতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ আহূত হইতেন। ভ্রমক্রমে যদি কোনও যোগ্য ব্যক্তির নিমন্ত্রণ করা না ঘটিত তাহা হইলে ন্যায়রত্ন মহাশয় শেষে উদ্বোধ হইলে তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া নিজ হইতে টাকা দিয়া বলিতেন, "তোমাদের বিদায় আমি লইয়া আসিয়াছিলাম।' এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, ন্যায়রত্ন মহাশয় নিজের টাকা দিতেছেন, ইহা জানিতে পারিলে সেই সকল পণ্ডিতের কখনই টাকা লইবেন না। ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রায়ই এইভাবে অনেক টাকা দান করিয়াছেন। পিতৃমাতৃদায়ে বা কন্যাদায়ে তাঁহার কাছে কেহ কিছু প্রার্থনা করিতে আসিলে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। এমন কি, অনেককে তিনি এত অধিক সাহায্য করিতেন, যাহাতে তাহাকে আর অন্যের দ্বারস্থ হইতে হইত না।

ন্যায়রত্ন মহাশয়, শুষ্ক দার্শনিক ছিলেন না, সাহিত্যের সুকুমার বিভাগে ও তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। সংস্কৃত ভাষায় তিনি কিরূপ শক্তিসম্পন্ন কবি ছিলেন তাহা তৎকৃত "কবিতাবলী," "রসরত্ন" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায়। তাঁহার "অদ্বৈতবাদখণ্ডন" প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থের গদ্য সরস ও প্রাঞ্জল। ন্যায়রত্ন মহাশয় খাঁটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও কখনও বাঙ্গালা ভাষাকে অবজ্ঞা করেন নাই। তিনি সাদরে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন করিতেন। অধ্যাপনা শেষ হইলে প্রায় প্রত্যহই তাঁহাকে ছাত্রগণ, বাঙ্গালা সাময়িক পত্র পড়িয়া শুনাইতেন। এই অবসর সময়ে ন্যায়রত্ন মহাশয়, উপহৃত বাঙ্গালা পুস্তকও শ্রবণ করিতেন। তবে তিনি প্রাচীন রীতিরই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, দাশরথি রায়, বাঙ্গালা ভাষার একজন প্রধান কবি। তিনি বলিতেন, "দাশুরায় বাঙ্গালার বেদব্যাস।" "বঙ্গবাসী" হইতে প্রকাশিত দাশুরায়ের পাঁচালীর ভূমিকায়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের লিখিত যে পত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, দাশুরায়ের প্রতি তাঁহার কিরূপ অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল।

১৩২০ সালের বৈশাখ-সংখ্যার "সাহিত্যে" খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর, "দাশরথি রায়" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"রাখাল দাসের বয়সের বাঙ্গালী পণ্ডিত এখন আর কেহই জীবিত নাই। * * *

"গত ১৩১৭ সালের মাঘ মাসে আমি কাশীধামে শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দর্শন লাভ করি। দাশরথির সম্বন্ধে দুটী কথা তাঁহার নিজের মুখে শুনিব, ইহাই ইচ্ছা ছিল। দাশরথির নাম করিতেই এই ঋষিপ্রতিম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইল, এবং আমি দাশরথির অনুকূলে দুই একটী কথা বলিতেই তিনি

যে ভাবে আমার মস্তকে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তুমি দাশরথিকে কবি বল! আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হও।" ইহার অর্থ এই যে, আমাদের শ্রেণীর লোক দাশরথিকে কবি বলিতে সম্মত নহেন। পূজ্যপাদ ন্যায়রত্ন মহাশয় পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন যে, আমি একজন সামান্য রাজকর্ম্মচারী এবং কিঞ্চিৎ ইংরাজী জানি। তাঁহার যেন মনে হইল যে, আমি দাশরথির প্রশংসার্থ দুটী কথা কহিয়া তাঁহার শ্রেণীর পণ্ডিত মণ্ডলীর সম্মান বর্দ্ধন করিলাম! বৃদ্ধ যুবকের উৎসাহ ও আনন্দের সহিত দাশরথির দুই তিনটী গান উদ্ধৃত করিয়া আমাকে তাহার সৌন্দর্য্য বুঝাইয়া দিলেন।

"বঙ্গে এই শ্রেণীর লোক অবশ্যই বিরল হইয়া আসিতেছেন। আমাদের শিক্ষা অন্তরূক। কিন্তু তাহা হইলেও ইঁহারা কাব্যের দোষ গুণ বিচারে অক্ষম, ইহা বলা যায় কি? ইঁহাদের সকলেরই মতে দাশরথির পাঁচালী উচ্চ অঙ্গের কাব্য।"

ন্যায়রত্ন মহাশয়, দাশরথির পাঁচালীকে এতই উচ্চ অঙ্গের কাব্য মনে করিতেন যে, তিনি বহুবার বলিয়াছেন, "আমার এই যে যৎকিঞ্চিৎ কবিত্ব, ইহা দাশুরায়ের প্রসাদে। দাশুরায়ের পাঁচালী শুনিয়াই আমার কবিতা রচনার শিক্ষা হয়।"

পরবর্ত্তী কালের কবিদিগের মধ্যে তিনি কবিবর হেমচন্দ্র ও নাট্য-সম্রাট্ গিরিশচন্দ্রের প্রশংসা করিতেন। মানকুমারীর কবিতাও তাঁহার খুব ভাল লাগিত।

মৃত্যুর বছর দুই পূর্ব্বে আমরা তাঁহাকে একবার রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনাইয়াছিলাম। প্রথম "উর্ব্বশী" শুনাই। তিনি অপ্রিয় সমালোচনা করিলেন। তা'র-পর, "মদন ভস্মের পূর্ব্বে" পড়িলাম। তাহাও তাঁহার ভাল লাগিল না। পরে যখন, "দুই বিঘা জমী," "পুরাতন ভৃত্য", "মরণ," শিশুর "জন্মকথা" ও "বিদায়" পড়ি, তখন ন্যায়রত্ন মহাশয় যেন বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "রবীন্দ্রনাথের এত কবিত্ব! কাব্যবিশারদের "মিঠেকড়া" শুনিয়া আমার ধারণা ছিল যে, রবীন্দ্রনাথের সব কবিতাই বুঝি 'কড়ি ও কোমলে'র মত বিশেষত্বহীন। আমার ইচ্ছা হইতেছে, আমি আজই রবীন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পত্র লিখি। যথার্থই রবীন্দ্রের মত কবি দুর্ল্লভ।"

ন্যায়রত্নমহাশয়, অমিত্রাক্ষর ছন্দের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই জন্যই মধুসূদনের "মেঘনাদবধ" কাব্য তাঁহার কাছে ভাল লাগিত না *।

ন্যায়রত্ন মহাশয়, প্রথম জীবনে দাশুরায়ের অনুকরণে 'আগমনী' নাম দিয়া কতকগুলি বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়াছিলেন। আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গালা রচনার নমুনা দেখাইবার জন্য এই 'আগমনীর' প্রথমাংশ হইতে কৈলাস বর্ণনার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

"কৈলাস সর্ব্ব-প্রধান যথায় বিরাজমান
মহাসনে শঙ্কর শঙ্করী;
স্বর্গতো অতি সামান্য ব্রহ্মলোক নহে মান্য,
গণ্য নহে গোলোক-নগরী।
যে স্থানের বিল্ববনে বিজনে একাগ্রমনে
যোগ-বাক্য বিরূপাক্ষ-মুখে,
শুনিয়া কালবারিণী মহাকাল-কুটুম্বিনী
নিমগন অগণন সুখে।

* * * *

"পুরের চৌদিক ঘেরি' কল্পবৃক্ষ সারি সারি
অমান্য সামান্য তরুমত,
যে স্থানে করেন দান ভগবতী, ভগবান্
চতুর্ব্বর্গ-ফল অবিরত।
যে স্থানের অণুমাত্র ছায়া বারাণসী-ক্ষেত্র
যা' হ'তে পবিত্র স্থান নাই,

* "একদা কতিপয় যুবক তাঁহার বিশ্বাস অপনোদন করিবার জন্য তাঁহাকে 'মেঘনাদ বধ' কাব্য শুনাইতে বসে। কিছুক্ষণ শুনিলে পর তাহারা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতামত জিজ্ঞাসা করিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় অধিক কথা না বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন।"

"নব্যাং নব্যমণিভূষজিত পাদযুগ্মাং
বিদ্যায় বঙ্গকবিতাং নবসভ্যসেব্যাম্।
একত্র ন পুরমিতাং বলয়ং পরত্র
পাদে চ সর্ব্বজনতীং যুবতিং স্মরামি॥"
"কাশীবাস," ১৯৬ পৃঃ।

যে বারাণসী নগরে বালেতে বাসনা করে
সুর নর কিন্নর সবাই।"

ন্যায়রত্ন মহাশয়, যে যুগে এই বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়াছিলেন সে সময়ে মিলের প্রতি তেমন লক্ষ্য রাখা হইত না,—'র' এ 'র' এ মিল থাকার জন্য 'হারে'র সঙ্গে 'নুপুরকে'ও মিলান হইত। তখন উপান্ত্য বর্ণের মিল, ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। কিন্তু উপান্ত্য বর্ণের মিল না থাকিলে যে কবিতার ছন্দের মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়, তাহা অনেকে বুঝিতেই পারেন না। আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যে কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, তাহার মিল লক্ষ্য করিবার বিষয়। দুইটী স্থান ছাড়া কোথাও অধম মিল নাই। যে দুইটী স্থানে উপান্ত্য বর্ণের মিল নাই, তাহাও রচনার মাধুর্য্যের জন্য কাণে সহজে ধরা পড়ে না।

এইবার ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শেষ বয়সের একটী বাঙ্গালা কবিতা উদ্ধৃত করিব। তাঁহার একমাত্র পুত্র বিদ্বান্ গুণবান্ হরকুমার শাস্ত্রীর অকাল বিয়োগ হইলে তিনি তাঁহার আরাধ্য দেবতা শঙ্করের চরণোপান্তে নিবেদন করিয়াছিলেন!

"যে হরকুমার মম একমাত্র সুত,
রূপেতে কুমার-সম সর্ব্বগুণযুত।
হে শিব যতনে অতি তোমারি সেবায়
বারশ বিরাশী সালে তার জন্ম হয়।
বত্রিশ বরষে তা'রে হরণ করিলে,
হৃতাপহারীর দোষ কেন স্বীকারিলে?
আশুতোষ, তব দোষ নহে এ সকল,
বিচারে বুঝিনু সব নিজ কর্ম্মফল।
যা হ'বার হইয়াছে, সে কথা বৃথাই,
ভব তব সন্নিধানে এই ভিক্ষা চাই,
দীনবন্ধু দয়াময় নাম তুমি ধর,
এজন্য মনের আশা জানায় কিঙ্কর।
ওহে বিশ্বরূপ, মম পুত্ররূপী হ'য়ে,
হেসে এসে ব'স যদি দাসের হৃদয়ে,
তবে ত বাঁচিতে পারে তব পদাশ্রিত,
হ'য়েছে জীবন্মৃত হারাইয়ে সুত।"

এই শোক-কবিতা, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ৭৭ বৎসর বয়সের সময়ে রচিত। কবিতাটীতে ভাব বা ভাষার কোনও আড়ম্বর নাই, অতি স্বাভাবিকরূপে হৃদয়ের অরুন্তুদ বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এইবার ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গদ্য প্রবন্ধের নমুনা দেখাইব। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'ডায়েরী'তে স্বর্গত মহাত্মা ভূদেব বাবু লিখিয়াছিলেন, "২৭।৯।৭৮ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দ্বারা প্রেরিত প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছে।" ভূদেব বাবুর উপযুক্ত পুত্র, খ্যাতনামা মনীষী রায় শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি-এল বাহাদুর, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রতি এতই শ্রদ্ধাবান্ যে, তিনি তাঁহার পিতৃদেবের 'ডায়েরী' অনুসারে সেই ৪১ বৎসর পূর্ব্বের "এডুকেশন গেজেট"র ফাইল খুঁজিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন। মুকুন্দবাবু বলেন, "এডুকেশন গেজেটে" প্রকাশের জন্য ত কত প্রবন্ধ আসে; কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রতি বাবার এতই ভালবাসা ছিল যে, তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল কি না, তাহার সন্ধান করিয়াছেন এবং নিজের দৈনিক লিপিতে তাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন।" শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবুর অনুগ্রহে বাঙ্গালা ১২৮৫ সালের ১২ই আশ্বিন তারিখের সেই পুরাতন এডুকেশন গেজেট, আমার হস্তগত হওয়ায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সেই লেখাটী উদ্ধৃত করিতে পারিলাম।

"ভাটপাড়ায় রমাবাই।"

"মহাশয়! বিগত ৫ই আশ্বিন শুক্রবার সুপ্রসিদ্ধ কর্ণাটী মহিলা শ্রীমতী রমাবাই ভাটপাড়ানিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের বাটীতে আগমন করিয়াছিলেন। রমাবাই-এর ভ্রাতা পণ্ডিত শ্রীনিবাসও তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। এই উপলক্ষে উক্ত শিরোমণিমহাশয়ের বাটীতে একটী বৃহৎ পণ্ডিত সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভাতে ভাটপাড়ানিবাসী অষ্টাদশ পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বিদ্যারত্ন, সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন, উক্ত শিরোমণি মহাশয়ের পুত্রদ্বয়, শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন (প্রধান স্মার্ত্ত), শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র তর্করত্ন

(নৈয়ায়িক), ব্যাকরণশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত দিগম্বর তর্কসিদ্ধান্ত, এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। উক্ত শিরোমণি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্র লাহোর সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রীও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

"সভাতে রামবাই অধিরোহণ করিবামাত্র সমুদয় পণ্ডিত-মণ্ডলী সানন্দে একস্বরে স্বাগত-পৃচ্ছা করিলেন, তদনন্তর শিরোমণিমহাশয়ের কনিষ্ঠ পৌত্র শ্রীযুক্ত শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্য এই শ্লোকগুলি পাঠ করিলেন।

* * * *

ইহার উত্তরে রমাবাই ৫।৭ মিনিটের মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটী শ্লোক রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন।

* * * *

অনন্তর রাখালদাস ন্যায়রত্ন একটী সমস্যা দিলেন। যথা—

"বেদপ্রয়োগো দ্ব্যণুকস্য কার্য্যতা"

সমস্যা পূরণ করিতে রমার অদ্ভুতশক্তি ; লিখিতে যা বিলম্ব। ৫।৬ মিনিটের মধ্যে রমা ইহার পূরণ করিলেন। যথা—

নৈয়ায়িকঃ কোঽপি বিবাদ আহ ভোঃ
ন গোতমোঽস্তীতি বিপক্ষমাত্তধীঃ।
ন্যায়ে কিলান্যায্যমতে বিভাগশো
বেদপ্রয়োগো দ্ব্যণুকস্য কার্য্যতা ॥

অনন্তর পণ্ডিতমণ্ডলী শ্রীমদ্ভাগবতের যে স্কন্ধের যে অধ্যায়ের যে কোন শ্লোকের একপাদমাত্র আবৃত্তি করিবামাত্র রমা কোকিলবিনিন্দিত কোমলকণ্ঠে সম্পূর্ণ শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া সংস্কৃত ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় ১।০ ঘণ্টাকাল রমা অসীম গুণবত্তাদ্বারা ভট্টপল্লীস্থ পণ্ডিতগণের সন্তোষসাধন করিয়া স্ত্রীসুলভ কোমলাঙ্গতাবশতঃ পরিশ্রান্ত হইলে পণ্ডিতগণ সভা ভঙ্গ করিলেন।

পরে শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় একখণ্ড নূতন বনাত পারিতোষিক প্রদান করিলেন। রমার ভ্রাতা লাহোরে হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য পাথেয় ব্যয় বা অন্য কোন খরচ লইলেন না।

শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবু বলেন, "এই সন্দর্ভটী অন্যের লিখিত হইলে কখনই "অনন্তর রাখালদাস ন্যায়রত্ন একটী সমস্যা দিলেন।"—এভাবে লেখা থাকিত না, নামের পূর্ব্বে কোনও বিশেষণ না থাকিলেও অন্ততঃ 'শ্রীযুক্ত' ও শেষে 'মহাশয়' থাকিত। সুতরাং ন্যায়রত্ন মহাশয় অন্যের লিখিত প্রবন্ধ প্রেরণ করেন নাই, ইহা তাঁহার নিজেরই লিখিত।"

একজন সে কালের খাঁটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাঙ্গালা ভাষায় কিরূপ অধিকার ছিল, তাহা দেখাইবার জন্যই এই সন্দর্ভের অবতারণা করিলাম।

ন্যায়রত্ন মহাশয়, সে কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও উদ্ধৃত গদ্য প্রবন্ধে এক 'পৃচ্ছা' শব্দ ব্যতীত পণ্ডিতোচিত কোনওরূপ কাঠিন্য বা জড়তা নাই, ইহা অবাধে বলা যাইতে পারে।

পরিণতি।

[শ্রীঅবনীকুমার দে।]

বক্ষে করি নীলিমার বারি
নির্ঝরিণী নেচে গেয়ে যায়,
শুষ্ক হ'লে রসটুকু তা'রি
মিশে পুন সেই নীলিমায়।

গন্ধপুষ্প ফোটে নব নব
শ্যামাঞ্চল ধরণীর বুকে,
টুটে গেলে গরিমা-বিভব
লুটায় সে পুন ম্লানমুখে।

ব্যোম হ'তে ওঙ্কারের সুর
পশে আসি মানবের কাণে,
অমনি সে ছুটে বহু দূর
পুন সেই মহাশূন্য পানে।

নারী হ'তে জনম সবার
কামনার এই দেহ-মন,
পুন সবে করে নারী সার
অপরূপ কামিনী-কাঞ্চন।

সংসারীর প্রেম।

[শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।]

(১)

তাপস। ক্ষুদ্র পাখী আজি ওই উড়ে গেল
মুক্ত সে যে ধরণীর মাঝে,
জীবন্মুক্ত আজি ওই জীবন ত্যজিল
দুখময় জীবনের সাঁঝে!

(২)

কিছু নাই হে সুন্দরি! অসার হেথায়
তব প্রিয় সুখ-আয়োজন,
বন্দী তুমি এ সংসার মায়া-কারাগারে
অপরাধ নাই কি স্মরণ?

(৩)

সুন্দরী। জানি এ মিথ্যা, তবু চাই সংসারের সুখ,
এই স্বামী—প্রিয়পরিজন,
এই নব কিসলয় তনয়ের মুখ
বুকে রাখি করিতে চুম্বন!

(৪)

সুখের সংসারে আজি সুখের গৃহিণী
সুখ-স্বর্গে করিতেছি বাস,
পুণ্য মোর হৃদিগত! দূর জন যিনি
স্বামীজনে সকল আশ্বাস।

(৫)

তাপস। তোমার জীবন কিগো সুখে ভরা সব
নাহি তায় অনন্ত সূচনা
আমার হৃদয়ে শুধু পশে হাহারব
নিখিলের যা কিছু বেদনা?

(৬)

হে সুন্দরি! এ জীবনে দু'দিনের সুখে
একি তব বিফল সাধন;
জীবনের পরপারে আসিলে সম্মুখে
কোথা রবে প্রিয় পরিজন?

(৭)

সুন্দরী। হে তাপস! তব প্রেম কঠোর হৃদয়ে
ছুটে গেছে অনন্তের পানে,
আদি নাই, অন্ত নাই; সরল প্রণয়ে
প্রেম পাই স্বামী-পদ-ধ্যানে।

(৮)

মিলন-সুখের দিন কাটিবে যখন
ভেঙ্গে যাবে পিপাসায় বুক,
ভাঙ্গিবে সংসার, মোর সোনার স্বপন
সুখময় তা'ও,—নাহি কোন দুখ!

এই পথে।

[শ্রীচারুশশী বন্দ্যোপাধ্যায়।]

এই পথে গিয়াছে নিশ্চয়—
ভুল কভু নাহি হ'তে পারে!
চরণদলিত তৃণগুলি
এখনো যে জাগে ধীরে ধীরে!
কেন তুমি বৃথা দাও আশ?
এই ঘাটে ক'রেছিল বাস—
এই ছায়ে ক্ষণেকের তরে!
—কাণাকাণি ক'রে তরুবরে!
এই পথে গিয়াছে নিশ্চয়
ভুল কভু নাহি হ'তে পারে!

ওই দেখ হরিণের শিশু
সরল নয়ন দু'টি তুলি'—
চরণ-শবদ শুনি' কা'র
আছে চেয়ে পথপানে ভুলি'!
কেন মোরে বল সব—মায়া?
একি মিছা? একি শুধু ছায়া?
কারে যেন লুকায়েছে বলি'
ওই দেখ নাচে ঢেউগুলি!
ওই দেখ হরিণের শিশু
আছে চেয়ে পথপানে ভুলি'!

অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১৬শ ভাগ ৩য় খণ্ড | পৌষ, ১৩২৬ | ৫ম সংখ্যা

ইংরাজের মানসপুত্র।

[শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত, বি-এ।]

পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের অনেক জ্ঞান লাভ হইয়াছে ত্য,কিন্তু এই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে যে াহারও কাহারও মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন ন্দেহ নাই। আমরা নিজের নিজত্বটুকু হারাইয়া ালিতে বসিয়াছি, অনুচিকীর্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। াজের জাতীয় ধর্ম্মে ও জাতীয় আদর্শে ততটা গৌরব অনু- ব করিতে পারি না। ইংরাজ যাহা বলিবে, ও ইংরাজ হা করিবে, তাহাই আদর্শস্থানীয় বলিয়া মনে করি। প্রকৃ- ই আমরা ইংরাজের মানসপুত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছি। ামাদের ধর্ম্মের ভিতর এমন সমস্ত জিনিষ আছে, যাহা কটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা ত দূরের কথা, অনেক য় ইংরাজের চোখ দিয়া দেখি বলিয়া নিন্দা করিতেও াবোধ করি না। এই সমস্ত বিকৃত মস্তিষ্ক লোককে দগ্ধ করিয়া এবং তাহাদের কশাঘাত করিয়া মহামতি ্ফ্ সাহেব যে সন্দর্ভ লিখিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ জ 'অর্চ্চনা'র পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

"ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ২৯২ ও ২৯৩ ধারায় একটি াককে অশ্লীল-প্রচার করার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। জন এ দেশীয় ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পরামর্শে এই অভি- োগের সৃষ্টি। তিনি নিজেকে গোঁড়া হিন্দু বলিয়া পরিচয় এবং কাঠগোড়ায় দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিবার সময় বলেন, তন্ত্রশাস্ত্র জিনিষটা কি, তাহা তিনি ঠিক নির্ণয় করিতে পারেন না। ইহা কলিযুগে প্রবর্ত্তিত কোন হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ; তাঁহাকে একখানি গ্রন্থ দেখান হইয়াছিল তাহা তন্ত্র কি না সে বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা নাই। এইরূপ অজ্ঞতাই বর্ত্তমান যুগে সাধারণ। যে শাস্ত্র হিমালয় (যাহা তান্ত্রিক দেবদেবী শিব ও পার্ব্বতীর বাসস্থান) হইতে কুমা- রিকা (তান্ত্রিক কুমারী দেবীর নামের অপভ্রংশ) পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র কত শতাব্দী ধরিয়া কত শত নর নারীর উপর আধিপত্য-বিস্তার করিয়াছে, যাহা আজিও প্রত্যেক হিন্দুর পারিবারিক রীতিনীতি, পূজা-পদ্ধতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে, এরূপ শাস্ত্র এখন ইংরাজি শিক্ষিত লোকের নিকট কিরূপে উপেক্ষা ও অনাদরের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভাবিবার কথা। এমন এক সময় ছিল, যখন ঐ শ্রেণীর লোকে অতি সন্তর্পণে তন্ত্রশাস্ত্রের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিত। এবং যদি কাহারও তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক থাকিত, তাহাকে কামুক ও মদ্যপায়ী বলিয়া আখ্যাত করা হইত।

"ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই—প্রথমতঃ এদেশে ইংরাজি শিক্ষিত লোকে পূর্ব্বে সকলেই এবং পরে অনেকেই তাহাদের ইংরাজ-গুরুর অত্যন্ত বশীভূত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ তাহারা যেন তাহাদেরই সৃষ্টি। এবং অদ্যাপিও অনেকে ইংরাজের মানসপুত্র। যাহা কিছু ইংরাজী ও পাশ্চাত্য, তাহা সবই তাঁহাদের নিকট আদর্শ স্থানীয়। লোকের ধারণা ছিল যে, হিন্দু ধর্ম্ম, দর্শন

যে কলা কেবল অশিক্ষিত স্ত্রীলোক, কৃষক ও দেশীয় পণ্ডিতেরই উপযোগী ; এই সমস্ত পণ্ডিত বিদ্বান হইলেও উঁহাদের বিদ্যা নিরর্থক, কারণ তাঁহারা পাশ্চাত্যশিক্ষার আলোক পায় নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিয়োগের জন্য বিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের নাম প্রস্তাব করা হইলে, এ দেশের সদস্যগণ তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করেন, কেন না তিনি দেশীয় পণ্ডিত মাত্র। অবশ্য এস্থলে ইংরাজ সদস্যগণ এবং ভূতপূর্ব্ব ভাইস চান্সেলার মহোদয় এরূপ অর্বাচীন আপত্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। এ দেশীয় বহু বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও অল্প থাকিলেও যখন ইংরাজ-গুরুর প্রভাব খুব প্রবল ছিল, তখন তাঁহারা যাহাই শিক্ষা দিতেন, তাহাই নীতিসঙ্গত বলিয়া মনে করা হইত। যদি তাঁহারা বলিতেন, যেমন একজন প্রফেসার বলিয়াছেন যে, বেদ 'শিশুমানবের নিরর্থক ভাষা' উপনিষদের ভাব এত নিম্ন শ্রেণীর যে, উহা বিশুদ্ধ ইংরাজিতে অনুবাদ করা যায় না ; 'ভারতের দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিতে হইলে লেখককে ইউরোপের দৈনিক জীবনের চিন্তা অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর চিন্তার সংস্পর্শে আসিতে হয়' ; স্মৃতিশাস্ত্র পুরোহিতদের জুলুম ; পুরাণ নিরর্থক উপাখ্যান ও তন্ত্রশাস্ত্র কেবল দুষ্টামি ও ব্যভিচার ; হিন্দুদর্শন (অপর এক প্রফেসারের ভাষায় বলিতে হইলে) 'নির্ব্বুদ্ধিতা ও পাগলামির সমন্বয়ে একটা অব্যক্ত ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়' ; 'যোগ ঈশ্বর-শাসিত রাজত্বে পাগলের উচ্ছ্বাস' ; ভারতের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি কেবল কুসংস্কার, গুণ্ডামি ও পৌত্তলিকতা, ভারতের কলা কুরুচিপূর্ণ, বীভৎস ও বিকটাকার—এরূপ ভাবে চলিলেও ঐ সমস্ত নিন্দাবাদ বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিচায়ক বলিয়া মনে করা হইত। শুধু মাঝে মাঝে এক একটা ক্ষীণ আপত্তি দেখা যাইত, তাহাও আবার অনেক সময়ে এরূপ ভাবে করা হইত, যেন একটা ত্রুটী করা হইয়াছে। আমার মনে আছে, স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র একটি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আমি বলিতে চাই না যে, এই সমস্ত প্রতিকূল সমালোচনার কোনটীরই ভিত্তি নাই। অন্য সমস্ত দেশে যেমন দোষ আছে, ত্রুটী আছে, এ দেশেও সেইরূপ আছে। যাঁহারা ভারতবর্ষের সমালোচনা করেন, তাঁহাদের নিজেদের দেশেও এইরূপ অনেক দোষ আছে। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত সমালোচনা এত অপরিমিত যে, উহা অসঙ্গত বলা যাইতে পারে।

"রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রথম বহুকালের সঞ্চিত কুসংস্কারের আবর্জ্জনা হইতে নিজেকে পৃথক্ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করেন। অসীম সাহসী মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ এ যুগেও ঐরূপে শাস্ত্রের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের উপর বিদেশীয় সমালোচনা এখন কোন কোন ক্ষেত্রে একটু জ্ঞানমূলক হইয়াছে। অবশ্য সকল স্থলে নয় ; কেন না, সম্প্রতি এমন সব পুস্তক বাহির হইয়াছে, যাহাতে গভীর অজ্ঞানতা ও পক্ষপাতিত্ব দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। একটী পুস্তকের মতে হিন্দুধর্ম্ম 'দুঃস্বপ্নজনিত' বিড়ম্বনা ও সময় নষ্টকর জঞ্জাল ব্যতীত আর কিছুই নয় ; ইহা মানুষের কোন উপকারে আসে না, কেবল জীবন-সংগ্রামে মানুষের বোঝার উপর আরও ভার চাপাইয়া দেয়।' অপর এক লেখকের মতে হিন্দুধর্ম্ম 'ভয়, অন্ধকার ও অনৈশ্চিত্যের কুহেলিকা মাত্র।' এ ধর্ম্মে নৈতিক ক্রমোন্নতির কোন আশঙ্কা নাই, ইহাতে ভগবানের নির্দ্দিষ্ট কোন প্রত্যাদেশ নাই, নৈতিক ক্ষেত্রে ধর্ম্মের কোন বিধিনিষেধ নাই ; ইহার তথা-কথিত ঈশ্বর ব্যাকাস্ (Backus), ডন জুয়ান (Don Juan) ও ডিক্ টার্পিনের (Dick Turpin) সংমিশ্রণ মাত্র।' আদর্শবাদের মুখোস পরিয়া ইহা জড়বাদ এবং শিশুর মত কুসংস্কার-জড়িত জান্তববাদ, ইহা বলিয়াও কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্মকে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ঈশ্বরক্ষে পৌঁছিবার পথ নহে। ইহা আবর্জ্জনার স্তূপমাত্র এবং মানুষ যতদূর ভাবিতে পারে, ইহা ঈশ্বর হইতে তত দূর। ইহা বিবেকসম্পন্ন লোকের মস্তিষ্ক বিকৃত করে, তাহার মন স্বজাতিবিদ্বেষে পূর্ণ করে। উহা 'কৃতকার্য্য হয় নাই বলিয়াই এত দিন স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু তর্ক বা বিতণ্ডা করিবার ইচ্ছা না থাকিলে স্বীকার করা যাইতে পারে যে, যদি একটা ধর্ম্ম অনেক দিন স্থায়ী হয়, তাহা হইলে উহার স্থায়িত্বই উহার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ পুস্তকেই (দি লাইট্ অফ্ এসিয়া— হ্যারল্ড বেগ্‌বি লিখিত)

[illegible] হইয়াছে যে, এই সমস্ত অন্ধ্রে,' ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত কুসংস্কারের আবর্জনার ভিতরেও এমন সব লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা যখন আরাধনা করেন তাঁহাদিগের সহিত যীশুর প্রতিমূর্ত্তির সাদৃশ্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়—নেত্র বিস্ফারিত, তেজোময় অথচ প্রশান্ত, মুখমণ্ডল বিনয়ে শোভিত, তেজস্বিতার উদ্ভাসিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এরূপ অসার ও দূষিত জিনিসের ভিতর এমন নিখুঁত লোকের সৃষ্টি হয়। এরূপ একটা 'অসঙ্গত ব্যাপার সম্পাদকীয় ভাষায় বড় কলাইয়া' লেখা হইয়াছে, অবশ্য ইহাতে লেখকের উদ্দেশ্য আছে। অপর অপর স্থলে এইরূপ দোষমূলক সমালোচনা অহঙ্কারজনিত অজ্ঞানতার পরিণাম। যেমন একজন লেখক বলেন—'ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম জিনিষটা কি, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা একজন ইংরাজের পক্ষে সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে লোকে সপ্তাহে নয় পেনিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, যাহারা দশ বৎসর বয়সে বিবাহ করে, যাহারা জাতিভেদের শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া অধোবস্থা হইতে উঠিতে পারে না, এরূপ লোকেরও ধর্ম্ম আছে।' যেমন পিটারবরোর বিশপ (Bishop of Peterborough) সম্প্রতি বলেন যে, পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স ছাড়া অন্য কোন ভাষায় যোগ্যতার মূল্য নিরূপণ করা দুরূহ। আশা করা যায়, এরূপ আত্মম্ভরী জড়বাদ এ দেশে যেন প্রবেশ না করে। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে লেখকদের অজ্ঞানতা ও সংস্কার বেশ বুঝা যায়। অবশ্য সকল ইংরাজ যে এরূপ সংস্কার-বশে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা নয়, তবে অধিকাংশ স্থলে মূলে ভ্রান্তি দেখা যায়। আবার এমন লোকের সংখ্যা আজ কাল বাড়িতেছে, যাঁহারা এ দেশে ধর্ম্মবিশ্বাস পূর্ণরূপে অনুমোদন না করিলেও ইহার গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ। এমন কি, আজকাল পাশ্চাত্যের উপর প্রতীচ্য চিন্তার প্রভাব ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে,—যদিও সব সময় ইহা স্বীকার করা হয় না,—কেন না, আজকাল অনেকের ধারণা যে, এ দেশ হইতে কোন বিষয়ে কিছুই শিক্ষা করিবার নাই। যাহা হউক, অপরের কথায় যেন আমাদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত বিকৃত না হয়। অপরে যাহা বলে বলুক, অমুক সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আমাদেরই নিষ্পত্তি করা কর্ত্তব্য। বিদেশীরা যত বড়ই পণ্ডিত হউন না কেন, জাতি ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত পক্ষপাত তাঁহারা কখনই এড়াইতে পারেন না। বিদেশী পণ্ডিতদের মতামতের উপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া ভারতবাসী যদি তাহার কুহক হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে, তবে সে নিজের কাজ নিজে সম্পন্ন করিতে পারে। অবশ্য আজকাল এ বিষয়ে অনেক উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়।

'যাহা হউক, এখনও বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে এমন অনেক লোক দেখা যায়, পাশ্চাত্য গুরু ও পাশ্চাত্য শিক্ষা যাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে। তাহাদের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব এত অধিক ও তাহাদের মন পাশ্চাত্য চিন্তার ছাঁচে এরূপ ভাবে গঠিত যে, নিজেদের জাতীয় সভ্যতার গুণ-গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রত্যেক বিষয়েই তাহাদের ইংরাজ শিক্ষকের অনুরূপ। কেহ কেহ আবার তাহাদের শাস্ত্র গ্রাহ্যই করে না, তাহারা প্রকৃতই ইংরাজের মানসপুত্র। যদি যথার্থই মানুষের মত নিজের চিন্তাশক্তির মধ্যে ও জীবনের পদ্ধতির মধ্যে স্বাধীনতা বজায় রাখিতে হয়, তবে ভারতবাসীকে ভারতবাসীর অন্তঃকরণ হারাইলে চলিবে না। যে লোক কেবল পরের অনুকরণ করে সে কি কখনও যাহাকে অনুকরণ করে, তাহার সমকক্ষ হইতে পারে? আমরা পরস্পরে পরস্পরের নিকট হইতে অনেক বিষয়ে শিক্ষা করিতে পারি বটে, তবুও এদেশে অনেকেরই এখনও জানিতে বাকী যে, তাহাদের জাতীয় সভ্যতা ত্রুটী সত্ত্বেও মহান্, এবং (যে কম করিয়া বলিলেও) যে সকল অতীত সভ্যতা পাশ্চাত্য জীবন এবং চিন্তাস্রোতের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, উহা তাহাদেরই সমকক্ষ।'

"আমার অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তন্ত্রশাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছি কেন? অনেক ইংরাজ (অবশ্য ইউরোপের অন্যান্য জাতি নহে) বলেন—আমার সময় ও পারশ্রম যোগ্যতর ভাবে ব্যয়িত হইতে পারিত। তাহার উত্তরে আমি বলি—যে জিনিষের উপর অপরিমিত অপবাদ বর্ষণ করা যায়, তাহার ভিতর আমি কিছু না কিছু কল্যাণ দেখিতে পাই। এ ক্ষেত্রেও তাই। ভারতবর্ষের লোকের এবং তাহাদের সভ্যতার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অবশ্য

[illegible] করিয়াও। যদি ইহাদের কোন দোষ থাকে, সত্যের খাতিরে উহার অনুগুণ সমালোচনা হওয়া দরকার। সমস্ত জীবন ধরিয়া আমি জগতের সমস্ত ধর্ম্ম ও দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছি। তন্ত্রশাস্ত্র জিনিষটা কি এবং লোকে যেরূপ মনে করে, প্রকৃতই ইহা হিন্দুশাস্ত্রের অন্যান্য শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী কি না, তাহা স্বয়ং নির্ণয় করিবার জন্যই আমি এই শাস্ত্রটা বিশেষভাবে পড়িতেছি। অনেকের ধারণা উহা কাম, বিদ্বেষ প্রভৃতি দোষের অনুশীলনে উৎসাহ দেয়। কিন্তু আমি জানি, জগতের অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় হিন্দুশাস্ত্রেও উহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

"আমি দেখিলাম, হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসে তন্ত্রশাস্ত্রের গুরুত্ব অধিক। কেহ কেহ মনে করেন, তন্ত্রশাস্ত্র তুচ্ছ ও নিষ্প্রয়োজন; ভারতবর্ষে বহু ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বাস, তন্ত্রশাস্ত্র এদেশে ধর্ম্মের অসংখ্য শাখার কেবল একটী নমুনা। পক্ষান্তরে ইহা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের মত আজিও দেবালয়ের এবং পারিবারিক রীতিনীতির উপর অল্পাধিক পরিমাণে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে এবং কত শতাব্দী ধরিয়া করিয়াছে। সেই জন্যই যাহারা ইহাকে ঘৃণা করে, তাহারা ইহার প্রভাবে এত ভীত হয়। ইহার আসল গুণ যাহাই হউক না কেন, কেবল ইতিহাসের দিক্ হইতে দেখিলে ভারতের সভ্যতার প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া ইহা পাঠের উপযোগী। টেরেন্স ঠিকই বলিয়াছেন—আমরা যখন মানুষ, তখন মানুষে যাহা করিয়াছে তাহা আমাদের নিকট নূতন হইতে পারে না। অবশ্য তন্ত্রশাস্ত্রের কতক অংশে এমন সমস্ত জিনিস আছে যাহা অনুমোদন করিতে পারা যায় না। ইহার এমন অনেক গুণ আছে, যেজন্য ইহা পাঠে উপকারিতা আছে। ইহা ভারতে মানবের সাধারণ জ্ঞানের অতীত গুহ্যবিদ্যার (Occultism) ভাণ্ডার। তন্ত্রের গুহ্য বিষয়গুলি বৈজ্ঞানিকের পক্ষেও প্রয়োজনীয়। "নব চিন্তা" (New thought) এবং এই প্রকারের অন্যান্য ব্যাপারগুলি মন্ত্রবিদ্যারই সমজাতীয়। তন্ত্রে অধ্যাত্মবাদ আছে, অনেক 'শক্তির' উল্লেখ আছে, এবং আরও অনেক ব্যাপার আছে। কিন্তু আমার মতে উহার লোকে সিদ্ধি পাইবার জন্য ভক্ত লালায়িত [illegible] 'গুহ্যবিদ্যা' পাঠে ও তাহার অনুশীলনে অনেক বিপত্তি আছে, এবং সমস্ত 'শক্তির' অনুধাবন প্রকৃত সিদ্ধি লাভের অন্তরায়। অবশ্য এই সিদ্ধিই সকল ধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য। তন্ত্রে (বিশেষতঃ শাক্ততন্ত্রে) বেদান্তের যে জ্ঞান সন্নিবেশিত আছে এবং যে সমস্ত পদ্ধতি দ্বারা 'অপরোক্ষ জ্ঞান' লাভ করা যায়, সেইগুলিই সকলের চেয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে শাক্ততন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এই যে, উহা অদ্বৈতবাদের সাধনাশাস্ত্র। ধর্ম্মের সত্য কিরূপ ভাবে উপলব্ধি করা যায়, ইহাই আজকালকার সর্ব্বত্র আলোচ্য বিষয়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সকলেরই একই চিন্তা। দর্শনের আলোচনায় শুধু মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়, আর কিছু লাভ হয় না। মস্তিষ্কের বিশুদ্ধতাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আমরা কি বিষয়ের আলোচনা করি, শুধু তাহা দেখিলে চলিবে না, আমরা কিরূপ ভাবে গঠিত হইতেছি তাহা দেখাই আসল কাজ। ধর্ম্মের শিক্ষা কিরূপে উপলব্ধি করিতে পারি (সাক্ষাৎকার) তাহা দেখাই প্রধান কর্ত্তব্য। ইহা সাধনার ফল; এই সাধনা হিন্দুর মতেই হউক, বা মুসলমানের বা খৃষ্টানের অথবা বৌদ্ধের মতে হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। হিন্দুর পক্ষে তন্ত্রশাস্ত্রই (যদিও উহার অনেক শাখা আছে) একমাত্র সাধনা-শাস্ত্র। এই জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রের এত উপকারিতা এবং হিন্দুর নিকট উহার এত কার্য্যকরী প্রভাব। এই জন্যই এবং অদ্বৈতবাদের জন্যই আমার মতে উহা পাঠের উপযোগী।

"তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ে আমার যাহা অভিমত, তাহা আরও কতকগুলি পণ্ডিত (যাঁদের নিকট আমি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করি) সমর্থন করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আমার এক সংস্কৃতজ্ঞ দার্শনিক বন্ধু এক মাস পূর্ব্বে যে পত্র দিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। তিনি বলেন—'প্রকৃতই তন্ত্রশাস্ত্র আমাকে অনেক নূতন আলোক দেখাইয়াছে। এমন কি, আমার মনে হয়, যেন আমি একটা নূতন জগত আবিষ্কার করিয়াছি। অনেক অস্পষ্টতা ও

[illegible] বিভিন্ন শাখায় ক্রমোন্নতির পথে যে সমস্ত অংশ খুঁজিয়া পাই নাই, এবং যাহা পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি, তাহা ইহাতে পাওয়া যায়।' অনেকে হয় ত মনে করিতে পারেন, তন্ত্রশাস্ত্রে এমন সমস্ত জিনিষ আছে যাহা একেবারে নূতন। যদি মূল শিক্ষার দিক্ হইতে দেখি, তাহা হইলে তন্ত্রশাস্ত্রের মূলে এমন কোন জিনিষ নাই যাহা অদ্বৈত বেদান্তে পাওয়া না যায়। অতএব যাঁহারা মনে করেন যে, তন্ত্রশাস্ত্রে এমন কতকগুলি মৌলিক সত্য পাওয়া যায়, যাহা একেবারে অভিনব, তাঁহাদিগকে এ ভ্রম দূর করিতে হইবে। অবশ্য বেদান্তের বাহ্য আকার, প্রণালী ও বিশেষ বিশেষ অংশের বিষয় আমি বলি না। যাঁহারা ভারতের সকল শাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, বিভিন্ন পদ্ধতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিভিন্ন ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া সকল শাস্ত্রের মূলে একই শিক্ষা পাওয়া যায়।"

প্রতীক্ষায়।

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল, বি-এ।]

(১)

কলিকাতা—বাগবাজার।
২০শে ফাল্গুন।

ভাই সরোদিদি,

অনেক দিন হ'ল তোমার চিঠি পত্র পাইনি। তুমি আমাদের সকলকে ভুলে গেছ' বোধ হয়! কিন্তু, আমি ভাই, তোমায় ভুলতে পারিনি! তাই, তুমি চিঠি না দিলেও অভিমানের মাথা খেয়ে আমি আগেই লিখতে বসেছি। হ্যাঁ ভাই সরোদিদি, শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়ে কি তোমার বাপ-মা-ভাই-বোনের কথা এম্‌নি করেই ভুলতে হয়? এখানে এসেই আমি কাল মাসীকে গিয়ে জিজ্ঞেস্ করলুম, তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন,—"না মা কৈ, এই একমাস হ'ল তার কোন চিঠি পাইনি। তবে ভাল আছে খবর পেয়েছি।"—দেখ্‌লুম তাতেই মাসীমা সন্তুষ্ট! সরোদিদি! সেই জন্তেই বলে, মেয়েমানুষ [illegible] জাত! নয় কি?—তুমিই বল!

যাহোক্, তোমরা সব কেমন আছ? কেমন আছে লিখো। তুমি এখানে কবে আস[illegible] অনেক দিন তোমাদের দেখিনি, একবার দেখ্‌তে [illegible] সাধ হয়। জামাই-বাবুকে বলে' যদি এক বার [illegible] এসো না সরোদিদি!

হ্যাঁ, আর একটা কথা তোমায় লিখ্‌তে ভুলে [illegible] কাল আমি বাপের বাড়ী এসেছি। কিন্তু, এবারকার [illegible] বেশ একটু নতুনত্ব আছে। উনি এবার আমার উপর [illegible] চটেছেন! কথাতেই বলে, রাগই পুরুষের লক্ষণ! [illegible] ছিল কি জানো, সরোদিদি?—সেদিন কথায়-কথায় শাশুড়ীর সঙ্গে বকাবকি হ'য়েছিল। আমার ভাই বড় রাগ হ'য়ে গেল! কখ্‌খনো যে কারু কথা সহ্য করেনি, সেই আমি কেন অত কথা সইব'? হ'লেই বা শাশুড়ী! যাহোক্, অনেক দিন সয়েছিলুম ভাই, কিন্তু এবার [illegible] আমার ভারী বিগ্‌ড়ে গেল। একদণ্ডও আর আমার সেখানে মন টিক্‌লো না। সেই রাত্তিরই ওঁকে আমার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেবার জন্তে ধরে' বস্‌লুম। প্রথমে কোন কথায় উত্তরই সে দিলে না। তারপর আরও দু'একবার পেড়াপীড়ি করতে বোধ হয় একটু বিরক্ত হয়েই বল্লে,—"তা বেশ, দোব পাঠিয়ে, যেও।" আমিও আর কিছু বল্লুম না। ওসব বিষয়ে আর কোন কথাই হ'ল না। পরের দিনেই সে দাদাকে চিঠি লিখে দিলে।

যে দুদিন সেখানে ছিলুম, শাশুড়ীর সঙ্গে কোন কথাই হয় নি। উনিও ভাল করে' কথা কইলেন না। আমারই বা কি এমন দায় বল? দু'দিন পরে এখানে চ'লে এলুম! এখানে এসে যেন হাড়ে আমার খানিক বাতাস লাগ্‌লো! অত খিটিমিটি আমি সইতে পারি না,—যা বলুব! মাকে বলিচি,—এখন শীগ্‌গীর আর আমি যাচ্ছি নি! থাক্ না ভাই তারা মায়ে-পোয়ে! আমিই বজ্জাত—আমিই জঞ্জাল, তা সরে' থাকাই তো ভাল!

খোকা এখন বেশ বস্‌তে শিখেছে, সরোদিদি! কি পাষাণ গো, খোকা এল, তা কেউ এক কৌটা সোন্দেশ

জানি.. কোরো না। যাক্, দেখা হ'লে সব বল্‌ব। চিঠি দিও।

ইতি —শ্রীমতী সুহাসিনী।

বর্দ্ধমান, ২৪শে ফাল্গুন।

ভাই হাসি,

এতদিন পরে তোর চিঠি পেয়ে সুখীও হলুম, আবার মনে বড় দুঃখ্যুও হোল। দুঃখের কথাটা পরে বল্‌চি। আমি চিঠি-পত্র দিই না বলে' তুই রাগ করেছিস্, তা ভাই আমার লেখবার ফুরসৎ বড় কম। টুনু, রুচি বড্ড দুরন্ত হ'য়েচে; সারা দুপুরটা ওদেরই সাম্‌লাই না চিঠি লিখি। আর সকলের খবর আমি এইখানে ব'সেই পাই, তাই তত গা'ও হয় না। যাই হোক্, তার জন্যে মনে কিছু করিস নি ভাই, লক্ষ্মীটি!

তার পর, যে কথা বল্‌ছিলুম, তোর চিঠি পড়ে' আমার বড় দুখ্যু হো'ল। শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে' হুট্ বল্‌তে বাপের বাড়ী চলে' আসাটা তোর ভাল হয়নি, হাসি! তাঁদের মনে কতখানি বাজ্‌ল বল্ দেখি। আর ভাই, তোর শাশুড়ী তো খুব ভাল মানুষ! অমন মানুষের সঙ্গে বনিয়ে চলা তো খুবই উচিত। আর, হ্যাঁলা, মেয়েমানুষ পরের বাড়ী যেতেই জন্মেছে,—প্রথম প্রথম কথা সইতে না পার্‌লে পর কি আর আপনার হয়, হাসি? তুই ভাই কি বুঝিস বল্‌তে পারি না, আমার তো মনে হয়,—আমি অভাগী, তাই আমি আস্‌বার আগেই শাশুড়ী আমার মরে' গিয়েছেন।

তোমার কথা শুনে উনি বড় দুখ্যু কর্‌তে লাগ্‌লেন। ছিঃ তাদের আর কি ভাই! পুরুষ মানুষ ইচ্ছে কর্‌লে আবার একটাকে ঘরে আন্‌তেই পারে! তখন, মরণটা হয় কা'র বল্ তো? ভগবান্ করুন, সে অভাগ্যি যেন শত্রুরেরও না হয়! যাহোক্, ও সব মনে রাখ্‌তে নেই বোন্! এসেছো, দু'মাস থেকে ছেলে কোলে নিয়ে ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ফিরে যেও। রাগ-অভিমান দু'দণ্ডের খেয়াল, দু'দণ্ডই তা ভাল লাগে।

আর আমার যাবার কথা লিখেছ?—তা ভাই, কেমন করে' যাই বল? আমি গেলে তোমার ঘর সংসারে কুরুক্ষেত্র যে বেধেই আছে! সত্যি, কি জ্বালাতনে আমি পড়্‌লুম হাসি, আমি কাছে খাবার নিয়ে না বস্‌লে বাবুর খাওয়া আর আধ-পেটাও হবে না। এক একদিন আমি মনে না পড়িয়ে দিলে হয় ত আমার ভুখে পাছাপেড়ে সাড়ীখানা প'রেই উকীল বাবু বরাবর মক্কেলদের সামনে গিয়ে হাজীর। কোথাও যাবার কথা বল্লেই চোখ কপালে তুলেছেন বলে' কথা! তাই আমিও সব বুঝে সুঝে এক রকম হাল ছেড়ে দিয়ে বসে' আছি। তবে ইচ্ছে আছে, একদিন সুবিধামত কথাটা পেড়ে দেখব'—কি হয়।

বেশী আর কি লিখব। খোকা, তুমি, আর দু'বাড়ীর সব যেমন যেমন থাকে লিখো। গুরুজনদের আমার প্রণাম দিও। ইতি—

শ্রীমতী সরোজবাসিনী।

(২)

বর্দ্ধমান, ২০শে চৈত্র।

ভাই হাসি,

প্রায় একমাস হ'তে চ'ল্লো তোমায় একখানা চিঠি দিয়েছিলুম,—কিন্তু এতদিনের মধ্যেও তার উত্তর পেলুম না। তুই আমার ওপর রাগ করেছিস্ বুঝি, না? সে চিঠিতে তোকে কত-কি সব লিখেছিলুম,—সেই জন্যেই রাগ করে' আর জবাব দিস্ নি, -এ আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারচি।

ছিঃ ভাই, রাগ করবি জান্‌লে আমি কখনো অত কথা লিখ্‌তুম না। তোর চেয়ে যে আমি দু' তিন বছরের বড়, সে কথা ছেড়েই দে,—ছেলেবেলাকার খেলার সাথী ভেবে তোকে দু'টো কথা লিখেছিলুম,—তার জন্যে কি রাগ কর্ত্তে হয়?—হাসি। তা হ'লে তুই আমায় পর ভাবিস্ বুঝি? নইলেই বা এমন এক কথায় চুপ্‌চাপ্ হ'য়ে যাবি কেন? যা হোক্ ভাই, কিছু দোষ নিস না। আমি তোর চিঠির আশায় রইলুম, এবার চিঠি না পেলে কিন্তু ভারী কষ্ট হবে

খোকা বাবাজী কেমন আছেন? হ্যাঁরে, দিন দিন সে কা'র মতনটী হচ্ছে, হাসি? আমার একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়। দেখি, কি করে' উঠতে পারি—এর পরে লিখবো। ইতি—

তোমার সরোদিদি।

কলিকাতা—বাগবাজার।

২৬শে চৈত্র।

ভাই সরোদিদি,

মনের আগুন মনেই চেপে থাকি। বল্‌বার কইবার কেউ নেই। তোমার ওপর রাগ আমি কেন করব বল! তুমি তো বেশ কথাই লিখেছ! তবে, আমার কপাল, আমি ও সব বুঝ্‌তে পারি নি। তুমি একলার ঘর নিয়ে বসে' আছো, শাশুড়ীর জ্বলন কি তা জান না, তাই মনে কর্‌চ'—আহা, যদি একটা শাশুড়ী থাকৃত! কিন্তু থাকলে বুঝ্‌তে পারতে—আর যদি আমারই মত একটা শাশুড়ীর হাতে পড়্‌তে—তা হ'লে দেখতে, কোথায় থাকৃত' জামাইবাবুর অমন বুক-ভরা আদর, আর মুখ-ভরা সোহাগ! তা হ'লে দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার কর্ত্তার সেই হাসিমুখখানিই গোঁ হ'য়ে থাকৃত'। সরোদিদি, জ্বলে পুড়ে আমার হাড় ঝর্‌ঝরে হ'য়ে গেছে। কি এমন রাগ গা! সংসার কর্‌তে গেলে কথা বল্‌তেও হয়, শুন্‌তেও হয়! মাকে যদি হঠাৎ কোনো কথা বলে' ফেলিচি,—ব্যাস, বাবুরও আর তিন দিন ধরে' হুঁ-হাঁ ভিন্ন কথাটি নেই! এম্‌নি করে' পুড়ে' পুড়ে' যাকে সংসার করতে হয়, সেই জানে মনে তখন কি হয়!—না, তুমি হয় ত আবার এ সব শুনে রাগ কর্‌বে! আচ্ছা সরোদিদি, রাগও অনেকে করে, করিচিও অনেক,—কিন্তু, দু' লাইন করে' চিঠি লিখ্‌তে মানুষের কি এমন মাথা হেঁট হ'য়ে যায়? যদি বল, তুমিই কি আগে এসে তাঁদের খোঁজ নিয়েছিলে। ও মা, সে গুণ কত সরোদিদি! চিঠি গেলে বোধ হয় টান্ মেরে ছিঁড়েই ফেলবে! তাই তো আমি চিঠি দিই নি! কেন, তিনি রাগ করতে জানেন, আর আমি জানি নে?

শাশুড়ীর দোষ আমি তত দিই না। প্রথম একটু রেগে উঠ্‌লেও ঠাণ্ডা হ'তে বেশীক্ষণ লাগে না। নিজে লিখ্‌তে জানে না তাই, নইলে কখনো চুপ্ করে' থাকৃতে পারতো না।····· আচ্ছা আমিও দেখ্‌বো সরোদিদি, খোঁজ আগে নিতে হয় কাকে।—তাঁকে না আমাকে?

তোমাদের কুশল লিখো। জামাইবাবু ও তুমি আমার প্রণাম জেনো। ইতি—

শ্রীমতী সুহাসিনী।

কলিকাতা—বাগবাজার

১২ই বৈশাখ।

ভাই সরোদিদি,

'মরণটা আমার কিসে হয় বলে' দিতে পারো? [illegible] সাধ্যি-সাধনা করেও ত' মরণ আসে না ভাই! [illegible] তাহ'লে যে জুড়িয়ে যাবো! জুড়ুতে ত বিধাতা দেবে না!

ভাই, এতদিন তোমায় চিঠি লিখতে পারি-নি, কেন [illegible] খোকার আমার বড্ড অসুখ! আগে-আগে যখন সাধারণ রকমই হ'য়েছিল, তখন তেমন খেয়াল করি নি। আর, তাও বলি, মা যে ভাই অমন একটুতে অস্থির হ'লে বড় রাগ করেন! কাজেই, কাউকে বলি নি!—দু' তিন দিন বাদে জ্বর হঠাৎ সেই যে বেড়ে গেল, আর ছাড়্‌তে চায় না! আমার ভারী ভাবনা হোল। ডাক্তার রোজই বলে—ভয় নেই, সেরে যাবে!—বড় রাগ হ'তে লাগলো সরোদিদি! আর; এদেরও কি ভাই ঐ একটা হাতা সহরে ডাক্তার জুট্‌ছে না?

কি বল্‌বো, সরোদিদি! এ দুঃসময়েও যে মানুষ তার সৃষ্টিছাড়া রাগ বুকে পুরে রেখে দেয়, তাকে কি বল্‌তে ইচ্ছে হয় ভাই বল তো? আমিই না হয় দোষ করিচি,—কিন্তু দিদি, ঐ একটা সোণার চাঁদ—বংশের বাতি—ও ভাই, সে কি দোষ করলে বল তো? ওকে দেখতেও কি একবার এখানে উঁকি মারতে নেই!—হায় রে কপাল! দেখ্‌তে আস্‌বে! দাদার চিঠিতে ক'ছত্র লিখে যে দয়া করে' খোঁজটা নিয়েছে,—এই ঢের ভাগ্যি!—তবু আমাকেও দেওয়া হোল' না! খোকার মা ত আমি!

সরোদিদি, আমার বুক ফেটে কান্না আস্‌ছে। 'ও'ই কিন্তু যত নষ্টের গোড়া! শাশুড়ী ত সে মানুষ নয়! নিশ্চই তাঁকে কোন খবরই জান্‌তে দেয় নি! নইলে যে খোকার একটু-কিছু হ'লে রাতদিন বুকে করে' ঘুরে বেড়াতেন, তার এই অসুখ শুনে তিনি এখনি নিজেই এসে হাজীর হতেন।······চিঠি লেখ্‌বার জন্যে দু'দিন কালী-কলম নিয়ে বসেছিলুম, কিন্তু পারলুম না, সব যেন ওলোট্-পালোট্ হ'য়ে গেল।

১৭ই বৈশাখ।

ছেলেমেয়ের ঝঞ্ঝাটে সেদিন চিঠিখানি শেষ করতে পারি নি। তাই আজও খানিকটা এই সঙ্গে লিখতে বসেছি। সরোদিদি! তুমিই এর বিচার ক'রো!

কাল বিকেলে প্রাণে কি দয়া হয়েছিল বলতে পারি না,— হঠাৎ একজন সায়েব ডাক্তার নিয়ে এখানে এসে হাজির হ'লেন। ছেলেমেয়েগুলোর মুখে শুনে আমার বিশ্বাসই হয় নি। কিন্তু তার পর জানলার পাশ থেকে দেখলুম, সত্যি সত্যি খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে ডাক্তারকে দেখাচ্ছে। আমি অনেকক্ষণ চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলুম। কৈ, এমন যত্নটা ত ভাই খোকা একদিনও পায় নি! তার পর বাড়ীর ভেতর এলেন। সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া হোল',—আর আমায় কি মুখের কাছে একটা কথা বলবারও তাঁর ফুরসৎ হোল' না! দু'দিন এক রাত এখানে রইলেন। রাত্রিতে ছেলের বিছানার পাশে দু'জনাই বসে। কিন্তু, একবার আমার পানে ফিরেও তাকালে না। আমার ভেতর তখন কি হচ্ছে কি বলবো, সরোদিদি, তবু বললুম,—"কেমন আছ?" উত্তর শুধু, "বেশ।" তার পর বোধ হয় এক ঘণ্টা চুপ করে বসে রইল। আমার ভারী রাগ হোল। আর কোন কথা বলতে পারলুম না। ঘরের মেঝের একটি কোণে উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়লুম। সেই সময় হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—"ছেলে অন্তর্য্যামী, খোকাই জানে দোষ কা'র বেশী।"... ...কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম সরোদিদি, সকালে উঠে দেখি, ঘরের ভেতর আমি আর খোকা,—আর কেউ নেই।

বৈকালে তিনি চলে গেলেন। সে খবরও পেলুম অপরের মুখে। সরোদিদি, মনে ক'রেছিলুম বিষ খাবো। কিন্তু, বাছার হাসিমুখ তাতেও বাধ সাধলে। বলতে পারো, আমি কি করি? ইতি—

তোমার বোন 'হাসি'

(৪)

কলিকাতা—বাগবাজার।
১লা জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীচরণেষু,

মাসীমার অসংখ্য প্রণাম নিও। কাল আমি এখানে অমন তাগাদা দিয়ে এখানে এসে পড়লুম তার কিছুই হোল না। আর, হোল নাই বা কেন! আমি আসবার আগেই আমার ইচ্ছে খানিকটা পূর্ণ হ'য়েচে। এখানে এসেই শুনলুম—পরশু হাসি তার শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। মাসীমাকে জিজ্ঞেস্ করে' জানলুম,—পাঁচ-ছ'দিন আগে ওখানে একখানা চিঠি আসে যে, সুরেনবাবু তাঁর মাকে নিয়ে কাশী গিয়েছেন। সেই দিন হ'তেই হাসি যেন কেমন হ'য়ে গেল। তার পর পরশুদিন হঠাৎ তার খেয়াল চাপে যে সে শ্বশুরবাড়ী যাবে। হাসি চিরকালই খামখেয়ালে! —সে খেয়াল তার কেউ ভাঙ্গতে পারে নি।

এখানে এসেও হাসির সঙ্গে দেখা হোল না বলে দুঃখ্যু হোল। কিন্তু, তবু আমি এ খবর শুনে খুসী হ'তে পেরেছি যে, দারুণ অভিমানী হাসি আজ নিজেই তার অভিমানের বোঝা ফেলে রেখে স্বামীর ঘরে চলে গিয়েছে। .....ইতি—

প্রণতা—তোমার সরোজ।

বর্দ্ধমান, ৫ই জ্যৈষ্ঠ।

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হ'লুম। আমি ভাল আছি। তোমাদের কুশল লিখো। তোমার বোন হাসি এখানে তোমায় এক চিঠি দিয়েছে, এই সঙ্গেই তা' পাঠিয়ে দিলুম। কিন্তু আমি তা পড়ে' ফেলেছি,—ত্রুটী মার্জ্জনীয়। সময়াভাব, -কাছারীর বেলা হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—তোমার উকীলবাবু।

শ্রীরামপুর, ৩রা জ্যৈষ্ঠ।

ভাই সরোদিদি,

তোমরা বোধ হয় শুনে খুব হাসতে থাকবে! আমি শ্বশুরবাড়ীতে এসেছি,—নিজে সেধে এসেছি,—বাড়ীর সরকার মশাই এসে ঘর-দরজা খুলে দিয়েছে! শূন্য ঘরে আমি আমার বুকজোড়া সোণার মাণিকটীকে নিয়ে নিজের অধিকারটি আবার তুলে নিয়েছি। মাকে নিয়ে কাশী গেছেন,—কিন্তু সে আমারই ওপর রাগ করে!—এখন বুঝচি সরোদিদি, তাঁর রাগ করাটা ত দোষের নয়! যখন তিনি খোকাকে দেখতে গিয়েছিলেন, একলা ঘরে

[illegible] পুরুষ তাঁকে পেয়েছিলুম, কৈ, সেদিন ত তাঁর [illegible] জড়িয়ে ধরে বল্‌তে পারি নি,—"ও গো, আমায় মাপ্‌ কর!"

.....সমস্ত ঘর-সংসার খাঁ-খাঁ কর্‌চে। তবু আমি বুক বেঁধেছি। এ বাঁধন আর সহজে আল্‌গা হবে না, সরোদিদি! সবকার বলচে,—মাস দুই বাদেই তাঁরা আস্‌বেন। কিন্তু তাই, দু'মাস হোক্‌, ছ'মাস হোক্‌, খোকার মুখ চেয়ে আমি এইখানেই পড়ে থাক্‌ব। পারবো না কি সরোদি'?—কেন পারবো না?—তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর, তোমার আশীর্ব্বাদ পেলে আমি ঠিক পারবো।

আমি প্রতীক্ষা কর্‌বো, সরোদিদি!—সেই দিনটীর প্রতীক্ষা কর্‌বো, যে দিন তাঁরা মায়ে-পোয়ে এসে আমার হাত ধরে বল্‌বেন—'হাসি, তোর সব অপরাধ ক্ষমা করলুম।' হ্যাঁ দিদি, সে শুভদিন কি আসবে না?—খোকাবাবু ব'লেছে—আস্‌বে। তবে আস্‌বে, কেমন সরোদিদি?—তোমার হাসির মুখের হাসি ফিরে আস্‌বে ত? খোকা আজকাল আমার সব কথার উত্তর দেয়। তার মুখখানি যেন দিন-কে-দিন ঠিক সেই ছাঁচটাই গ'ড়ে তুল্‌চে। ইতি—

তোমাদের হাসি।

শোপেনহাউয়েরের স্ত্রীবিষয়ক প্রবন্ধ সম্বন্ধে দু' একটী কথা।

[অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুপদ শাস্ত্রী, এম-এ, বি-এল্‌।]

আমি প্রবন্ধের অবতরণিকাতেই বলিয়াছি, যে সম্ভবতঃ স্ত্রী-জাতির উপর আক্রোশের বশবর্ত্তী হইয়াই দার্শনিকপ্রবর উক্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তিগুলির সকল স্থানেই যে সারবত্তা আছে তাহাও আমি বলি নাই। তিনি সময়ে সময়ে নারীজাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে গিয়া পরস্পর-বিরুদ্ধ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। যথা, তিনি একবার নারীকে objective এবং আর একবার subjective [illegible] বলিয়াছেন, (বলিতে পারি না এটা প্রবন্ধ-লেখকের দোষ কি ইংরাজী-অনুবাদকের দোষ) তথাপি তাঁহার যুক্তি যে সকল স্থানেই অসার, তাহাও আমার মনে হয় না। স্ত্রী-জাতির মন যে পুরুষ অপেক্ষা কিছু সঙ্কীর্ণতর তাহাতে সন্দেহের কারণ দেখি না। এবং মনের এই সঙ্কীর্ণতা যে সৃষ্টির পক্ষে উপযোগিনী তাহাও ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়। স্ত্রীলোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ মাতৃত্বে। মা আপন সন্তানকে সকল প্রকারে রক্ষা করেন। সে যতই মন্দ হউক না কেন তাহার দোষের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ। কিন্তু আপন সন্তানের প্রতি তাঁহার স্নেহ যত বেশী হয়, ঠিক সেই অনুপাতে আত্ম-পর জ্ঞানটাও তাঁহার বাড়িয়া যায়। তাঁহার এই মাতৃত্ব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ। এবং এই গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ বলিয়াই নিজ সন্তানের প্রতি তাঁহার স্নেহ বড়ই গভীর। এই স্নেহ যদি আপন গণ্ডী ছাড়াইয়া অপরের উপরেও গিয়া পড়ে, তাহা হইলে সে স্নেহের গভীরতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। অপর কথায় বলিতে গেলে নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরেই মাতৃত্ব সার্থকতা লাভ করে। মাতৃস্নেহ যে ভাবে যে মাত্রায় প্রবল, ঠিক সেই ভাবে সেই মাত্রায় না থাকিলে অসহায় সন্তানের যথাযথভাবে পালন হইতে পারে না। কাজেই প্রকৃতি দেবীর অভিপ্রায়ই এই যে, মা আপন আপন সন্তানকেই ভালবাসুন, এটী আপনার ছেলে, এটী পরের, এই জ্ঞানটা খুব বেশী মাত্রায় করুন। এই জন্যই বলিয়াছি যে, স্ত্রীজাতির সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টির পক্ষে উপযোগিনী।

এখানে অনেক পাঠিকা হয় ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিবেন যে, এটী আপনার ছেলে, এটি পরের, এ প্রভেদ কি পুরুষেরা করেন না? করেন বই কি, কিন্তু স্ত্রীলোকের মত অতটা নয়। তাঁহাদের এই স্বাভাবিক ভেদবুদ্ধিটা বিচারশক্তির সাহায্যে অনেকটা তিরোহিত হয়। স্ত্রীলোকের বিচার-শক্তির ততটা প্রখরতা নাই। তাঁহারা অনেকটা অন্ধ আবেগের বশবর্ত্তিনী। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অবোধ মূর্খ দুশ্চরিত্র পুত্রের উপর মার মমতা যত বেশী, পুরুষের স্নেহ তত কম। তবে স্ত্রীজাতি সঙ্কীর্ণচিত্ত বলিয়া তাঁহারা আমাদের ঘৃণার পাত্রী নন। মাতৃত্বকে পূজা না করে কে? কিন্তু এই মাতৃত্বই আত্মবিস্মৃতির মধ্যে সঙ্কীর্ণতার চরম বিকাশ।

এই সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায় স্ত্রীলোকের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে। কয়েক জন পুরুষ একসঙ্গে মিলামিশা করিয়া পরমবন্ধু ভাবে কাল কাটাইতে পারেন, কিন্তু কয়েকটী মা-জননী একত্র হইলেই সেখানে কলহের সৃষ্টি হয়। অনেকে বলেন, এটা শিক্ষার অভাবে। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। অবশ্য ইউরোপীয় সমাজের সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, কিন্তু যদি তদ্দেশীয় উপন্যাসাদিতে তাঁহাদের জীবন-প্রণালীর কিছু ছায়াও থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যেও চরিত্রগত এই দুর্ব্বলতা দেখা যায়। শিক্ষার ফলে কলহটা উচ্চস্বরে না হইতে পারে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্যকেও কলহ বলিতে হইবে। আর নিরক্ষর পুরুষের সংখ্যা এদেশে বিরল নহে। বন্ধুভাবে অবস্থানটা তাহাদের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায়। অবশ্য যতক্ষণ রঙ্গমঞ্চে কোনও মনোমোহিনীর আবির্ভাব না হয়। কিন্তু পুরুষের দুর্ব্বলতা ঐখানে, তাঁহারা অনেক সময়ে বামানয়নের কটাক্ষপাতে হিতাহিত জ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া যান। Schopenhawer এই জন্যই স্ত্রীলোকের মুগ্ধ করিবার শক্তিকে প্রকৃতিদত্ত অস্ত্র বলিয়াছেন। দুই ভাই পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকেন, কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, যখন তাঁহাদের মধ্যে কোনও মৃগনয়নার আবির্ভাব হয়, তখন তাঁহাদের মধ্যে ঠিক ততটা সদ্ভাব আর থাকে না। কারণ যদি তাঁহাদের ভার্য্যাগণ আপনাদের প্রাপ্যগণ্ডা বুঝিয়া লইবার মানস করেন, তখন ভ্রাতৃদ্বয় Scylla এবং Charybdisএর মধ্যে পড়িয়া যান। গৃহিণীর মনোরঞ্জন যদি করিতে হয়, তাহা হইলে ভায়ে ভায়ে পৃথক্ হইতে হয়, আর যদি ভায়ে ভায়ে সদ্ভাব বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে গৃহিণীর মনোরঞ্জন হয় না। স্ত্রীলোকের পৃথক করিয়া স্বামীকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিবার এই প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই তাহার আর একটী নাম দার (দারয়ন্তি পৃথক্ কুর্ব্বন্তি ইতি দারাঃ)। যাহাই হউক, এরূপ স্থলে কোনও কোনও পুরুষ reasonএর আশ্রয় লইয়া আপন স্ত্রীর চিত্তবিনোদন বিষয়ে হাল ছাড়িয়া দেন। আর যিনি প্রিয়ার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে যান তিনি পৃথক্ হন। একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিষয়ে যাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, তিনি আমার উক্তির সমর্থন করিবেন। যেখানে দেখা যায় ভায়ে ভায়ে বেশ মিল আছে, সেখানে ইহাও নিশ্চয় দেখিতে পাইবেন যে, বাটীর বধূরা একটী কথাও বলিতে পান না। আর যেখানে তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিবার শক্তি আছে, সেখানে ভায়ে ভায়ে মিল নাই। অবশ্য আমি কোনও Sweeping generalisation করিব না। কোনও কোনও স্থানে ইহার ব্যত্যয়ও দেখা যায়। কিন্তু আমি যাহা বলিলাম, তাহা সাধারণভাবে সত্য বলিয়া জানি।

"আমরা স্ত্রীলোকদিগকে পদানত করিয়া রাখিয়াছি, সৃষ্টির সময় হইতে আমাদের দাসত্ব করিতে করিতে স্ত্রীজাতির বুদ্ধিবৃত্তিরও অপকর্ষ সাধিত হইয়াছে। এখন যদি তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিত করা হয় তাহা হইলে তাঁহারাও ক্রমশঃ আমাদিগের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইবেন' একথা অনেকে বলিয়া থাকেন। এ কথার যুক্তিবত্তা আমি ঠিক বুঝিতে পারি না। ইউরোপ বহুকাল স্ত্রীজাতিকে তথাকথিত "মুক্তি" দিয়াছে, আজ কালকার হিসাবে যাহা সুশিক্ষা তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে ইউরোপীয় মহিলা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু কেহ কি এ কথা বলিতে পারেন যে, ইউরোপে স্ত্রীজাতি তাঁহাদিগের প্রকৃতিগত লঘুতা (frivolity) এবং সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন? সেখানে স্ত্রীস্বাধীনতার ফলে স্ত্রীজাতি অবাধ বিলাস স্রোতে আপনাদিগকে ভাসাইয়া দিয়াছেন। "সুশিক্ষা"র ফলে স্ত্রীজাতি ঈশ্বরদত্ত দায়িত্ব বোধ বিসর্জ্জন দিয়া নিজগর্ভের সন্তানকে স্তন্যদান পর্য্যন্ত অনাবশ্যক বোধে তুলিয়া দিতে বসিয়াছেন। যখন দেখা যায় যে, এ স্বাধীনতার ফল বিষময়, তখন মনে হয় যে, এ স্বাধীনতা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযোগিনী নহে। যদি স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সমকক্ষ জ্ঞান না করা যায়, তাহা হইলে অনেকে আমাদিগকে স্বার্থপরতা দোষে অভিযুক্ত করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক কি স্ত্রীলোক পুরুষের সমকক্ষ? দৈহিক বা মানসিক বলে স্ত্রীলোক কি পুরুষের নিম্নবর্ত্তিনী নহেন? কোমলতা যখন স্ত্রীজাতির প্রকৃতিগত এবং পুরুষের নয়, তখন এই কোমলা স্ত্রীজাতিকে পুরুষোচিত গুণে পুরুষের সমকক্ষ কি করিয়া বলা যাইতে পারে। পেলব শিরীষ কুসুমকে লৌহময় খড়্গের সমকক্ষ বলিতে

খাওয়া সত্যের অপলাপ মাত্র। নারীজনোচিত গুণে পুরুষকে ত কেহ নারীর সমকক্ষ বলেন না। স্ত্রী পুরুষের স্বাভাবিক ভেদটাকে তিরোহিত না করিতে পারিলে যদি কেহ আমাদিগকে স্বার্থপর বলেন, তাহা হইলে আমরা নাচার।

স্ত্রীজাতি যদি পুরুষোচিত গুণে পুরুষের সমকক্ষই হইবেন তাহা হইলে আবহমান কাল ধরিয়া তাঁহারা পুরুষের অধীন হইয়াই বা থাকিবেন কেন? "যদি survival of the fittest"-বাদ মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে কোথাও না কোথাও তাহাদিগকে আজ ঠিক পুরুষের মতই দেখিতে পাইতাম। তাহা যখন জগতের ইতিহাসে কোথাও হয় নাই, তখন এরূপ একটা কাল্পনিক সমকক্ষতা খাড়া করিয়া সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করি কেন?

যেখানে স্ত্রীলোকেরা আপনাদিগকে পুরুষের সমকক্ষ বলিয়া মানিয়া লইতে শিক্ষা করিয়াছেন, সেখানে অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে, তাঁহারা আত্মমর্য্যাদা বুঝিয়াছেন বলিয়া যে এরূপ করেন তাহা নয়, পুরুষ তাহাদিগকে ঐরূপ ভাবিতে শিখাইয়াছেন বলিয়াই। আমরাই তাহাদিগকে খেপাইয়া দিয়াছি। শিষ্যেরা পাঁচ জনে মিলিয়া "আপনি অবতার" "আপনি অবতার" বলিয়া বলিয়া যেমন গুরুকে অবতার বানাইয়া দেন, সেইরূপ "তোমরা কিসে আমাদের অপেক্ষা হীন" এইরূপ বলিয়া আমরাও নারীজাতিকে সমকক্ষ বানাইয়া দিয়াছি। একেই বলে "দশচক্রে ভগবান ভূত", সেই জন্য আমার মনে হয় Schopenhawer যে বলিয়াছেন —মনুষ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার সময়ে প্রকৃতি দেবী ঠিক্ মধ্যস্থল দিয়া ভাগ করেন নাই—এ কথা খুব ঠিক্।

যে শিক্ষা পুরুষকে দেওয়া হয়, তাহা কখনই নারীকে দেওয়া উচিত নয়। কারণ আমরা এই শিক্ষার ফলে দেখিতে পাই, চারিদিকে একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের হাওয়া বহিয়া যাইতেছে। বর্ণাশ্রমগত প্রভেদটা মানুষের সৃষ্টি সুতরাং সে প্রভেদ যদি সমাজের পক্ষে হিতকর না হয় উঠিয়া যাউক। কিন্তু স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ স্বাভাবিক এবং প্রত্যক্ষ, সে প্রভেদ উঠিবার নয়। কাজেই যে শিক্ষা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাবটাকে জাগাইয়া দিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, সে শিক্ষা স্ত্রীজাতিকে দিলে সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইবে। কারণ, স্ত্রী পুরুষের মিলন প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষিত, এ মিলন সম্পূর্ণ হইতেই পারে না যদি না দম্পতীর মধ্যে কেহ আপনার ব্যক্তিত্বকে অন্যের সুখ দুঃখের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যখন স্ত্রীই স্বামীর নিম্নবর্ত্তিনী, তখন স্ত্রীকেই এ ভার গ্রহণ করিতে হইবে, উপায়ান্তর নাই। বিদুষীরা আমাকে ক্ষমা করিবেন। যদি দুইটী জীবন মিলিয়া একটী জীবন হয়, ইহা কোনও রমণীর ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে নিজের প্রকৃত মূল্য বুঝিয়া এ স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবেই। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী নিজের স্বরূপকে অযথার্থভাবে দেখিতে নারীকে শিক্ষা দেয় —প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত করায়— এই জন্যই বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী নারীবিষয়ে মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া মোটেই নারীর উপযোগিনী নহে।

নারীর কার্য্যক্ষেত্র বাহিরে নয়, ভিতরে। গৃহস্থালীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীই নারী। তাহাকে সেই ভাবেই শিক্ষা দিতে হইবে। পুরুষোচিত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া নারী কখনই পুরুষের সমান উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবেন না। ভিতরে আপনার স্বায়ত্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া নারী যদি বহির্মুখে ধাবিত হন, তাহাতে তিনি নিজের সর্ব্বনাশ ত করিবেনই, উপরন্তু পুরুষের কার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থাপিত করিবেন। প্রকৃতি তাঁহাকে ভিতরের কার্য্যক্ষেত্রের উপযোগিনী করিয়া গঠিত করিয়াছেন, সেই কার্য্যক্ষেত্রে থাকিয়া তিনি দেবী পদবী লাভ করিতে পারিবেন। যে যাহার অধিকারী তাহাকে সেই বিষয়ের শিক্ষা দিলে সুফল প্রাপ্তির আশা থাকে। কবি মধুসূদনের প্রথম বয়সে ইংরাজি কবিতা লিখিবার ঝোঁক ছিল। সেই সময়ে তাঁহাকে একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক এই বলিয়া উপদেশ দেন, "তুমি ইংরাজিতে হাজার ভাল কবিতা লিখিলেও ইংরাজ কবিগণের সমকক্ষ হইতে পারিবে না, অতএব ইংরাজী কবিতা লেখা পরিত্যাগ করিয়া নিজের ভাষায় কবিতা লিখিতে চেষ্টা কর, তাহাতে তুমি বিখ্যাত হইতে পারিবে।" এই উপদেশ শুনিয়াছিলেন বলিয়া মধুসূদন আজ আমাদের বরেণ্য কবি। তাই বলিতেছিলাম যে, নিজের কার্য্যক্ষেত্রে থাকিয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে দেবী পদবী লাভ সুসাধ্য, কিন্তু তাঁহারা যাহার একান্ত অনুপযোগী, সেখানে হাজার চেষ্টা করিলেও তাঁহারা বিশেষ কিছু করিতে পারিবেন না।

অবশ্য কাহারও কাহারও সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। কারণ জগতে যেমন নারী-প্রকৃতি পুরুষ আছেন, তেমনি পুরুষ-প্রকৃতি নারীরও অভাব নাই। পুরুষোচিত কার্যে তাঁহারা পুরুষকে হার মানাইতে পারেন। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। কোনও নিয়ম করিতে গেলে সাধারণকে লক্ষ্য করিয়াই করিতে হয়, ব্যতিক্রমের (exceptions) দিকে চাহিতে গেলে চলে না। অতএব আমাদের স্ত্রীজাতির শিক্ষা-প্রণালী এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে নারী-চরিত্রের স্বাভাবিক গুণগুলি পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হইয়া উঠে, এবং দোষগুলি তিরোহিত হয়, যাহাতে তাঁহারা গৃহলক্ষ্মীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন। সেই মূর্ত্তিই তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ, তাহাতেই তাঁহাদের চরম পরিণতি, আর তাহাতেই দেশের ও দশের মঙ্গল। এ কথা যদি আমরা মোহের বশে ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে আমরা চোখের সম্মুখে দেখিব—মহিমময়ী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি নহে, কিন্তু কুরূপা বিলাসিনীর মূর্ত্তি। ভগবান্ করুন, আমাদের দেশের এ দুর্দ্দিন যেন না আসে।

আজকালকার প্রবৃত্তি কতকগুলি বড় বড় কথার আড়ালে সত্যকে গোপন করা। কেহ কেহ বলেন, নারী যদি আপনার নারীত্বকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন, তবেই স্ত্রী পুরুষের মিলন ঘনিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু এই নারীত্ব বলিতে তাঁহারা বুঝেন কি? আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এই বুঝি যে, নারীত্ব নারীত্বই, নরত্ব নহে। এ অর্থ যদি তাঁহাদের সঙ্গত হয়, তাহা হইলে আমিও বলি, নারী-শিক্ষা প্রণালী এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে সে বুঝিতে পারে, আমি নারী, নর নহে আমার কর্ত্তব্য নরের কর্ত্তব্যের সঙ্গে সমান হইতে পারে না। জগদীশ্বর আমাদের সন্তান-পালনের ভার দিয়াছেন, তাহাদের যাতে সম্যক্ লালনপালন হয়, আমাদের শুধু তাহাই জানা উচিত, বাহিরের কার্য্যক্ষেত্রে মন দিলে ঈশ্বরদত্ত কর্ত্তব্যগুলিকে অবহেলা করিয়া বিধির বিধানে পদাঘাত করা হয়, অতএব আমরা ভিতরেই থাকিয়া আমাদের স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতে থাকিব, সেই কার্য্যেই আমাদের গৌরব, তাহাতেই আমাদের মুক্তি। তাঁহাদের বুঝান দরকার যে, পুরুষের মন বিশ্বে ছড়াইয়া থাকে, মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত কোথায় উধাও হইয়া যায়, তাঁহাকে একটু সংযত না করিলে বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে চঞ্চলভাবে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া পুরুষ কিছুই করিতে পারিবেন না, সুতরাং ভিতরে থাকিয়া পুরুষকে সামলান নারীরই কার্য্য। নারীর জীবনের মূলমন্ত্র এই হওয়া উচিত—

"সংসারে যত প্রবল ঝঞ্ঝা
পাতিয়া লইব নিজশির,
এ যে ভার সব রমণীর।
চঞ্চল নীর তরণীর প্রায়
পুরুষের মন চারিধারে ধায়
অঞ্চলে তারে বাঁধিয়ে যতনে
করিব তাহার গতি ধীর;
এ যে ভার সব রমণীর।"

এ মন্ত্র ত্যাগের, ভোগের নয়। মালক্ষ্মীগণ! এ মন্ত্র যে দিন তোমরা ত্যাগ করিবে, সে দিন যেন ভারত মহাসমুদ্র গর্ভে ডুবিয়া যায়।

Schopenhawerএর নারীবিষয়ক প্রবন্ধ অবশ্য ইউরোপীয় মহিলাকেই লক্ষ্য করিয়াছে। নারীচরিত্রের যে দোষাবলী দার্শনিকপ্রবর কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই ইউরোপীয় নারীর সম্বন্ধে খাটে। কিন্তু ইহা পাঠ করিয়া যেন আমরাও একটু সাবধান হইতে পারি। কারণ আজকাল একটা বিকট বিলাতীর অনুকরণ-প্রবৃত্তি আমাদের দেশে আবির্ভূত হইয়াছে। আমরা যেন বিলাতী শিক্ষার মোহে অন্ধ হইয়া আমাদের কুললক্ষ্মীগণকে ইউরোপীয় বিলাসিনীতে পরিণত না করি—এই উদ্দেশে আমি প্রবন্ধটী পাঠক-পাঠিকাগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছি। Schopenhawerএর প্রবন্ধের ফলে যদি আমাদের দেশে এ বিষয়ে একটু আলোচনাও হয়, তাহা হইলে আমি শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। Schopenhawer আক্রোশের বশবর্ত্তী হইয়া লিখিলেও কতকগুলি খাঁটি কথা বলিয়াছেন। তিনি একজন ভুক্তভোগী, একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

অনাদৃতা জননী।

[শ্রীকালিদাস রায়।]

অমন লেখা পড়ায় মাথায় মারো হাজার ঝাঁটা
সাধে কি মোর এই বয়সে ভূতের মতন খাটা।
পরের দ্বারে দুখ মেহন্নত করতে কি হয় তায়
শুধু পোড়া পেটের লাগি, অমন বেটা যায়?
এমন সে যে হবে তাহা হয় নি কভু মনে
লেখাপড়া শিখ্‌লো বাছা কোন্ অশুভ খনে।
খন শিখ্‌তে শিখ্‌তে আজি পড়লো হাতে খাঁটা
তাই বলি বোন লেখাপড়ায় মারো হাজার ঝাঁটা।

নবীনের মা ভাগ্যবতী মুকু তাহার ছেলে,
বৌ নিয়ে সে পালায় নিক মাকে তাহার ফেলে!
নিমাই শরৎ নিতাই ভরত মুকু এরা সবাই
মাথায় রেখে পূজো করে মাকে তারা ক'ভাই।
গাঁয়ের যত মুকু ছেলে পয়সা আনে কম,
পেটের তরে মাকে তাদের করতে হয় না শ্রম।
বিদ্বানের মার ভাগ্যে দেখ চাউল চিড়া ছাঁটা
অমন লেখাপড়ার মাথায় মারো হাজার ঝাঁটা।

কর্ত্তা ছিল, ঠকর-মকর জানতো সামান্যই
একটি পা'ও চলত না সে মায়ের কথা বই।
আমার কথা ভাবল না সে, বিদ্যে শিখাইয়ে
ছেলেটারে ধনীর ঘরে দিয়ে গেল বিয়ে।
মুকু-জামাই বরং ভাল, ভার নিতে চায় আজ-ই
ছেলের মাথা হেঁট হবে তাই হই না আমি রাজী।
চরকা কাটি, বিক্রী করি উঠানের শাক ডাঁটা
অমন লেখাপড়ার মাথায় মারো হাজার ঝাঁটা।

বুক ফেটে যায় যখন তারে নিন্দে করে লোকে
সব চেয়ে দুখ বৎসরান্তে দেখতে পাই না চোখে।
জান্‌লে এমন গায়ের যত গয়নাগুলো বেচে
এক বেলা আধপেটা খেয়ে ভিক্ষা যেচে যেচে।
লেখাপড়া শিখাতে তায় দেতাম না এমন
ভাল্‌ ছিল মুকু হয়ে থাকত ঘরে, বোন।
ছেলের মিছে কি দোষ দেব, আমার কপাল কাটা
অমন লেখাপড়ার মাথায় মারো হাজার ঝাঁটা।

সারনাথের ইতিহাস।*

(সমালোচনা)

[শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।]

আমাদের পুণ্যময়ী জননী বঙ্গভাষা দিনে দিনে অত্যধিক সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা আমাদের পরম আনন্দের ও অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। পরন্তু জননীর এই উন্নতির দিনে যতগুলি গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে, সে সমস্তই যে সারবান্, একথা বলা যায় না। এই সুপবিত্র শুভ সময়েও এরূপ অনেক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, যাহাদের প্রচার বঙ্গভাষার এবং বঙ্গভূমির পক্ষে শুভকর নহে। বর্ত্তমান সময়েও সুপাঠ্য সদ্‌গ্রন্থ অতি অল্প সংখ্যকই প্রচারিত হইতেছে।

আমরা অদ্য যে গ্রন্থখানির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই গ্রন্থখানি বিশেষ সারবান্। আমাদের যত দূর জানা আছে, তাহাতে মনে হয়, এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে সারনাথের ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। অতএব, এই গ্রন্থের প্রণেতা শ্রদ্ধের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের মাতৃ-ভাণ্ডারের একটী অভাব মোচন করিয়াছেন—একথা অকপটচিত্তে স্বীকার করিতে হইতেছে।

সারনাথ বৌদ্ধগণের একটী অতি পবিত্র তীর্থস্থান। ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত যে "সদ্ধর্ম্মে"র বিমল আলোকে সমগ্র জগতের অর্দ্ধভাগ উদ্ভাসিত হইয়াছে, এই সারনাথের পবিত্র ভূমিতে সেই ধর্ম্মের প্রথম প্রচার হয়। এই দুঃখময় ক্ষণভঙ্গুর জগৎকে অতিক্রম করিয়া নির্ব্বাণলাভের পরম উপায়, আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সারনাথের পুণ্যক্ষেত্রে বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক উদ্‌ঘোষিত হয়।

কপিলবাস্তুর রাজকুমার জগৎকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন দেখিয়া হৃদয়ে যে গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তিনি বিস্তীর্ণ রাজ্য ও রাজভোগ তুচ্ছ করিয়া

---

* "সারনাথের ইতিহাস"। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য M.A. M.R. A.S. প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়; (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স); ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ১৭৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—১।০ টাকা।

ভিখারীর বেশে জগতের উদ্ধারের উপায়ের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ কালের কঠোর সাধনায় জগতের উদ্ধারের জন্য যাহা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সর্ব্ব প্রথমে সেই অমূল্য রত্ন সারনাথে "পঞ্চবর্গীয়" পাঁচজন শিষ্যকে বিতরণ করেন। সেই সময় হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ পতনের সময় পর্য্যন্ত সারনাথ বৌদ্ধধর্ম্মের একটী অতি প্রধান লীলা-নিকেতন ছিল। ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রচারিত "সদ্ধর্ম্মে"র উত্থান-পতনের ইতিহাস সারনাথের সহিত সম্পূর্ণ বিজড়িত। এই কারণে সারনাথের ইতিহাস,—কেবল সারনাথের ইতিহাস নহে,—বুদ্ধধর্ম্মের উত্থান-পতনের ইতিহাসও বটে। সারনাথের ইতিহাস না জানিলে, বুদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি ও ক্রম-পরিণতির ইতিহাস অজ্ঞাত থাকিয়া যায়।

ইংরেজ, ফরাসী এবং জার্ম্মাণ পুরাতত্ত্ববিদগণ অদ্যাবধি সারনাথ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গ ভাষায়ও সারনাথের প্রসঙ্গ কিছু কিছু আলোচিত হই য়াছে। কিন্তু পণ্ডিত দয়ারাম সাহনীর ক্যাটালগ ব্যতীত সারনাথের ধারাবাহিক আলোচনা কোন বিদেশীয় ভাষায় হইয়াছে কি না, তাহা আমাদের জানা নাই। পণ্ডিত সাহ নীর গ্রন্থও ক্যাটালগ মাত্র,—ইতিহাস নহে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে সারনাথের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে, এইজন্য এই গ্রন্থ অত্যন্ত আদরের বস্তু হইয়াছে। অধ্যাপক বৃন্দাবনচন্দ্র এই গ্রন্থে যেরূপ প্রচুর অনুশীলন ও বিচার-নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করিবে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ ও শাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব-মন্দিরের সুদৃঢ় কবাট তাঁহাদের বুদ্ধিকৌশলেই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত সকল স্থলেই ভ্রম-প্রমাদ রহিত নহে। পাশ্চাত্যগণ আমাদের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মানুষ্ঠান, রুচি ও মানসিক অবস্থার সহিত অদ্যাবধি সম্পূর্ণ পরিচিত হইতে পারেন নাই। এই জন্য অনেক স্থলে তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়া সত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। অতএব সকল স্থলেই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সুসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে বিশেষ বাধা আছে। আমাদের স্বদেশের ইতিহাস এখন আর পরের নিকট শুনিবার বস্তু নহে। আমাদের নিজের স্বাধীন চিন্তায় ও স্বাধীন চেষ্টার সহায়তায় স্বদেশের ইতিহাস লিখিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের এই সাধু উদ্যমে পাশ্চাত্য মনীষিগণের সংগৃহীত উপকরণ বিশেষ উপকারে আসিবে, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ভারতীয় ইতিহাসের স্বদেশীয় লেখকগণকে এই সকল কারণে পাশ্চাত্য মনীষিগণের নিকট চিরকাল ঋণী থাকিতে হইবে, তাঁহাদের প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে কৃপণতা করিলে অত্যন্ত অধর্ম্ম হইবে।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে অদ্যাবধি সারনাথ সম্বন্ধে আবি ষ্কৃত কোন তথ্যই উপেক্ষিত হয় নাই। গ্রন্থকার পাশ্চাত্য মনীষিগণের প্রচারিত কোন সিদ্ধান্তই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করেন নাই। কোন কোন স্থলে যুক্তি দ্বারা পাশ্চাত্য মনীষিগণের সিদ্ধান্তের সমীচীন সমালোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে এইরূপ স্বাধীন চিন্তা ও পরিশ্রমের সমাবেশ থাকায়, সারনাথ সম্বন্ধীয় পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধ ও গ্রন্থ অপেক্ষা এই গ্রন্থে অধিক তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে।

সারনাথের ইতিহাস কেবল ধর্ম্মের ইতিহাস নহে, ভারতীয় প্রাচীন শিল্প কলা-পদ্ধতির ইতিহাসও এই সারনাথের ভগ্নাবশেষের মধ্যে নিহিত আছে। যাঁহারা ভারতীয় প্রাচীন শিল্প কলা-পদ্ধতির অনুশীলন করিতেছেন, তাঁহারা সারনাথের চিত্রশালা (Museum) হইতে প্রচুর জ্ঞানলাভ করিবেন। অশোকের সময় হইতে হিন্দু-রাজত্বের অন্তিম অবস্থা পর্য্যন্ত ভারতের শিল্প-কলার অবলম্বিত পদ্ধতি এবং ঐ পদ্ধতির ক্রমপরিণতি সারনাথের চিত্র শালায় সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। অধ্যাপক বৃন্দাবনচন্দ্র এ বিষয়ে আলোচনা করিতে ভুলেন নাই। অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, মূর্ত্তিনির্ম্মাণ-পদ্ধতি ভারতীয় প্রাচীন শিল্প-কলার নিজস্ব বস্তু নহে; ইহা গ্রীকদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। "সারনাথের ইতিহাসে" পাশ্চাত্যগণের এই মত প্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের যতগুলি গৌরবের বস্তু আছে, তাহার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম একটি অতি প্রাচীন, এ কথা সকলকেই অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে। সেই "সদ্ধর্ম্মে"র প্রথম প্রচার-ক্ষেত্র, বহুশত ভিক্ষু ভিক্ষুণীর সাধনার নিকেতন এই সারনাথ স্বদেশীয় ও বিদেশীয়—সকলেরই দ্রষ্টব্য-স্থানের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই স্থান কেবল বৌদ্ধগণের অথবা ভারতীয়গণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা নহে; বিদেশীয় এবং ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী উদার-হৃদয় মনীষিগণেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, ইউনিভার্সিটী কমিশনের সভাপতি মহানুভব ডাক্তার স্যাডলার যখন সারনাথ দেখিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে —যে স্থানে ভগবান বুদ্ধদেব "ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন" করেন, অর্থাৎ প্রথম উপদেশ প্রদান করেন, সেই স্থানে,— তিনি মস্তকের আবরণ (টুপি) উন্মোচন করিয়া সসম্ভ্রমে তিনবার অভিবাদন করিয়াছিলেন। এই সারনাথ দর্শন করিবার পূর্ব্বে সারনাথের ঐতিহাসিক বিবরণ পাঠ না করিলে, সারনাথ-সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানলাভ হইতে পারে না। আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ায়, সারনাথের প্রাচীন বিবরণ জানিবার জন্য আমাদিগকে আর বিদেশীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না, আমরা মাতৃভাষার সাহায্যেই সারনাথের সমগ্র বিবরণ অবগত হইতে পারিব।

এই গ্রন্থের ভাষা সরল, লিপিকৌশলে গ্রন্থখানি উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভাষার ত্রুটী পরিলক্ষিত হইল। আশা করি, গ্রন্থকার ভবিষ্যতে সেই সকল ত্রুটী অবশ্যই সংশোধিত করিবেন। এই স্থলে আবশ্যক বোধে আরও দুই একটি কথা বলিতে হইতেছে;—

(১) এই গ্রন্থে বৌদ্ধ-সাহিত্যে সারনাথের উল্লেখের কথা অনেকবার লিখিত হইয়াছে। কাশীখণ্ডে রাজা দিবোদাসের উপাখ্যানের মধ্যে সারনাথের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত আছে। এ গ্রন্থে সে বিষয়ে কিছু লিখিত হয় নাই; সে কথার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল।

(২) এই গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় "আর্য্যের গম্ভীরা" হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে;—"কাশীর নিকটবর্ত্তী সারনাথ-বিহার বর্দ্ধিষ্ণু বৌদ্ধ-প্রধান স্থান। ব্রাহ্মণগণ নাকি কুমারিলের উত্তেজনায় অগ্নি-প্রদান করিয়া উহা ভস্মে পরিণত করিয়াছিলেন। কনিংহাম, কিটো, টমাস্ প্রভৃতি উক্ত স্থান হইতে অর্দ্ধদগ্ধ গলিত ধাতু প্রবাহ এবং ভস্মস্তূপ অপসারণ করিয়াছেন।"

গ্রন্থমধ্যে স্পষ্ট ভাবে এ কথার কোন খণ্ডন করা হয় নাই; সারনাথ-বিহারের ধ্বংস সম্বন্ধে ইহাও একটা মত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য অত্যন্ত কঠোর; তিনি কোন কথাই বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। এই কারণে এই ভিত্তি-হীন কল্পনার স্পষ্টরূপে খণ্ডন না করা গ্রন্থকারের পক্ষে অনুচিত হইয়াছে।

সারনাথ-বিহার অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হইয়াছিল, এ কথা সত্য হইতে পারে। সারনাথের ভগ্নাবশেষের অন্যতম অনুসন্ধানকারী মেজর কিটো এই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ঐ অগ্নিসংযোগে ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তৃত্ব এবং ভট্ট কুমারিলের নেতৃত্ব—এই দুইটাই আকাশ-কুসুমের ন্যায় কাল্পনিক। সারনাথে আবিষ্কৃত লিপি হইতে জানিতে পারা যায়, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সারনাথ বিহার বর্ত্তমান ছিল। কান্যকুব্জাধীশ্বর মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের (খৃঃ ১১১৪—১১৫৪) অন্যতমা রাজ্ঞী কুমরদেবী সারনাথে একটা বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং সম্রাট অশোকের সময়ের "শ্রীধর্ম্ম চক্র জিন" নামক বুদ্ধ মূর্ত্তির জীর্ণ সংস্কার করাইয়াছিলেন—ইহা সারনাথে প্রাপ্ত কুমরদেবীর প্রশস্তি হইতে জানিতে পারা যায়। ত্রিপুরীর চেদীবংশীয় কর্ণদেবের ১০৫৮ খৃষ্টাব্দের একখানি লিপি হইতে জানিতে পারা যায়,ঐ সময়েও সারনাথ-বিহারে স্থবির ও ভিক্ষুগণ বাস করিতেন। গৌড়াধিপ মহীপালের ১০৮৩ সংবৎ, অর্থাৎ ১০২৭ খৃষ্টাব্দের সারনাথ-লিপি হইতে জানিতে পারা যায়, সেই সময়ে সারনাথ-বিহারের জীর্ণ সংস্কার করা হইয়াছিল। এই সকল প্রমাণের দ্বারা দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সারনাথ-বিহারের অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধরূপে সিদ্ধ হয়। অন্যদিকে ভট্ট কুমারিল আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী; আচার্য্য শঙ্কর অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। এরূপ অবস্থায়, কুমারিলের উত্তেজনায় ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সারনাথ-বিহারের ধ্বংসের একটী অলীক কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

(৩) গ্রন্থের ৯৫ পৃষ্ঠায় অশোকানুশাসনের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার "তেতবে" পদটার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—এটী তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত বৈদিক শব্দ; ত্বিদ্ ধাতুর উত্তর "তু" প্রত্যয় হইয়া সম্প্রদান কারকে ত্বেতবে পদ সিদ্ধ হয়। এই "ত্বেতবে" পদের অপভ্রংশে "তেতবে" এইরূপ হইয়াছে।

এই স্থানে গ্রন্থকার একটু ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। "ত্বেতবে" বৈদিক শব্দ বটে, কিন্তু তুমুন প্রত্যয়ান্ত শব্দ নহে; তুমুন্ প্রত্যয়ের সমানার্থক "তবেন্" প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখানে "তু" প্রত্যয়ান্ত হইয়া তাহার উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে—এ কথাও সত্য নহে। "তবেন্" একটি অখণ্ড প্রত্যয়, ইহার নকারটী অনুবন্ধ, এখানে চতুর্থী বিভক্তির কোন সম্বন্ধ নাই। পাণিনি তুমর্থে "তবেন্" প্রত্যয়েরই বিধান করিয়াছেন। অষ্টাধ্যায়ীর তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদে ৯ম সূত্রে এই "তবেন্" প্রত্যয়ের বিধান করা হইয়াছে। * চতুর্থী বিভক্তি হইলেই সম্প্রদান কারক হয় না, ইহাও মনে রাখা উচিত। গ্রন্থকারের উদ্ধৃত কাত্যায়নের পালি ব্যাকরণের সূত্রেও "তবে" একটী অখণ্ড প্রত্যয়রূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। † গ্রন্থকার এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন,—"বৈদিক সংস্কৃতে এই তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্রিয়ার সহিত কর্ম্মণি বাচ্যের অর্থ পরিগ্রহ করে।" আমাদের মনে হয় গ্রন্থকারের এই উক্তি সত্য নহে। আমাদের পূর্ব্বকথিত পাণিনির ৩।৪।৯ সূত্রের মহাভাষ্যে ভাষ্যকার পতঞ্জলি স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, তুমুন এবং তাহার সমানার্থক এই প্রত্যয়গুলি ভাবে হইয়া থাকে। ৩।২।২৬ সূত্রের ভাষ্যেও ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—"তুমর্থশ্চ কঃ? ভাবঃ।" অতএব আমরা ভাষ্যকারের মতের অনাদর করিয়া গ্রন্থকারের মতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না।

(৪) "ধামেক" স্তূপ বলিয়া গ্রন্থকার যাহার উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ স্তূপের স্থানীয় নাম "ধমেক"। ইংরেজী অক্ষরে লিখিতে যাইয়া সাহেবেরা "ধামেক" লিখিয়াছেন। স্থানীয় লোকের নিকট, আমরা "ধমেক" নাম শুনিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেন, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও যোগশাস্ত্রের প্রচুর অনুশীলন ছিল। যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ "ধর্ম্মমেঘ" নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাধির নামের অনুকরণে এই স্তূপের নাম "ধর্ম্মমেঘ" রাখা হইয়াছিল; কালক্রমে তাহার অপভ্রংশে বর্ত্তমান "ধমেক" নাম উৎপন্ন হইয়াছে। (কাশীর সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল পরলোকগত ডাক্তার ভিনিস মহোদয়ের মতে "ধর্ম্মেক্ষা" শব্দ হইতে এই "ধমেক" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে)—সারনাথের ইতিহাস—১১৭ পৃষ্ঠা।

আমাদের সমালোচনা এই খানেই সমাপ্ত করিতেছি। অধ্যাপক বৃন্দাবনচন্দ্রের অনুশীলনের সাফল্য দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছি। আমাদের আশা আছে, গ্রন্থকার এই গ্রন্থ লিখিয়াই নিবৃত্ত হইবেন না; তাঁহার দ্বারা মাতৃভাণ্ডারের আরও অনেক অভাব পূর্ণ হইবে।

* "তুমর্থে সেসেনসেঅসেন্ক্সেকসেনধ্যৈঅধ্যৈন্কধ্যৈকধ্যৈন্শধ্যৈশধ্যৈন্তবৈতবেঙ্ তবেনঃ।"

† অনেক স্থলে "ইচ্ছন্তেসু সমানকত্তৃকেসু তবে তুহ বা।"

মন্দিরের দেবতা।

[শ্রীদীননাথ মজুমদার, এম-এ।]

বাজে আরতির শঙ্খ কাঁসের নিক্কণ
মন্দির ভরিয়া যায় শত ভক্তদলে।
ফল, ফুল, নৈবেদ্যের মহা আয়োজন
গৃহ গাত্র সিক্ত হয় পাদ্য অর্ঘ্য জলে।
কেহ পুত্র, কেহ ধন করিয়া যাচনা
কেহ ফেলি দরদের দ্রবিত নিঃশ্বাস।
কেহ সাধু খ্যাতি তরে করি নীরাজনা
নির্ম্মাল্য লইয়া শিরে গেল নিজবাস।
স্তব্ধ নিরজন গেহে একক দেবতা
সম্মুখে স্থাপিত নগ্ন জড় জল ঘট।
ফুল দূর্ব্বা বিল্বদলে ভূমি আচ্ছাদিতা
মানবের ছলনার পুণ্য দৃশ্যপট।
ডাকিয়া দেবতা কয় পূজারির কাছে
নাহি চাহি অর্ঘ্য জল, নৈবেদ্যের থালা।
বৃথা এ মঙ্গল ঘট পল্লবিত রাজে
নিষ্ফল চন্দন চূয়া—ধূপ দীপ জ্বালা।
আমি চাহি পরাণের আকুল পিয়াসা
অবিশ্রান্ত প্রীতি-প্রেম-ভক্তি বরিষণ।
নাহি চাই অর্ঘ্য, সাজি শুধু যাওয়া আসা
আমি চাই প্রাণে প্রাণে অন্তর মিলন।

জীবন-চরিতের মূল্য।

[শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এ।]

ব্যক্তিবিশেষের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া মানুষের মানসিক উন্নতি বিধান করা জীবন-চরিত লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য। সকল প্রতিভাবান পুরুষের জীবনচরিত যেরূপ সাহিত্যের হিসাবে প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান, সেইরূপ ব্যবসায় বা শিল্পে যাঁহারা যশোলাভ করিয়া কৃতিত্ব দেখাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও জীবনী তদ্রূপ সমাজের পক্ষে হিতকর। যাঁহাদের বহু আয়াস-লব্ধ ব্যবসায় বুদ্ধির সাফল্য, স্বপ্রতিষ্ঠিত ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবসায়ে দেদীপ্যমান, সেই শ্রেণীর কৃতী পুরুষদিগের জীবনী পর্য্যালোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। আজ যে বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে ব্যবসায় উন্নতি লাভ করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়াছে; বাঙ্গালী দীর্ঘ শতাব্দীর কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় মগ্ন থাকিয়া নিজ হাতের লক্ষ্মী পরকে দিয়া পরের দুয়ারে স্ব স্ব বিদ্যাবুদ্ধি বিক্রয় করিয়া স্বীয় অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, ঘুমের ঘোর কাটিয়া ব্যবসায় যে সকল উন্নতির প্রকৃষ্ট পথ নির্দ্ধারিত করিয়াছে সেই পথের প্রবর্ত্তক ও অগ্রণীদিগের জীবনী ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয়। তাঁহাদের ঘটনা-বৈচিত্র্যময় জীবন যতই পাঠ করা যায়, ততই আশার সঞ্চার হয়, হৃদয়ে নিরাশার কুয়াসা ভেদ করিয়া সাফল্যের উজ্জ্বল রশ্মি প্রতিভাত হয়। আশা সকল কার্য্যের প্রবণ; সেই আশা ও উৎসাহ যখন বহু বাধা বিঘ্নে ধ্বস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তখন ধৈর্য্যসহকারে সেই আশা পোষণ করিবার একটী অবলম্বন আবশ্যক। কল্পিত দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হইলেও কখনই আদর্শ হইয়া দাঁড়ায় না। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলাফলের দৃষ্টান্তই বড় কার্য্যকারী হয়। এরূপ স্থলে যাঁহারা নিজস্ব প্রারব্ধ কর্ম্মে সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হীনতা দীনতা অগ্রাহ্য করিয়া প্রাণপাত করিয়া সাফল্যের উচ্চ তুঙ্গে উঠিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনী বাস্তবিকই প্রাণ উন্মাদনা-কারিণী ও শিক্ষাপ্রদায়িনী। দারিদ্র্য সকল উন্নতির অন্তরায়, এই যে মারাত্মক ভ্রম যাঁহারা হৃদয়ে পোষণ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে অল্প মূলধনে নিজ বুদ্ধি-প্রভাবে যাঁহারা লক্ষপতি হইয়াছেন তাঁহাদিগের জীবন-চরিত পাঠ করিলেই সাধারণতঃ সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে ইচ্ছা হয়। প্রতিবন্ধের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, হৃদয়ের শোণিত দিয়া যাঁহারা ব্যবসায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আজ সমগ্র বাঙ্গালাদেশে যে নূতন জাগরণের ভাব আসিয়াছে, ব্যবসার যে ঢেউ উঠিয়াছে, তাহা চিরস্থায়ী ও ফলপ্রসূ করিতে হইলে প্রত্যেক কর্ম্মীর অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অটুট অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। সেই-জন্য আমাদের বাসনা যে আমরা পাঠকবর্গের সমক্ষে একে একে অক্লান্তকর্ম্মী, বাণিজ্য-লক্ষ্মীর একনিষ্ঠ সাধক এবং লক্ষ্মীর বরপুত্রদিগের শিক্ষাপ্রদ জীবনচরিত উপস্থাপিত করিব। দারিদ্র্যের সহস্র ঝঞ্ঝাবাত যাঁহারা নীরবে সহ্য করিয়াছেন, লোকনিন্দায় যাঁহারা ভ্রূক্ষেপও করেন নাই, জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে যাঁহারা স্বীয় সঙ্কল্প হইতে একতিলও বিচ্যুত হয়েন নাই, তাঁহাদের জীবনী আজি জাতীয় অভ্যুত্থানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকে, ইহা স্বদেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেরই বাঞ্ছনীয়। আমাদের বিশ্বাস, এই সকল জীবনী পাঠে আমাদের দেশের নিরুৎসাহী ব্যক্তি উৎসাহের উৎস পাইবেন, নিরাশ ব্যক্তির হৃদয়ে পুনরায় আশার মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইবে এবং নিষ্কর্ম্মার হৃদয়ে কর্ম্মের আগ্রহ জাগিয়া উঠিবে।

আলক্ষ্মী।

[শ্রীচণ্ডীদাস গুপ্ত, বি-এ।]

কপিলমুনির অগ্নিতেজে যেদিন সগররাজের বংশের ছোট ছেলেটি পর্য্যন্ত ভস্ম হইয়া গেল, সেই দিনের মতই যেন কা'র ক্রুদ্ধ অভিশাপে দয়াল চাটুয্যের অত বড় সংসারটি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। তার জীবনের শেষের দিনে সে তা'র মেয়ের মেয়ে শান্তি ভিন্ন তা'দের বংশের আর কেহ বাঁচিয়া আছে কি না, তাহার কোন ইয়ত্তা করিয়া উঠিতে পারিল না। এমন তা'র পোড়া কপাল, যে তা'র জামাতার বংশেরও অনেকে অতি অল্প আয়ু লইয়া জন্মিয়াছিল। দয়াল যেদিন এ রাজ্যের খেলা শেষ করিয়া দিল, সেদিন তের চোদ্দ বছরের মেয়ে শান্তি

তা'র মাতামহের কুলেরও আর কারও আশ্রয় না পাইয়া পিতার বৈমাত্রের ভাই মাণিকচন্দ্রের ভিটাতেই অল্প একটু স্থান পাইল। এখানে থাকিবার শান্তির এতটুকু দাবী ছিল না। তার একটিমাত্র কারণ এই যে, তার পিতার সহিত মাণিকের আদৌ সদ্ভাব ছিল না। বয়ালের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ধর্ম্মদাস-বুড়ো মাণিককে ডাকিয়া বলিয়াছিল,—'আর কেন। কচি মেয়েটা ত' আর তোমার কিছু অনিষ্ট করে নি'—তুমি নিজে যদি তা'কে রাখ তা' হ'লে কেমন দেখায় বল ত'।' ধর্ম্মদাসের কথা আর সে এড়াইতে পারিল না। শুধু শান্তিকে কেন, এমন কি তার মা'কেও ধর্ম্মদাস কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। তা' ছাড়া মাণিক জানিত, ধর্ম্মদাসের কথাটা তাচ্ছল্য করিলে তা'র নামে অভিযোগটা সে গ্রামের মধ্যে এত বড় করিয়া তুলিয়া ধরিবে যে, বিদ্রূপের জালায় হয় ত তা'কে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইবে।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া মাণিক দেখিল তার স্ত্রী কুমুদিনী আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া বিছানায় শুইয়া আছে। মাণিক একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি, অসুখ ক'রল না কি ?

কুমুদিনী লেপের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিল,—আর কথায় কাজ নেই, আস্তে আস্তে এখান থেকে চ'লে যাও ত'।

মাণিক ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল,—কেন, কি হ'য়েছে তোমার ? সেই সকালের কথাটা এখনও ভোল নি' ?—এ যে তোমার মিছে আব্দার গা। শান্তি এক ফোঁটা মেয়ে, সে কি আর সব কাজ ক'রতে পারে ?

কুমুদিনী আড় হইয়া শুইয়া উত্তর দিল,—ওঃ, ভারি করুণা ক'রছে সে। আমি যে নিজের শরীরটা নিয়ে এত ভুগছি,—একদিন আর সে কাজ ক'রতে পারে না ?

মাণিক পিছন ফিরিয়া কহিল,—কেনই বা ক'রবে।—সে ত আর তোমার বাড়ীর ঝি হ'য়ে আসে নি' ?

কুমুদিনী গলা চড়াইয়া বলিল,—যাও, যাও, মিছে বক্‌বক্ কর' না এখানে। লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটা এসে পর্য্যন্ত আমার অসুখ, ছেলেগুলোর অসুখ, আর তুমি এলে

মাণিক আর একটুও অপেক্ষা না করিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

রান্নাঘরের দাওয়ার এক কোণে বসিয়া শান্তি হিমে কাঁপিতেছিল। কুমুদিনী একটা মোটা গায়ের কাপড় জড়াইয়া বাঁকিয়া চুরিয়া আসিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—ভারি আদুরে মেয়ে হ'য়েছিস যে; তবু যদি খাবার খুদ জুটত। তা'র পর সে আর একটু সরিয়া গিয়া শান্তির মুখের কাছে হাত নাড়িয়া খুব চড়া সুরে বলিল,—অমন ক'রে পায়ের ওপর পা তুলে ব'সে থাক্‌লে আর ভাত জোটে না,—মরণ আর কি, —এলেন যেন একেবারে রাণী হ'য়ে।

শান্তি জড়ান কথায় বলিল,—আমি ত' রাঁধ্‌তে জানি না, খুড়ীমা। অন্য আর যে কাজ বল্‌বে আমি ক'রে দেব।

কুমুদিনী একটা পিঁড়ির উপর উঠিয়া বসিয়া কহিল,—বুড়ো মেয়ে কি আর জানিস্ তা' হ'লে ?—ছিঃ ছিঃ, কি আপদই জুটল আমার বাড়ীতে।

একেবারে অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মদাস-বুড়ো হাঁকিল,—কোথা রে, দিদি—এখনও সাড়া পাচ্ছি নে' যে ?

ধর্ম্মদাসের গলার আওয়াজ শুনিয়াই কুমুদিনী নিজের ঘরে গিয়া লেপের মধ্যে শুইয়া রহিল।

ধর্ম্মদাস চীৎকার করিয়া বলিল,—কৈ রে, আজকে আর আমার দিদি এসে হাত ধ'রে এগিয়ে নে' যাচ্ছে না ?—

শান্তি এতক্ষণ জোর করিয়া চোখ দু'টি খুলিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু চোখের কোণে কোণে এত জল জমিয়া গিয়াছিল যে, এক নিমেষে যেন সহস্র ধারায় আঁখিজল ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। সে মুখে কাপড় ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

ধর্ম্মদাস দালানের উপর উঠিয়া কহিল,—এ আবার কি ? এইমাত্র খুড়ীর সঙ্গে গল্প হ'চ্ছিল,—আর আমায় দেখেই কান্না।

শান্তি মুখ তুলিয়া বলিল,—কেন তুমি আমায় এখানে রেখে গেলে ?—আমি কিছুতেই একেলা থাক্‌তে পা'রব

ধর্ম্মদাস তাহার পাশে বসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—দূর, একলা কেন, এই ত আমি র'য়েছি।

ধর্ম্মদাসের মুখের কাছে মুখ রাখিয়া শান্তি কহিল,—না, তুমি আমায় এক্ষুণি নিয়ে চল।

ধর্ম্মদাস তা'কে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল,—ছিঃ, দিদি, অমন ক'রতে আছে কি; ওরা শুনলে কি ব'লবে?

তার পর শান্তির মুখখানি বুকের উপর রাখিয়া উঁচু করিয়া ধরিয়া ধর্ম্মদাস কহিতে লাগিল,—কোথাকার দিদিরে তুই,—আমি কি তোকে নে' যেতে পারি? ওরা যেতে দেবে কেন?

শান্তি নিরাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—যেতে দেবে না?—কেন যেতে দেবে না, দাদু?

ধর্ম্মদাস শান্তির চোখ দু'টি মুছিয়া দিয়া বলিল,—আমি কে? আমার সঙ্গে তারা কেনই বা যেতে দেবে?

কথাটি বলিয়া ফেলিয়া ধর্ম্মদাস আদৌ সুখ পাইল না। সে নিজের মুখের কথায় নিজেই শিহরিয়া উঠিয়া শান্তিকে আরও জোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল। তার মনে হইল কি সেই দিনই যেন তা'র অন্তরের সব বন্ধনগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়া তা'কে শ্মশানের একটা মড়ার মত নির্জীব করিয়া কে তা'র গলা টিপিয়া সেখানে ফেলিয়া রাখিয়া গেল! সে ত' বুড়ার একটি দিনের সম্বন্ধ-পাতান দিদি নয়! কেই বা জানে কত হাজার হাজার ... শেষে সাঁঝের অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া ধর্ম্মদাস এই মারখা... মেয়েটির জন্ত পাথরের ঘায়ে নিজের বুকের পাঁজরে ওয়ে প... করিয়া বলিত,—দিদি, দিদি, ওরে আমার দিদি, ছুটে আ... ই বুড়োর কোলের ওপর ছুটে আস্‌ছিস্ নে'?

মা...

(২)

ক'রছ... ...ের উপর বসিয়া হুঁকা মুখে দিয়া মাণিক বলিতে-... র্থা-শুনছ, আমাদের বোধ করি এবার না খেয়ে একটা... হবে। ধান আর তরি-তরকারী যা' লাগিয়েছিলাম কি তা... ত হ'ল না—এখন উপায় কি?

...মুদিনী জবাব দিল,—তা' শুনে আর আমি কি ...বল?

...একটান ধোঁয়া লইয়া বলিল,—সব যে-সে কথা নয় গো,—বুঝেই দেখ, আমি-এহেন লোক মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়েছি।

কুমুদিনী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—যেমন একটা কোথা-কার অলক্ষ্মী এনে ঘরে ঢুকিয়েছ।

মাণিক সে কথায় আমল না দিয়া কহিল,—ও পাড়ার কর্ত্তাবাবুর ছেলে রমেশ কিছু টাকা ধার দিতে রাজি হ'য়েছে তাই ভরসা, নইলে—।

কথা শেষ না হইতেই মাণিক কাণ খাড়া করিয়া কি শুনিয়া বলিল,—ঐ বুঝি রমেশ নিজে এসেই হাঁকাহাঁকি ক'রছে? তা'র পর হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

জেলার সব চেয়ে বড় ডাক্তার রামহরিবাবুর একটিমাত্র ছেলে রমেশ গত বৎসর আইন পাশ করিয়া বাপ মায়ের কাছে গ্রামে আসিয়া কিছুদিনের জন্ত বিশ্রাম লইতেছিল। রামহরিবাবু বৃদ্ধ বয়সে আর কোন কাজকর্ম্ম করিতেন না। সদ্‌ব্রাহ্মণ তিনি, সদাচারে নিজের জীবন অতি-বাহিত করিয়া ছেলেটাকেও সদ্বংশোচিত নিষ্ঠা ও তেজো-গর্ব্বে বিভূষিত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন।

রমেশ কহিল,—এই নিন্ আপাততঃ সামান্ত কিছু দিলুম। তা'র পর সে আর একটি কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া বলিল,—এই টাকাটাও রাখুন, ধর্ম্মদাস দাদু তা'র নাত্‌নির জন্তে পাঠিয়ে দিয়েছে।

মাণিক টাকাগুলি লইয়া বলিল,—যখন এতদূর এসেছ, রমেশ, তখন গরীবের বাড়ীতে কিছুক্ষণ ব'সতে হবে। রমেশ নানা আপত্তি তুলিয়াও যখন কিছুতেই পার পাইল না, তখন অগত্যা মাণিকের সহিত ভিতরেই চলিল।

কুমুদিনী বলিল,—আজ আমাদের যে উপকার ক'রলে, বাবা, তা চিরদিনই মনে থাকবে।

রমেশ লজ্জিত হইয়া কহিল,—না, না, ও কিছু না, ও কিছু না।

কুমুদিনী অল্পে অল্পে কহিতে লাগিল,—এরকম ভাবে ত কোন দিন আমাদের কপাল ভাঙে নি'। কি জানি অপয়া মেয়েটা এসে পর্য্যন্ত কেন আমাদের একটার পর একটা সর্ব্বনাশ হ'চ্ছেই।

রমেশ একবার ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইয়া বলিল

আপনার মুখে এ কথা সাজে না, খুড়ীমা। ভগবান আপনাদের মেরেছেন, তা'র কি দোষ?

কুমুদিনী অসুবিধা বুঝিয়া কহিল,—কথাটা আমার মনের মধ্যে এসেছিল, তাই তোমাকে ব'ললাম,—আহা, একফোঁটা মেয়ে, সে আর কি ক'রবে।

রমেশ মুখ ভার করিয়া বলিল,—আপনারা কি মনে ক'রছেন শান্তি দিন দিন আপনাদের গলগ্রহ হ'য়ে উঠ্‌ছে?

মাণিক একটু চঞ্চল হইয়া উত্তর দিল,—কেন তুমি ওর কথা শুনছ, রমেশ। ওর কথার কিছু দাম আছে কি?

রমেশ খুব গম্ভীর হইয়া বলিল,—আপনাদের কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পা'রছি না।

মাণিক দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল,—মেয়েলি কথাগুলো এমন আবল-তাবল হ'য়ে থাকে।

তা'র পর সে রমেশের হাত ধরিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া গিয়া একটু যেন চুপিচুপি কহিল,—ওর মাথাটা কিছু খারাপ হ'য়ে গেছে কি না, তাই সবায়ের ওপর রাগ ক'রে ব'সে থাকে।

রমেশ উত্তেজিত হইয়া বলিল,—যাক্, এর একটা আমি বিহিত ক'রবই।

সে চলিয়া গেলে মাণিক কুমুদিনীকে ডাকিয়া বলিল,—তোমার কি একটুও আক্কেল নেই গা?

কুমুদিনী গলা চড়াইয়া বলিল,—কেন, হ'য়েছে কি? ভারি বড় লোকের ব্যাটা সে। তাকে আবার ভয় ক'রে চ'ল্‌তে হবে।

তা'র পর শান্তির দিকে তাকাইয়া হুকুম দিল,—যা', বাসনগুলো মেজে, কাপড়-চোপড় কেচে নিয়ে আয়। একটাও কাজ জানে না—এইবার দেখ্‌ছি বুড়ো মেয়েকে মার ধ'রতে হবে।

তা'র বড় ছেলে নীরু সেই সময়ে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিতে লাগিল,—মা, দেখ, এই শান্তি দিদি—; তা'রপর শান্তির পানে তাকাইয়া বলিল,—ব'লে দি'—দেখ, এই শান্তিদিদি কি ব'লছিল জান, মা,—ব'লছিল, সে এখানে থাকতে চায় না।

কুমুদিনী বসিয়া পড়িয়া বলিল,—বিদায় হলে ত হাড় জুড়োয় আমার।

শান্তি খুব নরম সুরে কহিল,—কখন বলেছি রে ও নীরু, নীরু?

কুমুদিনী ধমকাইয়া বলিল,—যা' যা', এখন যা বললুম ক'রগে যা ত'—বলিস্ নি ত কি? সব বলতে পারি তুমি।—ও মিথ্যে কথা বলছে, না?

শান্তি চলিয়া গেলে মাণিক বলিল,—আচ্ছা, মেয়েটার ওপর তোমার কি বিষদৃষ্টি আছে বল ত'?

কুমুদিনী জবাব দিল,—আমার ত' সবই ব'ললে তুমি—কেবল ডাইনী ব'লতেই বাকি রেখেছ। একটা তের বছরের আইবুড়ো মেয়ে গলায় এসে প'ড়ল, সে ভার কে নেয়?

মাণিক বলিল,—এর জন্যে আর তোমার এত ভাবনা কেন? সে যা' করবার আমি বুঝ্‌ব।

কুমুদিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—হ্যাঁ গো, সমঝদার সবাই। তা' হ'লে আর এক ফোঁটা ছোঁড়া রমেশ বাড়ীতে এসে অত কথা শুনিয়ে দিয়ে যেত না।

মাণিক কহিল, তোমার দোষও ত বড় কম নয়?—তোমার কথাগুলো শুনলে যে গা শুদ্ধ জ'লে যায়।

কুমুদিনী বলিল,—যাও যাও, দিনরাত আর মিছে বকাবকি ভাল লাগে না। আমারই একশ'বার ঘাট হ'য়েছে।

ঘরের বাহিরে গিয়া কুমুদিনী দেখিল, শান্তি বাসন মাজিতেছে। চীৎকার করিয়া সে বলিল,—এখনও হ'ল না তোর? এমন হাড়কুঁড়ে ত আমি কোন কালে দেখি নি'।

শান্তি কহিল,—কাপড় কাচ্‌তে একটু দেরী হ'য়ে গেছে। আমি এখুনি সব মেজে দিচ্ছি।

কুমুদিনী বলিল,—এই বুঝি তোর কাপড় কাচা হ'য়েছে? যেমন ময়লা তেমনি র'ইল—ছিঃ ছিঃ, একশেষ।

শান্তি তাহার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া রহিল।

(৩)

সেদিন ধর্ম্মদাস ভোরবেলা উঠিয়াই শান্তিকে ডাকিয়াছিল। সমস্ত রাত সে কিছুতেই চোখের

তা'র দাদু নী বুঝি অভিমান করিয়া তা'র বুকের মাঝখানে আর ছুটিয়া আসিবে না। শান্তি সেদিন ঠিক যেমন ভাবে তা'র সহিত চলিয়া আসিবার জন্ত তাহাকে সাধিয়াছিল, সে প্রত্যেক কথাটি ধর্ম্মদাসের বুকজোড়া করিয়া তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে বিঁধিয়া দিতেছিল। সে ঠিক করিয়া বসিল কাহারও খাতির সে আর রাখিবে না। যে ছোট্ট মেয়ের সুন্দর মুখখানি তা'র এই শেষ দিনগুলায় তাকে প্রাণের আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, সেই শান্তিকে সে আজই যেমন করিয়া হ'ক লইয়া আসিবে।

মাণিকের বাড়ীর চৌকাটে পা দিয়াই সে শুনিতে পাইল ভিতরে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মদাস চীৎকার করিয়া ডাকিল,—কৈ রে, দিদি, আজ যে আর ছুটে এলি নে'?

মাণিক তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিল,—দেখ, ধর্ম্মখুড়ো, কি বিপদেই ফেলেছ আমায়—মেয়েটার জন্তে বাড়ীতে রোজ একটা না একটা অশান্তি লেগেই আছে।

ধর্ম্মদাস কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল,—লক্ষীছাড়া, দে, আমার দিদিকে ফিরিয়ে দে।

মাণিক একটু রাগিয়া বলিল,—কিন্তু যাই বল, ধর্ম্ম-খুড়ো, মেয়েটাও বড় একগুঁয়ে। একে ত অপয়া, তাতে কোন গুণ নেই।

ধর্ম্মদাস তা'র কথায় কাণ না দিয়া একেবারে উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—ওরে আমার দিদি,—আমার আনন্দী দিদি, আয়, আয়, ছুটে আয়; আর যে আমি দাঁড়িয়ে থাকৃতে পারছি নে'।

মাণিক নিকটে গিয়া বলিল,—কেন মিছে গোলমাল ক'রছ। সে পুকুরে জল আনতে গেছে।

ধর্ম্মদাস ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়া দেখিল, পুকুরের একটা কাদা-মাখা সিঁড়ির উপর বসিয়া একমনে শান্তি ভাবিতেছিল।

ধর্ম্মদাস উপর হইতে হাঁকিল,—দিদি রে, এই যে আমি, আছি।

তার পর সে নামিয়া গিয়া শান্তির হাত ধরিয়া তাহাকে তুলে লইয়া আসিল।

যায় হ'তে আস তুমি? আর একদিনও এমুখো হ'য়ো না।

ধর্ম্মদাস তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—দূর লক্ষী-ছাড়ী, তোর কাছে আসতে আমার ভারি দায় প'ড়েছে। আজ তোকে জন্মের মত লুকে ক'রে নে' যাব ব'লেই এসেছি।

তা'র পা জড়াইয়া ধরিয়া শান্তি বলিল,—তা' হ'লে গালাগালি খেয়ে তোমার প্রাণান্ত হবে, দাদু।

ধর্ম্মদাস তা'র গায়ের কাপড়টি ভাল করিয়া জড়াইয়া দিয়া কহিল,—তা'তে আর হ'য়েছে কি রে? চল্, চল্, বুড়ো আমি, আমায় আর দাঁড় করিয়ে রাখিস্ নে'।

ধর্ম্মদাস মাণিকের বাড়ীর দিকে আর না তাকাইয়া শান্তির হাত ধরিয়া খুব জোরে জোরে চলিতে লাগিল। যখন সে নিজের বাড়ী গিয়া উঠিল তখন দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িয়া শান্তি কহিল,—কেন, দাদু, তুমি এমন কাজ ক'রলে? একবার ব'লেও এলে না তা'দের?

ধর্ম্মদাস একটু হাসিয়া জবাব দিল,—এতে আর বলবার কি আছে রে, পাগ্লি। আমার নাত্নিকে আমি নে' এসেছি, আবার জিজ্ঞেস ক'রতে যাব কা'কে?

শান্তি কহিল,—তা'দের তুমি চেন না, তাই অমন কথা ব'লছ।

ধর্ম্মদাস একদৃষ্টে শান্তির মুখের পানে তাকাইয়াছিল। এই সেদিন যা'র আলো-করা চোখ দু'টি কেমন সুন্দর টানা ছবির মত তা'র সামনে পিট্ পিট্ করিয়া তাকাইয়াছিল, আজ তাহা কাকাশে হইয়া কোটরের মধ্যে বসিয়া গিয়াছিল। এই সেদিন যে কচি মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া সে অন্তরের মাঝখানে কেমন একটা কোমল স্পর্শের অনুভব ধরিয়া রাখিয়াছিল, আজ তা' এই অভাগা বুড়ার চোখের সামনে একটা যেন বাঁকা-চূরা কঙ্কালের মতই বোধ হইতেছিল। ধর্ম্মদাস শান্তির অলক্ষ্যে চট্ করিয়া একবার চোখের কোণের অশ্রু-বিন্দু মুছিয়া লইয়া বলিল,—দিদি আমার, কি হ'য়ে গেছিস্ রে এ ক'দিনে? আমার ওপর মান ক'রে বুঝি খাওয়া দাওয়া বন্ধ ক'রেছিলি?

শান্তি দাঁড়াইয়া উঠিয়া ধর্ম্মদাসের অসাড় হাত দু'খানি

তুলিয়া লইয়া বলিল,—না, আমার শরীরটা ক'দিন খারাপ আছে ব'লে এমন দেখাচ্ছে। আমার ত কোন কষ্ট হচ্ছে না, দাদু।

ধর্ম্মদাস ভাঙ্গা গলায় উত্তর দিল,—তা' ব'ললে আর আমি শুন্‌ছি কি? পাজি কোথাকার, আমার কাছে কোন কথা লুকিয়ে রাখিস্ নে' তা' ব'লে।

ধর্ম্মদাস আজ তন্ময় হইয়া শান্তিকে দেখিয়া লইতেছিল। সে তা'র ভাঙ্গা, খোড়ো ঘরের মাঝখানে যে ছোট্ট কুমারীকে প্রতিষ্ঠা করিবে বলিয়া ধরিয়া আনিয়াছিল, তাকে যেন আর একটি দিনের জন্যও চোখের আড়াল করিতে না হয়, সেই প্রার্থনা আজ সে অনুক্ষণ প্রাণের মধ্যেই করিতেছিল। এই ঘরের মাঝখানেই ত সে একদিন মড়ার হাট্ বসাইয়াছিল।—এইখানেই ত তা'র ছেলে মেয়ে, স্ত্রী সবাই শেষ হইয়াছিল। তা'র পর কত দিন ধ'রিয়া যেন অশোক বনের কত না চেড়ী তা'দের জীর্ণ মলিন অঞ্চল পাতিয়া তা'র বুকের উপর পাথর চাপাইয়া দিয়া সেইখানে বসিয়াছিল। আজ কেন এই একরত্তি মেয়েটির সাড়া পাইয়া তার ঘরের এক কোণ হ'তে আর এক কোণ পর্য্যন্ত আলোয় আলোয় ছাপিয়া উঠিল।

(৪)

রমেশের মাতা সুরেশ্বরী সেদিন ধর্ম্মদাসকে ডাকিয়া কহিল,—বেশ ক'রেছ, খুড়ো, তুমি না দেখ্‌লে আর তাকে কে দেখ্‌বে বল?—তুমি ছাড়া ত' আপনার লোক কেউ নেই তা'র।

ধর্ম্মদাস মুখ ভার করিয়া বলিল,—কেন মা, তার সঙ্গে আমার আর কি সম্বন্ধ?

সুরেশ্বরী কহিল,—কিন্তু তোমার চেয়ে কেউ তাকে ভাল বাসতে পেরেছে কি?

ধর্ম্মদাস উত্তর দিল,—কেন পারবে না, মা। যার প্রাণের টান থাকে সেই পারে।

সুরেশ্বরী একটু হাসিল মাত্র।

ধর্ম্মদাস কথাটা বুঝিয়া কহিল,—যা' বলেছ মা। কিছুতেই যে সেটাকে ভুল্‌তে পারলেম না। সে যে আমার মা'র পেটের দিদি কি না, তাই।

সুরেশ্বরী একটা আসন পাতিয়া দিয়া তাহাকে বসিতে বলিয়া কহিল,—যাই হ'ক, এখন মেয়েটির বিয়ে দিয়ে তা'কে সুখী কর।

ধর্ম্মদাস একটিও কথা না বলিয়া আসনের উপর বসিয়া পড়িল। সুরেশ্বরী একটু কাছে আসিয়া কহিল,—নাত্‌নির বিয়ের কথাতেই খুড়োর মুখ ভার হ'য়ে উঠলো দেখছি!

ধর্ম্মদাস হাসিয়া উত্তর দিল,—আমিই কি আর চুপ ক'রে ব'সে আছি, মা! একটা ভাল বর মিল্‌লেই শান্তিকে তা'র হাতে সঁপে দেব।

সুরেশ্বরী এলোচুলগুলি খোপা করিয়া আঁটিয়া বাঁধিয়া বলিল,—সে ত' আমাদের নিজেদের ঘরের মেয়ে ব'ললেই চলে। তা'র বাপ আমাদের কত উপকারই ক'রেছিল, তা' কি আর ভুলতে পারব।

ধর্ম্মদাস বলিল,—সে কথা যা'ক্। কিন্তু আমি জোর ক'রে ব'লতে পারি যে, তুমি আমার দিদিকে এক দিনের তরেও কোলে ক'রে আদর কর নি।

সুরেশ্বরী হাসিয়া কহিল,—তা' মিথ্যে নয়, তবে এবারে তোমার নাত্‌নিকে রোজই দেখতে পা'ব এখন।

ধর্ম্মদাস অন্যমনস্ক হইয়া বলিল,—আর একটা কথা কদিন ধ'রে তোমায় ব'লব মনে ক'রছিলেম। শান্তির নামে যা' অল্প কিছু বিষয় তা'র বাপ লেখাপড়া ক'রে গেছে সে কাগজপত্তর সব আমার কাছে র'য়েছে।

সুরেশ্বরী কহিল,—যা আছে তা'র বিয়ের সময়ে কাজে লেগে যা'বে।

ধর্ম্মদাস অস্পষ্ট স্বরে বলিল,—সে কথা ছেড়ে দাও। কি জান, বুড়ো আমি, কবে আছি, কবে নেই। কাগজপত্তর সব তোমাদের কাছে দে' যাব, যা' ভাল হয় কবো'।

সুরেশ্বরী তা'র মুখের উপর তাকাইয়া বলিল,—আচ্ছা, দিয়ে যেও। রমেশকে দেখিয়ে যা' হ'ক ক'রব এখন।

ধর্ম্মদাস উঠিয়া কহিল,—আজ তবে চল্লেম।

সুরেশ্বরী তখনও সেখানে বসিয়াছিল। ধর্ম্মদাস যে কখন একেবারে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তা' সে যেন দেখিয়াও দেখিতে পায় নাই। কেবলই সে ভাবিতেছিল যে ধর্ম্মদাস শান্তিকে সেদিন মাণিকের বাড়ী হইতে জোর করিয়া লইয়া আসিয়া মোটে ভাল করে নাই। তা' ছাড়া

এই লুকান কাগজপত্রের কথা যদি কোন মতে মাণিক জানিতে পারে তাহা হইলে সে হয় ত গ্রামের মধ্যে এমন হুলস্থূল কাণ্ড বাধাইবে যে, তা'র স্বামীর উচ্চ মাথাটাও একেবারে হেঁট হইয়া যাইবে। কতদিন ধরিয়া যে তা'রা সেই দেশে নিজেদের সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যশ-মান সব চেয়ে বড় হইয়া কাল কাটাইয়াছে তা' কি এক নিমেষের এই একটি ভুলের জন্য সব শেষ হইয়া যাইবে। সুরেশ্বরী তখনই রমেশকে সামনে পাইয়া কথাটি বলিয়া ফেলিল। রমেশ অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া উত্তর দিল,—কিন্তু মা, তোমার মুখের কথাটি মিথ্যে হবে, এ আমি বেঁচে থাকতে কখনও দেখতে পারব না। কি আর জানবে তুমি কত আশা ক'রে ধর্ম্মদাস দাদু তোমায় সেধেছিল। তোমার আশ্বাস পেয়ে সে বুক বেঁধে ফিরে গেছে।

সুরেশ্বরী বিচলিত হইয়া কহিল,—তা' হ'ক, বাবা, তুই এখুনি গিয়ে ব'লে আয় ও দলিল তা'র কাছেই থাক।

রমেশ মেজের উপর বসিয়া বলিল,—তা' আমি মুখ ট কখন বলতে পারব না।

সুরেশ্বরী চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল,—যা' হয় করিস।

রামহরি বাবু বহুদিন ধরিয়া নানা তীর্থ দেখিয়া বেড়াইতেছেন। কবে যে তিনি আসিবেন তার কোন ঠিক নাই। রমেশ সেইখানে বসিয়া ভাবিতেছিল, ইন্দ্র-তুল্য প্রতাপ যার, তারই একমাত্র ছেলে সে, কেমন করিয়া আজ মায়ের কথাটি মিথ্যা হইতে দিবে?

অথচ সে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছিল যে, এই সামান্য কাজটার জন্য তা'র পিতার স্বর্ণচূড়ের মত মাথাটি হেঁট হইয়া গিয়া ধুলার সহিত মিশাইয়া যাইতেছে। কেহ যদি আড়ালেও একবার বলিয়া ফেলে যে, রমেশরা ধর্ম্মদাসের সহিত একজোট হইয়া মেয়েটাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়া তা'র যা' কিছু বিষয় আছে, তা' হজম করিতে নানা মতলব আঁটিতেছে, তাহা হইলেও যে তা'রা সরমে মরিয়া গিয়া কেঁচোর চেয়ে সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইবে। এ দিকে শান্তিকে সে নিজেই বলিয়াছে,—যা করলে তোমার একটু উপকার হয়, তা' আমি নিশ্চয় করব। রমেশ এইটুকু সমস্যার ভিতর কোন কূল-কিনারা খুঁজিয়া পাইল না। এই ভাবিয়া তার প্রাণের মধ্যে সব চেয়ে ব্যথা লাগিল যে, শান্তির কাছেও বুঝি সে আজ খেলো হইয়া যাইবে! সে ছুটিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

(৫)

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল,—তা'দের বাড়ীতে কি আর এক দিনও যাও নি' তুমি?

রমেশ একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—কেন, আমাদের সেখানে যাবার কি দরকার?

শান্তি তাহাকে বসিতে বলিয়া চলিয়া গেল। রমেশ পিঁড়িটা সরাইয়া লইয়া ক্লান্তের ন্যায় দেয়ালে অঙ্গের ভর রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যখনই সে শান্তিকে দেখিতে আসে, তখনই তার যেন মনে হয় যে, এই বসন ভূষণ হীন নিরক্ষর মেয়েটি বুঝি তার মরমের কাণায় কাণায় নিজের অনশনক্লিষ্ট প্রতিমাখানি বসাইয়া দিয়া যাইবে। তাই রমেশের প্রাণে প্রাণে আজ যেন অমরাবতীর শতধারার মত স্নিগ্ধ প্রফুল্ল সুরধুনী বহিয়া যাইতেছে। কারও কথায় সে কোন দিন টলে নাই। কিন্তু আজ তার দ্রোণের প্রতিজ্ঞা যেন ছিন্নভিন্ন হইতে চলিয়াছে।

রমেশ তার নিজের আসা যাওয়ার মধ্যে এমন একটাও মিথ্যা উপলক্ষ খুঁজিয়া পাইল না যা'তে সে নিজকে প্রকাণ্ড এক দোষী বলিয়াও ঘৃণায়-লজ্জায় মরমে মরিয়া যাইবে। সে ত' আর জানিত না যে, তা'র অন্তরের মাঝখানে কোন্ দেবী এক নিজের রাজ্যের প্রসারটুকু বাড়াইয়া লইয়া তা'র চৈতন্যের আগাগোড়া দুই হাতে ঢাকিয়া রাখিয়া তা'কে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে।

শান্তি ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—তা' তোমার যখন সুবিধে একবা'র যেও সেখানে।

রমেশ অন্যমনস্ক হইয়া বলিয়া ফেলিল,—যেতে আর আমার আপত্তি কি আছে? কিন্তু তাদের কথা আর মুখেও এনো না তুমি।

শান্তি একটু দূরে বসিয়া পড়িয়া বলিল,—তা' আর কি হ'য়েছে? ঠিক আমার আপনার ব'লতে তারা ছাড়া আর ত' কেউ নেই।

রমেশ একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল,—কথাটা ঠিকই ব'লেছ। তবে তাঁ'রা আপনার লোক হ'য়েও এত পর হয়ে ব'সে আছে যে, তাঁ'দের সঙ্গে পরিচয় নেই বল্‌লেই চলে।

শান্তিকে নিরুত্তর দেখিয়া রমেশ জিজ্ঞাসা করিল,—মনে বড় কষ্ট হ'ল বুঝি? আমি ত গোড়াতেই ব'লে দিয়েছি সেখানে গিয়ে সব খবর তা'দের এনে দেব।

শান্তির মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। বলিল,—না, কষ্ট আর কি হবে।

রমেশ সোজা হইয়া বসিয়া কহিল,—আমার কাছে আর লজ্জা কি, শান্তি। আমি আর জানি না—।

সে কথা শেষ না করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—কতদিন পরে আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে তা' জানি না। বাবা চিঠি লিখেছেন একটা দরকারে কল্‌কাতায় যেতে হবে আমায়।

শান্তি মুখ নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—আর একটু ব'স না—দাদু ত এখুনি আস্‌বে।

রমেশ গাত্রোত্থানের কোনরূপ উদ্যোগ না দেখাইয়া বলিল,—জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছ, শান্তি। ভগবানের দয়া হ'লে সব শেষ হ'য়ে যা'বে।

শান্তি কাপড়ের আঁচলে মুখ মুছিয়া উত্তর দিল,—কষ্টকে আর আমি কষ্ট বলে গ্রাহ্য করি না।

রমেশ তা'র মুখের উপর চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—তা' ব'লে ত আর কষ্ট তোমাকে রেহাই দেবে না।

ঠিক দরজার কাছে আসিয়া ধর্ম্মদাস হাঁকিল,—কি রে, দিদি, কার সঙ্গে অত কথা হ'চ্ছে রে?

তার পর সে রমেশকে দেখিতে পাইয়া বলিল,—এই যে, আর না কি আমার বাড়ীতে আসবি নে' ব'লেছিলি?

রমেশ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—তুমি দেখ্‌তে পেলেই কোন্ দিন ধ'রে রেখে দেবে, সেই ভয়েই আর আস্‌ব না ঠিক ক'রেছিলুম।

ধর্ম্মদাসকে মুখ ধুইবার জল দিতে আসিয়া শান্তি বড় বিভ্রাটে পড়িয়া গেল। বুড়া একেবারে তার মুখখানি উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল,—বল্‌ত' রমেশ, আমার দিদিকে কেমন দেখ্‌তে—ঠিক যেন ছোট আনন্দময়ী দুর্গাঠাকুর না? তার পর শান্তিকে বুকের ভিতর চাপিয়া রাখিয়া কহিল,—লুকো, লুকো, পাছে ওরে দেখ্‌তে পেলে আবার হিংসে ক'রবে।

শান্তি চলিয়া গেলে রমেশ বলিল,—আজ আর আমার একটুও দাঁড়াবার সময় নেই।

ধর্ম্মদাস ঘরের ভিতর হইতে একটা কাগজের তাড়া আনিয়া কহিল,—তোর মা'কে যে দলিলের কথা বলে' ছিলেম, সেটা নে' যা'—ও পাপ বিদেয় হ'লে বাঁচি।

রমেশ বাহিরে যাইতে যাইতে বলিল,—আমি প'ড়ে দেখ্‌ব এখন, কি আছে না আছে।

ধর্ম্মদাস বলিতেছিল,—পাগ্‌লি দিদি, তা'দের বাড়ী যেতে আবার লজ্জা কি? রমেশের মা আবার তোর পর?

শান্তি বুড়ার কোলের কাছে সরিয়া গিয়া কহিল,—আর তিনি যদি আমায় ধ'রে রাখেন তা' হ'লে?

ধর্ম্মদাস হাসিতে হাসিতে বলিল,—তা' হ'লে তোকে সেখানে রেখে আমি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চলে আস্‌ব, আর কি।

শান্তি ধর্ম্মদাসের কোলের উপর হাত দু'টি জোড়া করিয়া রাখিয়া বলিল,—না, দাদু, আমরা ত বেশ আছি।

ধর্ম্মদাস তা'কে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল,—বড় সাধ ছিল যে দিদিকে আমার নে' গিয়ে তা'দের দেখিয়ে আনব।

শান্তি বলিল,—তা, আরও কিছুদিন পরে গেলেই চল্‌বে।

ধর্ম্মদাস চুপ্ করিয়া থাকিয়া কহিল,—যা' বলেছিস্ দিদি।—কি জানি যদি—।

ধর্ম্মদাস আর ভাবিতেই পারিল না। একটিবার সে চাহিয়া থাকিয়া আবার চোখের পাতা জোর করিয়া বন্ধ রাখিয়া যেন স্পষ্টই দেখিতে পাইল যে তা'র বুক খালি করিয়া দিয়া কে সেই অত দিনের পুরাণো দিদিকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে, আর সে সবারের দরজায় মাথা ঠুকিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছে—দিদি, দিদি, ওরে আমার দিদি, একবার চেয়ে দেখ, ফিরে দেখ।

সে শান্তিকে কোলের উপর উঠাইয়া লইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাণিক মাথায় হাত দিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়াছিল। আজ সে যে দিকে কাণ পাতিল, সেই দিকেই অন্নের হাহাকার শুনিতে পাইল। রমেশ যা' টাকা দিয়াছিল তার শেষ কাণা-কড়িটি পর্য্যন্ত নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। কুমুদিনী আজ ক'দিন ধরিয়া রোগের জ্বালায় ক্ষীণ হইয়া চলিয়া হাঁটিবার শক্তি হারাইয়াছিল। মাণিক সকালেই পাশের গ্রামের এক মহাজনের নিকট টাকা ধার করিতে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সে চারিদিকে শূন্য দেখিতে লাগিল, আর তার মাঝখা'ন শুধুই ডাইনি-বুড়ীদের মুখ-খিঁচুনি আর পোকা-মাকড়ের ছোট-বড় উপদ্রব দেখিতে পাইল। দেওয়াল ধরিয়া বাঁকিয়া-চুরিয়া কুমুদিনী সেইখানে আসিয়া নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। মাণিক তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া কহিল,—কেন তুমি আবার উঠে এলে গা?

কুমুদিনীর চোখ দু'টি ভিতরে ডুবিয়া গিয়া আরও ছোট ও তীক্ষ্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল,—তোমার কাছে ছোরা-ছুরি থাকে ত একদম আমার বুকে বসিয়ে দাও।—ছেলে-মেয়েগুলো চোখের সামনে ম'রবে এ আমি দেখ্‌তে পা'রব না।

মাণিক একটু ভয় পাইয়া কহিল,—আঃ কি পাগলের মত ব'কছ। তুমিও যদি এমন কর ত আমি কোন্ দিক সামলাই বল ত'?

কুমুদিনী সরু সরু হাত নাড়িয়া বলিল,—না, আর আমার বাঁচতে সাধ নেই। খোকারও আজ ভয়ানক জ্বর এসেছে—সেও ম'রবে।

মাণিক ধরা গলায় কহিল,—আরও কত দুঃখু আছে তোমার কপালে তা' দেখ্‌তেই পাবে। পাপের বোঝাটা ত তোমার কম নয়।

কুমুদিনী দাওয়ার উপরের বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়া বলিল,—তা'র জন্যে আমায় যত ইচ্ছে সাজা দাও।

মাণিক বলিল,—স্থাখ, একটা শেষ উপায় এখনও আছে। ঘোষ-পাড়ায় শুনে এলুম যে শান্তির সামান্য কিছু বিষয় আছে। তা'র দলিল ধর্ম্ম-খুড়োর কাছে এতদিন লুকান ছিল। এখন রমেশের কাছে গিয়ে প'ড়েছে।

কুমুদিনী মুখ ফিরাইয়া বলিল,—তা' তারা তোমায় সব দিয়ে দিচ্ছে?

মাণিক বলিল,—শান্তিকে যদি আবার নিয়ে আসতে পারি তা' হলে দলিলের দাবী করা যায়। বন্ধক রেখেও ত' কিছু দিন চলবে।

কুমুদিনী লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিল,—তা'ও কি হয় কখনও?

মাণিক দাঁড়াইয়া বলিল,—হবে না তা' জানি। যে বীরত্ব তুমি দেখিয়েছিলে।

কুমুদিনী অন্য দিকে ফিরিয়া বসিয়া রহিল। মাণিক সেই কালো মুখের দিকে আর একবারও না তাকাইয়া চলিয়া গেল। পথের কিছু দূরে গিয়াই সে দেখিল শান্তির হাত ধরিয়া ধর্ম্মদাস চলিয়াছে। মাণিক দূর হইতে নমস্কার করিয়া বলিল,—কি, ধম্ম-খুড়ো, কেমন আছ তোমরা?

ধর্ম্মদাস উত্তর দিল,—তা' আবার জিজ্ঞেস ক'রছিস, মাণিক। আমার দিদি কাছে থাকতে আবার খারাপ র'ইব?

শান্তি মাণিকের পায়ের ধূলা লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—খুড়িমা ভাল আছেন ত'—নীরু, খোকা সবাই ভাল আছে?

মাণিক কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল,—হ্যাঁ রে তা'রা সবাই ভাল আছে।

মাণিক আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবে কি। সে একটা কথাও গুছাইয়া বলিতে পারিল না। তা'র ঠোঁটের জড়তা আসিয়া কথাগুলিকে এলোমেলো অস্পষ্ট করিয়া দিতে লাগিল। আর লজ্জায় তা'র সমস্ত মুখটা সে তখন ঢাকিয়া দিতে পারিলে বাঁচিয়া যাইত। শেষে কহিল,—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, খুড়ো, আর একদিন দেখা ক'রব এখন।

অন্দরমহলে দরজার চৌকাটে দাঁড়াইয়া ধর্ম্মদাস ফুকারিয়া উঠিল,—কি, মা, আমার দিদিকে হাতে ধ'রে নে' এলেম, দেখ্‌বেনা একবার?

সুরেশ্বরী শান্তির কাছে গিয়া বলিল,—বাঃ বেশ দিদিটি ত' তোমার। তা'রপর সে শান্তিকে লইয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। ধর্ম্মদাস বলিল,—আমি একটু পরেই আস্‌ছি, মা।

সুরেশ্বরী ভাবিতেছিল, এমন খাসা দিব্য মুখ এই মেয়েটির যে, সামান্য ময়লা কাপড় পরিয়াও কেমন ফুট-ফুটে দেখাইতেছে। সে তা'কে বিছানার উপর বসাইয়া কহিল,—আমার ত' একটীও মেয়ে নেই, তুমি যদি আমার মেয়ে হও ত' আজই এক কথা বলে যাও।

শান্তি পা ঝুলাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল,—আপনি আমার সঙ্গে আদর ক'রে কথা কইছেন, এই আমার ভাগ্যি।

সুরেশ্বরী তাহার পার্শ্বে বসিয়া তা'কে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল,—তা' বললে হচ্ছে না। তারপর সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া একখানি খুব পরিষ্কার ধপ্‌ধপে কাপড় বাহির করিয়া তাকে সাজাইয়া দিল। মুখ মুছিয়া দিয়া বলিল,—আগে কিছু খেয়ে নাও; তোমার দাদুর আস্‌তে অনেক দেরী আছে।

কিছুক্ষণ পরে ধর্ম্মদাস আসিয়া দূর হইতে দেখিতে পাইয়া বলিল,—বাঃ বাঃ দিদি, বেশ ত পরী সেজে ব'সে আছিস্।

সুরেশ্বরী তাহার হইয়া উত্তর দিল,—আর তা' ব'লে যেতে দিচ্ছি না।

ধর্ম্মদাস হাসিয়া কহিল,—কি রে দিদি, তোরও তাই ইচ্ছে নাকি?

শান্তি নীরব হইয়া বিছানার কার্পেটের উপর বসিয়া রহিল। ধর্ম্মদাস তা'র হাত ধরিয়া মেজের উপর দাঁড় করাইয়া বলিল,—কি রে, কথা নেই যে মুখে?

সুরেশ্বরী কহিল,—ভয় কি, খুড়ো, তোমার দিদিকে আমি আর এক দণ্ডও ধ'রে রাখব না।

তার পর সে শান্তিকে ধরিয়া নীচু হইয়া তা'র মুখে হাত বুলাইয়া কহিল,—কেমন, মা'কে ভুলে যাবি নি' ত'?

শান্তি তার পায়ের ধূলা বুকে লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরেশ্বরী সেই সাজানো মেয়েটির কোমল দেহখানি একবার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—এই নাও ধম্মখুড়ো, তোমার দিদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আর ব'লে যাও যে আর একদিন নিশ্চয় আসবে।

(৭)

রমেশ কহিল,—না, আজকে আর কিছু খাবার ইচ্ছে নেই আমার।

শান্তি জলখাবারের থালাটি তার হাতে দিয়া কহিল,—একটা কথাও ত রাখতে হয়। আজ আমি নিজে হাতে যা' তৈরি ক'রেছি তাই তোমায় দিলুম।

রমেশ আর কথাটি না বলিয়া খাইয়া লইয়া কহিল,—ক'লকাতায় গিয়ে অবধি তোমাদের জন্যে আমার বড্ড মন কেমন ক'রত, শান্তি।

শান্তি বলিল,—একটু বসেই যাও না। দাদুর আস্‌তে কি আর দেরী হবে?

রমেশ কহিল,—না, না, আর আমার ব'সতেও ইচ্ছে নেই।

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল,—কেন, কি আর দোষ ক'রেছি আমি?

রমেশ জোরের সহিত বলিল,—তা' আমি জানি না। তবে তোমায় যেদিন একেবারে ভুলে যেতে পারব সেই দিন এসে দেখা ক'রব।

শান্তি একটু হাসিয়া কহিল,—তা' বাড়ীর বা'র হ'য়ে গেলেই যে তুমি আমাদের ভুলে যাও তা' কি আমি জানি না?

রমেশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—তা' হ'লে ত বেঁচে যেতাম, শান্তি।

তার পর সে শান্তির হাত দু'টি ধরিয়া ফেলিয়া কহিল,—আর একটী দিনও আমায় আস্‌তে অনুরোধ ক'রো না।

সে জুতার শব্দ করিয়া যখন চলিয়া গেল তখন শান্তি একটা চৌকির পাশে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। সে তার নীরব, ভাঙ্গা দিনগুলির মধ্যে দূর থেকে যে একটা পুলকের সাড়া পাইয়া নিজের ক্ষুদ্র বাসনার উপর প্রভুত্ব করিতে পাইয়াছিল, সেইটেই ত তা'র সব চেয়ে বড় পাওয়া! সে বিভুর পায়ে যাহা মাগিয়া লইতে সাহস করে নাই, তা' যেন যাচিয়া সাধিয়া কে তা'র বুকের কাছে রাখিয়া গিয়াছিল। রমেশকে ত সে একটী দিনের তরেও কাছের গোড়ায় আনিতে এতটুকু চঞ্চলতা দেখায় নাই। শুধুই সে যেমন-তেমন করিয়া একবার তা'কে চকিতের জন্য ক্ষীণ অস্পষ্টভাবে অন্তরের মাঝখানে স্মরণ করিতে পারিলেই ত' তা'র ছোট একান্ত প্রার্থনাটি পূরণ

করিয়া কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া রমেশ তার চোখের সামনে দেখা দিত! এ কি আর শান্তি ভুলিতে পারিবে! কিন্তু এই যে তা'র দূরের, অন্তরালের নিধিকে ক্ষণে ক্ষণে বুকে পাওয়ার মধ্যে কি একটা অপূর্ব্বতার ছাপ রহিয়া গিয়াছে তা' আর কখনও কি দেবতার মঙ্গল-স্পর্শে সোণা হইয়া ভরিয়া যাইবে? যা'কে সে গরব করিয়া ধরিয়া রাখিবে না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল, সেই আজ পায়ের তলায় তা'র সব অভিমানের ভারটুকু দলিয়া পিষিয়া চূর্ণ-চূর্ণ করিয়া দিয়া লুকাইয়া পড়িয়াছে। শান্তির দু'টি চোখের পাতার মাঝখানে জলের ধারা টলমল করিতেছিল। তা'র ক্ষোভের মাত্রাটুকু আজ এত চড়িয়া গিয়াছিল যে তা'র সব দীনতাকে, সব অতৃপ্তিকে আজ সে হাসিমুখে বরণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিল না। এ যে দুঃখ-সুখ দুই-ই তুচ্ছ করিয়া সব নিষ্ফলতার মাঝখানে কুড়িয়ে পাওয়া একটা রত্নকে এমনি ভাবে আড়ালে সরিয়া যাইতে দেখা, যে সেই দেখার সঙ্গে চোখ দু'টী ঝলসিয়া যায়!!

সুরেশ্বরী বলিতেছিল,—তিনি বাড়ী ফিরে আসুন ত। কথাটা আমি একবার পেড়ে দেখ্‌ব। শান্তিকে আমার খুব পছন্দ হ'য়েছে। রমেশের সঙ্গে বেশ মানাবে।

ধর্ম্মদাস চোখের পাতা মুছিয়া লইয়া কহিল,—আর তা' ছাড়া, মা, ছাখ, কোথায় কোন্ দেশে আবার দিদির বে' দিয়ে একলাটি ম'রব। তোমার ঘরে থাক্‌লে আমার আর কোন কষ্টই র'হবে না।

সুরেশ্বরী বেশ একটু তাজা হইয়া কহিল,—আমারও সাধ ছিল, খুড়ো, ঠিক এমনি একটী মেয়ে আমার ঘরখানি আলো ক'রে থাকে।

ধর্ম্মদাস হাসিয়া বলিল,—তা' রমেশকেও একবার কথাটার আভাস দিয়ে রেখো, মা।

সুরেশ্বরী আশ্বাস দিয়া কহিল,—বিয়ে না হবার ত কারণ দেখ্‌ছি না—তবে একেবারে পাকা কথা দেবার সময় নয় এটা।

ধর্ম্মদাস আরও অনেক এটা-ওটা গল্প করিয়া চলিয়া যাইবার সময় কহিল,—কিন্তু মনে থাকে যেন মা।

তার পর সে সোজা বাড়ী গিয়া দেখিল শান্তির সকালের খাবার যেমন ঢাকা ছিল তেমনিই রহিয়াছে, আর সে একটা দরজার কাছে বসিয়া নির্জীবের মত ভাঙ্গাইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মদাস তা'কে একেবারে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল,—কি রে, দিদি, এখনও খাওয়া হয় নি' যে?

শান্তি অস্পষ্টস্বরে কি সব বলিয়া গেল। ধর্ম্মদাস খানিকটা শুনিল, আর হয় ত' একটুও বুঝিল না। সে তা'কে পাশে বসাইয়া নিজেই খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। তার পর সে শান্তির হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। তখন প্রায় বৈকাল হইয়াছে। ফুরফুরে তাজা বাতাস বহিয়া তা'দের যেন মুখের কাছে খেলিয়া বেড়াইয়া আমোদ করিতে লাগিল। শান্তির হাত খুব জোরে চাপিয়া ধরিয়া ধর্ম্মদাস বলিতেছিল,—দিদি, আমার কাছে থাক্‌লে তুই বেশ থাকিস্, না?

শান্তি বুড়ার গা ঘেঁষিয়া চলিতে চলিতে উত্তর দিল,—কে আর আমার আছে যে, তার জন্ত মন কেমন ক'রবে?

ধর্ম্মদাস তা'র কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল,—তা' হ'লে বিয়ের পর বরের কাছে থাকবি কি ক'রে, দিদি? না, দাদুর কাছে পালিয়ে আস্‌বি?

শান্তি বলিল,—কথায় কথায় অন্তমনস্ক হ'য়ে তা'দের বাড়ী ছাড়িয়ে চ'লে এলে যে দাদু?

ধর্ম্মদাস পিছন ফিরিয়া কহিল,—হাঁ, তা'ই ত বটে। আর কি আমার নজর আছে রে!

রমেশদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া শান্তি সুরেশ্বরীকে প্রণাম করিল। আদর করিয়া সুরেশ্বরী বলিল,—আজ মেয়ে হয়ে এলি, না পরের মত একবার বেড়িয়ে যেতে এলি, বল্ আগে?

শান্তি কোন উত্তর দিল না।

সুরেশ্বরী পুনরায় বলিল,—দ্যাখ্, আজ কেমন ক'রে তোর চুল বেঁধে সাজিয়ে দি'। দেখিস্ রে যেন তোর দাদু রূপ দেখে আবার বিয়ে ক'রে না ফেলে।

তার সেই কালো কালো চুলের রাশি লইয়া সুরেশ্বরী মনের সাধে পরিপাটি করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে মনের মত করিয়া সাজাইতে বসিল। পরে একদৃষ্টে সেই

স্নিগ্ধ-আলো-করা মেয়েটির পানে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, —আমি কি আর মেয়ে সাজাতে জানি রে! তোর রূপ আছে বলেই একটুতে ভাল দেখাচ্ছে।

পরে তা'র পাশে বসিয়া হাতখানি ধরিয়া বলিল,—আজকে আমি তোর দাদুকে ভুলিয়ে তোকে এখানে রেখে দেব।

শান্তি হাসিয়া বলিল,—তা' সে এমন দাদু নয়, কেঁদে রসাতল ক'রবে।

সুরেশ্বরী তা'র গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—আজকের দিনটা তোকে কাছে রেখে মেয়ের সাধ মিটিয়ে নি'। একবার পালিয়ে গেলে কতদিন পরে হয় ত' আস্‌বি।

শান্তি কহিল,—আপনার পায়ে হাত দিয়ে ব'লছি, এবার যেদিন আস্‌ব নিশ্চয় থাকব।

রমেশের জুতার শব্দ পাইয়াই সুরেশ্বরী ডাকিল,—দেখে যা', রমেশ; কে এসেছে!

সে দূর হইতে দেখিয়াই বলিল,—ধর্ম্মদাদুও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, শিগ্‌গির পাঠিয়ে দাও, মা।

(৮)

আজ ক'দিন ধরিয়া শান্তির জ্বর হইয়াছে। তা'র কিছুই ভাল লাগে না। এখন আর জ্বরের প্রকোপ তত নাই। সে কোন রকমে অল্পসল্প চলিতে ফিরিতে পারে। একেলা ধর্ম্মদাস আর কত করিবে! কিন্তু সে বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া দিন কাটাইতে পারে। পলকে পলকে সে আর শান্তির জন্য ভাবিয়া মরে না। তা'র প্রাণজোড়া আশ্বাসের মধ্যে সে রোজ রোজ বল করিয়া বুকের পাঁজর চাপিয়া ধরিয়া সকল গ্লানি থেকে একেবারে খালাস পাইত। এমনি এক দিনে মাণিক আসিয়া তা'র সঙ্গে অনেক কথা কহিতেছিল। সে বলিতে লাগিল,—তোমার বুড়ো হাড়ে আর কত সইবে বল?

ধর্ম্মদাস ঢোঁক গিলিয়া কহিল,—আমার আবার কষ্ট কি?

মাণিক একটু সরিয়া আসিয়া বলিল,—এখন থেকে সেবা না ক'রলে বলা যায় না কি হয়। শান্তিকে খুব শক্ত রোগেই ধরেছে।

ধর্ম্মদাস এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল,—সেরে যাবে, ভয় নেই।

মাণিক যেন কথাটা শুনিতেই পায় নাই। বলিল,—আমার ইচ্ছে দিন কতক শান্তিকে নিয়ে গিয়ে রোগটা সারিয়ে দি।

ধর্ম্মদাস একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া জবাব দিল,—চুপ ক'রে যা', নচ্ছার।

মাণিক সুবিধা বুঝিয়া বলিল,—কেনই বা চুপ থাকব; আমাদের মেয়ে আমরা নিয়ে যা'ব, এ আর বেশী কথা কি?

ধর্ম্মদাস মাথার পাকা চুলগুলি মুঠা করিয়া ধরিয়া থাকিয়া বলিল,—চুপ্ কর, আর একটা কথাও ক'স নে'।

মাণিক কহিল,—আমার কর্ত্তব্য ত' আমায় ক'রতে হবে।

শান্তি অদূরেই কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তা'র সমস্ত শরীরের অণুপরমাণুর মধ্যে যে রোগ সেঁধিয়া রহিয়াছিল তা' যেন আজ বাহিরের পানে ছুটিয়া আসিয়া তা'র মুখের উপর কালি মাখাইয়া দিয়াছিল। কয়েক গোছা মাথার এলোচুল সামনে পড়িয়া তা'র নির্জ্জীব মুখখানিকে আরও কদর্য্য করিয়া দিল। ধর্ম্মদাস বলিল,—কি রে দিদি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ত' সব শুন্‌লি, এখন বল্ ত তুই এখানে থাক্‌বি না কাকার সঙ্গে যাবি?

শান্তির একটি কথাও ভাল লাগিল না। সে কি উত্তর দিবে ঠিক করিয়া রাখিয়াই যেন চুপি চুপি ধর্ম্মদাসের পাশে আসিয়া তা'র কোলের উপর হাত রাখিয়া বসিয়া রহিল।

মাণিক কহিল,—যা' ইচ্ছে সত্যি ক'রেই বল্।

শান্তি ধর্ম্মদাসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—আমার কাকার সঙ্গেই পাঠিয়ে দাও দাদু, আমি সেখানেই থাকব।

ধর্ম্মদাস তার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—তা' আমার আর রাখবার কি এক্তার আছে বল্?

তারপর সে শান্তির হাত ধরিয়া বাড়ীর বাহিরে রাখিয়া আসিয়া বলিল,—মাণিক; শিগগির নে' যা', আর এক দণ্ডও থাকিস্ নে'।

তা'রা চলিয়া গেলে ধর্ম্মদাস চোখ বুজিয়া ভিতরে ফিরিয়া আসিল। আজকের তা'র এই অন্তঃসারশূন্য প্রাণের মাঝখানে তুষারের হিম লাগিয়াই যেন তা'র সমস্ত অঙ্গটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বিছানায়

তাহারে পূর্ব্বেই সে অসাড় মূর্চ্ছিত হইয়া সেখানে পড়িয়া গেল!

গাড়ি খুব তাড়াতাড়ি চলিয়াছে। রমেশের সে দিনের কথাগুলি তা'র কাণের কাছে স্পষ্ট বাজিতেছিল। তা'র বাড়ীর কোল-ছাড়া হইয়া সে যে কি একটা বন্ধনকে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া দিয়া চলিয়া আসিল, তা' সে প্রাণের মাঝেই বুঝিতে পারিল! কিন্তু সে যে কেমন ভাবে সব ভুলিয়া থাকিতে পারিবে, তা সে নিজেই জানিত না! কোন মানাই সে মানিল না, কোন ডাক শুনিয়া সে সাড়া দিল না, এ যে অদ্ভুত মায়াবীর মত পিছন ফিরিয়া চলিয়া আসা, তা'র কাছে আজ সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু সেই যে কত দিনের ধীর পণ্ডিত ছেলেটির উপর যত অভিমান সে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল, তার লেশমাত্র আজও সে ভুলিয়া যাইতে পারিল না! সে কি ভাবিয়া এতদিন পরে আবার যেন নিজের সমাধির জন্য বুক বাঁধিয়া চলিল।

আজ চার দিন হইয়া গেল, তবু ধর্ম্মদাসের জ্ঞান সঞ্চার হয় নাই। সুরেশ্বরী রমেশের সহিত আসিয়া এ ক'দিনই সেখানে রহিয়া গেল।

দুই সপ্তাহ ধরিয়া বুড়া পূর্ব্বের ন্যায় বেশ কথা কহিতেছে। রমেশ যতক্ষণ থাকে সে তা'র দিকে তাকাইয়া শুইয়া থাকে। শুধাইবার মত কিছুই সে খুঁজিয়া পায় না। রমেশ শুনিয়াছিল, শান্তির সেখানে খুব বিমার হইয়াছে। সুরেশ্বরীর বড় অনুরোধে সে কাল তা'কে দেখিয়া আসিবেই ঠিক করিয়াছিল। ধর্ম্মদাসকে এ সব কথা আদৌ জানিতে দিল না।

তখন দুপুরের রৌদ্র একেবারে শেষ হয় নাই। ধর্ম্মদাস একেলা ছেঁড়া কাঁথার উপর শুইয়া শুইয়া অনেক পিছনের দিনের এলো-মেলো কথা ভাবিতেছিল। আর তা'র পড়িয়া থাকিতে ভাল লাগিল না। সে একবার খোলা উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিয়া হতাশ হইয়া একটা ভাঙ্গা সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল। তার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

মেটে পথ দিয়া সে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়াছে। আজ সে সন্ধানে একবার তা'র খুকুর শেষ কথাটি শুনিয়া আসিবে। রমেশ মুখ নীচু করিয়া সেই পথেই আসিতেছিল। কহিল,—এ কি, নাই বা দু'দিন চলা-ফেরা ক'রলে।

ধর্ম্মদাস হাসিয়া বলিল,—দূর, দূর, আমার দিদিকে দেখ্‌তে যাচ্ছি, এতে আবার মানা কি আছে রে?

রমেশের চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া বড় বড় জলের ফোঁটা পড়িতেছিল। ধর্ম্মদাস জিজ্ঞাসা করিল,—কি হ'য়েছে রে?

রমেশ জবাব দিল,—কি আর ব'লব তোমায়!—আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে প'ড়েছে।

ধর্ম্মদাস দুর্ব্বল পদে ঝড়ের মত ছুটিয়া চলিল। তা'দের বাড়ীর সুমুখে গিয়া দেখিল, মাণিক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মদাস তা'র গলার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—দে রে দে, আমার দিদিকে ফিরিয়ে দে।

তখন সেই তেকেলে-বুড়ো সেখানে আছাড় খাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতে না যাইতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—দিদি, দিদি, ওরে, ওরে আমার দিদি, একবার চেয়ে দেখ্‌, চেয়ে দেখ্‌!

'প্রমোদরঞ্জনে' মুক্তি'র গান।

[শ্রীহৃষীকেশ দত্ত।]

আমার প্রাণটি করিয়া চুরি,
আমার মনটী করিয়া চুরি,
এই আসি বলে গিয়াছিলে চলে,
এত দিনে এলে ফিরি গো,
এত দিনে এলে ফিরি।
কত নিশি গেছে কত দিন
কত সকাল সন্ধ্যা বেলি
কত বার মাস কত যুগ যুগান্তর
অতীতে পড়েছে ঢলি।
কত মরু গেছে রসাতলে
কত সাগরে উঠেছে বালি
কত নদী গেছে পথ ভুলি গো
গলে গেছে কত গিরি।

সারা জীবনের সাথে সকোড়ি জোর
কোথা যাবে মোর মান-চোর
ধরেছি যখন বেঁধেছি অন্তরে
আর কি ছাড়িতে পারি গো আর কি
ছাড়িতে পারি।

প্রবোধরঞ্জনে"" মুক্তি এই গানটী কে না শুনিয়াছেন? কিন্তু এই গানটার ভিতরে যে নিগূঢ় ভাব আছে তাহার দিকে কয়জন লক্ষ্য করিয়াছেন জানি না। গানটী গাহিতেছে মুক্তি। তাহার পরিচয় আমরা এখন দিব না, পরে আপনিই তাহা পরিস্ফুট হইয়া যাইবে। যাঁহার উদ্দেশে এই গানটী গাহিতেছেন, তিনি রঞ্জন। নাটো লিখিত রঞ্জনের পরিচয় এই যে, তিনি অবন্তী নগরের রাজপুত্র প্রমোদকুমারের সখা। সখার সহিত সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া বনে আসিয়াছিলেন। এবং হিমালয়ের অধিষ্ঠাত্রী জয়ন্তী-দেবীর ঘাসের বোঝা বহিয়া তাঁহাকে প্রীত করিয়াছিলেন। পুরস্কার-স্বরূপ জয়ন্তী দেবী তাঁহাকে তাঁহার কন্যার প্রিয়সখী মুক্তিকে দান করিয়াছিলেন। অন্য পক্ষে রঞ্জন সকলেই হইতে পারেন। রঞ্জয়তি ইতি রঞ্জন। যিনি "ঘাসের বোঁঝা" বহিয়া চিরকাল লোকরঞ্জন করিয়াছেন, তিনিই রঞ্জক। "চিনির বোঝা" না বলিয়া "ঘাসের বোঝা" বলিলেন কেন? না, তাহাতে বাহকের রসাস্বাদের স্বার্থ থাকিতে পারে। যিনি নিঃস্বার্থভাবে পরের জন্য কাজ করেন, তিনিই যথার্থ রঞ্জক। যিনি পরার্থে কর্ম্ম করিতে চিনি ও ঘাসে প্রভেদ দেখেন নাই, তিনিই সর্ব্বতোভাবে লোকরঞ্জন করিয়াছেন, তিনিই মুক্তির স্বামী হইবার যোগ্য। কর্ম্ম অবসানে মুক্তি আপনিই আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করে।

মুক্তি গাহিতেছে "আমার মন প্রাণ চুরি করিয়া কত দিন হইল তুমি গিয়াছিলে, আর আজ ফিরিয়া আসিলে! যাইবার সময় তুমি বলিয়া গিয়াছিলে, আমি এখনি আসিতেছি। হাঁ গা, তবে এত দেরী করিলে কেন?"

"ওগো, আমি তোমায় কত ভালবাসি তুমি জান না। আমি তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। তোমার দেহের প্রতি অঙ্গ আমার অঙ্গে লিপ্ত ছিল, তোমার প্রতি পরমাণু আমার পরমাণুতে মিলিয়া গিয়াছিল। যদি বল, তবে ছাড়িলাম কেন? কেন, তা আমিও জানি না। তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়া পরম সুখেই ছিলাম। এ বিশ্বে তখন আর কেবল আমি তোমার বুকে লুকাইয়া ছিলাম। তখন কি বলিয়াছিলে মনে আছে কি? বলিয়াছিলে, 'ওগো, আমার খেলা করিবার সাধ হইয়াছে। তোমার হৃদয়ে চিরবন্দী আমার আর ভাল লাগিতেছে না। একবার দাও, আমি একটু খেলিয়া আসি।'

"আমি তবু বলিয়াছিলাম, সখা, আমায় ছাড়িও না। বড় কষ্ট পাইবে। যে খেলা খেলিতে যাইবে সে খেলায় কোন সুখ নাই। সে বড় ভীষণ খেলা। কোমল দেহ তাহার ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে না। শুনিলে না। চলিয়া গেলে। যাইবার সময় প্রবোধ দিবার জন্য বলিয়া গেলে, 'আমি শীঘ্র আসিব।'

কেন তোমায় ছাড়িলাম? আমি ইচ্ছা করিলে সেদিন তোমায় ধরিয়া রাখিতে পারিতাম। আমার অসীম শক্তি। তুমি সামান্য জীব। আমার আকর্ষণ রোধ করা তোমার সাধ্য ছিল না। তবে ধরিয়া রাখি নাই কেন? পাছে তুমি দুঃখ পাও, এই জন্য। তুমি তখন মোহাচ্ছন্ন, খেলিবার সাধ তোমার বড়ই প্রবল। আমি যদি বাধা দিতাম তুমি মনে বড় দুঃখ পাইতে। প্রিয়তম, তোমার দুঃখ কি আমি দেখিতে পারি?

"তুমি বলিবে, 'হাঁ গা, তুমি যদি তখন জানিতে আমি মোহাচ্ছন্ন হইয়া খেলিতে ছুটিয়াছি, আর সে খেলায় এই দারুণ দুঃখ পাইব, তবে কেন আমায় ছাড়িয়া দিয়াছিলে? অবোধ শিশু উজ্জ্বল দেখিয়া অগ্নি ধরিতে যায়, সে জানে না যে অগ্নি তাহার হাত পুড়াইয়া দিবে। তাই সে যায়। বাধা দিলে সে কাঁদে। কিন্তু তাই বলিয়া কোন্ জ্ঞানবান ব্যক্তি তাহাকে সেই জন্য ছাড়িয়া দেয়। হে সর্ব্বান্তর্যামিন, তুমি সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও কেন আমাকে এই মরুভূমিতে পাঠাইয়াছিলে?"

"কেন শুনিবে? তোমাকে একটু শিক্ষা দিবার জন্য। একবার কষ্ট পাইলে আর তুমি সেখানে যাইতে চাহিবে না। তুমি বলিবে 'তুমি ত বড় নিষ্ঠুর, এই রকম করিয়া

... আমি বলি, মা, তোমারি নিষ্ঠুর ... পাওয়া যায়, হাত গুটিয়া যায় কাঁদে, কিন্তু ... কে এমন ব্যক্তি আছে যে তৎক্ষণাৎ তাহার ... দূর করিয়া তাহার অন্তর নিবারণ করিতে ... তাই লোকে আমাকে বাধা দেয় আগুন ধরিতে ... কিন্তু আমি জানিতাম, সংসার-খেলা খেলিতে ... মাত্রই তুমি জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া কাঁদিয়া ... নই গিয়া তোমায় বুকে তুলিয়া লইব, নিমিষে ... সকল জ্বালার অবসান হইয়া যাইবে। তাই ... ড়িয়াছিলাম।'

... আর বাধা দিলাম না। তুমি চলিয়া গেলে। ... 'আমি এখনি আসিব।' হাঁ মা, এই কি ... এখনি'? ভাব দেখি একবার সে কত দিন।

কত নিশি গেছে কত দিন,
কত সকাল সন্ধ্যা বেলি,
কত বার মাস, কত যুগ যুগান্তর,
অতীতে পড়েছে ঢলি।

যেদিন হইতে তুমি গিয়াছ সেই দিন হইতে আমি দিন গণিয়াছি। কত নিশা, কত দিন, কত সকাল, কত সন্ধ্যা, কত যুগ যুগান্তর যে অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? আমি সব গণিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু তুমি ত তাহা বলিলে বুঝিতে পারিবে না। সুতরাং বলিয়া লাভ কি। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে শুন, বোধ হয় তাহা হইলে কিছু বুঝিতে পারিবে।

কত মরু গেছে রসাতলে,
কত সাগরে উঠেছে বালি,
কত নদী গেছে পথ ভুলি গো,
গলে গেছে কত গিরি।

অস্থির সমুদ্র তটভূমির পাদদেশ ধৌত করিতে করিতে তটভূমির দিকে অগ্রসর হয়। শত বৎসরেও সে অগ্রসরের পরিমাণ বুঝা যায় না। কিন্তু আমি জানি তোমার গমনাবধি ... এলাও দেশ ঐরূপে সমুদ্রের জলদেশভুক্ত হইয়াছে। মানববুদ্ধিরচিত গণিতশাস্ত্র দিয়ে নিরূপণ কর দেখি সে সময়ের পরিমাণ কত?

... সমুদ্র আনা দেশ হইতে বালুকারাশি ... আনিয়া কোথাও একত্র করে এবং সেই একত্রিত বালুকারাশি ক্রমে দ্বীপে পরিণত হয়। এইরূপে দ্বীপ নির্ম্মিত হইয়াছে। কত বৎসরে এইরূপ এক একটী দ্বীপ নির্ম্মিত হইয়াছে—মানবের ইতিহাস তাহা ইয়ত্তা করিতে পারে নাই। আমি জানি এইরূপ একটী দ্বীপ নয়, রাশি রাশি দ্বীপ তোমার যাইবার পর হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। বুঝিতে পারিলে কি, সে কত কাল? না পার, আরও শুন।

নদী কূল ভাঙ্গিয়া কোন এক কূলের দিকে অগ্রসর হয়, ইহা সকলেই জানে। কিন্তু কে সেই অগ্রসরের পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারে? মনুষ্য এক জীবনে সে গতি লক্ষ্য করিতে পারে না। কিন্তু আমি জানি তোমার গমনাবধি কত নদী এইরূপে কূল ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতে হইতে এক দেশ হইতে আর এক দেশে গিয়াছে। এক সাগর হইতে আর এক সাগরে গিয়া মিশিয়াছে। ওগো, তাহা হইলে বলিতে পার কি, তুমি কতবার সংসারে জন্মগ্রহণের পর আমার কাছে ফিরিয়া আসিলে? তোমার গমনাবধি কত বিশাল ভূধর অল্পে অল্পে জীর্ণ হইয়া সমতল ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। কত উচ্চ গিরিশিখর গলিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এখন বুঝিতে পারিলে কি, কত কাল তুমি আমাকে ছাড়িয়াছিলে?

এই সময়ের মধ্যে আমি কি করিয়াছি জান কি?

সারা জীবনের সাথে রচেছি ডোর,
কোথা যাবে মোর নয়ন-চোর।

তুমি আমার মন প্রাণ চুরি করিয়া চলিয়া গিয়াছিলে। আমি কেমন করিয়া তোমাকে ছাড়িয়া স্থির থাকিতে পারি। তাই সারা জীবন তোমাকে স্নেহের রজ্জুতে বন্ধন করিয়া তোমার পাছু পাছু ছুটিয়াছি। তুমি যেখানে গিয়াছ আমিও সেইখানে গিয়াছি। তোমার জীবন রক্ষার উপযোগী সামগ্রী আমিই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। তুমি বিপদে পড়িলে তোমায় রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যেখানে তুমি রক্ষা পাইয়াছ, সেখানে আমার আনন্দ ধরে নাই। যেখানে রক্ষা করিতে পারি নাই, সেখানে কেবল অশ্রুনীরে ভাসিয়াছি। সখা, সে সকল কথা কি তোমার মনে পড়ে?

যখন তুমি বৃক্ষজন্ম লইয়া কেলি করিয়াছ, আমি মৃত্তিকা-অভ্যন্তরে রস হইয়া তোমার পুষ্টিসাধন করিয়াছি। তোমার পত্রগুলি যখন প্রখর মার্তণ্ডতাপে ঝলসাইয়া যাইত, আমি শীতল সমীরণ হইয়া তোমাকে ব্যজন করিয়া তোমার পত্রগুলি পুনবার্য় সজীব করিয়া দিতাম। আবার যখন ঝড় ও বৃষ্টি-আবর্ত হইত প্রচণ্ড বায়ুভরে তোমার শাখা প্রশাখাগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূপতিত হইত, আমার শত চেষ্টাতেও সেগুলির রক্ষা হইত না। ওগো, তখন আমি তোমাব দুঃখে কেবল কাঁদিতাম। বর্ষণবাবিরূপে নয়নাশ্রু দিয়া তোমার অঙ্গ ভাসাইয়া দিতাম।

বৃক্ষজন্ম ত্যাগ করিয়া তুমি পতঙ্গজন্ম গ্রহণ করিলে। পতঙ্গ হইয়া তুমি মনেব আনন্দে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে, আমিও পবনহিল্লোলরূপে তোমাকে বক্ষে ধাবণ করিয়া নাচিয়া বেড়াইতাম। তুমি তখন বড়ই অবোধ, নিজের আহার্য্য সংগ্রহ কবিতে শিখ নাই। আমি নানা স্থান হইতে কীট সংগ্রহ কবিয়া আহার্য্যরূপে তোমার সম্মুখে ধবিতাম, তোমাব পানীয়েব জন্য দূর্ব্বাদলেব উপব শিশিববিন্দু সাজাইয়া বাখিতাম। ওগো, তাহাতেই তুমি জীবনধারণ কবিয়াছিলে।

বিভিন্ন পতঙ্গজন্মেব পব তুমি পশুজন্ম গ্রহণ কবিয়াছিলে। আমি তখনও তোমাব সঙ্গ ছাড়ি নাই। তুমি বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে। আমি তোমাব জীবন ধাবণের জন্য স্থানে স্থানে আহার্য্য ও পানীয় সংগ্রহ কবিয়া রাখিতাম। তৎপবে পশুত্ব ত্যাগ কবিয়া তুমি দুর্ল্লভ মানবত্ব লাভ কবি'ল। ওগো, এ জন্ম অতি ভয়ঙ্কর। জীবনধাবণেব জন্য এত কষ্ট তুমি আব কোন জন্মে পাও নাই। এ জন্মে তোমাব কাছ হইতে আমাকে কিছু দূবে থাকিতে হইয়াছিল। যতদিন শিশু ছিলে, নিজেব জীবন ধারণেব জন্য কোন চেষ্টাই কবিতে না, কেবল ততদিন আমি মাতৃস্নেহ হইয়া তোমার দেহ রক্ষা করিতাম, মাতৃবক্ষেব ক্ষীব হইয়া তোমাকে পান কবাইয়া তোমাকে জীবিত বাখিতাম। বয়সেব সঙ্গে সঙ্গে তোমাব বুদ্ধিশক্তিব বিকাশ হইতে লাগিল। নিজেব একটা সত্তা অনুভব কবিতে লাগিলে। অহংকাব আসিয়া তোমার হৃদয় অধিকাব করিল। অহংকার হইতে মোহ আসিল। মোহ হইতে অজ্ঞানতা। এ সেই অজ্ঞানতাই তোমাকে ঘটাইল। তুমি দেহ-রক্ষার জন্য নিজেব চেষ্টা কবিতে আরম্ভ করিলে। আমারও অভিমান আসিল আর তোমার অত্যাবশ্যক, তেমন ভুলেও করি না। ভরণ-পোষণের জন্য তুমি যেমন যেমন চেষ্টা আমিও সেই সেই চেষ্টায় উপযুক্ত ফল তোমায় তাম। তাঁহাতে তোমার কত কষ্ট কবিতে হইত, কেবল মনের দুঃখেই থাকিতাম, কিছুই কবিতে না।

বলেছি ত তুমি তখন মোহাচ্ছন্ন, মোহবশে অজ্ঞান বলিয়া মানিয়া লইয়াছ, মরীচিকাকে জলব বুঝিয়াছ, ছায়াকে কায়া বলিয়া তাহার পিছু যাছ। তাহাতে পদে পদে বিপদে পড়িয়া ঘোব যাছ। দুঃখে পড়িয়া তুমি চীৎকাব করিয়া কাঁদিতে কখনও আমাব নাম ধবিয়া ডাকিয়া বলিতে, "ওগো এ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দাও"। আমাব ইচ্ছা হইত তখনই তোমায় বুকে তুলিয়া লই। কিন্তু, সখা, তুমি ত তখন আমাকে প্রাণেব সহিত ডাকিতে না। বিকাবেব রোগীর প্রলাপেব মত শুধু আমার নাম ধবিয়া চীৎকাব করিতে। সুতবাং আমি কেমন কবিয়া যাইব। আমি তোমাব দুঃখে কাতর হইয়া কেবল অশ্রুজল ফেলিতাম, পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া সে অশ্রুধারা নির্গত হইত। তাহাতে কত নদ-নদীর সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

ধবেছি যখন বেঁধেছি তখন
আব কি ছাড়িতে পারি গো।

বার বাব জন্মগ্রহণ কবিয়া সংসাবের গোঁত খাইতে খাইতে তোমার হৃদয় নির্ম্মল হইতে লাগিল। তখন আমাকে ভাবিতে আরম্ভ করিলে। ভাবিতে ভাবিতে সেই পূর্ব্বের বিচ্ছেদের স্মৃতি তোমার মনে জাগরিত হইল। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তোমার অজ্ঞানতা দূর হইয়া গেল। মোহের যবনিকা অপসৃত হইল। অহংকাব সোহং-ভাবে পরিণত হইল। তখন আর নিজের পৃথক সত্তা অনুভব কবিলে না। সর্ব্বভূতে আপনার সত্তা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলে। সখা, তুমি তখন আমার বড়ই নিকটে। আমিও আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম। তোমার অঙ্গ আসন্ন উৎসুক

করিয়া রাখিলাম। এস প্রিয়তম, তোমাকে সেই আসনে উপবেশন করাই। যখন একবার পাইয়াছি তখন আর তোমায় ছাড়িয়া দিব না। সংসারে তুমি বড় কষ্ট পাইয়াছ। এস সখা, চিরদিনের জন্ম তোমায় সকল জ্বালা হইতে মুক্তি দিই। এই বলিয়া মুক্তি বঞ্জনকে আলিঙ্গন করিল।

রঞ্জন ত মুক্তি পাইল। বঞ্জনের মুক্তি বঞ্জনের পাছু পাছু ঘুরিত। একদিন তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইল। পাঠক। তোমার আমার মুক্তিও কি ঠিক ঐ রূপ আমাদের পাছু পাছ ঘুরিতেছে? আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কি আমাদের ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করিয়া দিতেছে? আমাদের অলক্ষ্যে থাকিয়া আমাদের চেষ্টার ফল কি সেই দিতেছে? তা যদি হয়, তবে এস না তাহাকে ডাকিয়া বলি, 'ওগো আর আমাদের অলক্ষ্যে থাকিও না। আমাদের বড় জ্বালা। তুমি আসিয়া আমাদের সে জ্বালার অবসান কর।'

মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া কে বলিবে আমার জ্বালা নাই? কিন্তু আশে পাশে যখন আমাদের মুক্তি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তবে কেন সে জ্বালায় দিবা রাত্রি পুড়িয়া মরে? মুক্তি ত বলিয়াছিল, "সংসার-খেলা খেলিতে খেলিতে যখন জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিবে, তখনি গিয়া তোমায় বুকে তুলিয়া লইব।" আমরা ত অহর্নিশি জ্বালায় জ্বলিয়া যাইতেছি। এস না একবার কাঁদি। এস না একবার প্রত্যেকেই কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকি। বলি "ওগো মুক্তি, আমার এ খেলাঘর ভাঙ্গিয়া দাও। আর আমি খেলিতে চাহি না। খেলিবার সাধ মিটিয়াছে। এ খেলায় যে এত কষ্ট তা আগে জানি নাই। জানিলে আসিতে চাহিতাম না। তুমি এস, দয়া করে একবার এস। এসে আমার এ দারুণ জ্বালা নিবারণ কর।"

কই, আসিলে না ত? আসিবে কি, এ ত প্রাণের চীৎকার নয়। এ যে বিকারের রোগীর আর্ত্তনাদ!

মিনতি।

[শ্রীসময় লাহা।]

১

তোমরা ললনা ধৈর্য্য-প্রতিমা
একাধারে দেবী দাসী;
কি সাহসে সহ শতেক যাতনা
অধরে মৃদুল হাসি।

২

সরলা, কোমলা, মধুর, শীতলা,
তোমরা সংসার-গতি;
কভু বা মানিনী প্রবলা দামিনী
চকিতে সদয়া অতি।

৩

খরচে করচে সদা পুত মতি,
অকারণ কর 'আহা',
কারণ দেখাও খরচের বেলা
কি নিপুণ ভাবে তাহা।

৪

তোমরা বিনীতা শ্রীঅঙ্গ গলিতা
কথায় কথায় দেখি,
ও চরণ তলে রয়েছে পড়িয়া
কত যে ঘরের ঢেঁকি!

৫

থাক পরিপাটী সুরুচি সোহাগে
তোমরা নিরন্তর,
সাজিয়া যতনে ভূষণে রতনে
আলো করে' আছ ঘর।

৬

বসুধার সেরা কুসুম তোমরা
বিধির অবাক্ সৃষ্টি!
প্রীতি-প্রেম-স্নেহে পরিমল ভরা
সংসারের শুভ দৃষ্টি।

৭

জননী, ভগিনী, জায়া, সুতা রূপে
করপুটে সেবা ভরা;
কি যতনে চালাও সংসার
তোমাদের হাতে গড়া।

৮

সোণার এ ঘর করে' ছারখার
বিলাসে ঢালিয়া প্রাণ—
এস না বাহিরে পুরুষের কাজে
হারাতে নারীর মান।

সংগ্রহ।

[শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।]

অভিধান কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় বুঝাইয়া দিতে হইবে না। পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত অসংখ্য বৃহৎ অভিধান আছে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অভিধান (কোষ) "নিরুক্ত।" পাশ্চাত্য মনিষীবর্গের মতে, উক্ত গ্রন্থখানি খৃষ্টের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত। সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি অভিধান আছে, ঐ সকল গ্রন্থে শব্দ ও তাহার অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল অভিধানের ভিতর, জনসাধারণের মধ্যে "অমরকোষ" বিশেষ প্রচলিত, আরও কয়েকখানি প্রসিদ্ধ অভিধান আছে। শাশ্বতের "অনেকার্থ-সমুচ্চয়",—হলায়ুধের "অভিধান রত্নমালা",—যাদবপ্রকাশের "বৈজয়ন্তী" প্রভৃতি। জৈনমুনি হেমচন্দ্র রচিত তিনখানি অভিধান পাওয়া গিয়াছে,—১০৮৮ হইতে ১১৭২ খৃঃ অব্দের মধ্যে হেমচন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার রচিত কোষত্রয়ের মধ্যে "অর্ব্বাচীন শব্দকল্পদ্রুম" বর্ণমালানুক্রমিক, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং উত্তম। বঙ্গভাষায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সংগৃহীত অভিধানখানিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উত্তম। বঙ্গ-সাহিত্যে ইহা অপেক্ষা বৃহৎ অভিধান আমি দেখি নাই। ডোমিনেকন ভেলসণ্ট, মেজর বেকন প্রভৃতি বিদ্বানগণ রচিত বৃহৎ অভিধান আছে।

উপরোক্ত বৃহৎ বৃহৎ অভিধান থাকা সত্ত্বেও চীনের বিরাট অভিধানের নিকট ঐগুলি কিছুই নহে। চীনের এই অভিধানখানি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

১৪০৩ অব্দে মিঙ্গ-বংশী চীন সম্রাট "ভূংগাম য়ঙ্গলো" স্থির নিশ্চয় করিলেন যে, চৈনীক সাহিত্যের একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সুবৃহৎ অভিধান, জনসমাজে প্রচারিত করিতে হইবে। এই অভিধানখানি সম্পাদনার্থে তিনি "সীহচীন" (Hsiehchin) নামক কোন বিদ্বানকে নিযুক্ত করেন। ইনি ১৪৭ জন বিজ্ঞ ব্যক্তির সহকারিতায়, এক বৎসর চার মাসে অভিধানখানি সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই অভিধানের নাম,—"Wen-Hsien Tach-eng." অর্থাৎ সাহিত্যের পূর্ণ বিবরণ। গ্রন্থখানি অত্যন্ত বৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও, সম্রাটের মনঃপূত হইল না,—প্রবন্ধ এবং শব্দ সংগ্রহের নিমিত্ত সম্রাট পুনরায় পঞ্চিশ জন বিদ্বান ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যক্তিত্রয়ের মধ্যে সীহচীনও ছিলেন। ২১৬৯ জন বিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে চার বৎসর অনবরত শব্দ সংগ্রহের পর, অভিধানখানি সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

অসংখ্য বিদ্বানগণের চারি বৎসর প্রাণপণ পরিশ্রমের ফলে, ১১ ১০০ সংখ্যক পুস্তকে এই বিরাট অভিধান সমাপ্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক পুস্তক অর্দ্ধ ইঞ্চিরও অধিক মোটা, এক ফুট আট ইঞ্চি লম্বা, ও এক ফুট চৌড়া ছিল। ইহাতে সর্ব্বসমেত ২২,৮৭৭টি পরিচ্ছেদ ছিল এবং প্রত্যেক পরিচ্ছেদের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০ ছিল,—সমগ্র অভিধানখানি ৯,১৭,৪৮০ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছিল। সমস্ত পুস্তকগুলিকে যদি পর্য্যায়ক্রমে একের উপর আর একখান রাখিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে, সমগ্র পুস্তকের উচ্চতা ৪৫০ ফুট হইত। ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও উচ্চ দুর্গ আরাবিলির উচ্চতা ৫০০ ফুট।

১৪১০ অব্দে এই অভিধানখানি, ছাপাইবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, ইহার মুদ্রন-ব্যয় অত্যন্ত অধিক পড়িবে,—সুতরাং সকলেই ইহা মুদ্রিত হইবার আশা ছাড়িয়া দিলেন। ১৫৬২ অব্দে ১০০ ব্যক্তিকে অভিধানখানির নকল করিতে আজ্ঞা দেওয়া হয়। ১৫৬৭ অব্দে এই কার্য্য শেষ হয় এবং অভিধানের নকলখানি হন-লিন (Hon Lin) নামক বিদ্যালয়ে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৬৪৪ অব্দে মূল অভিধানখানি সমগ্র ভস্মীভূত হইয়া যায়। ১৯০০ অব্দে বক্সর-বিপ্লব কালে হনলন বিদ্যালয়ে রক্ষিত অভিধানের প্রতিলিপিখানিও নষ্ট হইয়া মাত্র ছয় সংখ্যা পুস্তক বাঁচিয়া গিয়াছে। এই বিরাট অভিধানের অবশিষ্ট পুস্তক ছয়খানি হার্বার্ট গিলস মহোদয়ের নিকট আছে। গিলস মহাশয় এই বিরাট অভিধানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া, জনসাধারণকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছেন। *

* * *

সকলেই "নায়গ্রা জলপ্রপাত"কে এতদিন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জলপ্রপাত বলিয়া স্বীকার করিতেন,

---

* Nineteenth Century হইতে।—লেখক।

কিন্তু সম্প্রতি একটী নূতন জলপ্রপাত আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা বৃটিশ গায়নায় অবস্থিত। এই প্রপাতের নিম্নে "পোটারো" নামক নদী প্রবাহিত হইয়াছে। ঐ স্থানে পর্ব্বতের ৮২২ ফুট উচ্চ শিখর হইতে, এক অতল-স্পর্শী গহ্বরে বারিধারা পড়িতেছে, এই অত্যুচ্চ প্রপাতের দৃশ্য যে কিরূপ ভীষণ ও ভয়াবহ তাহা সহজেই অনুমেয়। "নায়গ্রা প্রপাত" হইতে ইহা পাঁচ গুণ উচ্চ। বর্ষা অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে এই প্রপাতের দৃশ্য অত্যন্ত রমণীয় বোধ হয়। দূরদেশ হইতে অনেকে এই অদ্বিতীয় জলপ্রপাত দেখিতে গিয়া থাকেন।

*　　*　　*

আমেরিকার একখানি সচিত্র মাসিক পত্রে একটি বেশ কৌতূহলজনক সচিত্র প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। কতকগুলি নব-আবিষ্কৃত মেশিনের ছবি দিয়া লেখক পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, দোকান, অফিস প্রভৃতির হিসাব নিকাশ করিবার জন্য আর কেরানীর আবশ্যক হইবে না। আজ কাল অডিটার বুককিপার, একাউণ্টেণ্ট প্রভৃতির দ্বারা যে সকল কার্য্য লওয়া হয়, মেশিনে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত ও সুন্দর ভাবে ঐ সকল কার্য্য সম্পাদিত হইবে। কোন্ মেশিন কি কাজে লাগে, লেখক তাহার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল মেশিন জমা খরচ ও বিক্রীত দ্রব্যাদির হিসাব রাখিয়া থাকে। প্রাতঃকালে এই মেশিন জানাইয়া দেয় যে, কাল দোকানে কত বিক্রয় হইয়াছিল এবং আজ দোকানের বিভিন্ন বিভাগে কত টাকার দ্রব্যাদি আছে। হিসাব-নিকাশে এই মেশিনের কখনও ভুল হয় নাই। আমেরিকার দোকানগুলিতে এই মেশিনের দ্বারাই বুককিপারের কার্য্য লওয়া হইয়া থাকে। লেখক বলিয়াছেন,—'আশা করি, শীঘ্রই এই মেশিন পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে।"

*　　*　　*

আমেরিকা—ব্রুকলীন নিবাসী "জন্ ফ্লাওয়ার" নামক এক ইঞ্জিনিয়র, নূতন ধরণের এক প্রকার "টাইপ-রাইটিং যন্ত্র" আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত মেশিন স্পর্শ না করিয়াই পত্রাদি মুদ্রিত করা যাইবে। কেবল যন্ত্রটি সম্মুখে রাখিয়া, প্রতিপাদ্য বিষয় উচ্চকণ্ঠে বলিলেই চলিবে। কোনও কথা বলিতে না ... লিখিয়া যাইবে। যত জোরে যত কথা বলিবেন, যন্ত্র তত শীঘ্রতার সহিত লিখিতে থাকিবে। টাইপ রাইটিং ও টেলিফোনের এই উভয় যন্ত্রের সহযোগে এই অদ্ভুত যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। যন্ত্রে এমন কতকগুলি অংশ থাকিবে, যাহা কেবল ধ্বনিকে অক্ষরে পরিবর্ত্তিত করিবে। এই অদ্ভুত যন্ত্র সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, আর স্বতন্ত্র টাইপিষ্টের প্রয়োজন হইবে না।

*　　*　　*

এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে,—চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কুকুর ও বানর সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। কুকুরের বিচক্ষণতার কথা প্রায়ই শোনা যায়। সম্প্রতি একটী বুদ্ধিমান কুকুর সম্বন্ধে যেরূপ ঘটনা শুনা গিয়াছে, তাহাতে উহাকে কুকুর না বলিয়া, চতুষ্পদ মানুষ বলা যাইতে পারে, বর্ত্তমানে পৃথিবীর মধ্যে ঐ কুকুরটিই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। এই কুকুরটি চিকাগো নিবাসী জর্জ্জ ক্লেসন নামক এক আমেরিকান ভদ্রলোকের নিকট আছে।

ক্লেসন মহাশয়ের কুকুরটি গুণিতে পারে,—যোগ, বিয়োগ এবং গুণ করিতে জানে। ক'টা বাজিয়াছে ঘড়ী দেখিয়া তাহাও বলিতে পারে, এবং উত্তম গোয়েন্দাগিরিও করিতে পারে। সমস্ত সভ্য জগত এই অদ্ভুত জীবের গুণকাহিনী শুনিয়া, স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তিগণ চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনার্থে কুকুর দর্শনেচ্ছায় চিকাগো যাইতেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,—কুকুরটি মানুষের মনের কথাও জানিতে পারে।

যেদিন দর্শকসংখ্যা বেশী হইত, সেদিন ক্লেসন সাহেব সকলের সম্মুখে কুকুর আনিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন,—'আজ ক'জন ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন ?' ইহা শুনিয়া কুকুর একবার কক্ষের চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইয়া, যত মনুষ্য কক্ষে থাকিতেন, ততবার ডাকিয়া তাঁহাদের সংখ্যা জানাইয়া দিত। কোন দিন বা ক্লেসন সাহেব তাঁহার কোনও বন্ধুকে বলিতেন,—'আপনি কুকুরটিকে কোন অঙ্ক জিজ্ঞাসা করুন, ও আপনার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিবে।' কোন প্রদর্শনীতে একবার কোন ব্যক্তি কুকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তিন হইতে এক বাদ

দিয়া দুই যোগ (৩—১+২) করিলে কত হয়?' কিছুক্ষণ পরে কুকুর চার বার ডাকিয়া প্রশ্নের উত্তর দিল। ইহার পর ইংরাজি অক্ষর লিখিত কতকগুলি কাগজ খণ্ড কুকুরের সম্মুখে রাখিয়া, তাহাকে বলা হইল,—তুমি নিজের নাম লেখ। কুকুর খুব শীঘ্র পায়ের দ্বারা নিজের নামের অক্ষরগুলি আলাদা আলাদা সাজাইয়া ফেলিল। তার পর অনেকগুলি ছোট ছোট শব্দ তাহার দ্বারা বানান করান হইল,—এ পরীক্ষারও কুকুর প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইল,—দু' একটি ভুল সে অবশ্য করিয়াছিল,—তবুও বাক্‌শক্তিহীন পশুর এই বুদ্ধিই যথেষ্ট।

একবার কোন ব্যক্তি বলিল,—'শব্দ বানান করিবার ক্ষমতা কুকুরের নাই, ক্রেসন সাহেব নিশ্চয় এ সম্বন্ধে ইহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন।' এই কথা শুনিয়া ক্রেসন সাহেব কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেলেন; যাইবার সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বলিয়া গেলেন যে, 'আমার অনুপস্থিতিতে আপনারা কুকুরের দ্বারা শব্দ বিন্যাস করাইয়া দেখিতে পারেন।' ক্রেসন চলিয়া যাইবার পর, এক, দুই করিয়া অনেকগুলি শব্দ কুকুরকে বানান করিতে বলা হইল, কুকুর অক্ষর একত্র করিয়া, সমস্ত শব্দের নির্ভুল বানান করিয়া দিল। ক্রেসন সাহেব ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ইঁহারা মনে মনে কি ভাবিতেছিলেন?' কুকুর অক্ষর একত্র করিয়া তাহার উত্তর দিল,—'ইঁহারা আমাদের উপর সন্দেহ করিয়াছিলেন।' কুকুরের এই উত্তরে সকলে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। কোন ব্যক্তি একদিন কুকুরকে সেই তারিখের কোন একখানি নির্দ্দিষ্ট পত্রিকা আনিতে বলিলেন। নানা প্রকারের এবং বিভিন্ন তারিখের অসংখ্য পত্রিকার ভিতর হইতে, কুকুর ঠিক আদেশানুযায়ী পত্রখানিই উঠাইয়া আনিল। এই সকল ঘটনার দ্বারা কুকুরটির বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। *

---

* Strand Magazine হইতে।—লেখক।

সঙ্কলন।

পোষাক পরিচ্ছদ।

ত্বকের উপরেই ফ্লানেল বা পশমী পোষাক পরা উচিত নয়। কেন না, ত্বক সর্ব্বদাই ঘর্ম্ম বা তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসারণ করিতেছে; ফ্লানেল ও পশম নির্ম্মিত জিনিষ নিঃসারিত কোন পদার্থ শোষণ করিতে পারে না; ফলে ত্বক সর্ব্বদাই পূতিগন্ধময়, অনিষ্টকারী আর্দ্র অবস্থায় থাকে এবং লোমকূপগুলি বন্ধ হইয়া যায়। তুলা বা রেশমী জিনিষের শোষণ করিবার ক্ষমতা থাকায় পশমী জিনিষ ব্যবহার করিতে হইলেই, তাহার নীচে সূতি বা রেশমী পরিচ্ছদ ব্যবহার করা উচিত। নচেৎ ত্বকের স্বাভাবিক কার্য্য ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইবে।

আঁটা পোষাক কাহারও ব্যবহার করা উচিত নয়। ইহা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনায় এবং স্থানীয় রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত করিয়া পুষ্টির ক্ষতি করে। পোষাক যথোচিত বড় থাকিলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

পোষাক যত হালকা হয় ততই ভাল এবং তাহার রং-এর উপর শরীরের তাপ রক্ষণ ও বিকীরণের ক্ষমতা নির্ভর করে। ঈষৎ হলুদে ও সাদা পোষাক বাহিরের তাপ বিকীরণ করিয়া শরীরকে শীতল রাখে; সেই জন্য গ্রীষ্মকালে ইহার ব্যবহার অধিক। কাল পোষাক বাহিরের সমস্ত তাপ সঞ্চয় করে; সেই জন্যই শীতকালে কাল পোষাক সকলের ব্যবহার করা উচিত।—'স্বাস্থ্যসমাচার' কার্ত্তিক, ১৩২৬।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

গান—দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস। বঙ্গবাসী-সম্পাদক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য মাত্র আট আনা। সঙ্গীত রচনায় রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার সিদ্ধহস্ত। কলিকাতার কোনও সভা-সমিতির অধিবেশন সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না সেখানে রায় সাহেবের রচিত সঙ্গীত গীত হয়। তাঁহার সঙ্গীতাবলীর প্রথম উচ্ছ্বাস বাঙ্গালা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এখন দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস সঙ্গীত-প্রিয় বাঙ্গালীর প্রীতি ও ভক্তি উৎপাদন করিবে, ইহা আমাদের বিশ্বাস। দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস বলিয়া সঙ্গীতগুলিকে বর্ণনা করা বড় সমীচীন হইয়াছে, কারণ এগুলি কেবল সুর-তালে মিষ্ট কথার গাঁথুনি নয়—গানের ভাষার মধ্যে রচয়িতার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই দুর্ম্মূল্যের দিনে আট আনা দাম করিয়া লেখক পুস্তকখানিকে সর্ব্বজনাদৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইলে আমরা সুখী হইব। রায় সাহেবের "বিদ্যাসাগর" ও "ইংরেজের জয়" এখনও সমানভাবে বাঙ্গালা পাঠকের নিকট সমাদর লাভ করিতেছে।

অর্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১৬শ ভাগ ২য় খণ্ড | মাঘ, ১৩২৬ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

দু'চারিটী পুরাণ কথা।

[শ্রী—]

(১)

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থগুলি পূর্ণ গ্রন্থাকারে ও খণ্ডাকারে 'বসুমতী'র আফিস হইতে ও অন্যান্য স্থান হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে এবং অনেক সুলভ মূল্যে সে সকল গ্রন্থ বঙ্গীয় পাঠক ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের হস্তগত হইতেছে। এইরূপে দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রভৃতিরও গ্রন্থাবলী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়ায় সে সকলও সুলভ মূল্যে পাওয়ার সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর অদম্য উৎসাহে ও প্রবলোদ্যমে প্রকাশিত ও তাঁহারই সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' আর কেহই পুনঃ প্রকাশ করিতে আয়াস প্রয়াস স্বীকার করিতে এ পর্য্যন্ত সম্মত বা প্রস্তুত হন নাই। জনৈক লেখক বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ-সমালোচনা প্রসঙ্গে সত্যই বলিয়াছেন "বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীর গৌরব। জাতীয় সাহিত্যের একমাত্র কোহিনুর। যত দিন বঙ্গভাষা, তত দিন বঙ্গদর্শন।"

১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে 'বঙ্গদর্শন' প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্কিম বাবু ১২৮২ সালে বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা ত্যাগ করিয়া 'বঙ্গদর্শনের বিদায়' নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। যখন বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয়, সেই সময় ভবানীপুরের ব্রজমাধব বসু প্রকাশক হইয়া বিজ্ঞাপনে প্রচার করেন :—

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক।

„ দীনবন্ধু মিত্র	লেখকগণ
„ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
„ জগদীশনাথ রায়	
„ তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	
„ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য	
„ রামদাস সেন	
„ অক্ষয়চন্দ্র সরকার	

বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনায় বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছিলেন—

"ইংরেজীপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে, যে তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। * * * বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরই বাঙ্গালার অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গলা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ। (আবার) সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ।"

১২৭৯ সালে বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গসমাজের অবস্থা আলোচনা করিলে বঙ্কিম বাবুর উক্তিগুলি সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। বঙ্গদর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—"যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্দ্ধিত হয়।" 'আজকাল সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র পত্রিকার সংখ্যা-নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন, পাঠ করিবার অবকাশ থাকা ত দূরের কথা। এখনকার বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বসুমতী বা সঞ্জীবনীর কথা বলিব না। কারণ

এখন দুই টাকার মূল্যের কাগজ পল্লীতে পল্লীতে বিচরণ করিতেছে। সহর বা নগরের ত কথাই নাই। বহু পূর্ব্বের সোমপ্রকাশ তখনকার সাপ্তাহিক পত্র। মূল্য ছিল ১০৲ দশ টাকা। সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহার সম্পাদক। শুনিতে পাই "সোমবার আসিলেই লোকে 'সোমপ্রকাশ' দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত।" সাপ্তাহিক পত্রের অভাব জন্যই তখন লোকের এত আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ছিল। মাসিক পত্র সম্বন্ধেও একথা বলা যাইতে পারে। বঙ্গদর্শন, জ্ঞানাঙ্কুর ও আর্য্যদর্শনই তখনকার সময়ে সাধারণ্যে প্রকাশিত হওয়ায় মাসিক পত্রের প্রতি লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবুর সম্পাদিত প্রথম চারি বৎসরের বঙ্গদর্শনে যে সকল সুপাঠ্য, জ্ঞানগর্ভ ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, বঙ্গসাহিত্যে তাহা অমূল্য রত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাস্তবিক উক্ত চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন বর্ত্তমান সময়ে সকল পাঠকের পক্ষেই শিক্ষাপ্রদ। ঐ সকল প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হওয়ার আবশ্যকতা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থাবলীর কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তাঁহার কেন, আরও কত প্রসিদ্ধ, অপ্রসিদ্ধ লেখকের বা গ্রন্থকারের রচনাবলীও নানাভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। আমাদের মনে আছে কলিকাতায় অবস্থানকালে আমাদের পাঠদশায় আমরা এক দিন সন্ধ্যার সময় বঙ্কিম বাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখাল বাবুর নিকট হইতে প্রথম দুই বৎসরের বাঁধান বঙ্গদর্শন পড়িবার জন্য চাহিয়া আনিয়াছিলাম। আমরা তখন পটুয়াটোলা লেনে থাকিতাম, বঙ্কিমবাবু ভবানী দত্তের লেনে বাসা করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় রাখাল বাবু চাকর সঙ্গে লইয়া আমাদের বাসায় আসিয়া বলিলেন "বঙ্গদর্শন ২ খানা এখনই ফেরত দিন, বাবু লাইব্রেরীতে ঐ দুই বই না দেখিয়া আমাকে খুব তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, 'এ পুস্তক কাহাকেই কোন কারণে বাহিরে লইয়া যাইতে দিও না। এ বই ত বাজারে ইচ্ছামত কিনিতে পাওয়া যাইবে না। এক খণ্ড কোনরূপে নষ্ট হইলে আর উদ্ধারের উপায় সহজ নয়। ইহাতে যে সকল অমূল্য রত্ন নিহিত ও মুদ্রিত আছে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অতুলনীয়। আমার উত্তেজনা, প্ররোচনা ও উৎসাহে অনেক কৃ লেখক বঙ্গদর্শনে ঐ সকল প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রক করিয়াছেন। যদি কেহ পড়িতে চায়, লাইব্রে বসিয়া তাহাকে পড়িতে বলিও, কদাচ বাহিরে লইয়া য দিও না।' এই বলিয়া রাত্রিতেই বই ফেরত ল জন্য চাকর সঙ্গে আমাকে পাঠাইয়াছেন, অতএব শী ২ খানা ফেরত দিন।" আমার বন্ধু সারদা বাবু হা হাসিতে বলিলেন—"আজকার রাত থাকুক কাল আ দিয়া আসিব।" রাখাল বাবু পুনরায় বলিলেন "ন এখনই দিন্. বাবু একেই বিরক্ত হইয়াছেন, তার প না লইয়া গেলে তিনি প্রকৃতই ক্রুদ্ধ হইয়া আবার আ পাঠাইবেন।" রাখাল বাবুর কথা শুনিয়া ও মুখের দেখিয়া আমরা আর দ্বিরুক্তি করিলাম না। বই ২ ফেরত দিলাম। ইহাতে বুঝা যায়, প্রথম চারি বৎ বঙ্গদর্শন কেমন অমূল্য জিনিষ।

বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবু লি ছেন "যে সকল কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাে বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের আমার এই অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার ক হইতেছে।" এই বলিয়া তিনি কবিবর হেমবাবু, যোগেন্দ্র বাবু, রাজকৃষ্ণ বাবু, অক্ষয় বাবু, রামদাস প্রফুল্ল বাবু ও লালমোহন বিদ্যানিধি—প্রভৃতির লিপি বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ ও শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতি কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শেষ কথা ' ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমা শ্লাঘার বিষয় নয়।" এই ত বঙ্কিম বাবুর নিজের আমরাও জানি সে সময়ের সুলেখক, ইংরেজীপ্রিয় ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণই বঙ্গদর্শনকে সমু সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্রও সাহিত্যে বঙ্কিম' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "কবিবর হে বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা, মনস্বী যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নানা বিষয়িনী চিন্তা, দর্শী, ভাবুক ও চিন্তাশীল সমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষ সরকারের অক্ষয় ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ, সুপণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের বিবিধ রচনা, ডাক্তার রা

সেনের প্রত্নতত্ত্ব, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত,' দীনবন্ধুর সরস রসিকতা, নবীনচন্দ্রের নবীন পদ্য, ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রবন্ধ প্রভৃতির সাহায্যে—বঙ্কিম বাবু অজেয় বল বিক্রমে সাহিত্য-রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।"

বঙ্কিমবাবু একাধারে সুলেখক ও তীক্ষ্ণদর্শী ও স্পষ্টবক্তা সমালোচক ছিলেন। হারাণবাবুর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, "তিনি এক হস্তে পুষ্পমাল্য, অন্য হস্তে সম্মার্জ্জনী লইয়া সমালোচকের পবিত্র আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

আমাদের মনে হয় তাঁহার গ্রন্থাবলী অপেক্ষা তাঁহার সম্পাদিত প্রথম চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন আরও প্রয়োজনীয় ও স্পৃহনীয়। বর্ত্তমান ভাষা বিভ্রাটের সময়ে তাঁহার সমালোচনাগুলি সাধারণ্যে প্রকাশিত হইলে অনেক সুফল ফলিতে পারে। আমাদের মনে পড়ে, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শনে সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "যিনি মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দিতে পারিতেন, তিনি মুষ্টিভিক্ষা দিয়া বিদায় করিয়াছেন, তাহা হউক মুষ্টিভিক্ষা—এও স্বর্ণ-বৃষ্টি বটে।" এরূপ ভাবের কথা অনেক দিন আর শুনা যায় নাই। এই সকল কারণে ও অপরবিধ কারণেও আমাদের বিশ্বাস বঙ্গদর্শনগুলি পুনর্মুদ্রিত হইলে সাধারণের যথেষ্ট উপকার হইবে। সাপ্তাহিক কাগজের স্বত্বাধিকারীরা অনেক গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা কেন যে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, আমার এই পুরাণ কথাগুলি পড়িয়া যদি কেহ এ কার্য্যে অগ্রসর হন, তবে আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখা সার্থক হইবে।

(২)

আচার্য্য চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের নাম বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে এক "উদ্ভ্রান্ত-প্রেম"ই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রী-চরিত্র প্রভৃতি আরও ২।১খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থও তাঁহার রচিত, কিন্তু সে সকলের খবর বঙ্গীয় পাঠকগণ প্রায় রাখেন না। পূজ্যপাদ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ-সমালোচনায় 'বিদ্যাসুন্দরে'র মধ্যে 'বিদ্যার প্রতি রাণীর উক্তি' ও 'রাজার নিকটে রাণীর গমন', এই দুইটী উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—"উল্লিখিত রচনা কি সরল, কি মধুর এবং কি স্বভাব-সঙ্গত ও সময় সমুচিত। ভারতচন্দ্রের যদি আর কোন রচনাই না থাকিত, তথাপি সকল দিক্ বজায় রাখিয়া রাণীর এই একমাত্র পাকা গৃহিণী-পণার বর্ণন দৃষ্টেই তাঁহাকে মহাকবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইত।"

আচার্য্য চন্দ্রশেখরের একমাত্র উদ্ভ্রান্তপ্রেম সম্বন্ধেও আমরা বলি, যদি তিনি আর কিছুমাত্র রচনা না করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে ভাবুক, চিন্তাশীল ও সুলেখক বলিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ চিরকাল স্বীকার করিবেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, তিনি নানাকারণে বঙ্গ সাহিত্যের রীতিমত সেবা করিতে পারেন নাই। তবে আর একটী বিষয়ের রচনা করিয়া তিনি যে বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারে কতকগুলি রত্ন দিয়াছেন, তাহার সংবাদ বর্ত্তমান কালে নবীন পাঠকগণ অনেকেই জানেন না। সেই বিষয়ে কিছু বলিব বলিয়াই আমি আচার্য্যের কথা পাড়িয়াছি।

১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয়, ঐ সালের আশ্বিন মাসে 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামক আর এক খানি মাসিক পত্রও প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস নামক জনৈক লেখক তাহার সম্পাদক ছিলেন। 'সভ্যতার ইতিহাস' নাম দিয়া তিনি কতকগুলি প্রবন্ধ ঐ পত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আচার্য্য চন্দ্রশেখর ঐ পত্রের একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। 'মসলা বাঁধা কাগজ' নামক কতকগুলি প্রবন্ধ ঐ পত্রে তিনি রচনা করিয়া প্রকাশার্থ দিয়াছিলেন। আমাদের পাঠদ্দশায় আমরা ঐ সকল প্রবন্ধ পড়িয়া অনেক সময় শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ অনুভব করিয়াছি। 'জ্ঞানাঙ্কুর' দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। তাহার জীবন-কাল অতি অল্প। আচার্য্য চন্দ্রশেখর এখন জীবিত আছেন, কোন উৎসাহী গ্রন্থ-প্রকাশক উদ্যোগী ও মনোযোগী হইয়া তাঁহার রচিত 'মসলা বাঁধা কাগজ'

এখন দুই টাকার মূল্যের কাগজ পল্লীতে পল্লীতে বিচরণ করিতেছে। সহর বা নগরের ত কথাই নাই। বহু পূর্ব্বের সোমপ্রকাশ তখনকার সাপ্তাহিক পত্র। মূল্য ছিল ১০৲ দশ টাকা। সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহার সম্পাদক। শুনিতে পাই "সোমবার আসিলেই লোকে 'সোমপ্রকাশ' দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত।" সাপ্তাহিক পত্রের অভাব জন্যই তখন লোকের এত আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ছিল। মাসিক পত্র সম্বন্ধেও একথা বলা যাইতে পারে। বঙ্গদর্শন, জ্ঞানাঙ্কুর ও আর্য্যদর্শনই তখনকার সময়ে সাধারণ্যে প্রকাশিত হওয়ায় মাসিক পত্রের প্রতি লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবুর সম্পাদিত প্রথম চারি বৎসরের বঙ্গদর্শনে যে সকল সুপাঠ্য, জ্ঞানগর্ভ ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, বঙ্গসাহিত্যে তাহা অমূল্য রত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাস্তবিক উক্ত চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন বর্ত্তমান সময়ে সকল পাঠকের পক্ষেই শিক্ষাপ্রদ। ঐ সকল প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হওয়ার আবশ্যকতা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থাবলীর কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তাঁহার কেন, আরও কত প্রসিদ্ধ, অপ্রসিদ্ধ লেখকের বা গ্রন্থকারের রচনাবলীও নানাভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। আমাদের মনে আছে কলিকাতায় অবস্থানকালে আমাদের পাঠদশায় আমরা এক দিন সন্ধ্যার সময় বঙ্কিম বাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখাল বাবুর নিকট হইতে প্রথম দুই বৎসরের বাঁধান বঙ্গদর্শন পড়িবার জন্য চাহিয়া আনিয়াছিলাম। আমরা তখন পটুয়াটোলা লেনে থাকিতাম, বঙ্কিমবাবু ভবানী দত্তের লেনে বাসা করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় রাখাল বাবু চাকর সঙ্গে লইয়া আমাদের বাসায় আসিয়া বলিলেন "বঙ্গদর্শন ২ খানা এখনই ফেরত দিন, বাবু লাইব্রেরীতে ঐ দুই বই না দেখিয়া আমাকে খুব তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, 'এ পুস্তক কাহাকেই কোন কারণে বাহিরে লইয়া যাইতে দিও না। এ বই ত বাজারে ইচ্ছামত কিনিতে পাওয়া যাইবে না। এক খণ্ড কোনরূপে নষ্ট হইলে আর উদ্ধারের উপায় সহজ নয়। ইহাতে যে সকল অমূল্য রত্ন নিহিত ও মুদ্রিত আছে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অতুলনীয়। আমার উত্তেজনা, প্ররোচনা ও উৎসাহে অনেক কৃতবিদ্য লেখক বঙ্গদর্শনে ঐ সকল প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। যদি কেহ পড়িতে চায়, লাইব্রেরীতে বসিয়া তাহাকে পড়িতে বলিও, কদাচ বাহিরে লইয়া যাইতে দিও না।' এই বলিয়া রাত্রিতেই বই ফেরত লইবার জন্য চাকর সঙ্গে আমাকে পাঠাইয়াছেন, অতএব শীঘ্র বই ২ খানা ফেরত দিন।" আমার বন্ধু সারদা বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আজকার রাত থাকুক কাল আমরাই দিয়া আসিব।" রাখাল বাবু পুনরায় বলিলেন "না, না এখনই দিন. বাবু একেই বিরক্ত হইয়াছেন, তার পর বই না লইয়া গেলে তিনি প্রকৃতই ক্রুদ্ধ হইয়া আবার আমাকে পাঠাইবেন।" রাখাল বাবুর কথা শুনিয়া ও মুখের ভাব দেখিয়া আমরা আর দ্বিরুক্তি করিলাম না। বই ২ খানি ফেরত দিলাম। ইহাতে বুঝা যায়, প্রথম চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন কেমন অমূল্য জিনিষ।

বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন "যে সকল কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই—বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমার এই অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে।" এই বলিয়া তিনি কবিবর হেমবাবু, শ্রদ্ধেয় যোগেন্দ্র বাবু, রাজকৃষ্ণ বাবু, অক্ষয় বাবু, রামদাস বাবু, প্রফুল্ল বাবু ও লালমোহন বিদ্যানিধি—প্রভৃতির লিপিশক্তি, বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ ও শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শেষ কথা "ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নয়।" এই ত বঙ্কিম বাবুর নিজের কথা। আমরাও জানি সে সময়ের সুলেখক, ইংরেজীপ্রিয় এবং ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণই বঙ্গদর্শনকে সমুন্নত ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্রও 'বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা, মনস্বী যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের দর্শন, পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নানা বিষয়িনী চিন্তা, সূক্ষ্মদর্শী, ভাবুক ও চিন্তাশীল সমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের অক্ষয় ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের বিবিধ রচনা, ডাক্তার রামদাস

সেনের প্রত্নতত্ত্ব, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত,' দীনবন্ধুর সরস রসিকতা, নবীনচন্দ্রের নবীন পদ্য, ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রবন্ধ প্রভৃতির সাহায্যে—বঙ্কিম বাবু অজেয় বল বিক্রমে সাহিত্য-রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।"

বঙ্কিমবাবু একাধারে সুলেখক ও তীক্ষ্ণদর্শী ও স্পষ্টবক্তা সমালোচক ছিলেন। হারাণবাবুর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, "তিনি এক হস্তে পুষ্পমাল্য, অন্য হস্তে সম্মার্জ্জনী লইয়া সমালোচকের পবিত্র আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

আমাদের মনে হয় তাঁহার গ্রন্থাবলী অপেক্ষা তাঁহার সম্পাদিত প্রথম চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন আরও প্রয়োজনীয় ও স্পৃহনীয়। বর্ত্তমান ভাষা বিভ্রাটের সময়ে তাঁহার সমালোচনাগুলি সাধারণ্যে প্রকাশিত হইলে অনেক সুফল ফলিতে পারে। আমাদের মনে পড়ে, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শনে সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "যিনি মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দিতে পারিতেন, তিনি মুষ্টিভিক্ষা দিয়া বিদায় করিয়াছেন, তাহা হউক মুষ্টিভিক্ষা—এও স্বর্ণ-মুষ্টি বটে।" এরূপ ভাবের কথা অনেক দিন আর শুনা যায় নাই। এই সকল কারণে ও অপরবিধ কারণেও আমাদের বিশ্বাস বঙ্গদর্শনগুলি পুনর্মুদ্রিত হইলে সাধারণের যথেষ্ট উপকার হইবে। সাপ্তাহিক কাগজের সত্বাধিকারীরা অনেক গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা কেন যে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, আমার এই পুরাণ কথাগুলি পড়িয়া যদি কেহ এ কার্য্যে অগ্রসর হন, তবে আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখা সার্থক হইবে।

(২)

আচার্য্য চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের নাম বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে এক "উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম"ই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রী-চরিত্র প্রভৃতি আরও ২।১খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থও তাঁহার রচিত, কিন্তু সে সকলের খবর বঙ্গীয় পাঠকগণ প্রায় রাখেন না। পূজ্যপাদ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ-সমালোচনায় 'বিদ্যাসুন্দরে'র মধ্যে 'বিদ্যার প্রতি রাণীর উক্তি' ও 'রাজার নিকটে রাণীর গমন', এই দুইটী উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—"উল্লিখিত রচনা কি সরল, কি মধুর এবং কি স্বভাব-সঙ্গত ও সময় সমুচিত। ভারতচন্দ্রের যদি আর কোন রচনাই না থাকিত, তথাপি সকল দিক্ বজায় রাখিয়া রাণীর এই একমাত্র পাকা গৃহিণী-পণার বর্ণন দৃষ্টেই তাঁহাকে মহাকবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইত।"

আচার্য্য চন্দ্রশেখরের একমাত্র উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম সম্বন্ধেও আমরা বলি, যদি তিনি আর কিছুমাত্র রচনা না করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে ভাবুক, চিন্তাশীল ও সুলেখক বলিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ চিরকাল স্বীকার করিবেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, তিনি নানাকারণে বঙ্গ সাহিত্যের রীতিমত সেবা করিতে পারেন নাই। তবে আর একটী বিষয়ের রচনা করিয়া তিনি যে বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারে কতকগুলি রত্ন দিয়াছেন, তাহার সংবাদ বর্ত্তমান কালে নবীন পাঠকগণ অনেকেই জানেন না। সেই বিষয়ে কিছু বলিব বলিয়াই আমি আচার্য্যের কথা পাড়িয়াছি।

১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয়, ঐ সালের আশ্বিন মাসে 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামক আর এক খানি মাসিক পত্রও প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস নামক জনৈক লেখক তাহার সম্পাদক ছিলেন। 'সভ্যতার ইতিহাস' নাম দিয়া তিনি কতকগুলি প্রবন্ধ ঐ পত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আচার্য্য চন্দ্রশেখর ঐ পত্রের একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। 'মসলা বাঁধা কাগজ' নামক কতকগুলি প্রবন্ধ ঐ পত্রে তিনি রচনা করিয়া প্রকাশার্থ দিয়াছিলেন। আমাদের পঠদ্দশায় আমরা ঐ সকল প্রবন্ধ পড়িয়া অনেক সময় শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ অনুভব করিয়াছি। 'জ্ঞানাঙ্কুর' দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। তাহার জীবন-কাল অতি অল্প। আচার্য্য চন্দ্রশেখর এখন জীবিত আছেন, কোন উৎসাহী গ্রন্থ-প্রকাশক উদ্যোগী ও মনোযোগী হইয়া তাঁহার রচিত 'মসলা বাঁধা কাগজ'

প্রকাশিত করিলে বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট উপকার হইবে। আমাদের বিশ্বাস, 'মসলা বাঁধা কাগজ' প্রকাশিত হইলে আচার্য্যের নাম আরও উজ্জ্বল হইবে। বঙ্কিম বাবুর 'কমলাকান্তের দপ্তর' যেরূপ ভাবে লিখিত, মসলা-বাঁধা কাগজ সেইরূপ সুচিন্তিত ও রসভাব পূর্ণ। বর্ত্তমান সময়ে অনেক অসার ও অপদার্থ গ্রন্থের প্রচার হইতেছে, এ সময় ঐ সকল প্রবন্ধের প্রকাশ করিলে প্রকাশকেরও লাভের সম্ভাবনা আছে।

(৩)

স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের নাম অনেকেই জানেন। তাঁহার গবেষণাপূর্ণ ও সুচিন্তিত রচনাবলী বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার রচিত "গ্রীক ও হিন্দু" বঙ্গসাহিত্যে একটি উজ্জ্বল রত্ন। 'মণিহারী' নামেও তাঁহার আর একখানি গ্রন্থ আছে। কিন্তু তাঁহার মত বিচক্ষণ অনুসন্ধিৎসার সহিত বাল্মীকির রামায়ণ অন্য কেহ পাঠ করিয়াছেন বলিয়া আমার ধারণা নাই। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সময় সময় আমার কাছে চিঠি-পত্র লিখিতেন এবং আমার কর্ম্মস্থলে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া অনেক সময় উপকৃত ও কৃতার্থ হইয়াছি।

দার্জ্জিলিং জিলাস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে আমি অনেক দিন নিযুক্ত ছিলাম। সেই সময় Darjeeling Association নামে একটী সভাও সেইখানে ছিল, আমি কয়েক বৎসর তাহার সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলাম। আমরা কয়েকজন বাঙ্গালী বন্ধু-বান্ধবে উদ্যোগী ও উৎসাহী হইয়া দার্জ্জিলিংএ একটী Public Library প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণ পাঠকগণের পাঠের আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধন ও পাঠ-বাসনা চরিতার্থ করিবার উপায় করিয়া [illegible]। সুবিখ্যাত জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বড় জামাতা স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (তাৎকালীন গবর্ণমেন্ট উকীল) আমাদের প্রধান সহায় ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমি লাইব্রেরীর উন্নতি বিধানের জন্য তখনকার সুপ্রসিদ্ধ [illegible] পুস্তকগুলি যত্ন পূর্ব্বক কিনিয়া দিতাম। সে সময় সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারী, ক্যানিং লাইব্রেরী ও গুরুদাস বাবুর লাইব্রেরিই প্রধান। এখনকার মত পুস্তকালয় Library বা Book shopএর এত ছড়াছড়ি তখন ছিল না। অবিনাশ বাবু, যোগেশ বাবু ও গুরুদাস বাবুই—তখন নামজাদা [illegible]। প্রফুল্ল বাবুর 'বাল্মীকি ও তৎ সাময়িক বৃত্তান্ত' নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ড পাইয়া তাহা আমি স্বয়ং পাঠ করি এবং আমার অনুরোধে লাইব্রেরীর অনেক সদস্য তাহা পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের গভীর গবেষণা, ঐকান্তিক উৎসাহ দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত প্রীত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থখানি প্রথম ভাগ মাত্র। পুস্তকের বিজ্ঞাপনে দ্বিতীয় ভাগের উল্লেখ থাকায় আমি কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকবিক্রেতার নিকট পত্র লিখিয়া ঐ দ্বিতীয় ভাগের অনুসন্ধান করি। কিন্তু কোন স্থানে ঐ পুস্তক না পাওয়ায় প্রফুল্ল বাবুকে পত্র লিখি। তিনি সে সময় মুর্শিদাবাদের পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। আমার পত্র পাইয়া তিনি উত্তরে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ কোন স্থানে না পাওয়ায় আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। লোকে পুস্তকই পাঠ করিয়া থাকে, তাহাতেও অনেকের আসক্তি দেখা যায় না। আপনি পুস্তক না পাইয়া গ্রন্থকর্ত্তাকে ধরিয়াছেন। আপনার উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। তবে দুঃখের বিষয়, ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় নাই। আমি ঐ দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করিবার জন্য সংবাদ পত্রের জনৈক সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীকে কাপি দিয়াছিলাম। অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি তাহা প্রকাশিত না করায় আমি পত্র লিখিলে তিনি উত্তর দিলেন "কাপি হারাইয়া গিয়াছে।" আমি তাহার কোন নকল রাখি নাই। এবং আমার এখন এমন অবকাশ বা শ্রমশক্তি নাই যে, পুনরায় ঐ বিষয়ের জন্য নানা পুস্তক অনুসন্ধান করিয়া এবং রামায়ণ পড়িয়া আবার ঐ সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে পারি। এ জন্মের মত ঐ দ্বিতীয় ভাগ আর পাইবেন না, প্রথম ভাগ পাঠেই পাঠকগণকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।"

মনুষ্যত্ব !

(Burns হইতে আহৃত)

[শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ।]

(১)

কে তুমি এ বিশ্বমাঝে　　মলিন কাতর সাজে
　নির্ম্মল দৈন্যের লাগি সঙ্কোচ-কুণ্ঠিত,
ভিতরে বাহিরে দীন　　কাপুরুষ তেজোহীন
　তোমার লজ্জায় কবি হয়েছে লজ্জিত।
আঁধার কুটীরে আছ　　যদিও কষ্টেই বাঁচো
　নিষ্পাপ দৈন্যেরে তবু জেনো বরণীয়,
মুদ্রার মুদ্রাঙ্ক সম　　উচ্চপদ তুচ্ছতম,
　মনুষ্যত্ব খাঁটি সোণা,—চিরবরণীয়।

(২)

পর্ণ গৃহ রুক্ষ কেশ　　তৃণশয্যা জীর্ণ বেশ
　দিনান্তে শাকান্ন খাদ্যে নাহি অপমান,
লক্ষশাট পটাবৃত　　মূঢ় সে মূঢ়ই স্মৃত
　দুর্জ্জন হলেও ধনী পশুর সমান।
হীন আত্মা রম্য সাজে　　ঘুরে যারা দেশমাঝে
　মাটীর প্রদীপে তারা উজল ফানুষ,
দারিদ্র্য মাথার মণি　　মহামূল্য ধনে ধনী
　নিষ্পাপ, হলেও দীন, প্রকৃত মানুষ।

(৩)

পিতৃধন অধিকারী　　'বড়লোক' নামধারী
　হের অই দর্প অন্ধ স্বর্ণ গর্দ্দভ,
যেন কত দয়া করে　　পা ফেলে ধরণী 'পরে
　পিছে চলে তোষামোদী পদলেহী সব।
জড়ি-জড়োয়ার কাজ　　রেশমী পশমী সাজ
　তার পেশোয়াজ তাজ থাকুক যতই,
প্রকৃত মানুষ যারা　　উপহাসে হাসে তারা
　ভাবে নাক বিজ্ঞ তারে গজ-মূর্খ বই।

(৪)

গড়ে ঘটে বাদসাহ　　খুসীমত ওমরাহ
　উজীর আমীর রাজা মনসবদার,
সদাশয় সজ্জনেরা　　সকল সৃষ্টির সেরা
　শ্রেষ্ঠতম পুত্র তারা এ বিশ্বপিতার।
ধাতার পরম দান　　স্ব-মর্য্যাদা অভিমান
　রক্ষা করে চির তুঙ্গ তারা চিরবীর,
পার্থিব শক্তির পায়　　কভু ছিন্ন দীনতায়
　অনুগ্রহ কামনায় না নোয়ায় শির।

(৫)

কিছু পরে যাচ্ছি, হেন　　দিন নাহি রবে যেন
　চির অবিচার বল্ম সবে না সবে না,
গুণ জ্ঞান মহত্বের　　মর্য্যাদা বাড়িবে ফের
　দরিদ্রের এ দুর্দ্দিন রবে না রবে না।
বিত্ত-ধনে যেবা ধনী　　হবে সে নির্ব্বিষ ফণী—
　চিত্ত-ধনে যেবা ধনী তারি হবে জয়,
সবে ভেদাভেদ ভুলি'　　ভ্রাতৃভাবে কোলাকুলি
　করিবে করিবে প্রেমে এ নিখিলময়।

দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব তীর্থ।

(গোবিন্দদাসের করচা)

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম্-এ, বি-এল্।]

গোবিন্দদাসের করচায় দাক্ষিণাত্যে শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি ধর্ম্মের তীর্থ সম্বন্ধে যেমন অনেক তথ্যের আলোচনা করা হইয়াছে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের তীর্থ সম্বন্ধেও সেইরূপ বহু বিষয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-দেবের সময়ে দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলিলে, বিষ্ণুর উপাসনা ও বিষ্ণুর অবতার রাম ও বরাহ নৃসিংহ প্রভৃতি মূর্ত্তির পূজা বুঝাইত। রামাৎ ও অন্যান্য কয়েক শ্রেণীর বৈষ্ণবগণ দক্ষিণ ভারতে বিষ্ণু-পূজার প্রাধান্য বিস্তার ও তৎসঙ্গে জ্ঞান ও যোগমার্গ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রচার করিয়া, বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে ভাব দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দুর হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রেম-ভক্তির প্রভাব বড় বেশী ছিল না। শ্রীচৈতন্যদেব বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ও প্রেম-ভক্তির প্রাধান্য বিস্তার করিয়া দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের এক নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছিলেন। রামোপাসক বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর উপদেশ শ্রবণে ও প্রেমভাব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া যেরূপে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, গোবিন্দ-দাসের করচায় তাহার বিশদ বিবরণ স্থান পাইলেও শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র সম্বন্ধে উক্ত কাব্য-গ্রন্থে যৎসামান্য তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার কারণ, কৃষ্ণ-ভক্ত বৈষ্ণব-গণের তীর্থের সংখ্যা দক্ষিণ ভারতে অত্যন্ত কম। শ্রীচৈতন্য-দেব পুরী হইতে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া প্রথমে আলালনাথের শ্রীমন্দিরে গমন করেন।

"আলাল নাথেরে হেরি ভাব উথলিল।
অশ্রুজলে সে স্থানের মাটী ভিজাইল॥"

সেখান হইতে যাত্রা করিয়া ২৫টি স্থান দর্শন ও কয়েকটি শিব ও রামচন্দ্রের মূর্ত্তি পূজা করিয়া, বহুতর বৌদ্ধ ও অদ্বৈতবাদীর অন্তরে প্রেমালোক বিকীর্ণ করিয়া, "ক্রমে আসি উপনীত বিষ্ণুকাঞ্চীধাম।"

"ভবভূতি নামে শেঠী বিষ্ণুকাঞ্চী স্থানে।
লক্ষ্মী নারায়ণ সেবা করয়ে যতনে॥
বড় ভক্ত হয় শেঠী সাধুচূড়ামণি।
লক্ষ্মীনারায়ণ হয় তাহার পরাণী॥
নিত্য সেবা ভক্তি করে শেঠী মহাশয়।
সেবার লাগিয়া করে বহু অর্থ ব্যয়॥
মন্দির পাখালে নিত্য তাহার রমণী।
সেবার লাগিয়া ব্যস্ত সাধু শিরোমণি॥
নিত্য দুই মণ ক্ষীরে পায়সান্ন হয়।
প্রসাদ পাইতে কত উদাসীন যায়॥
লক্ষ্মী নারায়ণ দেখি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
প্রণাম করিয়া স্তব করিলা বিস্তর॥"

কৃষ্ণভক্ত শেঠী কৃষ্ণপ্রেম ও শ্রীরাধিকার ভক্তি সম্বন্ধে র ত অনভিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রতি তাঁহার তাঁহার সহধর্ম্মিণীর অকপট ভক্তির কথা শুনিয়া মনে হয় , তাঁহারা রামাত বৈষ্ণবদিগের অপেক্ষা ভক্তিমার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বিষ্ণুকাঞ্চীধাম হইতে যাত্রা করিয়া অন্যান্য অনেকগুলি তীর্থ দর্শন করিবার পর তাঞ্জোরে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি দর্শন করেন।

"ধলেশ্বর নামে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
তাঞ্জোরে থাকেন করি কৃষ্ণের সেবন॥
রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি আছে তাহার মন্দিরে।
সেইখানে মোর গোরা গেলা ধীরে ধীরে॥
ধলেশ্বর ব্রাহ্মণের আঙ্গিনার মাঝে।
প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ তথায় বিরাজে॥
তথি রহে বহুতর বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী।
যে স্থান দেখিলে হয় গৃহস্থ উদাসী॥"

তাঞ্জোর হইতে যাত্রা করিয়া বহু তীর্থ দর্শনান্তে, "তার পর পয়োষ্ণি নগরে প্রবেশিলা। শিব নারায়ণ দেখি প্রভুর ... হইলা।" এই তীর্থে যেমন শৈব ও বৈষ্ণবের উপাস্য দেবতার মিলন দেখা যায়, তাঞ্জোরেও সেইরূপ ধলেশ্বর ব্রাহ্মণের আঙ্গিনায় "গোসমাজ শিব রহে তার বাম ভাগে শিব দরশন কৈলা প্রভু অনুরাগে॥" দাক্ষিণাত্যের অপর কোনও স্থানে শৈব ও বৈষ্ণবের এরূপ যুগল বিগ্রহ উল্লেখ করচায় পাওয়া যায় না। পয়োষ্ণি নগর হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব নানা তীর্থে ভ্রমণ করিবার পর, বোম্বাই প্রদেশের বরোদা রাজ্যে আসিয়া গোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলেন।

"বরোদার রাজা বড় পুণ্যবান্ হয়।
গোবিন্দ সেবায় রত রাজা মহাশয়॥
গোবিন্দের মন্দির স্বহস্তে মুক্ত করে।
অম্বরীষ সম রাজা ঘোষে পরস্পরে॥
সদা ব্যস্ত মহারাজ গোবিন্দের লাগি।
গোবিন্দ সেবায় রাজা সদা অনুরাগী॥
স্বহস্তে তুলিয়া রাজা তুলসী-মঞ্জরী।
গোবিন্দের পাদপদ্মে দেন ভক্তি করি॥
সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের বাড়ী গোরা যায়॥
গোবিন্দ দেখিয়া প্রেমে লুণ্ঠিত ধরায়॥
ছিন্ন এবং বহির্ব্বাস পাগলের বেশ।
সদা উনমত্ত প্রভু কৃষ্ণেতে আবেশ॥
সব অঙ্গে ধূলা মাখা মুদ্রিত নয়ন।
গোবিন্দ দেখিয়া অশ্রু করে বরষণ॥"

তার পর কয়েকটি তীর্থ দর্শন করিয়া, "রণছোড়জীর সেবা আছে এক ঠাঁই। সন্ধ্যাকালে দর্শন করিতে তথা যাই॥" এই স্থানের "নিকটে গুণার গিরি অতি মনোহর।" এই গুণার পর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রথম বিবরণ গোবিন্দদাসের করচায় দৃষ্ট হয়।

"গুণার পাহাড় বড় উচ্চতর হয়।
শুরুদত্তা চরণ-যুগল সেথা রয়॥
গুণারের উচ্চ শিরে চরণ-যুগল।
চরণ দেখিতে চলে সন্ন্যাসীর দল॥
প্রভাতে চরণ-যুগ দেখিবারে যাই।
অপরাহ্নে চরণের নিকটে পৌঁছাই॥

শ্রীগুরু উপরে শোভে দুখানি চরণ।
চরণ দেখিয়া প্রভু করিলা বন্দন॥
ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ শোভয়ে পদতলে।
পাদপদ্ম দেখি প্রভু হরি হরি বলে॥
এক জন পাণ্ডা ইহ থাকে নিরন্তর।
চরণের কথা তারে পুছে বিশ্বম্ভর॥
পাণ্ডা বলে যদুগণ যখন মরিল।
তখন শ্রীবলদেব এখানে আইল॥
বলদেব আসি এথা তাপের কারণ।
তপ আরম্ভিলা করি যোগাসন॥
যোগাসনে বলদেব তপেতে বসিল।
প্রভাসে যাদবগণ যুদ্ধ আরম্ভিল॥
মধুপানে মত্ত হয়ে যত যদু বীর।
পরস্পরে যুদ্ধ করে ছুটিল রুধির॥
সাত্যকি প্রভৃতি ছিল যত বীরগণ।
একে একে যমালয়ে করিল গমন॥
কৃষ্ণের ইচ্ছায় সব যদুগণ মরে।
শেষে দেখা দিল কৃষ্ণ পর্ব্বত উপরে॥
এইখানে বলদেব দেখি যদুপতি।
কহিতে লাগিলা প্রভু আপনার গতি॥
বলদেবে কহে কৃষ্ণ গোলকে যাইব।
সিদ্ধ হৈল নিজ কার্য্য আর না রহিব॥
যাদবগণের পাপে পৃথিবী পূরিল।
এই জন্য যদুগণ উচ্ছিন্ন হইল॥
মোর লাগি কান্দে যদি পাণ্ডুপুত্রগণ।
তাহাদের শোক তুমি করিবে মোচন॥
প্রাণ হৈতে প্রিয়বস্তু দ্রুপদ কুমারী।
তারে আগে শান্ত কোরো এই ভিক্ষা করি॥
এত শুনি বলদেব উঠিল কান্দিয়া।
এই বাক্য বলে তবে বিনয় করিয়া॥
বিদুর উদ্ধব আদি যত ভক্ত আছে।
তুমি গেলে কি বলিব তাহাদের কাছে॥
কোন চিহ্ন রেখে যাহ তাহাদের লাগি।
যে চিহ্ন দেখিবে তারা হয়ে অনুরাগী॥
তুমি ত তাদের প্রাণ জানিয়া শুনিয়া।
গোলোকে যাইবে তুমি কেমন করিয়া॥
কৃষ্ণ বই তাহারা ত কিছু নাহি জানে।
কিরূপে তাদের কেলি যাবে নিজ স্থানে॥
পাঞ্চালী করিবে যবে হাহাকার ধ্বনি।
কি বলে বুঝাব তারে বুঝাহ আপনি॥
এত শুনি কৃষ্ণ এথা পদভর দিলা।
অমনি চরণ চিহ্ন এখানে রহিলা॥
এই কথা বলি পাণ্ডা বুঝাইয়া দিল।
অমনি প্রভুর হৃদে প্রেম উপজিল॥
আনন্দের ধাম গোরা প্রেম নিকেতন।
স্থির দৃষ্টে পদচিহ্ন করে দরশন॥
দেখিতে দেখিতে চিহ্ন প্রেমের নিঝর।
সহসা উথলি তাঁর উঠিল অন্তর॥
ভাবে গদ গদ প্রভু ধীরে ধীরে বলে।
পাণ্ডা ভাই তুমি সাধু কি রত্ন দেখালে॥
নিত্য তুমি সুখ লাভ কর দরশনে।
তব সব পুণ্যবান না দেখি নয়নে॥
পাষাণ হৃদয়ে যদি এ চিহ্ন পড়িত।
ব্রহ্মানন্দ সুখ তবে নিত্য উপস্থিত॥
পদচিহ্নে রাখি শির গোরা বিনোদিয়া।
তদুপরি বার বার পড়ে লোটাইয়া॥
বেত্রযষ্টি সম সেই ক্ষীণ কলেবর।
ফুলিয়া উঠিল প্রেমে পেয়ে অবসর॥
চরণ পরশি প্রভু নয়ন মুদিল।
হৃদয় বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল॥
পদ প্রদক্ষিণ করে করতালি দিয়া।
কটিবদ্ধ জটাবদ্ধ পড়িল খসিয়া॥”

শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন দর্শনে শ্রীচৈতন্যদেবের হৃদয়ে প্রেমভাব যেরূপে বিকসিত হইয়াছিল, ব্যথাভরা হৃদয়ের সেই প্রেমভাব যেরূপে তাঁহার ক্ষীণ কলেবরে, গদ গদ বচনে, অশ্রুবিগলিত নয়নে প্রকাশ পাইয়াছিল, গোবিন্দদাস তাহা সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন। ভাবের ক্রমবিকাশ অন্তর ও বাহিরে প্রবহমান প্রেমানন্দের যে চিত্র অঙ্কিত করিতেছিল, কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাহা সহজ ও সরল ভাষায় কাব্যাকারে পরিস্ফুট করিয়াছে। গোবিন্দদাস আর একখানি সুন্দর 'ভাবে'র চিত্র প্রভাস তীর্থে অঙ্কিত করিয়াছেন।

"ইহাকে প্রভাস তীর্থ বলে সর্ব্বজনে ।
প্রভাস দেখিয়া বড় প্রীতি পাই মনে ॥
যদুগণ যেখানে ত্যজিল কলেবর ।
সেইখানে প্রভু গিয়া কান্দিলা বিস্তর ॥
মধুপানে মত্ত হয়ে যত যদুবীর ।
পরস্পর যুদ্ধ করি ত্যজিল শরীর ॥
কেবা নিজ কেবা পর না করি গণন ।
কৃষ্ণের ইচ্ছায় মরে যদুবীরগণ ॥
চারুদেষ্ণ সুরস্থি সাত্যকি যুযুধান ।
শাম্ব গদ প্রভৃতি যতেক মতিমান্ ॥
পরস্পর যুদ্ধ করি মরে সেইখানে ।
বিরস বদনে প্রভু কান্দে সেই স্থানে ॥
কান্দিয়া এতেক হর্ষ কেহ নাহি পায় ।
কান্দিয়া আনন্দ প্রভু ধরায় ছড়ায় ॥"

প্রভাস তীর্থ অমরাপুরীর নিকট। গোবিন্দদাসের করচায় ভাব ক্রমশঃ ঘনাইয়া উঠিয়াছে।

"অমরাপুরীর লোক একত্র জুটিয়া ।
আনন্দ পাইল সবে প্রভুরে দেখিয়া ॥
পাগলের ন্যায় যেন ইতি উতি ধায় ।
আবেশে উন্মত্ত হয়ে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটি কভু যেন জ্ঞানহারা ।
মিশিয়া গিয়াছে ঊর্দ্ধে নয়নের তারা ॥
পৃষ্ঠদেশে এলায়ে পড়েছে জটাভার ।
হৃদয় মাঝারে অশ্রু পড়ে অনিবার ॥
পাগলের মত বেশ শিথিল অম্বর ।
সর্ব্বাঙ্গে উড়িছে খড়ি ধূলায় ধূসর ॥
কোথায় যজ্ঞের কুণ্ড বলে গোরা রায় ।
পাণ্ডাগণ সঙ্গে থাকি প্রভাস দেখায় ॥
প্রভাসের দক্ষিণ ভাগেতে মোরা যাই ।
সেইখানে গিয়া কুণ্ড দেখিবারে পাই ॥
এই কুণ্ড কাটি যদুপতি যজ্ঞ করে ।
সেই যজ্ঞে যদুগণ যুদ্ধ করি মরে ॥
যেইখানে সত্যভামা করি কান্নাবন ।
মাঝে মাঝে কৃষ্ণ সহ করি আগমন ॥
পরম আনন্দে বাস করিতেন সতী ।
সেই স্থান দেখিয়া গৌরাঙ্গ মহামতি ॥
কান্দিয়া উঠিলা প্রভু করি চীৎকার ।
হুকারি হুকারি প্রভু কান্দে অনিবার ॥"

চৈতন্যচরিতামৃতে এই সকল তীর্থের কোনও উল্লেখ নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ দুইটিমাত্র শ্লোকে পঞ্চবটী তীর্থ দর্শনের পর শ্রীচৈতন্যদেবের তীর্থ-ভ্রমণ বৃত্তান্ত শেষ করিয়াছেন।

"প্রভু আসি কৈলা পম্পা-সরোবরে স্নান ।
পঞ্চবটী আসি তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥
নাসিত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি ।
কুশাবর্ত্তে আইলা যাহা জন্মিলা গোদাবরী ॥
সপ্তগোদাবরী তীর্থ দেখি বহুতর ।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর ॥"
(চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃতে একটিমাত্র পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর চৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব ভক্ত রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করা অন্যান্য চরিতাখ্যান লেখকগণ যে কারণে যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই, তদ্বিষয়ে রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ বর্ত্তমান যুগের সমালোচকগণ শ্রীচৈতন্যদেবের অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া নানা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে যথেষ্ট আভাস দিয়াছেন। গোবিন্দদাসের করচায় উল্লিখিত বৈষ্ণব তীর্থ ব্যতীত আর একটি পৌরাণিক বৈষ্ণব তীর্থের বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই তীর্থের নাম দ্বারকা। "শ্রীচৈতন্যদেব ভক্ত না ভগবান ?"---এই প্রশ্নের উত্তর গোবিন্দদাসের দ্বারকা-লীলা বর্ণনায় পাওয়া যায়।

"প্রভাসেতে আর তীর্থ দেখিবার নাই ।
পহিলা আশ্বিনে মোরা দ্বারকায় যাই ॥
কৃষ্ণ নাম করিতে করিতে প্রভু যায় ।
সমুদ্রের ধারে ধারে যাই দ্বারকায় ॥
সাগরের খাড়ি পাই চারি দিন পরে ।
পার হৈতে হইবেক ডঙ্গার উপরে ॥
ডঙ্গার উপর দিয়া দ্বারকায় যাই ।
রৈবতক নামে গিরি দেখিবারে পাই ॥

ভাবে ঢুলু ঢুলু গোরা পর্ব্বত দেখিয়া।
মুচকি মুচকি প্রভু উঠিল হাসিয়া॥
কি যেন করিয়া মনে প্রফুল্ল বয়ানে।
মহাপ্রভু চলিলা হাসিয়া মোর পানে॥
মোর পানে চেয়ে বলে দ্বারকায় গিয়া।
চরিতার্থ হও সবে প্রণাম করিয়া॥
সব অঙ্গে মাথ রজঃ অতি ভক্তি করি।
দেখিলে পুণ্যের ফলে দ্বারকা নগরী॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জনমের সুকৃতের বলে।
দ্বারকা নগরী আজি দেখিলে সকলে॥
এত শুনি সবে মিলি প্রণাম করিল।
গোরার আনন্দ কূপ উথলি উঠিল॥
হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে।
ক্রমে উত্তরিলা প্রভু হেলিতে দুলিতে॥
ভাবসিন্ধু উথলিল মর্য্যাদা লঙ্ঘিয়া।
কার সাধ্য রাখে আর প্রভুরে ধরিয়া॥
উলটি পালটি পড়ে পৃথিবী উপরে।
ক্রমে ক্রমে প্রবেশিল পুরীর ভিতরে॥
লোমাঞ্চিত কলেবর কাঁপিতে লাগিল।
নয়ন ফাটিয়া যেন অশ্রু বাহিরিল॥
কোথা হে দ্বারকাধীশ এই কথা বলি।
অশ্রুজলে ভাসাইলা দ্বারবতী স্থলী॥
সব এলোমেলো জটা খসিয়া পড়িল।
অতি উচ্চ রবে গোরা কাঁদিয়া উঠিল॥
কি কব ভাবের কথা কহনে না যায়।
বার বার কৃষ্ণ বলি প্রভু ফুকরায়॥
দ্বারকাধীশের বাড়ী যবে প্রবেশিলা।
অমনি দ্বিগুণ ভাবে আনন্দে মাতিলা॥
কদম্বের ন্যায় শিহরিল কলেবর।
উলটি পালটি পড়ি ধূলায় ধূসর॥
ভাবে মাতোয়ারা প্রভু ঢুলু ঢুলু চায়।
দ্বারকাধীশের আগে ধরণি লোটায়॥
চারিদিকে পড়ে যেন ভক্তি উছলিয়া।
ফুলে ফুলে কাঁদে মোর গোরা বিনোদিয়া॥
নয়ন মুদিয়া কভু অম্বরেতে চায়।
অন্তরের মধ্যে যেন কি দেখিতে পায়॥

কখন বা ঊর্দ্ধমুখে তাকাইয়া রহে।
নয়ন হইতে অশ্রু দর দর বহে॥
কৃষ্ণেরে দেখিয়া তনু পুলকে পূরিল।
এক দৃষ্টে তাঁর প্রতি চাহিয়া রহিল॥
শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করে তিন বার।
নম্র হয়ে প্রতিবার করে নমস্কার॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গোরা বিনোদিয়া।
তাহা দেখি গুর্জ্জরেব পড়ে লোটাইয়া॥
দ্বারকায় মধ্যে ক্রমে হৈল জানাজানি।
সকলে প্রভুর কথা করে কাণাকাণি॥
কেহ বলে সন্ন্যাসী দেখিতে চল ভাই।
এমন সন্ন্যাসী কেহ কভু দেখে নাই॥
কি কব ইহার কথা কহনে না যায়।
এমন সন্ন্যাসী বুঝি না আছে ধরায়॥
এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখি নাই।
সন্ন্যাসীর রূপে গুণে বলিহারি যাই॥
দেখিলে তাহারে ভক্তি উপজয়ে মনে।
অশ্রু আসি দেখা দেয় আপনি নয়নে॥
ইচ্ছা হয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে চলে যাই।
বন্ধন কাটয়ে তারে দেখ যদি ভাই॥
দেখিলে সংসারে আর নাহি থাকে রুচি।
সে রূপ দেখিলে পাপী হয় সদ্য শুচি॥
এমন দয়াল আর দেখা নাহি যায়।
দয়া করে হরিনাম সকলে বিলায়॥
মাথা ভরা জটা পহিরণে বহির্ব্বাস।
দেখিলে তাহার রূপ পূরে অভিলাষ॥
ঈশ্বরের অবতার দেখি বোধ হয়।
ভক্তিরসে পূর্ণ সদা তাহার হৃদয়॥
ভাবাবেশে সদা মত্ত নবীন সন্ন্যাসী।
মাতাইয়া তুলিয়াছে দ্বারকা নিবাসী॥
কাম নাই ক্রোধ নাই নাহি অভিলাষ।
দ্বারকাধীশের প্রতি অটুট বিশ্বাস॥
হরি নাম দান করে পাপীরে ডাকিয়া।
তাহারে দেখিলে চিত্ত উঠে উথলিয়া॥
এক পক্ষ দ্বারকায় থাকি গোরা রায়।
দ্বারকাপতির কাছে নিত্য আসে যায়॥

জিতা পিরা দরশন করে প্রাণ ভরি।
ভক্তিরসে মাতাইলা দ্বারকা নগরী॥
দ্বারকানিবাসী যত ভক্তিপরায়ণ।
প্রভুরে দেখিতে সবে করে আগমন॥
সকলের সঙ্গে প্রভু ইষ্টগোষ্ঠী করে।
কীর্ত্তন করিয়া সবে নাচে প্রেমভরে॥
ধর্ম্মের ভাবেতে পুরী করে টলমল।
সকলের চিত্ত যেন হইল নির্ম্মল॥
মন্দ মন্দ বায়ু সদা বহিতে লাগিল।
পুষ্পগন্ধে চারিদিক যেন আমোদিল॥
সব লোক আনন্দিত প্রভু সঙ্গ পেয়ে।
কিবা নারী কিবা নর সবে আসে ধেয়ে॥
চারিদিকে মঙ্গলের চিহ্ন দেখা দিল।
হরিনামে দিক সব প্রসন্ন হইল॥
কিবা পাণ্ডা কিবা গৃহী সকলে মিলিয়া।
ধর্ম্ম উপদেশ শুনে শ্রবণ পাতিয়া॥
যেই জন নাহি বুঝে তাহারে বুঝায়।
নানা বুলি বলি প্রভু তাহারে মাতায়॥
কখন বা মোর প্রভু কাঁই মাই বলে।
কাঁই মাই বাত বলি বুঝায় সকলে॥
কেমন বুঝায় লোকে সর্ব্বশক্তিমান্।
উপদেশ শুনি সবে হইল অজ্ঞান॥
কিবা জ্ঞানী কিবা মূর্খ সকলে আসিয়া।
পুলকিত হইল সবে প্রভুকে দেখিয়া॥
একদিন সন্ধ্যাকালে প্রভু ধীরে ধীরে।
উপনীত হইল প্রভু কৃষ্ণের মন্দিরে॥
বহুতর লোক যায় প্রভুর পেছনে।
ভাল মন্দ নাহি বলে শচীর নন্দনে॥
মন্দিরের দ্বারে গিয়া অষ্টাঙ্গ করিল।
তাহা দেখি লোক সব গড়াগড়ি দিল॥
জোড় হস্ত করি প্রভু বহু স্তব করে।
অমনি নয়ন হৈতে অশ্রুজল ঝরে॥
প্রেমরসে ডগমগ প্রভুর হৃদয়।
যে দিকে তাকায় দেখে সব কৃষ্ণময়॥
চক্ষু মুদি কৃষ্ণ বলি ডাকিতে লাগিল।
প্রেমভরে কলেবর শিহরি উঠিল॥
সেই ভাব যে জন না দেখেছে নয়নে।
মুহি অতি মূর্খ তারে বুঝাব কেমনে॥
যেই খানে মরুক্ষেত্র কিছুমাত্র নাই।
সেখানে বহাল নদী চৈতন্য গোসাঁই॥
সমস্ত দেশের মধ্যে পাপী না রহিল।
ভক্তি দিয়া পাপীগণে প্রভু উদ্ধারিল॥
একদিন পাণ্ডাগণ আনন্দ করিয়া।
মহামহোৎসব করে ভোগ লাগাইয়া॥
অতিথি বৈষ্ণবগণে করি নিমন্ত্রণ।
ক্ষীর দধি পুরী আদি কররে বণ্টন॥
পন্থুদের মধ্যে গিয়া গোরা গুণমণি।
প্রসাদ বণ্টক প্রভু করেন আপনি॥
রজনীতে সবে মেলি কুটীরেতে যাই।
পরম আনন্দে মোরা রজনী কাটাই॥
এইরূপে পক্ষকাল ইষ্ট গোষ্ঠী করি।
পরদিন ছাড়ে প্রভু দ্বারকা নগরী॥
প্রভু বলে এইবার নীলাচলে যাব।
নীলাচলে সবে মেলি আনন্দে কাটাব॥"

দ্বারকা হইতে নীলাচলে আসিতে হইলে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্ব প্রান্তে উপস্থিত হইতে হয়। শ্রীচৈতন্তদেব পথিমধ্যে অনেকগুলি তীর্থ দর্শন করিবার পর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। "পহিলা আশ্বিনে" তিনি দ্বারকায় পঁহুছিয়া ছিলেন এবং সেখানে এক পক্ষ অবস্থান করিয়া "মাঘের তৃতীয় দিনে" পুরীতে ফিরিয়া আসেন। এই তিন মাস আঠার দিনের মধ্যে তাঁহারা যে সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন, কোথাও বৈষ্ণবের তীর্থ বা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শন করেন নাই। গোবিন্দদাসের করচা পাঠ করিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দক্ষিণ ভারতে বিষ্ণুর উপাসক দুই চারি স্থানে বৈষ্ণবধর্ম্মের ক্ষীণালোকে ভক্তিমার্গের পথিককে কতকটা সাহায্য করিলেও রামোপাসক রামাত বৈষ্ণবগণই জ্ঞানমার্গ উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শৈব জগতে ভগবান রামচন্দ্রের লীলাভিনয় হইয়াছিল বলিয়া দাক্ষিণাত্যে রামাত সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের অস্তিত্ব সম্ভবপর হইয়াছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল পশ্চিম ও উত্তর ভারত এবং সেই কারণে

শ্রীচৈতন্যদেব পশ্চিম ভারতে আসিয়া গুণার পর্ব্বত, প্রভাস ও দ্বারকায় কৃষ্ণপ্রেমের স্মৃতি-চিহ্ন অবলোকন করেন।

গোবিন্দদাসের করচা পাঠ করিতে করিতে মনে হয় যেন আমরা যুগে যুগে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু সভ্যতার অভিব্যক্তির ইতিহাস পাঠ করিতেছি। বাস্তবিক, গোবিন্দদাসের করচা কেবল একখানি সুবৃহৎ আখ্যান-গ্রন্থ নহে। ইহা নানাবিষয়িণী জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গুণার পর্ব্বত, প্রভাস ও দ্বারকার বর্ণনায় কবি পৌরাণিক তত্ত্বের সহিত ভাব-লীলার এমন সুন্দর সংমিশ্রণ করিয়াছেন যে, পাঠকের স্মৃতি ও হৃদয়ের সুপ্ত প্রেম-ভক্তি যুগপৎ জাগ্রত হইয়া উঠে। কবিত্ব আর কাহাকে বলে? বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্যের সমালোচকগণের মধ্যে অনেকেই বলেন যে, "চৈতন্যচরিত লেখকগণের অনেকেরই পদ্য কেবল চৌদ্দয় চেনা যায়।" গোবিন্দদাসের সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণভাবে খাটে না। তাঁহার রচনায় যে পুনরুক্তি দোষ নাই, এ কথা বলা যায় না। প্রাচীন বাঙ্গালী কবির রচনায় সর্ব্বত্র পুনরুক্তি দোষ লক্ষিত হয়। তাহা হইলেও, যে কবির রচনা পাঠ করিলে "পাষাণ হৃদয়ে ব্রহ্মানন্দ সুখ" জন্মে, হৃদয়ের অসাড়তা দূর হয়, "ভাবসিন্ধু মর্য্যাদা লঙ্ঘিয়া" উথলিয়া উঠে, সে কবির রচনা প্রাণহীন নহে। গোবিন্দদাস তাঁহার কাব্যের আখ্যান-বস্তুর কবিত্বময় ধর্ম্মজীবনের ঘটনাগুলি যে ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে অক্ষরে অক্ষরে প্রেম-ভক্তির জীবন্ত চিত্র ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ভাব-লীলা বর্ণন করিবার সুবিধা পাইলে কবিরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকেন। গোবিন্দদাসের কবি-জীবনে সে সুবিধা বা অসুবিধা ঘটে নাই। তাঁহার সে অবসরই বা কোথায় ছিল? শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গের সাথী হইয়া তিনি ভক্তির ও প্রেমের চিত্র জীবন্ত আদর্শ হইতে অঙ্কিত করিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা-ভূমিতে সেই জন্য আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে ভক্ত ও প্রেমিকের বেশে দেখিতে পাই। ভগবানের লীলা ভক্তের কার্য্যাবলীতে আরোপ করিতে যাইয়া অন্যান্য চরিতাখ্যান লেখকগণ যেমন কৃষ্ণ-চরিত্রের অনন্ত রহস্য পরিমাণ ও সীমায় বিষয়ীভূত করিয়াছেন, তেমনি আবার ভক্তের প্রেমিকতা অত্যুজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত চরিত্র বাগাড়ম্বর কীর্ত্তিতে পরিণত করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের করচায় আমরা আদর্শ মানবের পরিচয় পাই, মূর্ত্তিমান ভক্তি ও প্রেমের চিত্র দেখিতে পাই। তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া আমরা যেমন এক দিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমান হৃদয়ে আকৃষ্ট হই, তেমনি আবার অপর দিকে আমাদের হৃদয়ের প্রেম মানব সমাজে ছড়াইয়া পড়ে। গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রে যথার্থ প্রেম-ভক্তির বিকাশ দেখাইয়াছেন। তিনি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদর্শে শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহার কারণ, তাঁহার যে ত্রিগুণীর ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি গুণার পর্ব্বত, প্রভাস ও দ্বারকায় শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণাবতার সাজিয়া ভগবদ্‌লীলার অভিনয় করেন নাই। তিনি ভক্তরূপে প্রেমিকরূপে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন গোবিন্দদাস করচায় ভাষায় তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের লিখিত শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেতিহাসে মহাপুরুষের পূর্ব্বাপর কার্য্যে সেই কারণে কোনও অসঙ্গতি দোষ লক্ষিত হয় না। যে ভক্ত শিব শক্তি রামচন্দ্র বরাহ নৃসিংহ প্রভৃতি বিগ্রহের পূজা করিয়া দাক্ষিণাত্যের তীর্থে তীর্থে বৈষ্ণবধর্ম্মের উদারতা প্রকটিত করিয়াছিলেন, তিনি গুণার পর্ব্বত, প্রভাস ও দ্বারকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ব-ব্যাপী অনন্ত প্রেমের কথা স্মরণ করিয়া ভাবাবেশে মত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয় "ভক্তিরসে পূর্ণ" হইয়াছিল। ভগবানের অবতার লীলার কথা বেদ পুরাণ শাস্ত্রগ্রন্থ ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপুস্তকে যুগে যুগে অসংখ্য বার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রেমিক ও ভক্তের হৃদয়ের সৌন্দর্য্যভাব কয়জন বর্ণনা করিয়াছেন? একাধারে প্রেম-ভক্তির পূর্ণ বিকাশও বোধ হয় শ্রীচৈতন্যদেব ব্যতীত জগতে অপর কোনও মহাপুরুষে দেখা যায় না।

হাসি।

[শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ, বি-এল।]

(১)

নিভৃত ঘরে বিধুর সম
    ধর ধর কভু বহিয়া যাও,
আধ বিকশিত কুসুমের মত
    অধর প্রান্তে আলোক দাও।

(২)

ভরা গঙ্গার লহরী মতন
    কেনিলোচ্ছ্বাসে বহিয়া যাও,
রুদ্র বা কভু মানবের ঘোর
    চিত্ত বিকার দেখায়ে দাও।

(৩)

গগনের কোণে উষার মতন
    ব্রীড়া বধূটী দাঁড়ায়ে রও,
সন্ধ্যার ম্লান গোধূলির বেশে
    কখন বিদায় মাগিয়া লও।

(৪)

ঝটিকার আগে রশ্মির রেখা
    মরুসোপান্তে মিলায়ে যাও,
মরুর মাঝারে মরীচিকা সম,
    কভু বা পাছে ছলি' পলাও।

(৫)

আননে উপরে দিনের মতন
    মরম বিষ কভু দেখাও,
কখন বা তুমি যবনিকা সম
    চিত্ত-নাটক ঢাকিয়া দাও।

(৬)

কিরূপ মাধুরী, কিবা মূর্চ্ছনা,
    দেব মহিমায় শোভিছ তুমি,
কত না অশ্রু কত ভালবাসা
    কত আকাঙ্ক্ষা রয়েছ চুমি।

(৭)

কত না কাব্য কত না রাজ্য
    তোমাতে উদয় তোমাতে লয়,
দেশ কাল ভেদ তোমাতে যে নাই
    তুমি রহিয়াছ বিশ্বময়।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।

প্রাচীন মিসর।

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্যবিশারদ]

আজ কাল সংবাদপত্রে মিসর দেশের কথা সকলেই পড়িতেছেন। এই দেশ আফ্রিকার উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। ইহার মধ্যভাগ বিধৌত করিয়া নাইল নদী প্রবাহিতা হইয়াছে। এক দিন এখানকার অধিবাসীরা বিদ্যা ও ধর্ম্মোন্নতি দ্বারা জগতে যথেষ্ট প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল। তাহাদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মমতের সহিত হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারাদির এতই সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি প্রাচীন কালে এই দুই জাতির মধ্যে একটা বিশেষ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়।

অনেকে বলেন, প্রাচীন মিসরীয়গণ "সেমিটিক্" (Semitic) ও "ইথিওপিক্" (Ethiopic) জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন। গ্রীক্ ইতিহাস-লেখক "হিরোডোটাসে"র (Herodotus) গ্রন্থ হইতে আমরা পুরাতন মিসরবাসী-দিগের সভ্যতার কথা অবগত হই। "মানিথো" (Manetho) নামক জনৈক মিসরীয় ধর্ম্মযাজকও গ্রীক্ ভাষায় একখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

সেকালে মিসর দেশ ৩৬টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ঐ প্রদেশগুলি "নোমস্" (Nomes) নামে অভিহিত হইত। তথাকার জনসংখ্যাও মোটামুটি হিসাবে প্রায় ৭০,০০০০০ সত্তর লক্ষ হইবে। "থিবিস্" (Thebes) সহরই তখন ঐ রাজ্যের রাজধানী। এখনও ঐ সহরের ভগ্নাবশেষ পর্য্যটকদিগের হৃদয়ে দেশের অতীত ইতিহাস জাগাইয়া তুলে।

বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মিসরীয়গণ "থিবিস্" হইতে তাহাদের রাজধানী "মেম্ফিস্" (Memphis) নগরে স্থানান্তরিত করে এবং তাহার পর 'Ombi', 'Edfou', 'Esneh', 'Elephantine' এবং 'Philoe' প্রভৃতি জনপদগুলিও একে একে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে।

প্রাচীন মিসরীয়দিগের বর্ণমালা চিত্রময় ছিল। পশু, পক্ষী ও গ্রহনক্ষত্রাদির আকার ও নানবদেহের বিভিন্ন

ভিন্ন অবয়ব চিহ্নের দ্বারা তাহারা লিপি কার্য্য সম্পন্ন করিত।" আজ পর্য্যন্ত প্রায় নয় শত প্রকার ঐরূপ চিত্রকা অক্ষর বাহির হইয়াছে।

ইহারা হর্ম্ম্যশিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বস্ত্র বয়নেও তাহাদের নৈপুণ্য দেখা গিয়াছে। তাহারা কাগজ ও কাচ প্রস্তুত করিতে জানিত এবং জৈবজাতত্ব, ক্ষেত্রতত্ব, জ্যোতিষ ও সংগীত-বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। ইহাদের শ্রমশীলতার কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া তাহারা ভীষণ ভীষণ "পিরামিড্" ও অত্যদ্ভুত হর্ম্ম্যরাজি নির্ম্মাণ করিত; অশ্ব বা বলদের পরিবর্ত্তে নিজেরাই শকট টানিত; সহস্রাধিক "টন্" ওজনের সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ড শত-সহস্র ক্রোশ দূর হইতে আপনারাই বহন করিয়া আনিত। পাঠক, শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, একবার সুদূরস্থিত কোনও খনি হইতে প্রকাণ্ডাকার এক খণ্ড পাথর বহন করিয়া আনিতে দুই হাজার লোকের তিন বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এই সকল উৎকট শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাহারা "কার্য্যং বা সাধয়েৎ জীবনং বা পাতয়েৎ" মনে করিত। শক্তির অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করিয়া অনেক সময় অনেক লোক জীবন হারাইত। শুনা যায়, লোহিত সাগর হইতে নাইল নদীর "খাড়ি" (Arm of the Nile) পর্য্যন্ত একটি সুদীর্ঘ খাল খনন করিতে গিয়া এক লক্ষ কুড়ি হাজার লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিল।

ভারতের ন্যায় প্রাচীন মিসরেও জাতিভেদ বিদ্যমান ছিল। এ দেশের ন্যায় সে দেশেও গুণকর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। ধর্ম্মযাজকেরাই সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিত এবং যুধাম জাতি ধর্ম্মযাজকদিগের ঠিক নিম্নেই সম্মান পাইত।

আমাদের ব্রাহ্মণের ন্যায় মিসরের যাজকগণও একটি জাতি বিশেষ। কেবল দেব-মন্দিরে পূজা করাই তাহাদের একমাত্র কার্য্য ছিল না। জ্ঞান-চর্চ্চাই তখন তাহাদের নিত্যব্রত ছিল। অনেকে চিকিৎসক ও স্থপতির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিত। বিচারকার্য্যও যাজকদিগের এক-চেটিয়া ছিল। এমন কি, দেশের রাজা পর্য্যন্ত তাহাদের বিচারাধীন ছিলেন। ধর্ম্মযাজকেরা প্রকাশ করিত, ঈশ্বর প্রতি আইন অনুসারেই তাহারা সকল বিষয়ের বিচার করিয়া থাকে।

এই সমস্ত যাজকগণের কোন ক্রমেই স্বেচ্ছাচারী হইবার উপায় ছিল না; সর্ব্বদাই পবিত্রভাবে কালযাপন করিতে হইত। একাধিক বিবাহ, অতি ভোজন, এবং নিরামিষ্য ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ ছিল। তাহারা রাজার নিকট হইতে নিষ্কর ভূমি ও নানাবিধ উপঢৌকন পাইত। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক দেব মন্দিরে যে সকল ভূসম্পত্তি দেওয়া থাকিত, মন্দির সংশ্লিষ্ট যাজকগণ তদ্দ্বারাই পরম সুখে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। দেশের জনসাধারণের উপর তাঁহাদের প্রভুত্ব যথেষ্ট ছিল।

প্রাচীন মিসরের "Sacerdotal" জাতিই যুধাম জাতি বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহাদের সংখ্যা প্রায় চারি লক্ষ। ইহারা সর্ব্বপ্রকার শিল্প বাণিজ্য হইতে বিরত থাকিত। আমাদের ক্ষত্রিয় জাতির ন্যায় যুদ্ধই ইহাদের ধর্ম্ম ছিল। এই সকল লোক প্রত্যেকে রাজ-পুরস্কার হইতে ৮$\frac{1}{2}$ "একার" নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইত।

দেবোত্তর ও নিষ্কর ভূমি ব্যতীত দেশের আর সমুদয় ভূমিই রাজসম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। প্রজাগণ মোট উৎপন্ন শস্যের $\frac{1}{5}$ অংশ রাজাকে কর স্বরূপ প্রদান করিত এবং অবশিষ্টাংশ নিজেরাই গ্রহণ করিত।

প্রাচীন মিসরের অন্যান্য জাতির মধ্যে কৃষক সম্প্রদায়, শিল্পী সম্প্রদায় ও পশুপালক সম্প্রদায়ই সর্ব্বাধিক উল্লেখ যোগ্য। শিল্পী-সম্প্রদায় আবার নানাভাগে বিভক্ত ছিল; যথা—তাঁতি, স্বর্ণশিল্পী, কাষ্ঠর ইত্যাদি। পশুপালকেরা বিবিধ নীচ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। তাহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি শূকর পালন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত তাহারাই সমাজের সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া গণ্য হইত।

অতি প্রাচীন কালে সমস্ত মিসরবাসীরা অদ্বৈতবাদী ছিল বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু ক্রমে ঐ অদ্বৈতবাদ বিলুপ্ত হইয়া তাহাদের মনে পৌত্তলিকতাই স্থান পাইয়াছিল। তাহারা হিন্দুদিগের ন্যায় পরমেশ্বরের রূপ কল্পনা করিত। ঐ সকল কল্পিত রূপ "শিব-দুর্গা"র ন্যায় আবার নানা নামে

অভিহিত হইত। আমাদের পুরাণে বর্ণিত আছে, ভগবান মৎস্যাবতার হইয়া বৈবস্বত মনুকে একখানি সুবৃহৎ অর্ণবযান প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। বৈবস্বত মনু সর্ব্ব প্রকার জীবের এক এক দম্পতী ও সপ্ত সংখ্যক ঋষি সঙ্গে লইয়া পোতারূঢ় হইলে পৃথিবীতে এক ভয়ানক জলপ্লাবন উপস্থিত হয়। প্রাচীন মিশরবাসীদিগের নিকটও এই জলপ্লাবনের কথা কিছু কিছু শুনা যাইত। তাহাদের মতে "অসিরিস্" নামে এক মহাপুরুষ এই জগদ্ব্যাপী জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

সে কালের মিসরীগণ "প্রকৃতি"-"পুরুষ" বিশ্বাস করিত। তাহারা বলিত, ঈশ্বর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ দুই ঐশী শক্তির নাম "নেফ্" ও "পুথা"।

বিষ্ণুকে তাহারা "আমন্" দেবতা নামে অভিহিত করিত। এই "আমন্" দেবতাই সৃষ্টির পালনকর্ত্তা। জগতের সমস্ত জীব জন্ম হইতে মরণ কাল পর্য্যন্ত এই "আমন্" দেবতার পালন-ক্রিয়ার দ্বারা অবস্থিতি করে বলিয়া তাহারা মনে করিত।

ইহারা দেবাসুরের সংগ্রামের কথাও অবিশ্বাস করিত না। "তাইফন্" নামধেয় এক অসুর নাকি কোন সময়ে তাহাদের "অসিরিস্" দেবের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

প্রাচীন মিসরে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল না। উৎসবে, লোকযাত্রায় ও পরগৃহে মিসর রমণীরা ইচ্ছামত গমনাগমন করিত। দেশের জনসাধারণ গাভী, কুকুর, সারসপক্ষী, বাজপক্ষী, মৎস্য ও কুম্ভীরের পূজা করিত; কিন্তু সকল স্থানে সকল জীবের পূজা প্রচলিত ছিল না। উত্তর পশ্চিমবাসীরা আমাদের যেমন মৎস্যভোজী বলিয়া ঘৃণা করে, প্রাচীন মিসরবাসীদিগের মধ্যেও সেরূপ উদাহরণ দৃষ্ট হইত। এক দেশের লোক যে প্রাণীকে পরম পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিত, অপর দেশের লোক হয় ত সেই প্রাণীকেই অস্পৃশ্য বোধে স্পর্শ করিত না। এইরূপ মতদ্বৈধ লইয়া উভয় দেশবাসীর মধ্যে সময়ে সময়ে ঝগড়া বিবাদ, এমন কি যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইত। কোন কোন স্থানে সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ ও ললাট-দেশে শ্বেত ত্রিকোণ-চিহ্ন-বিশিষ্ট "এপিস্" নামক গো সকলের পূজা প্রচলিত ছিল। "এপিসে"র ভক্তগণ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকল কথাই নখদর্পণের ন্যায় দেখিতে পারেন বলিয়া সাধারণ লোক বিশ্বাস করিত।

মিসরীয়গণ জন্মান্তরের কথা মানিত। মরণের পর স্বর্গ নরক ভোগের কথা তাহারা অস্বীকার করিত না। পরলোকে একজন বিচারকর্ত্তার কাছে সুকৃতি ও দুষ্কৃতির বিচার হয়, এ ধারণা তাহাদের স্থির ছিল। ঐ বিচারকর্ত্তাই শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে জীবকে পুরস্কার অথবা দণ্ড দেন। তাহারা এই ধর্ম্মরাজকে "অসিরিস্" নামে অভিহিত করিত। "অসিরিস" দেবতা যে লোকে বাস করিতেন, তাহার নাম "অমিন্থি"।

মৃত্যুর পরই মানুষের জীবাত্মা নরযোনি প্রাপ্ত হয় না। ঐ সকল আত্মা পর্য্যায়ক্রমে ভূচর, জলচর ও খেচর প্রাণীর দেহধারণ করিয়া বেড়ায় এবং তিন সহস্র বৎসর পরে মানবজন্ম লাভ করে, ইহাই প্রাচীন মিসরীয়দিগের মত।

তাহারা মৃত ব্যক্তিকে সমাহিত করিবার পূর্ব্বে তৎকৃত সদসৎ কর্ম্মের বিচার করিত। জীবদ্দশায় ঐ লোক যে সকল পুণ্যানুষ্ঠান বা পাপার্জ্জন করিয়াছে তাহার সবিশেষ আলোচনা করা হইত। ধর্ম্মযাজকগণ এই বিচার না করিয়া কাহাকেও সমাহিত করিতে আজ্ঞা দিতেন না। গ্রামে কোন লোকের মৃত্যু হইলে অমনই চতুর্দ্দিক হইতে প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজকগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বিচারাসনে উপবেশন করিতেন। তাহার পর একে একে মৃত ব্যক্তির পাপ-পুণ্যের খতিয়ান করা হইত। যাহারা পুণ্যবান বলিয়া বিবেচিত হইত তাহাদের সসম্মানে সমাহিত করা হইত এবং যাহাতে ঐ সকল ব্যক্তির পূত-দেহ দীর্ঘকাল রক্ষিত হয় তাহার সুব্যবস্থা করা হইত। আর যে সকল ব্যক্তি পাপী বলিয়া গণনীয় হইত তাহাদের দেহ রক্ষা করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইত না। ধনী দরিদ্র সকলেই এই নিয়মের অধীন ছিল। এমন কি রাজার মৃত্যু হইলেও বিনা বিচারে সমাধি হইত না। এই ধর্ম্ম বিধান প্রচলিত থাকায় প্রাচীন মিসরীয়গণ জীবদ্দশায় চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ হইতে চেষ্টা করিত।

সে কালে মিসর দেশে শবদেহ রক্ষা করিতে না পারিলে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের ক্ষোভের আর পরিসীমা থাকিত না। ইহার আরও একটা কারণ ছিল। সাধারণ লোক বিশ্বাস করিত মৃতদেহ রক্ষা করিতে পারিলেই জীবাত্মা অবিনশ্বর থাকিবেন, অপর পক্ষে দেহটি নষ্ট হইলে আত্মার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

রোম সাম্রাজ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইলে মিসরের লোকেরাও ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

প্রবাসী মামা।

[শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল, বি, এল]

(১)

বৈশাখ মাস। মার্ত্তণ্ডদেব গগন মধ্যস্থ হইয়া অনলময় রশ্মিজালে সমগ্র কুলগ্রামটিকে দগ্ধ করিতেছিলেন। ছোট পাখীটি পর্য্যন্ত বাসা ছাড়িয়া বাহির হইতে পারিতেছিল না। কুকুরগুলা ছায়াশীতল স্থানে শয়ন করিয়াও হাঁফাইতেছিল। এমন সময় হীরু ঘোষ কর্ম্মক্লান্ত দেহে অবসন্ন পদে মাঠ হইতে গৃহে ফিরিতেছিল। দ্বার পার হইয়া আঙ্গিনায় পদার্পণমাত্র অস্ফুট আনন্দ-কোলাহলে আকৃষ্ট হইয়া সম্মুখে চাহিবামাত্র যখন তাহার জামাতা দীনবন্ধু হস্তস্থিত জ্বলন্ত তাম্রকুটের কলিকা একপার্শ্বে নিক্ষেপ করিয়া লাফাইয়া উঠানে নামিল ও শ্বশুরের পদধূলি গ্রহণ করিল তখন হীরুর মুখে একটা হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিলেও তাহার বুকটা ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। যেন দিব্যচক্ষে সে তাহার হৃদয়াকাশের এক প্রান্তে এক খণ্ড ঘনকৃষ্ণমেঘ দেখিতে পাইয়া শিহরিয়া উঠিল।

মনোভাব মনোমধ্যে দমন করিয়া সে জামাতার সহিত দাওয়ার উপর বসিল। কুশল সংবাদাদি দানের পর জামাতা জানাইল যে, আগামী সপ্তাহে সে সস্ত্রীক বাটী ফিরিবে।

হীরু দুই একবার ওজর আপত্তি করিবার পর শেষে সম্মতি দিল। তাহার মনে জাগিল, প্রায় বর্ষকাল পূর্ব্বে এক রাত্রে শানায়ের মধুর রাগিণী-মুখরিত নরনারীবেষ্টিত সভামাঝে সে যে তাহার আদরিণী কন্যা মুখরাণীকে এই যুবকের হাতেই সমর্পণ করিয়াছে। তার পর কি আর কন্যার উপর পিতার কোন দাবী আছে? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে স্নান করিতে গেল।

আহারাদির পর যখন পত্নী মোক্ষদা আসিয়া বলিল যে, জামাতা প্রথম শ্বশুরবাটী আসিয়াছে; সুতরাং তাহাকে অন্ততঃ পনেরো দিন এখানে রাখিয়া যত্নাদি না করিলে তাহার সাধ মিটিবে না; তখন হীরু আর থাকিতে পারিল না—অর্দ্ধরুদ্ধস্বরে বলিল, "বৌ, আমারও কি অসাধ যে, মেয়ে জামাই নিয়ে দশ দিন আমোদ-আহ্লাদ করি, কিন্তু মনে আছে কি সেই চিঠির কথা—" তাহার স্বর ক্রমে নিম্ন হইতে নিম্নতর সুরে নাবিতেছিল,—"কেবলার চিঠি—"!

নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষদার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি ম্লান হইয়া গেল! হীরু বলিতে লাগিল, "সাত বৎসর পরে সে ফিরছে। ভগবান না করুন যদি জামাই থাকতে থাকতে সে এসে পড়ে তখন কি হবে ভেবেছ কি? নতুন কুটুম্বের কাছে কি আর মুখ দেখাবার যো থাকবে?"

(২)

মোক্ষদার বিবাহের পর এক বৎসরের মধ্যে তাহার পিতামাতা দুই বৎসরের সন্তান কেবলচাঁদকে মোক্ষদার হাতে সঁপিয়া দিয়া মানুষের অজানা দেশাভিমুখে যাত্রা করে। ফলে মোক্ষদাও ছোট ভাইটিকে কোলে লইয়া শ্বশুরবাটী প্রবেশ করে ও নিজ সন্তানের মত যত্নে তাহাকে মানুষ করিতে থাকে। কিন্তু কেবলের অদৃষ্টে মানুষ হওয়া ঘটিল না। দিদির অত্যধিক আদর—শিশুর অত্যধিক মিষ্টান্ন ভোজনের ন্যায়—তাহার পক্ষে বিষময় ফল-উৎপাদন করিল। সুপথ ছাড়িয়া কুপথ সে অতি অল্প বয়সেই বাছিয়া লইল ও নিজ অধ্যবসায়ের ফলে এ পথে সে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। ফলে, যৌবনে পদার্পণের পূর্ব্বেই পার্শ্বস্থ গ্রামের লোকেরা পর্য্যন্ত তাহার অত্যাচারে বিব্রত হইয়া উঠিল। শেষে একদিন হীরু ঘোষ গ্রামের মোড়ল সাধু দাঁ ও আরও দশ জনের পরামর্শে পত্নীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ অগ্রাহ্য পূর্ব্বক অষ্টাদশবর্ষীয় শ্যালকের হাত ধরিয়া কলিকাতা যাত্রা করিল ও সেখানকার একটা বোর্ডিং স্কুলে তাহাকে রাখিয়া দিল। তাহাকে সকলে

বলিয়াছিল যে, সেখানে ছাত্রদের খুব কড়া শাসনে রাখিয়া সুশিক্ষা প্রদান করা হয়।

বলা বাহুল্য, এখানে কেবলের অবনতির মাত্রা ষোল-কলা পূর্ণ হইয়া গেল। ছয় মাসের মধ্যে হীরু তাহার নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক পত্র পাইল যে, বোর্ডিং স্কুলের ঠিকানা বদলাইয়াছে। এবার হইতে হীরু যেন অন্য ঠিকানায় কেবলের নামেই টাকা পাঠায়। কারণ বোর্ডিং-এর ম্যানেজারের নামে টাকা অনেক সময় গোলমাল হয়, অন্য ছাত্ররা টাকা তাহাদের বলিয়া লইয়া যায়, এমন কি, ম্যানেজারও সব টাকা জমা দেয় না।

পত্র পাঠ করিয়া হীরু কিছু বুঝিল না বটে তবে পরের মাস হইতে ভিন্ন ঠিকানায় কেবলের নামেই টাকা পাঠাইতে লাগিল।

আরও আট মাস কাটিল। তার পর একদিন বোর্ডিং-এর ম্যানেজারের নিকট হইতে হীরু এক পত্র পাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহাতে লিখিত ছিল যে, কেবলচাঁদ বোর্ডিং ছাড়িয়া বহু দিন পূর্ব্বে পলায়ন করে তাহার কোন সন্ধানই স্কুলের কেহ পায় নাই। সম্প্রতি একদিন পুলিশ তাহাদের স্কুলে আসে ও কেবলের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে। তখন স্কুলের অধ্যক্ষ জানিতে পারেন যে, কেবল এক বারাঙ্গনাকে হত্যা করিবার অভিযোগে ধৃত হইয়া হাজতে আছে।

পত্রের মর্ম্ম জানিতে পারিবামাত্র মোক্ষদা আহারাদি ত্যাগ করিল। অগত্যা হীরু সংবাদটি আত্মীয় বান্ধবের নিকট গোপন রাখিতে পরামর্শ দিয়া ছাতা ও লাঠি হাতে কলিকাতা যাত্রা করিল। বোর্ডিংএ গিয়া সে কেবলের পূর্ব্ব পত্র দেখাইল ও তাহাদের লোকের সাহায্যে কেবল যে ঠিকানা দিয়াছিল সেই ঠিকানায় উপস্থিত হইল। সেখানে সব রহস্য প্রকাশ পাইল। সকলের মুখে হীরু শুনিল যে, প্রায় বৎসরাবধি কেবল ঐ ঠিকানায় এক বারাঙ্গনার ঘরে আড্ডা করে। শেষে এক রাত্রে নেশার ঝোঁকে কেবল তাহার সহিত বিবাদ সুরু করে, ঐ বিবাদ [illegible] মধ্যে এমন অবস্থায় দাঁড়ায় যে, উত্তেজনার মুখে কেবল তাহার গলা টিপিয়া ধরে, আর অভাগিনী তাহাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

তার পর দায়রায় কেবলের বিচার আরম্ভ হইল। তৃতীয় দিবসে যখন জুরীরা একবাক্যে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিল, তখন জজ রায় দিলেন, 'আসামীকে সাত বৎসর সশ্রম কারাবাস ভোগ করিতে হইবে।'

দুই বিন্দু অশ্রু অর্দ্ধমলিন উত্তরীয়াগ্রে মুছিয়া হীরু অস্থির পদক্ষেপে ধর্ম্মাধিকরণ ত্যাগ করিল।

দেশে গিয়া গ্রামস্থ সকলকে জানাইল, কেবলের লেখাপড়ার সুবিধা হইল না। সে নিজের চেষ্টায় এক সওদাগরী আফিসে চাকুরীর যোগাড় করিয়া ব্রহ্মদেশে—রেঙ্গুন নগরে চলিয়া গিয়াছে।

হীরু শুনিয়াছিল ব্রহ্মদেশ নাকি সমুদ্রের পারে; আর সেখানকার সংবাদ বড় শীঘ্র এদেশের কেহ পায় না।

হীরু পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা রাধারাণীকে পর্য্যন্ত ভুলাইলেও পত্নী মোক্ষদার নিকট সত্য গোপন করিতে পারে নাই। সব শুনিয়া সে চীৎকারের উদ্যোগ করিলে হীরু বলিল, "দেখ, হতভাগার বরাতে যা ছিল তা হোল, তার জন্ম রাত্রু ভুগ্‌বে কেন? যদি কেউ জান্তে পারে যে, আমাদের আত্মীয় খুনে বদমাইস, তা হলে কেউ কি আর এ মেয়েকে তার ঘরে নিয়ে যাবে? অতএব সাবধান।"

সুতরাং মোক্ষদা মনের আগুন মনে চাপিতেই বাধ্য হইল।

তার পর সাত বৎসর পরে সেদিন যখন কেবল পত্রযোগে জানাইল, সে শীঘ্র দেশে ফিরিতেছে, তখন হইতেই স্বামী স্ত্রী অকূল পাথারে ভাসিতেছিল। কিছু স্থির করিতে না পারিয়া শেষে তাহারা সত্যনারায়ণকে সওয়া পাঁচ আনার সিন্নী মানত করিল।

(৩)

'যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়'—প্রবচনটি হীরুর বরাতে সত্য না হইয়া আর ছাড়িল না।

সন্ধ্যার আঁধার তখনও গ্রামটিকে পূর্ণভাবে গ্রাস করে নাই। তখনও ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলিলেও মন্দিরে মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিতে সুরু করে নাই—তখনও রাধারাণী ঘাট হইতে ফিরে নাই।

জামাতা দীনবন্ধুও বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল।

রন্ধনশালার দাওয়ায় বসিয়া রন্ধনরত পত্নীর সহিত জামাতা-সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। এমন সময় গোয়ালঘরের পাশ হইতে মনুষ্য-কণ্ঠে কে ডাকিল "দিদি!" স্বর শ্রবণমাত্র খোকদা চমকিয়া উঠিল—তাহার হাতের খন্তা ঝনাৎ শব্দে পড়িয়া গেল।

স্তম্ভিত হীরু কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই কেবলচাঁদ দাওয়ায় বসিয়া পড়িল ও ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "দিদি, আজ তিন দিন কিছু খাই নাই।"

ঐ রুক্ষ দেহ, শুষ্ক মুখ, নগ্ন পদ, আর আর্ত্তস্বর! খোকদা কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষণেক পরে কেবলচাঁদ এক বাটি গরম দুধ আর পোয়াটাক বাতাসা খাইয়া কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিলে, হীরু পত্নীর মুখপানে চাহিয়া বলিল, "এবার এদিকের কি হবে ভেবেছ?"

সে কি ভাবিবে। তাহার নারী-হৃদয় দীর্ঘ কালের পর স্নেহের পাত্রটিকে জড়াইয়া ধরিয়াছে—সংসারের অন্য কোন কথা ভাবিবার এখন তাহার অবসর কোথা? সে বলিল, "এ অবস্থায় কি মানুষে একে তাড়াতে পারে?"

"কিন্তু মেয়ে জামাই এলে কি বল্‌বে তাদের?"

অসহিষ্ণুভাবে পত্নী বলিল, "যা এত দিন বলে এসেছ। লোকে বিদেশে কি চিরদিন থাকে? তাই আমার ভাই দেশে ফিরে এসেছে!"

"এই বেশে? বিদেশে তার অবস্থা ভাল—সে চাক্‌রী ছেড়ে নিজে ব্যবসা করে, এই কথা সবাইকে আমি বলে এসেছি। এখন এই পথের কাঙালকে আমি কি বলে তাদের সামনে দাঁড় করাবো?"

তাহার নারী-হৃদয়ে আর সহ্য হইল না। সে বলিল, "তবে বলো ভাই আমার খুন করে জেল খেটে এসেছে! এখন একে বাঁচতে দাও!"

অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে হীরুঘোষের বিবর্ণ মুখপানে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কেবল বলিল, "আমি আর বাঁচবো না। উঃ বুকটা আমার খালি হয়ে গিয়েছে!" সে বুকে হাত দিল।

খোকদা। যা কেবল, বিছানায় শো' গে যা। স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল, "তোমার ধোপদুরস্ত কাপড় আর একটা গেঞ্জী ওকে দাও, তা হলেই ভদ্রলোকের মত দেখাবে।"

মুখ বিকৃত করিয়া হীরু বলিল, "ছাই পোষাকে ঐ চোয়াড়ে চেহারার কখনও ভদ্রলোক সাজা যায়?"

ক্ষণমধ্যে তাহার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিল, বলিল, "শোন, যাও বাক্স থেকে গোটাচারেক টাকা আমায় এনে দাও। একখানা কাপড় আর একটা জামা আমি এনে দিচ্ছি। ওকে পোয়াটাক তেল দাও বেশ করে মেখে চান্ করে ও এখন গোয়ালঘরে বসে থাক; আমি এলে তার পর বেরোবে। দেখি যদি জামাইকে ভোলাতে পারি।"

কেবল বলিল, "টাকা কিছু বেশী করে নিয়ে যাও। একটা পাঞ্জাবী, এক গাছা ছড়ি আর এক জোড়া জুতো এনো।"

হীরু তাহাকে এমন ধমকাইয়া উঠিল যে, বেচারী চমকাইয়া তিন হাত সরিয়া গেল। পরে দিদির পানে চাহিয়া বলিল, "দিদি, জুতোটুতো না হলে কি করে ভদ্রলোক হওয়া যাবে?"

খোকদা স্বামীকে ডাকিয়া শয়ন-কক্ষে লইয়া গেল। ক্ষণপরে হীরুকে কক্ষ হইতে বাহির হইতে দেখিয়া কেবল বলিল, "আমার পা তোমার পায়ের চেয়ে চার আঙুল বড়, মনে থাকে যেন!"

হীরু তাহার কথার উত্তর না দিয়া খোকদাকে বলিল, "ওকে গোয়ালঘরে বসিয়ে রাখ; রাস্তায় যেন সেখানে না যায়। তুমিই নজর দিও।"

সে দ্রুতপদে ষ্টেশনের দিকে ছুটিল।

(৪)

পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে কুলগ্রামের ছোট বড় সকলে শুনিল, হীরু ঘোষের বরাত ফিরিয়াছে—কেবলচাঁদ ব্রহ্মদেশ হইতে অগাধ টাকা রোজগার করিয়া ফিরিয়াছে। বলা বাহুল্য, কয়েক দণ্ডের মধ্যে হীরু ঘোষের পাড়া-প্রতিবেশীর দল তাহার ক্ষুদ্র চণ্ডীমণ্ডপ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তাহারা দেখিল, চক্‌চকে বার্ণিশ করা জুতা পায়ে, লাল গেঞ্জির উপর সবুজ পাঞ্জাবী গায়ে, ধোপদস্ত ফুলপাড় ধুতি পরিধানে কেবলচাঁদ হীরুঘোষের কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া

... সকলকে বুঝবীরানা চালে বুঝাইতেছে যে, "মুলুকদেশে আর বাঙ্গালায় তফাৎ অনেক। সেখানে রাস্তায় ধুলোতেই টাকা—ছ' দশটা নয়—একেবারে মুঠো মুঠো! আর সেখানে বাঙ্গালীর কি খাতির, যেন তারাই দেশের মালিক" ......ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ বক্তৃতার পর জামাতার পানে চাহিয়া বলিল, "বাবাজী চল, তোমায় একবার সেখানে নিয়ে যাই। দেখ্‌বে দুবছরের মধ্যে তুমি বড়লোক হয়ে যাবে।"

আনন্দের আতিশয্যে দীনবন্ধুর চক্ষুর্দ্বয় ছল ছল করিতেছিল। গ্রামের মোড়ল সাধুচন্দ্র দাঁ জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর হে কেবলবাবু (বাবু সম্বোধনে কেবলচাঁদ একটু চমকিত হইল—কেব্‌লা ছাড়া অন্য কোন নামে আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে ডাকে নাই) বিদেশে তোমার শরীর তো মোটে সারে নাই।"

ঈষৎ রুক্ষস্বরে কেবল উত্তর দিল, "হুঁ, সেখানে প্রাণমশাই বেঁচে আছি এই ঢের! পয়সা থাকলে কি হবে—দেশে খুব মড়ক—বড় সাবধানে সেখানে থাক্‌তে হয়। একটু ঠাণ্ডা লাগলেই বাতশ্লেষ্মা—একটু খাওয়ার গোলমাল হ'লেই ভেদবমি।"

শেষ কয়টা কথায় উপস্থিত অনেকেরই বদনে বিষাদের ছায়া দেখা দিল। পয়সা পাইলে কি হয়—প্রাণটা তো আগে!

সাধুচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "বাবাজীর কিসের ব্যবসা?"

কথাটায় কেবলচাঁদ প্রথমে কান দিল না, কিন্তু মোড়ল ছাড়িবার পাত্র নয়। বার বার জিজ্ঞাসার পর সে অন্দরমহলে যাইবার জন্য পা' বাড়াইয়া বলিল, "আজ্ঞে, কাজের কথা বল্‌ছেন? নানা রকম কাজ আমি কর্ত্তাম—চাল, তুলা, তিসি আরও কত জিনিষের।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দীনবন্ধুর হাত ধরিয়া বলিল, "এস হে জলযোগের সময় হোল।" পরে উপস্থিত সকলের পানে চাহিয়া বলিল, "পরে আমি আপনাদের সে দেশের অনেক গল্প বোল্‌বো।"

অন্দর-মহলে পদার্পণ মাত্র রাধারাণী জামাবাবুকে প্রণাম করিল। সকালে মামা উঠিবার আগেই সে ঘাটে গিয়াছিল।

ঈষৎ হাসিয়া কেবল তাহাকে বলিল, "এই যে রাধু বেশ বড় হয়ে উঠেছিস। যা—আমার জল খাবার নিয়ে আয়।"

কি আনিবে জিজ্ঞাসা করিলে, কেবল বলিল, "খান-কয়েক লুচি আর একটু হালুয়া হলেই চল্‌বে—আর দুধ একটু মিষ্টি দিয়ে ঘন করে ফুটিয়ে দিস্। এখানে কি আর রাবড়ী, সন্দেশ পাওয়া যায়—তা খাব!"

তখন হীরু গোয়ালঘরে খড় কাটিতেছিল। সে শুধু একটা অস্ফুট হুঙ্কার ছাড়িল।

আহারে বসিয়াও নিস্তার নাই। পদীর মাসী, রামীর পিসি, বামার মা, খেঁদুর মা' সকলে আসিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নে বেচারীকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। খাইতে খাইতে কেবল যথাসম্ভব তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল।

এক জন জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, এখন থাক্‌বে তো?"

কেবল। থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। একবার শুধু এদের দেখ্‌তে এসেছি। বিশেষ, রাধুর বিয়ের সময় আস্‌তে পারি নি। ক্ষণেক থামিয়া বলিল, "ছ'তিন দিনের মধ্যে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু দিদি ভারি দুঃখ করচে। বলে, জামাই এসেছে, এক সঙ্গে কিছু দিন আমোদ আহ্লাদ কর্—এর মধ্যে যাবি কি?"

"আহা, সে তো ঠিক কথাই বাবা। ঘরের ছেলে ঘরে এসেছ দশ দিন জিরোও। তা বাবা, এবার বিয়ে থা' কর। হাঁ, আমাদের নলিনের এক মাসতুতো বোন আছে। বেশ ডাগর-ডোগর—আর দেখ্‌তেও নেহাইৎ মন্দ নয়, বাবা। যদি ভরসা দাও, তাহলে জ্যৈষ্ঠ মাসেই চার হাত এক করে দি'। আর সংসারী তো হতে হবে।"

গোয়ালঘরে হীরু আঙুল কাটিয়া ফেলিল।

(৫)

হীরুর সহিত মোক্ষদার বিবাদ চলিতেছিল। বিবাদ অবশ্য কেবলকে লইয়া। সে বায়না ধরিয়াছে, তাহার একটা ট্যাকঘড়ি আর এক ছড়া চেন চাই—নতুবা তাহার অন্নগ্রহ থাকিতেছে না। মোক্ষদা ভয়ে ভয়ে যত বলিতেছিল যে, ভাই যাহা চায় তাহাকে তাহাই দেওয়া হোক—আর হীরু তত রাগিয়া চীৎকার করিতেছিল, "আমি পার

কোথা? এই সাত দিনের মধ্যে ওর জন্ত প্রায় দেড়কুড়ি টাকা খরচ করেছি। যা চায় তা' দিই-ই বা কোথা থেকে? আর কাল যদি আকাশের চাঁদ চায়!"

মোক্ষদা।—আহা, আস্তে কথা কও। এখনি হয় তো জামাই এসে পড়বে। গোয়ালঘরে রাহু আছে—যদি শুন্‌তে পায়!

বলা বাহুল্য, হীরুর গর্জ্জনের পরিমাণ বাড়িলেও উচ্চতা ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল।

শেষে অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর হীরু পত্নীর নিকট হইতে চাবি লইয়া বাক্স খুলিল।

মধ্যাহ্নকালে কেবলচাঁদ তিনটা লোকের মাথা বোঝাই করিয়া হাট হইতে ফিরিল ও দাওয়ায় উপবিষ্ট দীনবন্ধুর পানে চাহিয়া বলিল, "হাঁ, তোমায় বল্‌তে ভুলে গেছি, সকালে ইষ্টিসানে গেছলাম। রেঙ্গুনে ম্যানেজারের কাছে তার করে দিয়েছি।"

তার পর হাট হইতে আনীত আনাজ ও মৎস্যাদি গুছাইতে ব্যস্ত রাহুর পানে চাহিয়া বলিল, "ওঃ সেখানে মুক্তা কি সস্তা—আর কি বড়! আমি তোর জন্য এক ছড়া মুক্তার মালা পাঠাতে ম্যানেজারকে লিখেছি। চড়ুয়ের ডিমের মত সে মুক্তা, আমাদের দেশে রাজারাজড়ার ঘরেও নেই!"

আনন্দে শুধু রাহুর নয়—দীনবন্ধুর মুখ পর্য্যন্ত লাল হইয়া গেল।

এই কয় দিনে দীনবন্ধুর সহিত কেবলচাঁদের আলাপ খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। দীনবন্ধু বুঝিয়াছিল যে, সে মামা-শ্বশুরের সুনজরে পড়িয়াছে—শীঘ্র তাহার বরাতে কিছু লাভের আশাও রহিয়াছে। উভয়ে মধ্যে মধ্যে গোপন-পরামর্শও চলিত।

সে দিন উভয়ে একত্র জলযোগ করিতে করিতে নানাবিধ বৈষয়িক পরামর্শ করিতেছিল। রাহু মামার পাতে গরম লুচি দিতে দিতে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, লোকে বল্‌ছে তোমার অনেক টাকা। আচ্ছা, কত টাকা তোমার আছে? লাখ টাকা হবে?"

কেবলচাঁদ একটু বিচলিত হইল,—নিজেকে সম্বরণ করিয়া বাম হস্তে মাথা চুলকাইল—আকাশ পানে চাহিল—শেষে বলিল, "বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই—তার বেশী হবে!" দীনবন্ধু ভাবিল, "বাপ্‌! সাত বৎসরে লাখ টাকা! কি রোজগার!"

এমন সময় হীরু সেখানে আসিয়া পড়িল—দীনবন্ধুর সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে কেবলচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সম্বন্ধে কি করলেন? আচ্ছা, সেখানে বোধ হয় টাকায় টাকা লাভ হবে?"

কেবল হীরুকে দেখিয়াছিল—তবে তাহার পিছাইবার পথ ছিল না। গলাটা সাফ্‌ করিয়া বলিল, "সে পরামর্শ করব পরে"—তার পর হীরুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মনিঅর্ডার এসেছে কি? একবার ডাকঘরে লোক পাঠাও না।"

হীরুর কিন্তু জামাতার শেষ কয়টা কথা কানে বড় জোর বাজিয়াছিল। কেবলের সঙ্গে জামাতা কিসের পরামর্শ করে? শ্যালকের কথায় কান না দিয়া, সে জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেব্‌লা তোমার সম্বন্ধে কি করবে? ওকে কি তুমি টাকাকড়ি দিয়েছ না কি?"

জামাতা মাথা নত করিয়া রহিলেও হীরু ছাড়িল না,—আবার জিজ্ঞাসা করিল। তখন কেবল বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল, "ও আমাদের গোপন কথা হচ্চে, তোমার তা'তে মাথা ঘামাবার দরকার নাই।"

বেগতিক দেখিয়া হীরু সরিয়া পড়িল।

(৬)

রাত্রে সে পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল যে, দীনবন্ধু কেবলকে কিছু টাকাকড়ি দিয়াছে কি না। মোক্ষদা জানাইল যে, সে ও সম্বন্ধে কিছু জানে না। তবে দু'জনে যে একটা কিছু পরামর্শ চলিয়াছে, এ সন্দেহ তাহার মনে জাগিয়াছে। বলা বাহুল্য, রাত্রে দুর্ভাবনায় হীরুর ভাল ঘুম হইল না। যদি কেব্‌লা জামাতাকে ঠকায়—মিথ্যা প্রয়োচনায় তাহার টাকাকড়ি আত্মসাৎ করে,—তবেই সর্ব্বনাশ।

প্রাতঃকালেই হীরু কন্যাকে ডাকিল। অনেকক্ষণ অনুনয় বিনয় ও ক্রোধ প্রদর্শনের পর রাধারাণী বলিল, "মামাবাবু আশা দিয়েছেন যে, ওঁর ৫০০৲ টাকা তিন মাসের ভেতর ডবল করে দেবেন।"

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে জিজ্ঞাসা করিল, "টাকা কিছু দিয়েছে কি ?"

"টাকা বোধ হয় এখনও দেওয়া হয় নাই।"

একটু আরাম বোধ করিয়া হীরু বহির্বাটিতে আসিল ও দেখিল যে, কেবলা দীনবন্ধুর সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করিয়া পরামর্শ করিতেছে। তখন সে আর থাকিতে পারিল না, জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি সত্য সত্য কেবলকে ৫০০৲ দিবে স্থির করেছ নাকি ?"

ঈষৎ লজ্জিতভাবে সে উত্তর দিল, "আজ্ঞে, টাকাটা যোগাড় কর্ত্তে বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে। পরের কাছে আছে—তাগাদা দিয়েছি—দু'তিন দিনের মধ্যে এসে-পড়বে।"

ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠস্বরে হীরু কেবলকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ বুদ্ধি তোকে কে দিলে ?"

"কি বুদ্ধি ?"

"ছেলে মানুষের টাকা—"

ব্যবসায় খাটবে তা' ছেলেমানুষের টাকা কি ? আর আমার চলতি কারবার, তাতে লোকসানের কোন ভয় আছে নাকি ? তার পর যদি জামায়ের বরাতে দাঁও লেগে যায়, এক ক্ষেপেই ঐ সামান্য টাকা তিন গুণ হয়ে যেতে পারে।"

এই বলিয়া সে অনুকম্পাভরা-নয়নে দীনবন্ধুর পানে চাহিল—হীরু ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শূন্যদৃষ্টে তাহাদের মুখ-পানে চাহিয়া রহিল।

মধ্যাহ্নে আহারের পর সে মোক্ষদার দ্বারা কেবলকে কক্ষমধ্যে ডাকাইল ও স্ত্রীপুরুষে তাহাকে বোঝাইতে সুরু করিল। শেষে মোক্ষদা ছল ছল নেত্রে বলিল, "ভাই, মেয়ের আমার সর্ব্বনাশ করো না। জামায়ের টাকা এরকম করে নিলে, মেয়েকে সারা জীবন খোঁটা খেতে হবে। দোহাই তোমার, কচি মেয়েটার মুখপানে চেয়ে ঠাণ্ডা হও—বোন। আমার সবে ধন নীলমণি—ওর চখে এক ফোঁটা জল দেখলে আমি গলায় দড়ি দোব।"

কেবলচাঁদ নির্ব্বিকার। চক্ষু মুদিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে সে শুধু বলিল, "টাকাটা এখন ভারি কাজ দেবে।"

হীরু আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না—রুদ্ধস্বরে বলিল, "এ রকম করে আপনার লোককে ঠকাতে তোর একটু লজ্জা হবে না ?"

কেবলা।—লজ্জা আবার কি ? আর যদি তোমার এতে এত কষ্ট বোধ হয়, তুমিই না হয় টাকাটা শোধ করো। ৫০০৲ টাকা তুমি যে রকম করে হোক দিতে পারবে। আমি জানি তোমার পয়সা আছে।

হীরু। পাজী, ছুঁচো, আমি এখনই জামাইকে তোর সব কথা বলে দিচ্ছি—তোর ভড়ং ভেঙ্গে দিচ্ছি !

কেবল হাসিল, বলিল, "তাতে আমার চেয়ে তোমার ক্ষতিই বেশী হবে। আমিই তাহ'লে জামাইকে বলে দেব যে, এ টাকায় তোমারও বখরা আছে। যে জামাই তোমার, ওকে যা বোঝাব তাই বুঝবে।"

হতাশ-নয়নে মোক্ষদার পানে চাহিয়া হীরু বলিল, "তখনই তোমায় বলেছিলাম, একি সোজা আপদ জুটিয়েছ ! ওঃ আমি দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছি !"

মোক্ষদা ফোঁপাইয়া কাঁদিতে সুরু করিল।

(৭)

আহারাদির পর সমস্ত দিন হৈ হৈ করিয়া, অপরাহ্নে কেবলচাঁদ জলযোগে বসিয়াছিল। দীনবন্ধু প্রতিবাসীর বাটীতে পাশা খেলায় মত্ত ছিল, সুতরাং কেবল একাকীই খাইতেছিল—আর মোক্ষদা সম্মুখে বসিয়া আর একবার ভ্রাতাকে সুবুদ্ধি দিবার চেষ্টায় ছিল।

এমন সময় হীরু ঘোষ গুণ গুণ স্বরে গান গাহিতে গাহিতে সেখানে দেখা দিল। চারি দিক চাহিয়া থপ্ করিয়া দাওয়ায় বসিল ও একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাক্, বাঁচা গেল ! বৌ মা, শীগ্‌গীর একটু গরম দুধ আর হালুয়া আমায় এনে দে—ভারি খিদে !" বলিয়াই গান ধরিল—

"মা আমায় ঘোরাবি কত—"

এমন অসময়ে ক্ষুধার কথায় শুধু মোক্ষদা নয় কেবলও বিস্মিত হইল। তার পর লুচি হালুয়া। গুড় মুড়ি বড় জোর নারিকেল-মণ্ডা ছাড়া অন্য কোন জিনিষ যে কখনও খায় না ! মোক্ষদা ভাবিল, স্বামী পরিহাস করিতেছে ; আর তা ছাড়া গত দুই দিন হইতে যে, সে অনাহারে আছে বলিলেই হয় !

প্রাণের বহরে বিস্মিত কেবল আর থাকিতে পারিল না—জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো আজ যে ভারি ফুর্ত্তি! যখের ধন পেয়েছ না কি?"

তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া হীরু বলিতে লাগিল, "আমার আর এতে দোষ কি! ছোঁড়া নিজের পাপে নিজে মল। মোড়ল মশাই ঠিক বল্লে যে, তার প্রথম দিনই সন্দেহ হয়েছিল। যাকু—আমি আর কি করব বল!"

কেবলের সন্দেহ হইল। আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে মরবে?"

মোক্ষদাও জিজ্ঞাসা করিল, "কার কি হোল গা?"

"আর কার—এই কেবলার। কে মোড়লের কানে তুলে দিয়েছে যে, ওর বিদেশে ব্যবসার কথা—টাকারোজগারের গল্প সব মিছে। ও খুনে—জেল ফেরৎ! আর তার পর নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে ও দীনবন্ধুর কাছ থেকে টাকা ঠকাবার চেষ্টায় আছে।"

লুচির গ্রাস কেবলের হাত হইতে পড়িয়া গেল! মোক্ষদা সোৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, সত্যিই কি তিনি সব জান্‌তে পেরেছেন?"

"শুধু জানা? তিনি হচ্চেন পঞ্চায়েতের মাথা। তাঁর এলাকায় দাগী বদমাইস থাক্‌বে? এতক্ষণ তাঁর লোক দারোগার কাছে পৌঁছে গেছে। যাক্ আমার দোষ কি!"

কেবল লাফাইয়া উঠিল, চাপা স্বরে বলিল, "এ নিশ্চয় তোমার কাজ! তুমিই সব বলে দিয়েছ! যাবার আগে আজ তোমায় খুন করে তবে যাব।"

সে উঠানে বাঁশবটির দিকে আগাইল—হীরুর স্বর বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। মোক্ষদা ত্রস্তে কেবলের পিছনে ছুটিল।

সহসা দ্বারদেশ হইতে সাধু খাঁ হাঁকিল, "হীরু আছ নাকি? কেব্‌লা কৈ হে?"

কে যেন উদ্যতফনা সর্পের মাথায় লগুড়াঘাত করিল। কেবলচাঁদ একবার দ্বারপানে, একবার হীরুর মুখের দিকে চাহিল!

হীরু ডাকিল, "এই যে, আসুন খুড়া মশাই, সব ঠিক—চলে আসুন।"

কেবল দুই লম্ফে খিড়কীর দ্বার পার হইয়া গেল। মোক্ষদাও তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকিল।

"কি হে, জোর তাগিদ কেন? কি ঠিক?"

"আজ্ঞে, আসুন, বসুন। কেলে গাইটার বাছুর হয়েছে—তার দুধ একটু সেবা করুন। কৈ গো, এক বাটি গরম দুধ খুড়ামশাইকে দাও না।"

দুধ আনিতে রান্নাঘরের দ্বারে পা দিবামাত্র মোক্ষদা ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো বল না, সত্যিই দারোগা কেবলকে ধরতে এসেছে?"

পত্নীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া হীরু দুধের বাটি আনিয়া সাধুর সম্মুখে রাখিল।

সাধু। জামাইকে, কেবলকে দেখ্‌ছি না কৈন? তারা গেল কোথা?

নির্ব্বিকার চিত্তে হীরু বলিল, "জামাই বোধ হয় পাশের বাড়িতে খেলা করচে। আর রেঙ্গুন থেকে এক জরুরী চিঠি এসে পড়ায় কেবল এইমাত্র যাত্রা করলে। জানি না সে আবার কত দিনে ফিরবে!"

সে মোক্ষদার পানে চাহিল। চারি চক্ষের মিলন হইতেই মোক্ষদার সজল নেত্র দুইটী আপনিই মাটিপানে নামিয়া পড়িল।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

রক্ত দূষিত হয় কেন?

আহারবিহারের নিয়ম পালনে যাঁহারা অমনোযোগী, যে-কোন দিন যে কোন মুহূর্ত্তে সামান্য কারণে তাঁহারা গুরুতর বিপদে পড়িতে পারেন। অনেক সময়েই আমরা দেখিতে পাই, দেহের কোন জায়গায় একটু-একটু আঁচড় লাগিয়া, দেখিতে-বলবান্ অনেক লোক একেবারে অসহায়ের মত মরণের মুখে গিয়া পড়িয়াছেন। রক্ত বিষাক্ত হওয়াই ইহার কারণ। কিন্তু রক্ত কিছুতেই বিষাক্ত হইতে পারে না—মানুষ যদি স্বাস্থ্যের নিয়ম নিয়মিত ভাবে বুঝিয়া এবং মানিয়া চলে।

রক্ত বিষাক্ত হয় কেন? দেহের চামড়া যখনই খোলা ক্ষত বা ময়লা আলপিনের খোঁচায় বা, অন্য কোন কিছুর দ্বারা ছড়িয়া যায়, তখনই সে জায়গাটা খড়খড়ে, লাল, স্ফীত ও আরক্ত হইয়া উঠে,—অর্থাৎ সেখানে প্রদাহের প্রথম লক্ষণগুলি একাশ পায়। ইহার অর্থ কি জানেন? দেহের ভিতরকার স্বাভাবিক রক্ষাকর্ত্তারা এই সব লক্ষণের

মাহাত্ম্যে শরীরের মধ্যে খবর পাঠায় যে, শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিতে উদ্যত। সর্ববিধ ব্যাধি ও রোগ বীজাণুর আক্রমণে বাধা দিবার জন্য আমাদের দেহের মধ্যে যে সদা-প্রস্তুত সৈন্যদল আছে, সংবাদ পাইবামাত্র তাহারা তৎক্ষণাৎ ঘটনাক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়।

আমরা কোন কাল্পনিক গল্প বলিতেছি না। রোগবাহী বীজাণুগণের সহিত, মানব-দেহের সৈন্যসামন্তেরা সর্ব্বদাই সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়া আছে। দেহমধ্যস্থ এই সেনাদলের নাম, শ্বেত-রক্ত রেণু।

মানুষের স্বাস্থ্য যখন নির্দ্দোষ থাকে, তখন যে মুহূর্ত্তে কোনরূপ আঘাতের ছিদ্র পথে রোগবীজাণুরা দেহ-দুর্গে ঢুকিতে উদ্যত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই অমনি দেহের ভিতর হইতে লক্ষ লক্ষ শ্বেত-রক্ত-রেণু তাহাদের প্রবেশ-পথে আসিয়া যথাসাধ্য বাধা প্রদান করে। ফলে, স্বাস্থ্যবান লোকের অধিকাংশ রক্তরেণুদের কবলে পড়িয়া, রোগজীবাণুরা দেখিতে দেখিতে মরিয়া যায়।

এখন রোগজীবাণুদের আক্রমণ পদ্ধতির কথা বলিতেছি। ধরুন, একটী ময়লা আলপিনের মুখে কয়েক হাজার দর্শনাতীত জীবাণু আছে। খোঁচা লাগিয়া মানুষের গায়ের চামড়া যেই একটু ছিঁড়িয়া গেল, অমনি তাহারা দলে দলে ক্ষতস্থানের ভিতর গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে তাহাদের দল বৃদ্ধি হইতে লাগিল :—ছিল তিন হাজার, হইল বারো হাজার। তাহাদের দল ভারি হইবার উপায়ও খুব সোজা। তিন হাজার জীবাণুর প্রত্যেকে আপনাদের দেহকে দুই ভাগ করিয়া ফেলে এবং ছয় হাজারে পরিণত হয়। তার পর সেই ছয় হাজার জীবাণু আবার ঐ উপায়ে বারো হাজারে গিয়া দাঁড়ায়। এমনি করিয়া তাহাদের দল ক্রমেই বাড়িতে থাকে।

সুতরাং বুঝিতে পারিতেছেন, মানুষের দেহের মধ্যে এই ভয়ানক জীবাণুগুলি ঢুকিয়া যদি কোন বাধা না পায়, তবে অবস্থাটা অচিরেই কতদূর সাংঘাতিক হইয়া উঠে। দেহের মধ্যে জীবাণুদের অনধিকার প্রবেশ বাধা দিবার জন্য, রক্তবহা নাড়ীর মধ্য দিয়া শ্বেত-রক্ত-রেণুরা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসে বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি ; নহিলে কেহ নোংরা নখে গা আঁচড়াইয়া দিলেই আমরা খুব শীঘ্র অনিবার্য্য মৃত্যুমুখে গিয়া পড়িতাম।

দূষিত ক্ষতের উপরে অণুবীক্ষণ ধরিলে দেখা যাইবে, রোগজীবাণু এবং শ্বেত-রক্তরেণুর মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে। রক্তরেণুরা প্রত্যেক দশ, বিশ, পঞ্চাশ—এমন কি একশোটি পর্য্যন্ত রোগজীবাণুকে খেয়িয়া হজম করিয়া ফেলিতেছে।

লড়ায়ে যদি রক্তরেণুরাই বেশী বলবান হয়, তবে তারা সমস্ত শত্রুকে নিঃশেষে নাশ করিয়া, রণক্ষেত্র ছাড়িয়া আবার স্বস্থানে ফিরিয়া যায়, এবং স্বাভাবিক অবস্থা পাইয়া ক্ষতস্থান আবার সারিয়া আসে।

কিন্তু দেহের স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ থাকিলে মানুষের কি দুরবস্থা হয় জানেন? সে ক্ষেত্রে উক্ত রক্তরেণুরা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তাহার ফলে ক্ষতের মুখে যখন জীবাণু-সমাগম হয়, শ্বেত-রক্তরেণুরা তখন অশেষ চেষ্টা করিয়াও (এমন কি, সর্পদের মত এক রকম বিষাক্ত বাষ্প ছাড়িয়াও), শত্রুপক্ষেরই কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। বরং শেষটা রোগ-জীবাণুদের আক্রমণে তাহারাই দলে দলে মরিয়া যাইতে থাকে ; এবং সর্ব্বশেষে মানুষের সু-রক্ষিত দেহ-দুর্গ শত্রুপক্ষের হস্তে গিয়া পড়ে। কড়ে আঙুলের ডগায় সামান্য একটু আলপিনের খোঁচার ফলে, তখন অত বড় দেহের সমস্ত রক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠে।

—"স্বাস্থ্য-সমাচার" কার্ত্তিক, ১৩২৬।

প্রতিশোধ।

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল, বি-এ]

ডাক্তারী, কবিরাজী প্রভৃতি রকমারি চিকিৎসার পর যখন মহেশপুরের বিখ্যাত জমীদার বিজয়বাবুর রোগটা ঠিক যক্ষ্মা বলিয়াই স্থির হইয়া গেল, তখন তিনি তাঁর সংসারের খানিকটা অংশ তুলিয়া লইয়া পলাইয়া আসিলেন—মহেশপুর হইতে সুদূর দার্জ্জিলিঙ্গে। এ ঘটনায় মহেশপুরের দরিদ্র গৃহস্থ-প্রজারা কতটা দুঃখিত হইয়াছিল বলা শক্ত ; কেন না, একদিন গিয়াছে, যে দিন এই বিজয়বাবুর লোলুপদৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনেক গৃহস্থকে তাঁর কুললক্ষ্মীদের হাত ধরিয়া দেশান্তরী হইতে হইয়াছিল। কিন্তু সে তাঁর উদ্ধত যৌবনের পঙ্কিল ইতিহাস। আজ সেই সুপুরুষ বিজয়মাধবের শরীর শীর্ণ, সে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ কালীমায় ঢাকিয়া গিয়াছে,—মাথার কুঞ্চিত কেশ অকালেই পাকিয়া উঠিয়াছে। কোন্ এক অব্যর্থ অভিশাপে এই প্রৌঢ় বয়সেই যেন তাঁহাকে বার্দ্ধক্যের চরম সীমায় আনিয়া ফেলিয়াছে। তাই সে দিন যখন তিনি গ্রামের আবাস ছাড়িয়া সেই সুদূর পার্ব্বত্য দেশের যাত্রী হইলেন, তখন যেন এটা তিনি নিঃসংশয়েই বুঝিয়াছিলেন,—এই যাত্রাই তাঁহার ইহজন্মের শেষ যাত্রা। কি-এক অসহ্য বেদনায় তাঁহার অন্তর উদ্বেলিত হইয়াছিল। গ্রামের বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়দের চোখে-মুখে সহানুভূতির ছদ্ম আবরণটুকু দেখিতে পাইয়াও তিনি কিন্তু সেদিন নিজেরই অপরাধের বোঝায় তলে মাথা নত করিয়াছিলেন।.....

দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়া তিনি প্রথম দিনকতক অনেকটা সুস্থ রহিলেন। অনিবার্য্য মৃত্যুর পথের পাশে দাঁড়াইয়াও আবার তাঁর প্রাণে বাঁচিবার আশা বলবতী হইল। আবার

সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার রাশি মাথা ঠেলিয়া উঠিতে চাহিল।

নিয়ম মত ঔষধ চলিতেছিল। কিন্তু মাসখানেকের পর আবার উপসর্গ দেখা দিল। প্রত্যহ বৈকালে জ্বর আসিতে সুরু হইল। বিজয়বাবু এবার একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। এই দূরদেশে তাঁর একমাত্র বন্ধু ছিলেন—একজন উকীল, যোগেশবাবু। যোগেশবাবু প্রায়ই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন, কিন্তু বিজয়বাবু পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িতে তিনি তাঁর জন্য বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তথাপি তিনি আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"দেখ বিজয়, অমন করে' ভেঙ্গে পড়্‌লে ত' চল্‌বে না এখন। এখনও তোমার এমন কিছুই হয় নি, যাতে একেবারে হতাশ হ'য়ে পড়্‌তে হবে।"

সে দিনও ঠিক এই কথাই হইতেছিল। দিনান্তের ক্লান্ত প্রকৃতি অদূর উপত্যকায় গা এলাইয়া দিয়া কি-এক রঙ্গীন নেশায় বিভোর হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল। বিজয়মাধব জানালার পাশে শুইয়া শুইয়া সেই দিকেই চাহিয়াছিলেন,—দুই চোখেও যেন তাঁর স্বপ্নের ধাঁধা লাগিয়াছিল, তাঁহার মুখের চেহারা যেন ক্রমশই অস্পষ্ট এবং অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। যোগেশবাবু তাঁহার গায়ে একটা নাড়া দিয়া পিঠ্ চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন,—"অত ভেবোনা হে, ভেবোনা! রীতিমত ভাল লোকের ওষুধ খাও, সেরে যাবে।"

বিজয়মাধব তাঁর জাগ্রৎ স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া মুখ তুলিলেন,—হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা যোগেশবাবু, আপনি কি মনে করেন, টাকায় সবই হয়?"

যোগেশবাবু বিস্মিত হইয়া হাসিয়া বলিলেন,—"কেন বল দেখি! হঠাৎ ও কথা!"

—"না, ভাই বল্‌চি, বলুন না!"

—"পাগল! টাকায় কি হয়?"

—"কিছু হয় না"—"বিশ্বাস করি না।"

—"হবে না কেন! সংসারের ছোট বড় অনেক কাজই টাকায় হয়। তবে, প্রকৃত দেখ্‌তে গেলে—"

বিজয়মাধব হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,—"তাই বলুন, প্রকৃত দেখ্‌তে গেলে—কিন্তু সে প্রকৃত দেখ্‌তে পারে ক'জন? হাজারে একজন,—তাও পারে কি?"

—"তা কেমন করে' বলি বল! বোধ হয় তাও না।"

বিজয়মাধব আবার বালিশে ঠেস দিয়া উপত্যকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। যোগেশবাবু অন্য কথা পাড়িয়া বলিলেন,—"কাল তা হ'লে সাহেবকে আর একবার Call দিও।"

—"না যোগেশবাবু, আর ওসব ঝঞ্ঝাট কাজ নেই।"

—"কাজ নেই কি? পাগলামী ক'রোনা। তুমি হ'লে কি বল ত? ওষুধ ঠিক খাওয়া হচ্চে ত?"

—"তা হচ্চে। কিন্তু এবার ভাব্‌ছি, বন্ধ করে' দেব।"

—"সর্ব্বনাশ! তুমি দেখ্‌চি আত্মহত্যা করবে। নাঃ, কাল হ'তে আমি এসে তোমার ওষুধ-পত্র খাইয়ে যাব। আচ্ছা পাগল ত' তুমি!"

যোগেশবাবু স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। তিনি সাদাসিদে মানুষ। কাজেই, আজকার এই কথাগুলার নীচে বিজয়মাধবের যে কোন বিশেষ এক ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, তাহা তিনি সন্দেহ পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। শুধু, এই একান্ত ভীত এবং হতোদ্যম রুগ্ন বন্ধুটার কথা ভাবিয়া তিনি আজ বড়ই দুঃখিত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

চাকর আসিয়া জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের কোণে চুল্লী জ্বালিয়া দিল। বিজয়বাবু বার-কতক খুক্ খুক্ করিয়া কাশিয়া গায়ের কম্বলখানা সর্ব্বাঙ্গে মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। চোখ বুজিয়া তিনি সেই একান্ত নির্জ্জনে থাকিয়াও নিজের চিন্তায় বিভোর হইয়া গেলেন। নিজের মনেই তিনি বলিতে লাগিলেন,—"মিথ্যা কথা, ও মিথ্যা কথা! টাকা শুধু যে জীবন দিতে পারে না, তা নয়,—অতীতকে ডুবিয়ে দেবার ক্ষমতাটুকুও তার নাই। সে দিতে পারে শুধু চোখে একটু রঙ্গীন নেশা মাখিয়ে যা'র ভেতর দিয়ে আমরা আমাদের অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, সমস্তই রঙ্গীন দেখ্‌তে থাকি! আর তার কোনও ক্ষমতা নেই, কিছু না! নহিলে, মহেশপুরের দত্তবংশের সমস্ত সম্পত্তি—সব ঐশ্বর্য্য—সব প্রতাপ শুধু একটা সামান্য কাহিনীর কালো দাগটুকু ধুয়ে দেয় না কেন?—" নিজের মধ্যেই একটা গভীর উত্তেজনা অনুভব করায় বিজয়মাধবের কাশির বেগটা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল।

এমনি করিয়া মাসখানেক কাটিল। ঔষধে আর বড়

একটা উপকার দেখা গেল না। তবে, রোগ ঠিক একই ভাবে রহিয়া গেল, এই পর্য্যন্ত।......সেদিন যোগেশবাবু বেড়াইয়া আসিয়া বন্ধুর কাছে বসিয়া বলিলেন,—"ওহে, এক কাজ করবে?" বিজয়মাধব চোখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিতে তিনি বলিলেন,—"দেখ, এখান হ'তে ক্রোশদুয়েক দূরে কোন্ পাহাড়ের গুহায় একজন মহাপুরুষ থাকেন। তিনি নাকি এই যক্ষ্মা আর হাঁপানীর বিষয়ে একেবারে ধন্বন্তরী। যাবে একবার তাঁর কাছে?"

বিজয়বাবু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"ব্যাস্, তা হ'লে এইবার 'দৈব' কিছু করাতে চান্, কি বলেন? সবই ত' এক্সপেরিমেন্ট করে' দেখা গেল!"

—"আঃ—না, তুমি কেবল ও-ই ভাব্‌বে! দৈব চিকিৎসার আশ্রয় নিলেই কি রোগীর শেষ অবস্থা ধরে' নিতে হবে নাকি?—ভাল মুস্কিল তোমাকে নিয়ে! না, সত্যি, তাঁর কাছে ওষুধ নিয়ে নাকি অনেকেই একেবারে নীরোগ হ'য়ে গেছে। কি, বিশ্বাস হচ্চে না?—"

—"না, তা হবে না কেন? তবে, যারা সেরেছে, তাদের পরমায়ু ছিল—!"

—"আর, তোমারই যে নেই সে কথা কে বল্লে? দেখ, যেতে চাও ত' আমি সব বন্দোবস্ত করি।"

বিজয়বাবু গম্ভীর মুখে পাশ ফিরিয়া বলিলেন,—"তা আমি আর কি বল্‌ব'! যা ভাল বোঝেন করুন।"

যোগেশবাবু একটা গভীর তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—"বেশ, বেশ, তা'হলে আমি সমস্ত পাকা খবর নিয়ে বল্‌ব' তোমায়। কিন্তু, কথাটা যে খাঁটী সত্যি, এবং মহাপুরুষ যে ভণ্ড নন, সেটা আমি একজন খুব অন্তরঙ্গের মুখেই শুনেছি। অমন যে তাঁর হাঁপানির টান,—তাঁর ওষুধ ধারণ ক'রে অবধি লেশমাত্র আর টের পাবার যো নেই। আমি বল্‌চি,—তাঁর দয়ায় তুমি ভাল হ'য়ে উঠ্‌বেই।"

তাঁর এই শেষের কথাটাই সেদিন অনুক্ষণ বিজয়বাবুর কানে বাজিতে লাগিল। মহাপুরুষের দয়ায় তিনি নীরোগ হইবেন, এই যে গভীর আশা,—নিজের মনের সুদৃঢ় বাধা, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মাঝখানেও এটুকু তিনি কোনক্রমেই অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। এবং কি-জানি-কেন নিজেরই আবিষ্কৃত এই আশার আলোকে তিনি আজ যেন নিজেকে অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেন।

* * * *

তুষার ঢাকা ধবলগিরির উচ্চ শিখরে প্রভাতের তরুণ সূর্য্য তখনও নিজের মুখ দেখিয়া হাসিতেছিল, সেই হাসির টুক্‌রা কুড়াইয়া হিমালয়ের বিশাল গাত্রে অজস্র মণিমাণিক্য ঝলসিতেছিল। সেই সময় যোগেশবাবু তাঁর রুগ্ন বন্ধু ও দুই জন ভৃত্য সঙ্গে লইয়া মহাপুরুষ-আশ্রিত পর্ব্বতের পাদমূলে অবতীর্ণ হইলেন। গাড়ী হইতে নামিয়া বিজয়বাবু যখন চারিদিকের মৌন প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া দেখিলেন তখনই যেন তাঁর মনে হইল, আজ,—প্রকৃতির এই মহিমময়ী মূর্ত্তির সম্মুখে মহাপুরুষের চরণাশ্রিত তাঁর সব রোগ—সব জ্বালা কে যেন এককালে মুছিয়া দিয়া গেল। সেই বিগত-যৌবন উচ্ছৃঙ্খল বিজয়মাধবের মনে আজ যেন হঠাৎ কোথা হইতে নীরব ভক্তির স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

পাহাড়ের উপর খানিকটা উঠিয়া গিয়া সন্ন্যাসীর আশ্রম। আরোহণের বেশ সুবিধা আছে। বিজয়বাবু প্রভৃতি ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেলেন। আরও জনকতক নরনারী মহাপুরুষের দর্শনে আসিয়াছিলেন। একখানি ব্যাঘ্র-চর্ম্মের আসনে নির্ব্বাক্ সন্ন্যাসী বসিয়া। তাঁহার শরীর শীর্ণ, দেহের বর্ণ ভস্মাচ্ছাদিত—সুগৌর, তাহার উপর একখানি মোটা কম্বল ঢাকা। দীর্ঘ জটা, দীর্ঘ শ্মশ্রু, দুই চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত। দেখিয়াই যেন বিজয়বাবুর মনে কেমন একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। সন্ন্যাসীর মুখে এতটুকু হাসির চিহ্ন নাই, পাষাণের মত অটল অচল নির্ব্বিকার হইয়া তিনি বসিয়া আছেন। আগন্তুক নরনারীদের কেহ গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিতেছে, আর, মহাপুরুষ শুধু একবার হাত উঠাইয়া ইঙ্গিতে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। বিজয়বাবু বুঝিলেন, ইঁহাদের সকলেই এ মহাপুরুষের নিকট কোন-না-কোন বিষয়ে উপকৃত। তা ছাড়া, সন্ন্যাসীর ভাব-গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার যোগেশবাবুর কথা সম্পূর্ণই বিশ্বাস হইল। এমন সর্ব্বসিদ্ধ মহাপুরুষ কেন না ধন্বন্তরী হইবেন।... তাঁহারা সকলে কুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন, সন্ন্যাসী মুখ না তুলিয়াই পূর্ব্ববৎ আশীর্ব্বাদ করিয়া নির্ব্বাক্ রহিলেন।

অনেকক্ষণ কাটিল। অন্য সকলে একে একে বিদায় লইয়া উঠিয়া গেল। সেই সময় যোগেশবাবু অবসর বুঝিয়া আবার একবার প্রণাম করিয়া যুক্তকরে বলিলেন,—"গুরুদেব!"

এবার মহাপুরুষ মুখ তুলিয়া চাহিলেন। যোগেশবাবু বলিলেন,—"আমার এই বন্ধু কঠিনরোগে অনেক দিন হ'তে—"

সন্ন্যাসী গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"কে?" যোগেশবাবু বন্ধুর দিকে দেখাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসী একবার কৃতাঞ্জলি বিজয়মাধবের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ বিজয়মাধবের মনে হইল, সন্ন্যাসী একবার কেমন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন, একটা যেন গাঢ় কালো ছায়া রাহুর মত আসিয়া তাঁর দীপ্ত মুখখানা ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তেমনই স্থির—নিশ্চল। ধীরে ধীরে তিনি চক্ষু মুদিলেন, এবং সেই ভাবে খানিকক্ষণ থাকিয়া আবার সহাস্যে চোখ খুলিয়া বিজয়মাধবকে বলিলেন,—"হুঁ,এস।" —বলিয়া তিনি নিজে উঠিলেন। বিজয়বাবু তাঁর বন্ধুর দিকে চাহিতে সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে আসিতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং বিজয়বাবু একাই সন্ন্যাসীর পিছনে চলিলেন।

খানিকটা উঠিয়া আসিয়া বিজয়মাধব দেখিলেন,—সেই পাহাড়ের উপর বেশ খানিকটা সমতল ভূমি; আর তাহারই সামনে একটী সুন্দর গুহা। সন্ন্যাসী সেই গুহায় প্রবেশ করিয়া বিজয়মাধবকেও ভিতরে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। দেখিয়াই বিজয়মাধবের মনে হইল, এইখানেই মহাপুরুষের বিশ্রাম গুহা। সন্ন্যাসী একটী বেদীর উপর বসিলেন। বেদীর সম্মুখে একটা ধুনী জ্বলিতেছিল।

অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব। সে নীরবতা ছিন্ন করিয়া বিজয়মাধব বলিলেন,—'প্রভু!'

হঠাৎ সন্ন্যাসী মুখ তুলিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—"প্রভু! 'প্রভু' কেন বিজয়!"

নিজের নাম শুনিয়া বিজয়বাবু চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁর বিশ্বাসের মাত্রাই বাড়িয়া গেল। মহাপুরুষের অজানিত কি থাকিতে পারে?—তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—"ও কথা বল্‌বেন না প্রভু! সবই তো জানেন আপনি—!"

সন্ন্যাসী আবার তেমনি হাসিয়া বলিলেন,—"জানি বৈকি, সব জানি!"

বিজয়বাবু যেন কৃতার্থ হইয়া মাথা নামাইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ সন্ন্যাসীর দুই চোখের দৃষ্টির সম্মুখে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। এ কি কঠোর দৃষ্টি!...বিজয়বাবু যেন কেমন একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী আবার একটুখানি হাসিয়া হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, একটু বোস' তুমি! আমি এখনই ফির্‌চি! দেখ ত, কেমন ছবি!"

পাশের ঝুলি হইতে কি একটা তাঁহার কোলের সামনে ফেলিয়া দিয়া তিনি গুহার পিছন দিক্ দিয়া কোথায় সরিয়া গেলেন। বিজয়মাধব সেটী তুলিয়া লইয়া সেই অগ্নির আলোকে যাহা দেখিলেন, তাহাতে মুহূর্ত্তে নিস্পন্দ হইয়া গেলেন।...এ সন্ন্যাসী কি মায়াবী? নহিলে, সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর ঝুলিতে যুবতীর চিত্র কেন? আর, এ যুবতী—এর চোখের চাহনি—অধরের হাসি—গ্রীবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত যে তাঁর কাছে বহু দিনের পরিচিত! সে কি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে? নরক হইতে সে কি তাঁহার নিকট কৈফিয়তের দাবী করিতে এই সন্ন্যাসীর শরণাগত হইয়াছে?...গুহার পাষাণগাত্র ধরিয়া বিজয়মাধব সেই ছবির পানে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন।

এ দিকে সন্ন্যাসী গুহার বাহিরে আসিয়াই একান্ত শক্তিহীনের মত উর্দ্ধমুখে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার দুই চোখ ছাপাইয়া কোথা হইতে অশ্রুর উৎস গড়াইল। কাতর-কণ্ঠে করযোড়ে বলিলেন,—"হে গুরু! হে স্বামী! আজ আমায় শক্তি দাও। দীর্ঘ বিশ বৎসরের সাধনা বিফল করিও না।" ..সেই কঠোর সন্ন্যাসী যে কতক্ষণ এমনি করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই জ্ঞান ছিল না; সহসা চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া আবার তিনি গুহামধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, বিজয়মাধবের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে,—সেই শীতের দিনেও তাঁর কপাল ও গণ্ড বহিয়া ঘাম ঝরিতেছে। সন্ন্যাসী ডাকিলেন,—"বিজয়!"

স্বপ্নোত্থিতের মত বিজয়মাধব তাঁহার পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ঠাকুর! এ কি আমার বিচার! এ—এ ছবি—!"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"বিচার? কিছু না। এ যুবতীকে কখনও দেখেছ কি?—এর স্বামীকে—"

—"সে ত' অনেক দিন মরিয়াছে—"

সন্ন্যাসী অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। "না মরে নাই! মরিলেই ভাল হইত! কিন্তু বিজয়, তুমি কি মনে কর, তাঁর দেওয়া এই প্রাণটা এতই ভঙ্গুর?—সে মরে নাই। না মরিয়া কি হয়েছে দেখিবে? ...এক মহাপুরুষ নামধারী সন্ন্যাসীর কঙ্কাল।" সন্ন্যাসীর ঠোঁট কাঁপিতেছিল, বিক্ষিপ্ত জটাগুলিকে মুখের উপর হইতে পিছনে সরাইয়া দিয়া তিনি বোধ করি নিজেকে সংযত করিবার জন্ম চুপ্ করিয়া চোখ বুজিলেন।...আর সেই শীর্ণ পাণ্ডুর অথচ জ্যোতির্ম্ময় মুখের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বিজয় মাধবের চোখের সুমুখ দিয়া যেন এই দীর্ঘ বিশ বৎসর হঠাৎ পিছাইয়া পড়িল। এবং তাহারই পিছনে তিনি দেখিতে পাইলেন,—তাঁহার অন্তরঙ্গ দরিদ্র বাল্যসখা চন্দ্রনাথ, আর তার পরমা রূপসী স্ত্রী পার্ব্বতী।........

বিজয়মাধব সন্ন্যাসীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।—"প্রভু! প্রভু! একি! আমি চিনেছি—চিনেছি!.. চন্দ্রনাথ! বন্ধু! আমার—আমার পাপের শাস্তি—"

গুহা কাঁপাইয়া সন্ন্যাসী হাসিয়া উঠিলেন;—"হাঃ হাঃ হাঃ—ঠিক বলেছ'—পাপের শাস্তি! কিন্তু বলেছি তো বিজয়, এ বিচার নয়! বিচারের এখনও তোমার অনেক দেরী! আজ বিশ বৎসর পরে তোমার মুখে আমার নাম শুনে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে' উঠ্‌লো। আজ বিশ বৎসর পরে দুই বাল্যবন্ধুতে এই যে সাক্ষাৎ—এটুকু না হ'লেই ছিল ভাল। কিন্তু কি করব, এ বিধির নির্ব্বন্ধ!...একদিন নিশ্চিন্ত মনে যে দরিদ্র বন্ধুর তুমি সর্ব্বনাশ করতেও কুণ্ঠিত হও নাই,—তার সামান্য কুঁড়েখানি অন্ধকার করে'—তার মান, ঐশ্বর্য্য, লজ্জা সব ডুবিয়ে দিয়ে তার সতী-স্ত্রীকে কলঙ্কিত ক'রেছিলে,—আজ সেই বন্ধুরই তুমি শরণাগত! এ বিশ্বাস তোমারও হয় না, আমারও হয় না!—কিন্তু, হাঃ হাঃ হাঃ—আমার চীৎকার করে' হাসতে ইচ্ছা হচ্ছে।—কি মজা এ! কি মজা!"

বিজয়মাধবের অন্তরাত্মা শঙ্কায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই বেদীর উপর বসিয়া দুলিতে দুলিতে বলিলেন,—"বিশ বৎসরের কথা, তবু এখনও ভুল্‌তে পারি নি! সংসার ছেড়ে—লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে সন্ন্যাস নিয়েছি, তবু সে সংসারের অত্যাচারের কথা ভুল্‌তে পারি নি! তুমি পুরুষ, আর সে ছিল নারী, তার প্রলোভনের চোখে তুমি সুন্দর—তুমি আনন্দের মূর্ত্তি ধরে' ফুটে উঠেছিলে;—কিন্তু, আমি জানি, মরবার আগে সে তার দারুণ ভুল বুঝ্‌তে পেরেছিল,—তার সেই কাতর ডাক সেদিন আমার অন্তর পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছিল! এ কি ব্যর্থ হয়!..."

আত্মবিস্মৃত সন্ন্যাসীর চোখ দিয়া বিন্দুর পর বিন্দু করিয়া অশ্রু গলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু সে দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি তন্ময় হইয়া বলিতেছিলেন,—"তুমি আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছিলে,—শুধু এই ছবিখানি আমার সম্বল ছিল। এই বিশ বৎসর এ আমার ঝুলির ভিতরে সঙ্গে সঙ্গে আছে। সে কলঙ্কিনী হ'য়েছিল, ভুলের বশে সে পাপের পসরা মাথায় তুলেছিল; কিন্তু ও ছবির গায়ে কলুষের গন্ধ নেই। ও প্রভাতের নিকলঙ্ক কমল, তার সৌরভ যে এখনও আমি ভুল্‌তে পারি নি! এই সন্ন্যাসের মুখোস্ পরেও আমি তা'রই চিন্তা করেছি; এই বিশ বৎসর ধরে'—স্বামী আমি—তার ভুলের জন্ম—তার পাপের জন্ম ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি!"

বিজয়মাধব নির্ব্বাক হইয়া সন্ন্যাসীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁর মনে হইল, সাম্‌নের ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মত সহস্র তীব্র অনুভূতি তাঁর বুকের ভিতর নিরন্তর দংশন করিতেছে। তিনি অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিলেন.—"কিন্তু আমি? আমার কি হবে?—চন্দ্রনাথ! আমি তোমার মহাশত্রু! আমার মৃত্যু দাও। অন্যায়ের প্রতিশোধ নাও।..."

চন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"হুঁ, প্রতিশোধ নেব।...এস, গুরুর কৃপায় আমি যে ঔষধের অধিকারী, তা'তে আজ আমি সব চেয়ে বড় কাজ করলুম। এই নাও—তোমার রোগের ঔষধ।"—বলিয়া তিনি ঝুলি হইতে কি-খানিকটা ভস্ম লইয়া কাগজে মুড়িয়া তাঁহার

হাতে দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"যাও, এখন আমার ঘ্যানেন্দ্র নাথ। মনে রেখো বিজয়,—এই সন্ন্যাসীর প্রতিশোধ।..."

বিজয়মাধবের চোখের সামনে সন্ন্যাসী,—গুহা, সমস্তই ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। তিনি টলিতে টলিতে বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। তার পর আর তাঁর জ্ঞান ছিল না।... পুনরায় যখন তাঁর সে চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলেন,—সন্ন্যাসীর গুহার সম্মুখে যোগেশবাবু, আর তিনি তাঁর হাঁটুর উপর শুইয়া আছেন। কষ্টে মাথা তুলিয়া দেখিলেন,—সন্ন্যাসীর গুহার দ্বার বন্ধ হইয়া গেছে।

সাহিত্যিক গুণগ্রাহিতা।*

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার প্রিয় গ্রন্থকার ছিলেন সার্ ওয়াল্টার স্কট্ (Sir Walter Scott)। আমি দিবারাত্রি তাঁহার উপন্যাসসমূহ পাঠ করিতাম; আমি যেন তখন সেই মধ্যযুগে অবস্থিত হইয়া সেই যাদুকর কল্পনা-প্রসূত চিত্রসমূহ প্রত্যক্ষ করিতাম। বাস্তবিক স্কট্ (Scott) একটী নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—উহা কতকটা আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও স্পষ্ট, এবং মোটের উপর ইউরোপের মধ্যযুগের একটি খাঁটি চিত্র। সৃষ্টি-ক্ষমতায় অন্যান্য যাঁহারা তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন, তাঁহাদের নাম নখাগ্রে গণিয়া বলা যায়। চার্লস্ ডিকেন্‌স্ (Charles Dickens) আশ্চর্য্য রসিকতার সহিত লণ্ডন-জগতের যথাযথ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন; বলজাক্ (Balzac) অনন্যসাধারণ শক্তির সহিত পারিস্ জগতের চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন; এবং এমিলি জোলাও (Emile Zola) তদ্রূপ শক্তির সহিতই নিম্নতর ফরাসী জীবন ও সমাজের কতকগুলি ছবি আঁকিয়াছেন।

আমি জানি না, সার ওয়াল্টার স্কট্ই আমাকে ইতিহাসের স্বাদ গ্রহণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, অথবা আমার ইতিহাসের প্রতি অনুরাগই আমাকে স্কটের ভক্ত করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু কোন বিষয়ই, এমন কি কবিতাও, আমার উপর ইতিহাসের মত এতাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে গিবনের (Gibbon) "রোম সাম্রাজ্য" আমি প্রথম পাঠ করিয়াছিলাম, এবং ঐ মহাগ্রন্থই আমাকে প্রথম মুগ্ধ করিয়াছিল। তদীয় চিত্রপটের বিশালতা, [illegible] এবং বিষয়সমূহের মহত্ব ও বৈচিত্র্য, এবং তাঁহার জীবন্ত ও স্পষ্ট চরিত্রাঙ্কন ক্ষমতা ঐতিহাসিক সাহিত্য-রাজ্যে ঐ গ্রন্থটিকে অদ্বিতীয় করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থপাঠ করিবার সময় মনে হয়, বিভিন্ন জাতি এবং বংশসমূহ, রোমক, গল, জার্ম্মান্, আরব, মোগল, এবং তুর্কগণ মহামহিমান্বিত সম্রাট, বর্ব্বর সেনানায়ক, এবং সাহসী খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম-যোদ্ধা প্রভৃতি যেন আমাদের চক্ষের সমক্ষে দলবদ্ধ হইয়া চলিয়া যাইতেছে। প্রাচীন সভ্যতার অবনতি হইতে আরম্ভ করিয়া, মধ্যযুগের ক্ষীণালোক পথে ইটালী, স্পেইন ও ফ্লাণ্ডারস্ দেশের ভিতরে আধুনিক সভ্যতা সূর্য্যালোকের প্রথম প্রবেশ সময় পর্য্যন্ত মানব-জাতির উন্নতির ইতিহাস এই গ্রন্থে যে শক্তির সহিত ব্যাপক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কখনও কেহ অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

আমি অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলাম, কিন্তু উক্ত গ্রন্থের সমকক্ষ কিছুই পাই নাই। গ্রোট্ (Grote) পরিশ্রমী লেখক, তাঁহার বর্ণনাও যথাযথ এবং লেখার ভাবের গভীরতাও দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাঁহার সহানুভূতি এবং জীবন্ত ভাবে বর্ণন-ক্ষমতার অভাব আছে। গিজোর (Guizot) "সভ্যতার ইতিহাস" চিন্তাশীলতা এবং দার্শনিক ভাবে পরিপূর্ণ, এবং পাঠকের সমক্ষে মধ্যযুগের আভ্যন্তরীণ চিত্র প্রকাশ করে। বাক্‌লের (Buckle) গ্রন্থগুলি নানা মতবাদে পরিপূর্ণ এবং তৎকৃত ফরাসী এবং স্পেইন দেশের কোন কোন যুগের চিত্রগুলি, ক্ষমতার পরিচায়ক। আমি সিসমণ্ডীর (Sismondi) 'ফ্রান্স' নামক ৩০ খণ্ড গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় এবং তদীয় "ইটালির সাধারণ তন্ত্র" (Italian-

---

* স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় তদীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব বর্ণনা করিয়া বিলাতের 'ওয়েষ্টমিনষ্টার রিভিউ' নামক পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের "প্রতিভা"তে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত মহাশয় উক্ত প্রবন্ধটির অনুবাদ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ বলিয়া আমরা উদ্ধৃত করিলাম।—অর্চ্চনা সম্পাদক।

Republic) নামক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় পাঠ করিয়াছি ; উভয়ই মহৎ গ্রন্থ। মেকলে (Macaulay) এবং কার্লাইল্ (Carlyle) বৃত্তাবলী ও চরিত্রসমূহ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাদিগকে ঐতিহাসিক না বলিয়া চিত্রকর এবং বর্ণনপটু কাহিনী লেখক বলাই বরং ভাল। জার্ম্মান্ ভাষায় আমার এরূপ জ্ঞান ছিল না যে, উক্ত ভাষায় লিখিত আধুনিক জার্ম্মান্ ঐতিহাসিকদিগের মূল মহাগ্রন্থসমূহ পাঠ করিতে পারি। ইংরেজি, ফরাসী, এবং জার্ম্মান এই তিনটি মহতী ভাষা না শিখিলে আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। আমার সংস্কৃতের অধ্যাপক পরলোকগত ডাক্তার গোল্ড্ষ্টুকর্ (Dr. Goldstucker) সময় সময় বলিতেন :—"এক জাতি তোমাকে যাহা বলে তাহা কখনও বিশ্বাস করিও না ; তিনটি জাতির লেখাই পাঠ করিও এবং নিজে বিচার করিয়া দেখিও।"

গত পাঁচ শতাব্দীর ইতিহাস সম্বন্ধে কোন মহৎ গ্রন্থ এখনও লিখিত হয় নাই—আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস রচনার জন্য গিবনের মত একজন শক্তিশালী লেখক এখনও আবির্ভূত হন নাই। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ নূতন তথ্য এবং মালমশলার অনুসন্ধান করিতেছেন ; যখন এই সকল সংগৃহীত হইবে, তখন যে বর্ত্তমান ইউরোপের একখানি উপযুক্ত ইতিহাস লিখিত হইবে, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে কোন কোন বিশেষ যুগের ঘটনাবলী পূর্ণভাবে, যথাযথরূপে এবং জীবন্ত ভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইংলণ্ডের ফ্রিম্যান্ (Freeman) এবং ফ্রুড্ (Froude), লেকি (Lecky) এবং গার্ডিনার্ (Gardiner) পরিশ্রমী লেখক। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোন উচ্চদরের ইংরেজ ঐতিহাসিক জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

ফরাসী ঐতিহাসিকদিগের সর্ব্বপ্রধান দোষ এই যে, তাঁহারা অতিরিক্ত নাটকীয় ভাবাপন্ন। ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের প্রধান দোষ যে তাঁহারা সঙ্কীর্ণ,—এবং কখনও কখনও খুব চাপা। ফরাসী ঐতিহাসিকেরা চমৎকারপ্রদ নাটকোচিত ঘটনাসমূহ পাইলেই আত্মবিস্মৃত হন, তা সেগুলি জাতীয় মহৎ অবদান বা বীরকীর্ত্তিসূচকই হউক, অথবা ঘোর জাতীয় কলঙ্কের পরিচায়কই হউক। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ ইংলণ্ডের সুমহৎ জাতীয় অজ্ঞানের যথোপযুক্ত আলোচনা করেন না ; এবং তাঁহারা বৃটিশ জাতির গুরুতর কলঙ্কগুলির বর্ণনা করিতেও অনিচ্ছুক। ফরাসীরা ফরাসী বিপ্লবের গৌরব কাহিনী যেমন শতমুখে বর্ণনা করিয়া থাকেন, উহার গুরুতর অপরাধসমূহ এবং অগণিত লোকের হত্যা ব্যাপারও তেমন ভাবেই লিপিবদ্ধ করেন। এলিজাবেথের (Elizabeth) সময়ে স্বাধীনতা ও লোকহিতের জন্য ইংলণ্ড যে বৃহৎ যুদ্ধ করিয়াছিল, ইংরেজেরা সে সম্বন্ধে যথোপযুক্ত বর্ণনা করেন নাই। অপর পক্ষে ইংরেজেরা আয়র্লণ্ডে যে অগণিত লোকের প্রাণবধ ও অন্যান্য প্রকারের অত্যাচার করিয়াছেন, তাহা ফরাসী বিপ্লব, অথবা জেঙ্গিস্ খাঁ এবং তৈমুরলঙ্গের অত্যাচার হইতে জঘন্যতর ; কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা সে বিষয়ে নির্ব্বাক। ফরাসী লেখকেরা তাহাদের চিত্রে অতিরিক্ত রঙ্গ ফলাইয়া থাকেন ; ইংরেজ লেখকেরা জীবন্তভাব ফুটাইয়া তুলিবার মত বর্ণ যোজনা করিতে পারেন না। ইংরেজ জাতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রিন্ (Green) ; ফরাসী জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক মিসিলেট্ (Michelet)।

মার্কিন ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে প্রেশ্কট (Prescott) এবং মোট্লির (Motley) গ্রন্থ আমি ভালবাসি ; কিন্তু, তাঁহাদিগের গ্রন্থের সহিত পরিচিত হওয়ার বহু পূর্ব্বে,—বাল্যে ওয়াশিংটন্ আরভিঙ্ (Washington Irving) পড়িয়া আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতাম। মার্কিন দেশীয়েরা নেপোলিয়ান বোনাপার্টির (Nepolean Bonaparte) সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীবনী লিখিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, তাঁহারাই আধুনিক ইউরোপের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস রচনা করিবেন, কারণ তাঁহারা যতটা অপক্ষপাতিতার সহিত লিখিতে পারিবেন, কোন ইংরেজ, ফরাসী, অথবা জারম্যান্ লেখক ততটা পারিবেন না।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার প্রিয় কবি ছিলেন বায়রণ্ (Byron) ও সার্ ওয়াল্টার্ স্কট্ (Sir Walter Scott) ; তাঁহাদিগের সরল এবং প্রাঞ্জল রচনারীতি—আধুনিক সমালোচকগণ যাহাকে ভাবগাম্ভীর্য্যের অভাব

বলেন—তাহা বালকেরও বোধগম্য। বহু বৎসর পরে আমি হোমার (Homer) এবং সেকস্পিয়ারের (Shakespeare) গ্রন্থ পাঠ করি, আমি কখনও ইউরোপীয় পুরাতন ভাষা শিক্ষা না করায়, পূর্ব্বোক্ত কবির গ্রন্থের পোপ (Pope) কৃত অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলাম। এবং তখন আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, হোমার উচ্চশ্রেণীর কবি এবং উচ্চশ্রেণীর স্রষ্টা। হোমার যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অধুনা-বিলুপ্ত একটি পুরাতন জগতের দর্পণ স্বরূপ, কিন্তু চিত্রটি চিরদিন সজীব থাকিবে। সেক্স্পিয়রও একটি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জীবন্ত চরিত্রে পরিপূর্ণ; সেই সব চরিত্র মনুষ্যোচিত ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং মানবোচিত প্রবৃত্তিদ্বারা পরিচালিত। আমি কোন কালেই মিল্টনের (Milton) পক্ষপাতী ছিলাম না। ইংরেজদিগের মহাকাব্য রচনার উপযোগী প্রতিভা নাই। স্বর্গ নরকের উজ্জ্বল চিত্রাঙ্কন করিলেই মহাকাব্য হয় না, অদৃষ্ট ও পুরুষকার সম্পর্কে আলোচনা কবি অপেক্ষা উৎকট পবিত্রতাবাদী (Puritan) প্রচারকের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। পরবর্ত্তী ইংরেজ কবিদিগের গুণও আমি তেমন উপলব্ধি করিতে পারি নাই,—টেনিসন্ (Tennyson) বা ব্রাউনিঙএর (Browning)ও নহে। আমার যেন মনে হয়, অদ্ভুত শব্দের ব্যবহার, এবং সুগঠিত বাক্য ও অতিমার্জ্জিত কবিতা রচনার দিকেই আধুনিক কবিগণের ঝোঁক বেশী। তাঁহাদের রচনায় পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের মহীয়সী কল্পনা প্রসূত চিত্রাবলীর অভাব দৃষ্ট হয়। স্কটের বৃহৎ তেজস্বী জীবন্ত চরিত্রগুলি যেন মর্ম্মর প্রস্তরে খোদিত প্রতিমূর্ত্তির মত প্রতীয়মান হয়, তাহার তুলনায় টেনিসনের "আইডিলস্ অব দি কিঙ" (Idylls of the king) (রাজকাহিনী) নামক গ্রন্থের বীরগণ, নিপুণ বয়নশিল্পীরা তিরস্করণী গাত্রে সুকৌশলে যেরূপ ছবি আঁকিয়া থাকেন, সেইরূপ ছবির স্থায় প্রতিভাত হয়। একমাত্র শেলিই (Shelley) আধুনিক কবিতায় অপূর্ব্ব মধুরতা এবং সৌন্দর্য্যের সহিত অতীতের কল্পনা সম্পদ এবং মানব মনের আবেগ একত্রিত সম্মিলিত করিয়াছেন। অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেবল মনে প্রাণে প্রতিবাদ, বেদনায় কি মর্ম্মন্তুদ বিলাপ, ভাবের কি গভীরতা, এবং হৃদয়াবেগের কি উন্মাদনা, আর কবিতার কি মাধুর্য্য! যদি তিনি দীর্ঘজীবী হইতেন, তাহা হইলে মানব জীবন সম্পর্কে শেলির আরও উদার ও ব্যাপক ধারণা জন্মিত, কারণ কবিতা মানব জীবনেরই মত বহুমুখী।

ফরাসী দেশ কাব্যসম্পদে সম্পন্ন নহে। পুরাতন কবি শিল্পী রাসিন্ (Racine) ও কর্ণেইলের (Corneille) পর উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ফরাসীদেশে কোনও বড় কবির অভ্যুদয় হয় নাই। ভল্টেয়ার (Voltaire) অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বপ্রধান সাহিত্যিক; ইউরোপের সিংহাসন সমূহ তাঁহার সমক্ষে ভয়ে কম্পমান ছিল; তদীয় প্রতিভার তীব্র আলোকপাতে [illegible] কুসংস্কার সমূহ বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল; তাঁহারই গঠনপটু প্রতিভার সংস্পর্শের ফলে, বর্ত্তমান সময়ে আমরা যাহাকে আধুনিক ইতিহাস বলিয়া বুঝি, তাহার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ভল্টেয়ার প্রকৃত কবি ছিলেন না; তৎকৃত "হেন্‌রিয়েড্" (Henriade) কৃত্রিমতায় পূর্ণ এবং তাঁহার নাটকসমূহ ক্লান্তিজনক। কবিহৃদয় লইয়া রুশো (Rousseau) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কদাচিৎ কবিতা লিখিতেন; তাঁহার আলাময়ী গদ্য রচনা সকল জাতিকেই নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার কবিতা আধুনিক ইউরোপে রণভেরীর নিনাদবৎ ধ্বনিত হইয়াছিল।

অনুবাদের সাহায্য ব্যতীত আমার পক্ষে গেটে (Goethe) ও শিলারের (Schiller) গুণ গ্রহণের উপায় নাই। কিন্তু অনুবাদের ভিতর দিয়াও তাঁহাদের মহত্ত্ব ও গৌরব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ফরাসীদেশে ভল্টেয়ার ও রুশোর মত, ইংলণ্ডে বায়রণ ও শেলির মত তাঁহারাও সেই প্রতিভা সমোজ্জ্বল ব্যক্তিসঙ্ঘের অন্তর্গত, যাঁহারা ইউরোপে এক মহান্দোলনের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন বা তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সেই আন্দোলনেরই রাজনৈতিক অভিব্যক্তি মাত্র। এই সমস্ত মহিমান্বিত নামের সঙ্গে আমি সেই সকল ক্ষুদ্রতর কবিদিগের নাম করিতে চাই, যাঁহারা বাল্যে আমাকে আনন্দ দিয়াছেন, এবং এখনও আমাকে

রোহিত করেন। রবার্ট বার্ণস্‌এর (Robert Burns) কবিতায় ভাব এবং প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়। টমাস্‌ মুরের (Thomas Moore) "আইরিশ মেলোডিস" (Irish melodies) আয়র্লণ্ডগীতি এখনও আমার কানে লাগিয়া রহিয়াছে; লঙ্‌ফেলোর (Longfellow) সরল কবিতাগুলি এখনও আমাকে কর্ণে প্রণোদিত করে।

আমি ইংরেজী শিক্ষার বহুকাল পরে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছি। পাশ্চাত্যের কবিতা হইতে প্রাচ্যের কবিতায় কি পরিবর্ত্তন! কেমন শান্তি ও কোমলতা, কি বর্ণরাগ ও উজ্জ্বল আলোকপাত, কেমন মনোরম দৃশ্য-রাজি এবং সৌন্দর্য্যময় প্রতিমানিচয়। প্রাচ্যই কাব্য, দর্শন এবং ধর্ম্মের জন্মভূমি; প্রাচ্যই মানবীয় কল্পনার অত্যুচ্চ অভিব্যক্তি এবং মানবীয় ধর্ম্ম বিশ্বাসের উন্নততম আকাঙ্ক্ষানিচয়ের আবাসস্থল।

প্রথম হইতেই কালিদাস আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন; আমি তদীয় জগদ্বিখ্যাত "শকুন্তলা" অপেক্ষা "কুমার-সম্ভব"কে বেশী ভাল বাসিতাম। এই দুইখানি কাব্য উজ্জয়িনীর প্রতিভাশালী কবির চরমশক্তি বিকাশ করিয়া কবিত্বের উচ্চতম গ্রামে আরোহণ করিয়াছে। এবং দুইটি চরিত্র,—তপোবন বাসিনী শকুন্তলা আর নিভৃত পর্ব্বত কন্দর বিহারিণী উমা—মানব কল্পনার মধুরতম সৃষ্টি সমূহের অন্যতম। ভবভূতি অধিকতর ক্ষমতাশালী; কিন্তু কালিদাসের হৃদয় বা তদীয় সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধের শক্তি তাঁহার নাই। ভারবির রচনায় সময়ে সময়ে প্রতি-ভার অপূর্ব্ব উচ্চতা পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু উহা প্রায়ই কৃত্রিমতায় পূর্ণ।

কিন্তু উচ্চতম শ্রেণীর যথার্থ কবিতা আস্বাদন করিতে চাহিলে প্রাচীন ভারতীয় বিরাট মহাকাব্যসমূহের অভ্য-ন্তরে প্রবেশ কর। মানুষের কল্পনা "মহাভারত" হইতে অধিকতর সুন্দর অথবা মহৎ কিছুরই ধারণা করিতে পারে নাই। "ইলিয়াডে"র (Iliad) তুলনায় মহা-ভারতে চিত্রিত দৃশ্যাবলী ও ঘটনারাজি অধিকতর সজীব, অধিকতর বৈচিত্র্যময়, এবং অধিকতর উজ্জ্বল। সমস্ত চরিত্রগুলি আমাদের নিকট পরিষ্কার উজ্জ্বল ও স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, আমরা সকল চরিত্রের মধ্যেই প্রাণের স্পন্দন

প্রত্যেক ব্যক্তি,—কর্ণ এবং অর্জুন, ভীষ্ম এবং দ্রোণ, ভীম এবং দুর্য্যোধন, গান্ধারী এবং দ্রৌপদী, প্রত্যেক চরিত্রই—বীর পুরুষ এবং বীরনারীর হৃদয়াবেগ ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, গুণ এবং কখন কখন বা দোষের সমাবেশে একেবারে সজীব বলিয়া বোধ হয়। মহাকবির সেই বিশাল চিত্রপটে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল জাতিরই সমাবেশ রহিয়াছে। কত সাহস ও অটল প্রতিজ্ঞার কত কীর্ত্তি, কত অন্যায় অত্যাচার, শত্রুকে তাহার প্রতিশোধের কত কাহিনীতে এই আখ্যায়িকা পূর্ণ। এ সমস্তই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের একটি পুরাতন চিত্র, কিন্তু এখনও উহা অমর কবির কবিতায় জীবন্ত রহিয়াছে।

দুইটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির সমালোচনায় সম্ভবতঃ কোন দুই ব্যক্তিই একমত হইতে পারেন না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র স্রষ্টাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। এবং আমার বিবেচনায় এই মানদণ্ড দ্বারা বিচার করিলে (অবশ্য আমার এই মত অন্যে গ্রহণ করিতে পারেন বা নাও পারেন) পৃথিবীর সমস্ত জাতির কবি-দিগের মধ্যে মহাভারতের কবিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতে হয়; এবং "ইলিয়াডে"র কবিকে দ্বিতীয় স্থান দিতে হয়। আর, উক্ত উভয় কবির অনেক নিম্নে মধ্যযুগের ধর্ম্মবিশ্বাস ও সভ্যতার অমর কবি ড্যান্টিই (Dante) বোধ হয় তৃতীয় স্থানে দাঁড়ান। কিন্তু ড্যান্টি এবং সেক্‌স্‌পিয়ার উভয়েই প্রাচীন কবিদিগের সহিত তুলনায় খাট হইয়া পড়েন, কারণ তাঁহারা দুঃখ কষ্ট এবং চিত্তের আবেগ উন্মাদনার মধ্যেই মানব চিত্র অঙ্কনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; সামর্থ্যে এবং ধৈর্য্যে মানব চরিত্রের যে গৌরব, তাহা প্রাচীন কবিশিল্পীগণই সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং তাঁহাদিগের সৃষ্ট জগৎ বিশালতর, এবং অধিকতর সমৃদ্ধি-শালী ও বৈচিত্র্যময়। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত আধুনিক তুলনাই চলে না।

মহাকাব্য হিসাবে "মহাভারতে"র সঙ্গে "রামায়ণে"র তুলনা হয় না; কবিহিসাবে হোমারের সঙ্গে ভার্জিলের (Virgil) তুলনা হয় না। দুঃখের বিষয়, ভার্জিল প্রাচীন রোমান এবং অন্যান্য লাটিন জাতির কাহিনী ও ঐতিহাসিকত্বের সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ সঙ্কলন [illegible]

গ্রথিত করিয়া প্রাচীন জগতের যথাযথ চিত্র সম্বলিত একটি প্রকৃত মহাকাব্য সৃষ্টি না করিয়া একজন "ট্রোজান" (Trojan) কর্ত্তৃক রোম নগরী স্থাপন বিষয়ক গল্প অবলম্বন কাব্য লিখিতে প্রণোদিত হইয়া ছিলেন। আর দুঃখের বিষয়, বাল্মীকিও সেইরূপ কোশল এবং বিদেহ রাজকুলের বংশপরম্পরাগত ইতিকথা, কাহিনী, ও কিংবদন্তীগুলি হইতে একটি যথার্থ মহাকাব্য রচনা না করিয়া লঙ্কাযুদ্ধের কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যে স্বভাবানুরক্তি এবং পুরাতন রীতিনিচয় ও পৌরাণিক ঐতিহ্যের যথাযথ বর্ণনা, কাব্য গ্রন্থ মধ্যে "মহাভারত" ও "ইলিয়াড্" কে অদ্বিতীয় করিয়া রাখিয়াছে, তাহা "রামায়ণ" ও "ইনিডে"র (Æneid) যুদ্ধ বর্ণনায় আমরা পাই না। তথাপি "রামায়ণে"র প্রথম অংশ কোমল তুলিকা স্পর্শে পারিবারিক জীবনের করুণ মধুর চিত্রাঙ্কনে অন্য সকলকে অতিক্রম করিয়াছে। এবং সীতা অপেক্ষা নারীচরিত্রের উচ্চতম আদর্শ জগতের সাহিত্যে আর সৃষ্ট হয় নাই।

সম্ভবতঃ আমি প্রধান কবিশিল্পীদিগের তালিকা হইতে ফার্দ্দৌসীকে বাদ দিয়া অন্যায় করিয়াছি, কিন্তু আমি তাঁহার মূলগ্রন্থ কদাপি পাঠ করি নাই। ফার্দ্দৌসী ত্রিংশ বর্ষকাল পরিশ্রম করিয়া প্রাচীন পারস্যের কিংবদন্তী ও ইতিকথা সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং প্রাচীন যুগের বীরত্বপূর্ণ জীবনের এমন একটি ছবি আঁকিয়া তুলিয়াছেন, যাহা চিরস্থায়ী হইবে। আমি মধ্যযুগের জারম্যান জীবনের চিত্রপূর্ণ "নিবিলুঞ্জেন লীডে"র (Nibelungenlied) ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়াছি, কিন্তু প্রাচ্য মহাকাব্যসমূহের তুলনায় সে চিত্র নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হয়। যদি আমরা হোমারকে বাদ দেই, অথবা যদি আমরা তাঁহাকে এসিয়াবাসী বলিয়া ধরিয়া লই—কারণ তিনি তাহাই ছিলেন / তাহা হইলে আমরা যথার্থ রূপে বলিতে পারি যে, মহাকাব্য প্রাচ্যদেশেরই সম্পত্তি। ইউরোপে একখানিও বিরাট মহাকাব্যের সৃষ্টি হয় নাই।

বিস্ময়ের বিষয় হইলেও ইহা সত্য, যে আমি সেক্স্পিয়ার এবং স্কটের গুণ বুঝিতে শিক্ষা করার পরে বাঙ্গালা সাহিত্যের গুণ গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি, কারণ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ আদর ছিল না। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে একজন কবি, সকলের উচ্চে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; তিনি মুকুন্দরাম। তিনি প্রকৃত কবি, প্রকৃত দ্রষ্টা; তিনি বাঙ্গালার জনাকীর্ণ, শান্তিময় গ্রাম্যজীবনের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা চিরদিন সজীব থাকিবে। কাশীরাম ও কৃত্তিবাস তাঁহাদের কৃত প্রাচীন মহাকাব্যদ্বয়ের অনুবাদের নিমিত্ত চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। ভারতচন্দ্র শব্দ[illegible] পারিপাট্য এবং ছন্দনৈপুণ্যে সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যথাযথ চিত্রাঙ্কনে, করুণরস বর্ণনায়—এক কথায় যথার্থ কবিত্ব বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে দুইজন প্রধান লেখকের অভ্যুদয় হইয়াছে। মধুসূদনের কল্পনা অত্যুজ্জ্বল, কিন্তু, তদীয় কাব্যের অনুপ্রাণনা প্রকৃতির নিজ ভাণ্ডার হইতে গৃহীত হয় নাই, কিন্তু গ্রন্থ হইতে—প্রধানতঃ দুইখানি গ্রন্থ, অর্থাৎ, "রামায়ণ" ও "ইলিয়াড্" হইতে গৃহীত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতি হইতে অনুপ্রাণনা গ্রহণ করিয়া অধিকতর সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। এবং এইজন্য তাঁহার অঙ্কিত আধুনিক বাঙ্গালী জীবনের চরিত্রচিত্রাবলী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শিল্পীদিগের সৃষ্ট চিত্রাজির ন্যায় জীবন্ত, শক্তিমন্ত, ও যথাযথ।

যদিও প্রথম বয়সে দর্শন শাস্ত্র আমার প্রিয় ছিল, তথাপি আমি এখন পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে কিছুই বলি নাই। সার্ উইলিয়াম্ হ্যামিল্টনের (Sir William Hamilton) বক্তৃতাগুলি প্রথম আমার চিত্ত আকর্ষণ করে, কিন্তু শীঘ্রই জন ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এবং বেইন (Bain) তৎপরিবর্ত্তে আমার চিত্ত অধিকার করেন। তৎপর, যাঁহারা ইংলণ্ডীয় দার্শনিক চিন্তা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন সেই লক্ (Locke) এবং হিউমের (Hume) দিকে এবং এমন কি কখনও গভীর চিন্তাশীল দার্শনিক হব্‌সের (Hobbes) দিকেও, আকৃষ্ট হই। লিউইসের (Lewes) "দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস" নামক গ্রন্থ আমার মনে সমগ্র দার্শনিক জগৎটাকে যেন প্রকাশিত করিয়া দিয়াছিল। এই গ্রন্থ লোকপ্রিয় বটে, কিন্তু ইহাতে চিন্তার গভীরতা দৃষ্ট হয় না।

এই গ্রন্থ হইতেই আমি ডেকার্টে (Descartes) ও লাইব্‌নিজ্ (Leibnitz), কান্ট (Kant) ও হেগেল (Hegel), এবং গ্রীস দেশীয় প্রাচীনতর দার্শনিকদিগের প্রধান মতগুলির একটা ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু ইউরোপীয় (দর্শন শাস্ত্রের) ইতিহাসগুলি অসম্পূর্ণ, এবং উহারা প্রাচ্য চিন্তাজগতের খবর [illegible]কারই দেয় না। পঞ্চবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে যে [illegible] দর্শন শাস্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছিল তন্মধ্যে "সাংখ্য" ও "বেদান্ত" সম্বন্ধে আমি শেষজীবনে কিছু কিছু জ্ঞানলাভ করিয়াছি।

দর্শনশাস্ত্রের "পরে" অর্থশাস্ত্র,—যাহার সহিত কার্য্যক্ষেত্রের অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক,—তাহা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে; এবং য়্যাডাম স্মিথ্ (Adam Smith) ও রিকার্ডো (Recardo) এবং জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) আমার সমক্ষে এক নূতন জগৎ খুলিয়া দেন। ছাত্রাবস্থায় লণ্ডননগরে আমি কখনও কখনও জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছি, এবং হেন্‌রি ফসেটের (Henry Fawcett) সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার সম্মান উপভোগ করিয়াছি। আমি তাঁহাদের মতবাদ সমূহে অত্যন্ত আস্থাবান্ ছিলাম। কিন্তু পরজীবনে, কর্ম্মক্ষেত্রে শাসনকর্ত্তারূপে আমি এই সকল সিদ্ধান্তের সঙ্কীর্ণতা লক্ষ্য করিয়াছি, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় লেখকগণ প্রাচ্য দেশের আর্থিক অবস্থার ধারণা করিতে কি প্রকার অকৃতকার্য্য হন, তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। সিস্‌মণ্ডি (Sismondi) ও লেভেলে (Laveleye), এবং অন্যান্য ইউরোপীয় লেখকগণ ভারতীয় ভূমিবন্দোবস্তের নিয়ম বুঝিতে পারেন না; এমন কি, মিল্ (Mill) যিনি ত্রিশ বৎসর "ইণ্ডিয়া আপিসে" কাজ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার "পলিটিক্যাল্ ইকনমি" নামক গ্রন্থে ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ড, ফরাসীদেশ ও ইটালি দেশের ভূমি-সম্পর্কিত নিয়মের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ভারতীয় সমস্যাগুলিকে স্পর্শ করিতেও সাহস করেন নাই। প্রাচ্যের দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও অর্থশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতকে প্রাচ্যদেশেই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

আমি কখনও নিয়মিত ধর্ম্মশিক্ষা পাই নাই, কিন্তু হিন্দুবালকের পক্ষে গৃহে ধর্ম্ম শিক্ষার অভাব হয় না। আমার মা ধার্ম্মিকা হিন্দুরমণী ছিলেন, এবং গভীর ধর্ম্ম ভাব তাঁহার প্রকৃতিগত এবং সহজাত ছিল। যখন আমার ভালরূপ বর্ণপরিচয়ও হয় নাই, তখনই তিনি আমাকে প্রাচ্যদেশে যে সমুদয় কাহিনীর ভিতর দিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়, সেই সকল পবিত্র কাহিনী মুখে মুখে বলিতেন। আমার পিতৃদেব ও পিতৃব্য মহাশয় যদিও খৃষ্টান ছিলেন না, তথাপি আমি যখন ইংরেজী বুঝিতে সমর্থ হইলাম তখন তাঁহারা বাইবেলের (Bible) অংশসমূহ এবং ধর্ম্ম সম্পর্কিত কবিতাবলী আমাকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। আমার হাতে যে সকল গ্রন্থ প্রথম পড়িয়াছিল তন্মধ্যে পেলি (Paley) ও ব্লেয়ারের (Blair) ধর্ম্মোপদেশ অন্যতম; আর সেই সময়ে আমি মহিমান্বিত ব্রাহ্ম আচার্য্য স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা শ্রবণ করিতাম। উহার বহু পরে আমি প্রাচীন ভারতের গভীর এবং অত্যুন্নত ধর্ম্মগ্রন্থ "উপনিষদ" ও "গীতা"র প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আমি তখন এই প্রাচীন ধর্ম্ম ভাণ্ডার আমার স্বদেশবাসীগণের সহজলভ্য করিবার প্রেরণা অনুভব করিলাম। আমি পণ্ডিতদিগের সাহায্যে "ঋগ্বেদ" বাঙ্গলায় অনুবাদ করিলাম; এবং সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রাবলী হইতে সার সংগ্রহ করিয়া বঙ্গানুবাদ সহ এক বিস্তৃত গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম।

ধর্ম্ম জিনিসটা মানব হৃদয়ের ভাববিশেষ। উহা কোন মত বা বাঁধা নিয়ম নহে যাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। আমার অনেক সময় দুঃখ হয় যে, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতবাসীর হৃদয়নিহিত এই ভাবটিকে একেবারেই প্রোৎসাহিত করা হয় নাই; প্রত্যেক বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু বালকদিগের জন্য হিন্দুশাস্ত্র ও মহাকাব্যগুলি হইতে, মুসলমান বালকদিগের জন্য, "কোরাণ" হইতে, এবং খৃষ্টিয়ান বালকদিগের জন্য "বাইবেল" হইতে পাঠের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সপ্তাহে এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা সময় এইরূপ পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে, এবং সৎস্বভাবান্বিত ধর্ম্মের শিক্ষকগণ এই সমস্ত পবিত্র গ্রন্থাবলীর অংশবিশেষ পাঠ করিলে আশা করা যায় সত্বরই বিদ্যালয়ের

সমস্ত বালকগণ এবং তৎসঙ্গে বাহিরের শত শত শ্রোতা নির্দ্দিষ্ট দিনে পাঠকদিগের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইবে। কর্ত্তব্যজ্ঞান, বদান্যতা, ও নিঃস্বার্থপরতা সম্বন্ধে উপদেশগুলি নানা আকারে এবং বিচিত্র কাহিনী রূপে যে ভাবে ঐ সকল গ্রন্থে বারবার বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদিগের হৃদয়ে ঐ সকল উপদেশ গভীরভাবে মুদ্রিত হইবে। এতদ্দ্বারা তাহাদিগের চরিত্র, তাহাদের ভবিষ্যৎ স্বভাব ও জীবন সুগঠিত হইবে।

বঙ্কিম-বাবুর অপ্রকাশিত পত্র।

(স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি-আই-ই, মহোদয়ের নিকট লিখিত।)

সুহৃদ্বরেষু—

আপনার অনুগ্রহপত্র পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন দুই-একমাসের জন্য আসিতেছি এরূপ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট শুনিয়াছিলাম। এজন্য একাই আসিয়াছি। বিশেষ পরিবার আনিবার স্থান এ নহে। এক্ষণে জানিলাম ইহার ভিতর অনেক চক্র আছে। * * * সেই মহরার দল আমাদের স্বদেশী স্বজাতি, আমার তুল্যপদস্থ; আমার ও আপনার বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য। আমিই বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব, আপনিই বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন? এ ঈর্ষাপরবশ, আত্মাদরপরায়ণ জাতির উন্নতি নাই। বল, "বন্দে উদরম্"।

বৈশাখের "বান্ধব" পাইয়াছি। এবং "মূলমন্ত্র", "জাতীয় সঙ্গীত" এবং অন্যান্য প্রবন্ধ পড়িয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি।

আপনিও "শাপেনাস্তংগমিতমহিমা," শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তবে আপনি মহৎকর্ত্তব্যানুরোধেই এ দশা প্রাপ্ত, কাজেই তাহা সহ্য হয়, কিন্তু আমি যে কি জন্য বৈতরণী-সৈকতে পড়িয়া ঘোড়ার ঘাস কাটি তাহা বুঝিতে পারি না। যে ব্যক্তি লিখিয়াছিল "যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী", সে ব্যক্তি নিশ্চিত জানিত উড়িষ্যার বৈতরণীপারেই যমদ্বার বটে। যশোহরবিদ্যার কিয়দংশ হস্তলিপি হইতে হেম-বাবুর মুখেই শুনিয়াছিলাম। সেটুকু আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। বোধ হয় সেটুকু আপনিও গ্রন্থকারের মুখে শুনিয়া থাকিবেন। অবশিষ্টাংশ এখনও মুদ্রিত করিয়া পড়ি নাই। যেটুকু পড়িলাম তাহাতে বুঝিলাম যে গ্রন্থকারের মুখে না শুনিলে গ্রন্থের সকল রসটুকু পাওয়া যায় না। বিশেষ তাঁহার ছন্দ নূতন—আমার আবৃত্তির সম্পূর্ণ আয়ত্ত নহে। এ জন্য স্থির করিয়াছি যদি কখন রজনী প্রভাত হয়, তবে তাঁহারই মুখে অবশিষ্টাংশ শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম

• আনন্দমঠে বিস্তর ছাপার ভুল দেখিলাম। অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করিবেন। ইতি ২৩শে পৌষ।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়।

আত্মসর্ব্বস্ব।

(টুর্গেনিভ হইতে)

[শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী]

সে ছিল বাড়ীর সকলের চাবুক। ধনীর ঘরে অপূর্ব্ব স্বাস্থ্য নিয়ে সে জন্মেছিল। দীর্ঘকালব্যাপী জীবনে সে আরও ধন-উপার্জ্জন করেছে, আরও স্বাস্থ্যবান হয়েছে, কিন্তু কোনও দিন কোনও পাপ করেনি, কোনও দিন তার কোনও ভুল ভ্রান্তি হয়নি।

অনিন্দ্যনীয় তার চরিত্র, অন্ততঃ সে নিজেকে সেরূপ মনে করত…নিজে যা ঠিক বলে বুঝতো, পরেও তাই ঠিক বলে বুঝুক, এই অনুযায়ী কার্য্য করুক, এই ছিল তার জীবনের,মনের ইচ্ছা—তার সংস্পর্শে যে এসেছে, তাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন সবাইকে দলিত হয়ে যেতে হয়েছে।

তার এই আত্মসর্ব্বস্ব বিবেকই তার ধন, তার সম্পত্তি…, এই সম্পত্তির আশ্রয় যারা নিয়েছে তাদের চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দিতে হয়েছে।

এই আত্মাভিমানী আত্মসর্ব্বস্ব পুরুষটীর মনে কোনও দিন দয়ামায়া দেখা যায় নাই, কারও কোনও উপকার জীবনে সে করে নাই, কারণ আত্মসর্ব্বস্ব বিবেক কোনও দিন তাকে পরের ভাল করতে বলে নাই।

নিজের ছাড়া পরের ভাবনা সে কোনও দিন ভাবে নাই…নিজে খুব ভাল, সৎ, বুদ্ধিমান, সবজান্তা এই বলাই ছিল তার কাজ।…পরে যদি এ কথা না বলত, না স্বীকার করতো, তার ওপর [illegible] চটে যেত।

কিন্তু নিজে যে যে আত্মসর্ব্বস্ব, স্বার্থপর, এ কথা সে কোনও দিনই ভাবে নাই। নিজে খুব পরের কাজ করেন, উপদেশ দেন, এই ছিল তার ধারণা। আর আত্মসর্ব্বস্ব অপরকে সাবধান করা, নিন্দা করা এই ছিল তার প্রধান কর্ম। [illegible] আত্মসর্ব্বস্ব ছিল নিঃসন্দেহ, কিন্তু অন্যের আত্ম-সর্ব্বস্বতা তার [illegible] ওপর ছিল এক প্রতিবন্ধক।

নিজের তার ধারণা ছিল নিজের কোনও দুর্ব্বলতা, নিজের কোনও দোষ তার নাই, যেই পরের এতটুকু দোষ ও দৌর্ব্বল্যের পরিচয় পাওয়া যেত আর কি রক্ষা ছিল তার কাছে। পরের দোষকে, দৌর্ব্বল্যকে সে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দিত না। সে কোনও জিনিসকে কিম্বা লোককে ঠিক স্বরূপে বুঝিতে পারিত না, কারণ সে নিজেকে মনে ক'রত সব চেয়ে বড়, সবার উপরে, সবজান্তা · নিজের গণ্ডীর মধ্যেই সে আত্মবুদ্ধির বশে যেতে থাকতো।

ক্ষমা জিনিসটা যে দেবধর্ম্ম এর অর্থ পর্য্যন্ত সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারত না। কোনও দিন নিজে সে দোষ করেনি, কোনও তাকে অনুতাপও করতে হয় নি, নিজেকে ক্ষমা করতে হয় নি…সে ক্ষমার অর্থ বুঝবে কি করে?…পরকে কেন ক্ষমা করতে হয় তা' বোঝার অবসর তার ঘটে নি।

নিজের বিবেকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে, নিজের ভগবানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বীরের মত নির্ভীকহৃদয়ে, অকম্পিতস্বরে এই পৃথিবীর সমস্ত গুণের আধার আত্মসর্ব্বস্ব লোকটী বলতো—"আমিই পৃথিবীর আদর্শ পুরুষ।"

মৃত্যুর সময়ও মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সে ঐ রকম বলবে—তার পাষাণ হৃদয় এতে বিন্দুমাত্র চঞ্চল হবে না·· একটুকুও দাগ পড়বে না।

কি অসমিত আত্মতুষ্টি! এ গুণ পৃথিবীতে দুর্লভ নয় তো। এই আত্মসর্ব্বস্বপরায়ণতা উলঙ্গ পাপের চেয়েও বীভৎস, তা কে অস্বীকার করতে পারে?

তব নিশ্বাস।

[শ্রীচারুশশী বন্দ্যোপাধ্যায়।]

তব নিশ্বাস পবনে পবনে আছে,
জল-কল্লোলে মিশ্রিত তব তান!
তরু-মর্ম্মরে আকুলি' বিকুলি' সদা
আহ্বানে মোরে—পাগল করে গো প্রাণ!
নবীন সূর্য্যে পূতানন তব ভাসা—
আহা, অঞ্জলি ভরে'—বুক পূরে' করি পান!
সুনীল গগনে শুভ্র মেঘে গো শুনি—
আহা, স্বপনের মত দুলে দুলে তব গান!

তব সৌরভ কুসুমে কুসুমে কাঁপে—
তব কিঙ্কিনী তৃণে তৃণে বেজে' যায়!—
তব চুম্বন শিশিরে শিশিরে লাগা—
তব গৌরব ভ্রমরে ভ্রমরে গায়!
দূর দিগন্তে, অতি দূরে তব বাস—
তবু নয়নে নয়নে বুকে বুকে তুমি, হায়,
ওগো স্নিগ্ধমূর্ত্তি চারিদিকে তব হেরি'—
গুমরি গুমরি প্রাণ—যায়, ফেটে যায়।

অতি ক্ষুদ্রের অভিযান।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম এ, বি-এল।]

"কুটুস্ কুটুস্ কামড়াব--গর্ত্তের ভেতর সেঁদোব"—এ নীতি আমাদের দেশের "ক্ষুদে পিঁপড়ে"র বটে, কিন্তু পিপীলিকা জগতের ইহা বিশ্বজনীন নীতি নয়। অবশ্য জোট্ বাঁধার যে কি উপকার—যৌথ-শক্তি যে কত বড় শক্তি, তাহা পিপীলিকাকুল নিত্যই আমাদের বুঝাইয়া দেয়। কিন্তু এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পিঁপড়ার দল নিজেদের সংহতির প্রতাপ কতদূর অবধি বিস্তার করিতে পারে, তাহার কথা আজ আমি আপনাদের জানাইব।

আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশে এবং পশ্চিম আফ্রিকায় এই জাতীয় পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। আফ্রিকার ইংরাজেরা ইহার নাম দিয়াছে Driver Ant বা "চালক পিঁপড়া"। যখন কোটী কোটী চালক-পিপীলিকা দলবদ্ধ হইয়া সারি দিয়া যুদ্ধ-যাত্রা করে, তখন তাহাদের অভি-

বানের মুখে যে জীব পড়ে, তাহার আর নিষ্কৃতি নাই—হউক সে জীব হাতী বা ঘোড়া, বাঘ বা সিংহ, আর নর বা বানর। ইহাদের ক্ষুধা দারুণ। কীটপতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জীব ইহাদের ভক্ষ্য। মনুর ভক্ষ্যাভক্ষ্যের নিয়মও ইহারা মানে না, কোরাণেরও হারাম হালালের বিধির কোন মূল্য ইহাদের নিকট নাই। এই ক্ষুদ্রকায় কৃতান্তের সারি একটা প্রাণী পাইলেই ঝাঁকে ঝাঁকে তাহাকে আক্রমণ করে, নিজেদের ক্ষুদ্র হুলের দুকাশ্রিত বিষে তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া অচিরেই সেই শিকারটির প্রাণবায়ু বাহির করিয়া দেয়। পরিশেষে তাহার দেহ আকণ্ঠ ভোজন করিয়া নূতন শিকারের অন্বেষণে গমন করে। সময়ে সময়ে বনের মধ্যে তাহাদের প্রশস্ত সারি ত্রিশূলের ফলার মত ভাগ হইয়া যায়, এবং তাহারা বহুটা স্থানে বিস্তৃত হয় তাহার মধ্যে কেবল তাহাদের ভিন্ন আর অন্য প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয় না। এমন ইহাদের কল্যাণকর জঠরাগ্নি যে ভবের দুঃখ তাহাকে ভোগ করিতে হয় না, ইহারা যাহার সাক্ষাৎ পায়।

Du Chaillu (ডু শেলু) নামক এক জন আফ্রিকার সাহেব ইহাদের বর্ণনা করিয়াছেন। মোটের উপর ঐ কথা—আরশুলা হইতে আরম্ভ করিয়া, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার এবং কাফ্রির ভবলীলা সম্বরণের বর্ণনা। খেত কায় ডু শেলু সাহেব জলের মধ্যে ডুবিয়া বহুবার ইহাদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেনে।

যখন মার্ত্তণ্ডের উত্তাপ খুব প্রখর, তখন বৃক্ষের ছায়ায় ইহারা চলে—সারি প্রস্থে মাত্র দুই ইঞ্চি, কিন্তু দৈর্ঘ্যে দুই চারি মাইল বা ততোধিক। বৃক্ষহীন প্রদেশে ইহারা মাটির দুই চারি ফিট্ নীচে সুড়ঙ্গ কাটিয়া চলে—কারণ পশ্চিম আফ্রিকার উত্তাপ বড় অল্প নয়।

ময়াল সাপ এ প্রদেশে প্রচুর। তাহার বৃহৎ উদরটি পূর্ণ হইলেই ময়াল সাপের নিদ্রাবেশ হয়—আমাদের জমিদার বাবুদের "ভাত ঘুমে"র মত। সেই ভাত-ঘুমের সময় একবার চালক-পিপড়া তাহাদের সন্ধান পাইলে অজগরের তন্দ্রা মহানিদ্রায় পরিণত হয়। বিধির বিধান,—অভাব হইলেই আয়োজন, যে দিকেই জল পড়ে প্রকৃতি সতী সেই দিকেই ছাতা ধরেন।* তাই তিনি এ দেশের অজগরের প্রাণে পিপীলিকা-ভীতির প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছেন, অজগর জানে গুরুভোজনের পর নিদ্রা নিষ্কর্ম এবং নিদ্রিত অবস্থায় যদি চালক-পিপীলিকা আক্রমণ করে, তাহা হইলে মরণ নিঃসন্দেহ। অজগর শিকার ধরিয়া দেহের চাপে তাহাকে নিষ্পেষিত করে বিন্তু অপর দেশের অজগরের মত সদ্য সদ্য তাহাকে ভক্ষণ করিতে পারে না। আত্ম-রক্ষার সহজাত বুদ্ধির নিকট পেটুক-প্রবৃত্তি নতশির হয়। তখন সে শিকার ফেলিয়া বনের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া দেখে, তাহার পিপীলিকার শিকার হইবার সম্ভাবনা যদি বোঝে পিপীলিকা দলবদ্ধ আসিতেছে, তাহা হইলে আপন মুখের গ্রাস ফেলিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করে। পিপীলিকাও নিহত জন্তুর মাংস পাইয়া অজগরের পশ্চাদ্ধাবন করে না।

চালক পিপীলিকার নদী পার হইবার পদ্ধতিও অপূর্ব্ব। তাহাদের অভিযানের মুখে নদী পড়িলে চালক চমূ নদী তীরস্থ বৃক্ষারূঢ় হয়। তাহার পর দ্বিতীয়টি প্রথমের পিছনে কামড়াইয়া ধরে, তৃতীয়টি দ্বিতীয়কে মুখে করিয়া ঝুলাইয়া দেয়, এইরূপে বৃক্ষশাখা হইতে একটি পিপীলিকার দড়ি ঝুলিয়া পড়ে। এই লম্বমান রজ্জু নদীর স্রোতে ভাসিতে থাকে এবং পিপীলিকার যোগে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। সেই ক্রমঃবর্দ্ধমান এবং ভাসমান রজ্জুর সেতু-ক্রমশঃ পরপারের কূলে গিয়া আশ্রয় লাভ করে। তখন যেমন পরবর্ত্তী পিপীলিকা কূলে উঠে পূর্ব্ববর্ত্তী পিঁপড়া অমনি দেহ অসংলগ্ন করিয়া লয়। এইরূপে একটির পর একটি পিপীলিকা তীরে উঠিয়া, পরপারের জঙ্গল নির্দ্ধারণের চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়।

ইহাদের জ্ঞাতি ভ্রাতারা আছে ব্রেজিলে। (লর্ড আভেবেরী) সাহেবের পিপীলিকার পুস্তকে বর্ণনা আছে। সে বর্ণনা তিনি লইয়াছেন বেট্‌স্ নামক সাহেবের নিকট হইতে। আফ্রিকার বর্ণনা তিনি পাইয়াছেন Savage সাহেবের আমি উপরে ডু শেলু সাহেবের যে কথা বলিয়াছি, সাহেব প্রায় তাহাই বলেন। "Wonders of Animal Life" নামক পুস্তকে এই চালক পিপীলিকার অভিযানের

... একটা সুন্দর ছবি আছে। ইহাদের ভয়ে বনের ... দিয়া তাহাদের স্বাভাবিক বৈরিতা ভুলিয়া ... মানুষ, বাঘ, হরিণ, হস্তী প্রভৃতি ... বিকই এ চিত্রে শিখিবার অনেক ...।

... ভগবানের শিক্ষা চমৎকার— ... ধার উপকারিতা, ক্ষুদ্রত্বের ... বড় হইয়াছে—এ শিক্ষা না ... াগিবে না।

ব্যর্থ-সৃষ্টি।

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়]

রূপ ও সৌন্দর্য্য যদি সকলি অসার—
তাহাদের এ সৃষ্টি কি ব্যর্থ বিধাতার?
সৌন্দর্য্য যদ্যপি কেহ নাহি করে পান,
রূপরসে আদ্র নাহি হয় যদি প্রাণ,
লয় হ'ক স্রষ্টা সনে মিলুক আবার।
কোন্ প্রয়োজনে তারা লাগিবে ধরার?

সৃষ্টি ব্যর্থ? একি কথা কহিতেছি হায়—
রূপ রাজ্য অন্তর্গত বিশ্বশক্তি প্রায়;
সৌন্দর্য্যের গুণে মুগ্ধ মহাকবিগণ,
রূপের কটাক্ষে মত্ত প্রেমিক সুজন;
মানবের আকর্ষণ দোঁহা প্রতি ধায়।
সৃষ্টি নহে ব্যর্থ তব, হে মঙ্গলময়।

বকরীদ।

দেশে একটা নূতন সামাজিকতার স্রোত আসিয়াছে যাহার প্রভাবে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে—এ কথা ষ্টেট্‌সম্যান কাগজের সম্পাদকও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। উভয় সম্প্রদায় এই সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত করিবার জন্য সংযমের পরিচয় দিতেছে। কিন্তু 'অল ইণ্ডিয়া মোস্লেম লীগ' যে মহত্বের পরিচয় দিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া সকল হিন্দুর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিবে। এই বারে অমৃতসরের মজলিসে দিল্লীর অক্লান্ত-কর্ম্মী স্বাধীন-চিত্ত দেশ-হিতৈষী ডাঃ আন্‌সারী প্রস্তাব করেন যে বক্‌রীদের সময় মুসলমানগণ তাহাদের হিন্দু ভ্রাতাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য যথাসম্ভব গো-হত্যা না করিয়া অন্য জীব 'হালাল' করিবে। খুব আবেগের সহিত নিখিল ভারতের মুসলমান সভা—আট কোটী ভারতবাসী মোস্লেমের প্রতিনিধি সে প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে কোরবাণীর জন্য হিন্দু গৃহস্থ এই মহোৎসবের সময় মসজিদে খাসী ও ভেড়া পাঠাইত,—এবারেও তাহাই হইবে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই না হইলে কি ভারতবাসীর এত দুর্দ্দশা হয়! ধন্য মুসলমান সম্প্রদায়! আমরা এই সংযমের জন্য ডাঃ আনসারী প্রমুখ মুসলমান প্রধানগণের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। জয় ভারত-মাতার জয়! হিন্দু-মুসলমানের জয়!